শঙ্কাশিহর

প্রেমেন্দ্র মিত্র জয়ন্তী সেন

সম্পাদিত

গ্রন্থপ্রকাশ

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৭৩

প্রকাশক
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ,
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
বিভূতিভূষণ রায়
বিদ্যাসাগর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১৩৫।এ, মুক্তারামবাবু স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ মানব-চেতনার সহজাত ও আদিমতম অনুভূতির প্রতি আকর্ষণকে একটি শিশুর মুখে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বর্ষণঘন সন্ধ্যার নিবিড় রহস্যে অভিভূত হয়ে শিশু চাইছে তার মায়ের কোলে বসে আকাশ চেরা বিদ্যুতের প্রচণ্ড আবির্ভাবে ভয় পেতে, কারণ ভয় করতেই সে ভালোবাসে। এই ভয় করতে ভালোবাসার বিচিত্র নেশা, প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অতি আধুনিকতম মানব-চেতনার একটি বিশিষ্ট অংশকে ক্রমাগত চুম্বকের মত আকর্ষণ করে আসছে। ভয় কাকে বলে : যা অজানা, যা দুর্জ্ঞেয়, যার সহজ সরল ব্যাখ্যা হয় না, অস্ফুট কুয়াশার আড়ালে যার স্বরূপ, তাকক মনোবৃত্তির প্রান্ত ছাড়িয়ে অলৌকিক অবাস্তবের দেশে যার প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি, সেই অপরিচিত সত্তাকে ভয় করার উন্মাদনা আবহমান কাল ধরে আমাদের প্রতিটি রক্ত-কণিকার বুকে একই সঙ্গে অনাস্বাদিত শঙ্কা ও সুখের শিহরণ জাগিয়ে তুলছে। এই উন্মাদনা গুহামানবের নিবিড় সংশয়াচ্ছন্ন চিত্ত প্রকৃতির বিচিত্র খেয়াল-খেলাকে দেবত্বের মহিমায় মণ্ডিত করে আপন ধর্ম-চেতনার অঙ্কুরকে ক্রমশ সঞ্জীবিত করে তুলেছে। এই উন্মাদনা যুগে যুগে কালে কালে সুপ্ত মনকে দূরদূরান্ত পেরিয়ে নবদিগন্ত আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ করে, আমাদের চার-দেওয়ালে রুদ্ধ নির্বিঘ্ন ছক-কাটা জীবনের প্রশান্ত আবহাওয়ায় হঠাৎ-আলোর ঝলকানির মত উচ্ছ্বাস-আবেগের বন্যা দুকূল প্লাবিত করে নব নব অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সন্ধানে মনকে পাল তুলে ছুটে যেতে লুব্ধ করে। তারপর সভ্যতার রূপান্তর ঘটলে বহিঃপ্রকৃতির থেকে লক্ষ্য ক্রমশ স্থানান্তরিত হয়ে কেন্দ্রীভূত হয়েছে মানুষের মনোজগতের অপরিসীম রহস্যরোমাঞ্চকর পরিবেশে। বিজ্ঞান যখন দুর্জ্ঞেয় প্রাকৃতিক রহস্যের জটিলতাকে উত্তরোত্তর প্রমাণ-যুক্তির অকাট্য অস্ত্রে আমাদের

উন্মিলিত দৃষ্টির সামনে সহজবোধ্য করে তুলেছে তখন অজানাকে জানার অনিবার্য মোহে মানুষ চোখ ফিরিয়েছে নিজের মনের দিকেই। তার বৈচিত্র্য, রহস্য, গভীর অতল অসীম সমুদ্রের মত ব্যাপ্তি, তার নিষ্ঠুর ভয়ঙ্করের সাদৃশ্যে আকর্ষণীয় স্বরূপ মানুষের সৃজন-কল্পনাকে অনুপ্রেরণার তাগিদে বার বার মুখর করে তুলেছে।

তাছাড়া গতানুগতিক জীবনের ক্লান্তিকর একঘেয়েমির বেড়াজাল থেকে অবাধ মুক্তি পাওয়ার আনন্দ প্রতিফলিত হয় পলাতক মনোবৃত্তির মাধ্যমে। অজানার প্রতি উন্মাদ আকর্ষণের অন্যতম কারণ হিসেবে এই মনোভাবকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তাই শৈশবের রূপকথার জগতে অথবা প্রাচীনযুগের সাহিত্যে, কাব্য-গাথায়, নাটকে বাস্তবের সীমা লংঘন করার প্রবৃত্তি প্রবল। জানা পরিবেশ ছেড়ে সম্পূর্ণ কাল্পনিক বৈচিত্রে তখন পথ হারিয়ে গেছে। তারপর রুদ্ধনিঃশ্বাসে বিপদের, আশঙ্কার, ভয়ের, অবক্ষয়ের, অনিশ্চয়তার প্রচণ্ড ঝঞ্ঝায় দুলতে দুলতে অবশেষে নিশ্চিত পরিণতির সুধাশ্যামলিম তীর দৃষ্টিগোচরে এনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা। রূপকথার প্রাচুর্যময় রাজপুরীতে সুখসমৃদ্ধ আবহাওয়ার মধ্যে রাক্ষসখোক্কসের আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন সেখানেই। তা না হলে পরের পরিচ্ছেদে বিঘ্নবিহীন সুখী জীবনকে নেহাৎই জোলো মনে হয়। মৃত্যু আছে বলেই জীবন সুন্দর, দুঃখের আগুনে শোধিত হয়ে সুখ আরও উজ্জ্বলতর, ভয়াবহ অমানিশার অন্ধকার সূর্যকে প্রাতঃস্মরণীয় করে, সংশয়ের উদ্বেল-দোলার উপর অস্তিত্বে বিশ্বাস এত রমণীয়।

সাহিত্য যখন জীবনের দর্পণ, তখন জীবনের প্রতিটি অনুভূতি সাহিত্যেরসের উৎস বলেই পরিগণিত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বীভৎস রসও তাই আলঙ্কারিকদের মতে অন্যতম প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষ যখন ভয় পেয়েছে, ভয়কে উপভোগ করতে শিখেছে, তখনই

তার লেখনীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে সেই সব রহস্য-কাহিনী, ভীতিই যার প্রথম ও প্রধান উপাদান। ভীতিমূলক সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আলোচনা করা এই স্বল্পপরিসর মুখবন্ধে সম্ভব হবে না। তবু সংক্ষেপে বলা যায় প্রাচীন দৈত্য-দানব জাতীয় নানা অলৌকিক সত্তা, মধ্যযুগের অন্ধকাররূপী চিরন্তন অমঙ্গলের প্রতীক শয়তান, ও আধুনিক কালে মানুষের অন্তরের লোভ, ক্ষোভ, ঘৃণা, নীচতা, নিষ্ঠুরতার তামসিক রূপ-বর্ণনায় সাহিত্যের একটি শাখা পরিপুষ্টতা লাভ করে এসেছে। সেটা শুধু পাশ্চাত্য দেশেই নয়। আমাদের দেশের সাহিত্যর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এখানেও বীভৎস রসের আধিক্যের নিদর্শন যথেষ্ট মেলে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে এ জাতীয় রচনাকে আমরা অভিজাত-সাহিত্যের সুউচ্চ বেদীতে স্থান দিতে পারি কিনা। জনপ্রিয়তা বস্তুটি সাধারণত সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী। যা জনপ্রিয়, তার গুণাবলী ধ্রুপদী সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। আধুনিক ডিটেকটিভ উপন্যাস বা গল্প সেই কারণে অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেও উন্নাসিক সমালোচকবৃন্দের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারে পরিপূর্ণ মর্যাদা পায় নি। অথচ এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, সমলোচকেরা যতই পৃষ্ঠপোষকতা দানে বিরূপ হোন না কেন, সাধারণ মানুষ সেই উপেক্ষিত অবহেলিত জাতে ঠাঁই-না-পাওয়া গল্পের রসাস্বাদে আজ পর্যন্ত উচ্ছ্বসিত না হয়ে পারেন না। শঙ্কা, শিহরণ, রোমাঞ্চ, ভয়, কৌতূহল, উত্তেজনার সংমিশ্রণে আজকে যে ধরনের গল্প সর্বজন-চিত্তহারী হতে পেরেছে, তার সাহিত্য-মূল্য বিচারের নবপর্যায় শুরু হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর নিকৃষ্টতা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যিনি সমালোচকের আসন অলঙ্কৃত করে বসেছেন, তাঁকে সনির্বন্ধ আবেদন, মানব-মনের আদিমতম অনুভূতির প্রাঞ্জল প্রকাশকে তাচ্ছিল্য না করে তিনি যেন লোকপ্রিয়তার কারণাবলী খুঁটিয়ে বিচারের পরে এ জাতীয় সাহিত্যের

মূল্যায়নে ব্রতী হন। মহৎ সৃষ্টির সঙ্গে তুলনায় নয়, এর মূল্য স্বতন্ত্র এবং ভিন্নধর্মী। অতএব সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হলেও একেবারে উপেক্ষা করা বোধহয় অভিজাত সমালোচকের পক্ষেও আর সম্ভব নয়। বিশেষ করে এডগার অ্যালেন পো, স্যার আর্থার কন্যান ডয়েল থেকে শুরু করে বহু বিশিষ্ট গুণী সাহিত্য-স্রষ্টার লেখনী-নিঃসৃত বিখ্যাত গল্প-উপন্যাসের নূতন ধারা প্রবর্তন হবার পরে।

আজকের যুগ বিজ্ঞানের যুগ, যুক্তির যুগ। অতএব রহস্য-গল্পের কাঠামোয় অলৌকিকতা, অবাস্তবতা রূপকথাসুলভ সহজ পরিণতি সর্বদা পাঠকের তৃপ্তিদায়ক নাও হতে পারে। তবুও যতই বিজ্ঞানের অগ্রগতি হোক, যতই যুক্তির জোরালো আবেদন মানুষকে বাস্তব-সচেতন করে তুলুক, মানব-মনের পটভূমিকায় সেই চিরন্তন শিশু আজও তার উৎসুক চোখ মেলে রয়েছে অন্ধকারের দিকে। ভয় না পেলে আলোর স্বচ্ছ স্বরূপ উপলব্ধি হবে কেমন করে? সে কারণেই কোনো এক সমালোচক বিদ্রূপাশ্রিত কণ্ঠে যখন বলেছিলেন ডিটেকটিভ বই লেখা হয় বয়স্ক শিশুদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, তাঁর কথায় একটি সত্য উক্তি প্রকাশিত হয়েছিল।

১৮৪১ খৃস্টাব্দে আমেরিকায় এডগার অ্যালেন পো প্রথম গোয়েন্দা-গল্পের সৃষ্টি করলেন। এর আগে অষ্টাদশ শতকে অবশ্য ইংলণ্ডে "নভেল অফ টেরর" এর আবির্ভাব হয়েছিল। তার প্রকৃতি অবশ্য গোয়েন্দা-গল্পে ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। তবে সে যুগের পাঠক-মনে এ জাতীয় সাহিত্য যে প্রচুর আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল, তার প্রমাণ জনৈক সমালোচকের উদ্ধৃতি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি বলছেন, "শিল্প-সৃষ্টি হিসাবে এই রচনার উৎকর্ষ যাই হোক না কেন, "টেরর" বা ভীতি কাহিনী বহু জনকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। এর সাদৃশ্য অনেক উচ্চস্তরের শিল্পকর্মের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, এবং স্কট, ব্রন্টি-ভগিনীদ্বয় ও শেলীর কবিতায় পর্যাপ্ত প্রভাব বিস্তার করে।"

আজকের গোয়েন্দা-গল্পের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হোল, এই বিশেষ জনপ্রিয় কাহিনী-বিন্যাসে কোনো অযৌক্তিক অথবা অলৌকিক ঘটনা-সন্নিবেশ গ্রাহ্য হয় না। এই কাহিনীর প্রারম্ভে কোনো একটি বাস্তব-সমস্যার উদ্ভব এবং পরিশেষে তার অচিন্তনীয় সমাধান যুক্তির সাহায্যে প্রদর্শিত হবে। ভাষা সহজ, অথচ রসাশ্রিত। প্লট জমাট ঋজু, আপন গতিপথ থেকে কক্ষচ্যুত কখনই নয়, অতীব কৌতূহলোদ্দীপক এবং অবিশ্বাস্য পরিণতিতে সমাপ্তি। বাংলা ভাষায় রোমাঞ্চকর গল্পের অভাব ছিল না, কিন্তু প্রকৃত গোয়েন্দা-গল্প অনেক পরবর্তী যুগে সংযোজিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে 'দারোগার দপ্তর' রচিত প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি স্বীয় অভিজ্ঞতলব্ধ খুন-জখম চুরি-ডাকাতির সত্য ঘটনা গল্পের আকারে লিপিবদ্ধ করে বাঙালী পাঠকের গোয়েন্দা-কাহিনীর রস-আস্বাদনের সুযোগ এনে দেন। তারপরে নানা বিচিত্র ধারায় এ জাতীয় কাহিনী বাংলা সাহিত্যে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যদিও মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা যান্ত্রিক-সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তবুও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে শঙ্কা-শিহর জাগানো রহস্যাশ্রয়ী গল্পের মূল এবং প্রধানতম বৈশিষ্ট্য সেই প্রাচীন-যুগের মতই আদি ও অকৃত্রিম ভয় এবং কৌতূহল উৎপাদন করা। আমাদের ভয় বা কৌতূহল কোনদিনই মেটার নয়।

জয়ন্তী সেন

প্রথম গোয়েন্দা অর্থাৎ গুপ্তরহস্য-সন্ধানীর দেখা সাহিত্যে কোথায় পাই ?

সেই সঙ্গে বাধা-বিপদের বিরুদ্ধে দুঃসাহসিক অভিযানের ?

শ্রীমতী জয়ন্তী সেনের মূল্যবান ভূমিকাটিতে তার নির্দেশ দেওয়া আছে। সরকারি ভাবে মার্কিন লেখক এডগার অ্যালেন পো-কেই প্রথম গোয়েন্দা-কাহিনীর স্রষ্টা বলা যায়।

কিন্তু সাহিত্যে গোয়েন্দার এবং দুঃসাহসিক অভিযাত্রীর প্রথম উল্লেখ মাত্র এই সেদিনের নয়।

দুঃসাহসিক গুপ্তরহস্য-সন্ধানীর কথা সাহিত্যে প্রথম শোনা যায় দু-এক শ' এমনকি দু-এক হাজার বছর মাত্র আগে নয়। শুনি অন্তত সাড়ে তিন হাজার বছর আগে ত বটেই!

কোথায়, কোন সাহিত্যে ? সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার সাহিত্যে জেনেও যিনি অনুমান করতে এখনো পারেন নি তাঁকে একটু চমৎকৃত হতে হবে।

শুধু এদেশেরই নয়, সমস্ত বিশ্বসাহিত্যের মধ্যে সন্ধান করলেও প্রথম গোয়েন্দা ও দুঃসাহসিক পর্যটকের কাহিনী পাই ঋগ্বেদে।

ঋগ্বেদে অনেক কিছুই আছে আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করবার মত। এ কাহিনীটি তার মধ্যেও বেশ একটু অসাধারণ ও অপ্রত্যাশিত।

অপ্রত্যাশিত এই দিকে দিয়ে যে ঋগ্বেদের এই সূক্তটিতে কোনো দেবতার উচ্ছ্বসিত স্তুতি কি উৎসর্গের বিনিময়ে বর-প্রার্থনা নেই, আছে নিছক একটি গল্প। গল্প না বলে তাকে নাটকাংশ বলাই বোধহয় উচিত। কারণ সংলাপের মাধ্যমেই কাহিনীটি বলা হয়েছে।

কে এই কাহিনীর নায়ক ?

পুরুষ হয়ে বলতে লজ্জায় মাথা একটু হেঁট হয় বই কি !

কারণ নায়ক নন তিনি, নায়িকা।

ইতিকথা-রূপ সাহিত্যে প্রথম একাধারে গোয়েন্দা ও পর্যটক কোনো পুরুষ নন, সরমা নামে জনৈক অসামান্যা মহিলা।

সাহসের তাঁর অন্ত নেই আর তারই সঙ্গে বিচক্ষণতার। প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর গোপন আস্তানা খুঁজে বার করতে দুর্গম অজানা অরণ্য-পর্বত পার হয়ে তিনি একাই বেরিয়েছিলেন অবিশ্বাস্য দুঃসাহসে।

সে অভিযানে সফলও তিনি হয়েছিলেন।

শত্রুরাই তাঁকে তাদের দুর্গম গোপন আস্তানায় দেখে বিস্ময়-বিমূঢ়। বিস্ময়ের সঙ্গে শ্রদ্ধাও অবশ্য মিশ্রিত।

ঋগ্বেদের এই সূক্তটি যা দিয়ে সুরু—শত্রুদের সেই প্রথম সম্ভাষণেই সে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

হে সরমা কি জন্যে তুমি এখানে এসেছ ?—জিজ্ঞাসা করেছে তারা। তারপর বলেছে, এ অনেক দূরের পথ। পিছন দিকে তাকালে আর এখানে আসা যায় না। কী এমন দামী জিনিস আমাদের কাছে আছে যার জন্যে এই পথে তুমি এসেছ! ক'রাত্রি তোমার পথে কেটেছে ? নদীই বা পার হয়েছ কেমন করে ?

সরমা তার যা উত্তর দিয়েছেন তাতে একটি গভীর রহস্য যেমন উদ্‌ঘাটিত হয়েছে সেই সঙ্গে সে যুগের একটি বিস্ময়কর চিত্রও।

সরমা বলেছেন, ইন্দ্রের দূতী হিসেবে আমায় পাঠান হয়েছে। দেখো পণি-রা, তোমরা অনেক গরুর পাল চুরি করে এনে লুকিয়ে রেখেছ। সেই সব গো-পাল উদ্ধার করাই আমার উদ্দেশ্য।

সরমার এই উক্তিতে প্রথমেই আমাদের অবাক হতে হয়, দূতী হিসেবে একটি মেয়েকে ওই দারুণ দুঃসাহসিক কাজে পাঠান হয়েছে দেখে। ইন্দ্র ত আর যেমন-তেমন কেউ নন। তাঁর ক্ষমতা, বিচক্ষণতা,

লোকবল, কিছুরই অভাব ছিল না। তিনি আর সকলকে বাদ দিয়ে একটি মেয়েকে এ কাজের জন্য বাছাই করে তাকে রীতিমত মহীয়সী করে তোলার সঙ্গে সে যুগের ধারণাই আমাদের মনে পাল্টে দিয়েছেন।

ইন্দ্রদেবের নির্বাচন যে নির্ভুল, অপাত্রে তিনি যে দায়িত্ব অর্পণ করেন নি, এ সূক্তের পরবর্তী আলাপে তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পণি-রা বৈদিক যুগের আর্য দেবগোষ্ঠীর এক প্রবল শত্রুসম্প্রদায়। তারা আর্যদের গরুর পাল তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে সেবারে এমন এক পাহাড়-ঘেরা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিল যা খুঁজে বার করা প্রায়-অসাধ্য। সেই অসাধ্যসাধন করার জন্যেই শত্রুপক্ষের মেয়ে হলেও সরমাকে তারা বোনের মত নিজেদের দলে নিতে চেয়েছে এবং তাদের গোপন আশ্রয় অত্যন্ত সুরক্ষিত হলেও সরমাকে সেখানে লুকোন গাভীদের ভাগও দিতে চেয়েছে।

সরমা কিন্তু ঘৃণা ভরে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তাই নয়, ইন্দ্র ও পরাক্রান্ত অঙ্গিরার সন্তানদের নামে পণিদের শাসিয়ে তাদের লুট-করা গোধনের লোভ ছেড়ে পালাবার উপদেশ দিয়েছেন।

সরমার সদুপদেশ পণি-রা শুনেছিল কিনা জানি না। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৮ সংখ্যার সূক্ত আমাদের ওইটুকু জানিয়েই শেষ। বিবরণটি অসমাপ্ত হলেও তার মধ্যে রহস্য-রোমাঞ্চ-কাহিনীর সমস্ত উপাদানই কি পাই না? এমন কি বর্তমানে যে গুপ্তচর-ঘটিত কাহিনী বিদেশী সাহিত্যে জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেছে, তারও প্রথম নমুনা সরমা ও পণিদের ওই কাহিনীটিতেই পাই। গোয়েন্দা-অভিযাত্রী বা গুপ্তচর যাই বলি, তিনি মহিলা হওয়ায় রহস্য-কাহিনীর প্রথম বীজটির মূল্য আমাদের কাছে অনেক বেড়ে গেছে।

ঋগ্বেদের এই গল্পাংশটুকু একটু সবিস্তারে জ্ঞাপন করে এইটুকুই শুধু বোঝাতে চাই যে রহস্য-রোমাঞ্চের প্রতি আকর্ষণ, অজানা

সম্বন্ধে কৌতূহল, দুঃসাহস ও প্রহেলিকা-ভেদের বুদ্ধির প্রতি শ্রদ্ধা, এবং বিভীষিকাময় কল্পনা ও উপভোগ মানুষের মনের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। আমাদের মনের এই প্রবণতা ও রুচিকে তৃপ্ত করবার জন্যে সজ্ঞানে সাহিত্য-সৃষ্টি অবশ্য এক শতাব্দীর খুব বেশী আগে হয় নি। মার্কিন লেখক এডগার অ্যালান পো-ই এ বিষয়ে পথ দেখিয়েছেন। বর্তমানে রহস্য-রোমাঞ্চ-কাহিনী জনতোষণের ধান্দায় যে ব্যবসাদারী রূপ নিয়েছে তা অবশ্য তাঁর অভিপ্রেত ছিল না। তিনি সাহিত্যেরই একটি অনাবিষ্কৃত এলাকায় বিচরণ করতে চেয়েছিলেন নিজের মনের গঠনেরই বিরল ব্যতিক্রমের দরুন। এডগার অ্যালান পো-র ১৮০৯ খৃস্টাব্দে জন্ম, আর মৃত্যু ১৮৪৯-এ। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে ইওরোপীয় সাহিত্যে রহস্য-রোমাঞ্চের আবির্ভাব সুরু হয়ে তার কদর বাড়তে থাকে। ফরাসী ভাষায় Emile gaboriau আর ইংরেজিতে William Wilke Collins তখনকার এই জাতীয় কাহিনীকার হিসাবে স্মরণীয়। গোয়েন্দা কাহিনীকে শুধু জনপ্রিয়তার শিখরে নয় কলাকৌশলের সূক্ষ্মতায় আর বিন্যাস-চাতুর্যে বিশিষ্ট এক সাহিত্য-বিভাগের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন অবশ্য বিশ্ববিখ্যাত আর্থার কন্যান ডয়েল। তাঁর শার্লক হোম্স সর্বদেশের জনপ্রিয় সাহিত্যের অমর একটি চরিত্র।

ইওরোপ-আমেরিকায় রহস্য-রোমাঞ্চ কাহিনী শার্লক হোমস্-এর পদানুসরণ করে ইদানীং নানা বিচিত্র পথের সন্ধানী হয়েছে। তার সব বৈচিত্র্যই যে অনুমোদনযোগ্য তা বলতে বাধে। রহস্য-রোমাঞ্চের চেয়ে যৌন উত্তেজনা যোগাবার তাগিদই সেখানে বহু ক্ষেত্রে নির্লজ্জ ভাবে স্পষ্ট।

'শঙ্কা-শিহর' নামে বর্তমান সংকলনটির উপাদান শুধু গোয়েন্দা-কাহিনী কিন্তু নয়। নামটির ভেতর দিয়েই এই সংগ্রহটির কাহিনী-চয়নের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। ঋগ্বেদের সরমা ও পণিদের বৃত্তান্তে যার আভাস পেয়েছি মানুষের মনের সেই

চাহিদা মেটাবার মত কাহিনী আদিকাল থেকে যা এদেশের সাহিত্যে লেখা হয়েছে তারই বাছাই-করা নমুনা এ সংগ্রহে গ্রথিত। প্রাচীন পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যই যে আদি নিদর্শনগুলি যুগিয়েছে তা বলাই বাহুল্য। জাতক থেকে সুরু করে কথাসরিৎ-সাগর, দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা, বেতাল পঞ্চবিংশতি ও বিশেষ করে দশকুমার চরিত-এ যে সব উপাদেয় কাহিনীগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি শুধু 'শঙ্কা-শিহর' নামটিই সার্থক করেনি এ দেশের প্রাচীন সমাজ ও লোক-যাত্রার একটি ধারাবাহিক চিত্রও ফুটিয়ে তুলেছে। পরিবেশ ও জীবনযাত্রার প্রকরণ-পদ্ধতির যত পরিবর্তনই হোক আমাদের মনের ভালো-মন্দ অনেক বৃত্তির মত শঙ্কা-শিহরের আকর্ষণ যে চিরদিন সমান দুর্বার, প্রাচীন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এ জাতীয় রচনার সংগ্রহের প্রধান ইঙ্গিত বোধহয় এই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মহাসার জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব সর্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া তাঁহার অমাত্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। একদা রাজা বহু অনুচর সঙ্গে লইয়া উদ্যান-বিহারে গিয়াছিলেন। সেখানে বিচরণ করিতে করিতে তাঁহার জলকেলি করিবার বাসনা হইল এবং তিনি মঙ্গল-পুষ্করিণীতে অবতরণপূর্বক রাণীদিগকে আনাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন। রাণীরা আসিয়া স্ব স্ব মস্তক ও গ্রীবা হইতে আভরণ উন্মোচন এবং উত্তরীয় বসন পরিত্যাগপূর্বক পেটিকার ভিতর রাখিলেন এবং সেই সমস্ত দাসীদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পুষ্করিণীতে অবতরণ করিলেন।

এই সময়ে উদ্যানবাসিনী এক মর্কটী একটা বৃক্ষের শাখায় বসিয়াছিল। যখন অগ্রমহিষী আভরণ উন্মোচন করিয়া উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত পেটিকায় রাখিয়াছিলেন, তখন সে তাহা দেখিয়াছিল। তাহার ইচ্ছা হইল মহিষীর মুক্তাহারটি নিজের গলায় পরে। এই নিমিত্ত সে, দাসী কখন অন্যমনস্ক হইবে, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। দাসী প্রথমে চারিদিকে দৃষ্টি রাখিয়া আভরণগুলি রক্ষা করিয়াছিল, কিন্তু শেষে তন্দ্রাভিভূত হইয়া ঢুলিতে লাগিল। মর্কটী যেমন তাহার অনবধানভাব বুঝিতে পারিল, অমনি বায়ুবেগে বৃক্ষ হইতে অবতরণপূর্বক ঐ গজমুক্তাহার গলায় পরিল, এবং বায়ুবেগে বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শাখার অন্তরালে বসিয়া রহিল। অনন্তর পাছে অন্য কোন মর্কট দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় সে হারগাছটা তরুকোটরে লুকাইয়া রাখিল, এবং মুখখানি এমন করিয়া সেখানে বসিয়া পাহারা দিতে লাগিল যে কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে সে এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গ জানে ?

এই দাসীর যখন ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সে দেখিল হার নাই। সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ ? চোরে মহিষীর মুক্তামালা লইয়া পলাইয়া গেল।" এই কথা শুনিয়া চারিদিক হইতে প্রহরিগণ ছুটিয়া আসিল এবং দাসীর কথামত রাজাকে সংবাদ দিল। রাজা বলিলেন, "চোর ধর।"

তদনুসারে প্রহরীরা উদ্যান হইতে বাহির হইল এবং 'চোর ধর' 'চোর ধর' বলিয়া ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিল। এই সময় এক জনপদবাসী কর দিতে আসিয়াছিল, সে গণ্ডগোল শুনিয়া ভয় পাইয়া পলাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রহরীরা তাহাকেই চোর মনে করিল এবং প্রহার করিতে করিতে বিদ্রূপসহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওরে ধূর্ত চোর, তুই এমন মূল্যবান হার চুরি করিলি কেন ?"

জনপদবাসী ভাবিল, 'আমি যদি বলি হার চুরি করি নাই, তাহা হইলে আজ আমার প্রাণ বাঁচিবে না ; ইহারা প্রহার করিতে করিতেই আমায় মারিয়া ফেলিবে। অতএব চুরি করিয়াছি বলিয়া অপরাধ স্বীকার করাই ভাল। ইহা স্থির করিয়া সে বলিল, 'আমিই হার চুরি করিয়াছি বটে।" তখন প্রহরীরা তাহাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ঐ মহামূল্য হার অপহরণ করিয়াছ ?" হাঁ, মহারাজ।" "হার কোথায় ?" "দোহাই মহারাজ !" আমি বড় গরীব, হারই বলুন, আর খাটপালঙ্কই বলুন, আমার বাবার বয়সেও কখন এসব জিনিস দেখি নাই। শ্রেষ্ঠী মহাশয় বলিলেন, হারগাছাটা আনিয়া দে ; তাই আমি উহা লইয়া তাঁহাকে দিয়াছি। উহা এখন কোথায় আছে তিনিই বলিতে পারেন, আমি জানি না।" তখন রাজা শ্রেষ্ঠীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই ব্যক্তির হস্ত হইতে হার গ্রহণ করিয়াছ কি ? "হাঁ, মহারাজ।" "হার কোথায় ?" "পুরোহিত মহাশয়কে দিয়াছি।" অনন্তর পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, অমুক গন্ধর্বকে দিয়াছি আর গন্ধর্ব বলিল, 'পুরোহিত মহাশয় হার দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমি উহা প্রণয়োপহার স্বরূপ অমুক বারবিলাসিনীকে দান করিয়াছি।" তখন সেই বারবিলাসিনীকে আনয়ন করা হইল। সে কিন্তু বলিল, "আমি কোন হার পাই নাই।"

এই পাঁচটি লোক ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সূর্যাস্ত হইল। তখন রাজা বলিলেন "অদ্য আর সময় নাই, কল্য দেখা যাইবে। অনন্তর তিনি বন্দীদিগকে জনৈক অমাত্যের হস্তে সমর্পণপূর্বক নগরে প্রতিগমণ করিলেন।

বোধিসত্ব ভাবিতে লাগিলেন, হার হারাইল উদ্যানের অভ্যন্তরে, জনপদবাসী ছিল উদ্যানের বাইরে। উদ্যানদ্বারে বহু প্রহরী আছে। কাজেই ভিতর হইতে কেহ যে হার লইয়া বাহিরে পলায়ন করিয়াছে তাহা অসম্ভব। ফলতঃ ভিতর হইতে হউক কিংবা বাহির হইতেই হউক হার চুরি করিয়া

জনপদবাসী বলিয়াছে শ্রেষ্ঠীকে দিয়াছি, তাহা কেবল নিজেকে বাঁচাইবার জন্য, শ্রেষ্ঠী ভাবিয়াছেন পুরোহিতকে জড়াইতে পারিলে সহজে নিষ্কৃতি পাইবেন ; তাই তিনি পুরোহিতের নাম করিয়াছেন। কারাগৃহে গন্ধর্বকে লইতে পারিলে আমোদ-প্রমোদের সুবিধা হইবে, সেইজন্য পুরোহিত মহাশয় গন্ধর্বকেও ইহার মধ্যে ফেলিয়াছেন আর বারবণিতা সঙ্গে থাকিলে কারাযন্ত্রণার উপশম হইবে আশা করিয়া গন্ধর্বও এই রমণীকে দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। আমার অনুমান হয় এই পাঁচজনের একজনও চোর নহে। উদ্যানে বহু মর্কটী বাস করে, তাহাদের মধ্যে কোন মর্কটীই এ কাজ করিয়াছে।

এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বোধিসত্ত্ব রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, চোরদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে আজ্ঞা হউক। আমি তাহাদিগকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিব।" রাজা বলিলেন, 'এ অতি উত্তম প্রস্তাব, পণ্ডিতবর, আপনি তাহাদিগকে পরীক্ষা করুন।" তখন বোধিসত্ত্ব ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া আদেশ দিলেন, "বন্দী পাঁচজনকে একই স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখ এবং চারিদিকে পাহারা দাও। তাহারা পরস্পর কে কি বলে কান পাতিয়া শুনিবে এবং আমায় জানাইবে।" ভৃত্যেরা আজ্ঞামত কার্য করিল।

বন্দীরা একত্রে উপবেশ করিবার পর কথোপকোথন আরম্ভ করিল। শ্রেষ্ঠী জনপদবাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আরে জনপদবাসী ধূর্ত, তুই কি পূর্বে কখনও আমায় দেখিয়াছিলি, না আমি তোকে দেখিয়াছিলাম। তুই কখন হার দিলি বল ?" সে কহিল, 'শেঠজি, মহামূল্য হার তো দূরের কথা আমি ভাঙ্গা খাটিয়াখানা পর্যন্ত চক্ষে দেখি নাই। আপনার দোহাই দিয়া যদি বাঁচিতে পারি এই আশাতেই ও কথা বলিয়াছি।' তখন পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন, "মহাশ্রেষ্ঠিন্ যে দ্রব্য তুমি নিজেই ইহার নিকট পাও নাই, তাহা আমায় দিয়াছ কি প্রকারে বলিলে ?" শ্রেষ্ঠী উত্তর দিলেন, "ভাবিলাম আমরা দুইজনেই যখন উচ্চপদস্থ লোক তখন একসঙ্গে মিলিলে এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একটা পথ হইতে পারে।" গন্ধর্ব বলিল, 'ঠাকুর, তুমি তবে আমায় কখন হার দিয়াছিলে ? "ওহে তোমায় এখানে আনিতে পারিলে মনটা সুখে অতিবাহিত হইবে। তাই তোমায় জড়াইয়াছি।" সর্বশেষ বারাঙ্গনা বলিল, "তবে রে গন্ধর্ব ! তুই বা কেমন আমার কাছে আসিয়াছিলি, আর আমিই বা কখন তোর কাছে গিয়াছিলাম যে, তুই বলিলি আমায় হার

দিয়াছিস্ ?" গন্ধর্ব বলিলেন, "এত রাগ কেন ভাই ? তুমি কাছে থাকিলে বেশ ঘরকন্না করিবে, মনে কোন উদ্বেগ থাকিবে না, সময়টা সুখে কাটিবে, বোধহয় যেন বাড়ীতেই আছি ; সেইজন্য তোমার নাম করিয়াছি।"

নিয়োজিত মনুষ্যদিগের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বোধিসত্ত্ব নিশ্চিত বুঝিলেন ইহারা চোর নহে, কোন মর্কটীই হার লইয়াছে। তিনি স্থির করিলেন, এমন কোন উপায় করিতে হইবে যে মর্কট ঐ হার ফিরাইয়া দেয়। তিনি পদ্মবীজ দ্বারা অনেকগুলি হার প্রস্তুত করিলেন এবং কয়েকটা মর্কটী ধরাইয়া তাহাদের কাহারও হাতে, কাহারও গলে সেইগুলি পরাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। যে মর্কটী মুক্তাহার অপহরণ করিয়াছিল, সে বৃক্ষে বসিয়া তাহাই পাহারা দিতেছিল। বোধিসত্ত্ব উদ্যানস্থ লোকদিগকে বলিলেন, "তোমরা গিয়া বাগানের সমস্ত মর্কটীর উপর দৃষ্টি রাখিবে এবং যাহার গলে মুক্তার হার দেখিতে পাইবে তাহাকে ভয় দেখাইয়া উহা লইয়া আসিবে।"

এদিকে যে মর্কটীরা পদ্মবীজহার পাইয়াছিল তাহারা প্রহৃষ্টচিত্তে বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে বিচরণ করিতে করিতে সেই মুক্তাহারপহারিণী মর্কটীর নিকট গিয়া বলিল, দেখত. আমরা কেমন অলঙ্কার পাইয়াছি। "ইহাদের আস্ফালন তাহার অসহ্য হইল। সে বলিল! "ভারী তো হার! পদ্মবীজের হার পরিয়াই এত অহঙ্কার!" ইহা বলিয়া সে মুক্তার হার বাহির করিল। নিয়োজিত পুরুষেরা তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাড়া করিল, মর্কটী ভয়ে হার ফেলিয়া পলাইয়া গেল। তাহারা উহা বোধিসত্ত্বকে আনিয়া দিল। বোধিসত্ত্ব হার লইয়া রাজার নিকট গিয়া বলিলেন, 'মহারাজ, এই আপনার হার আনিয়াছি, এই পাঁচজন নিরাপরাধ, উদ্যানের একটি মর্কটী ইহা চুরি করিয়াছিল।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "পণ্ডিতবর, মর্কটী যে হার লইয়াছিল আপনি কি প্রকারে জানিলেন এবং কি উপায়েই বা ইহা প্রাপ্ত হইলেন।" তখন বোধিসত্ত্ব সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

পুর্ণপাত্রী জাতক

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজশ্রেষ্ঠীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। কতিপয় সুরাপায়ী তাঁহাকে বিষমিশ্রিত সুরাপান করাইয়া অচেতন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বোধিসত্ত্বের সুরাপানের ইচ্ছা ছিল না; কিন্তু তাহাদের ধূর্ততা প্রকাশ করিবার জন্য তিনি আপানভূমিতে গিয়াছিলেন এবং

তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে সুরা বিষ মিশ্রিত। অনন্তর তাহারা যাহাতে পলায়ন করে এরূপ উপায় স্থির করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, রাজভবনে গমনকালে সুরাপান করা বিধেয় নহে; তোমরা এখানে বসিয়া থাক; আমি ফিরিবার সময় ভাবিয়া দেখিব। পান করিতে পারি কিনা।

বোধিসত্ত্ব যখন রাজভবন হইতে প্রতিগমন করিতেছিলেন তখন ধূর্তরা তাহাকে পুনর্বার আহ্বান করিল। তিনি আপানভূমিতে গিয়া বিষ মিশ্রিত সুরাপাত্র দেখিয়া বলিলেন, ওরে ধূর্তগণ, তোদের আকার-প্রকার তো আমার ভালো বোধ হইতেছে না। আমি যাইবার সময় পানপাত্রগুলি যেমন পূর্ণ দেখিয়াছিলাম এখনও সেগুলি তেমনি আছে! তোরা সুরার গুণকীর্তন করিতেছিস বটে, কিন্তু নিজেরা এক বিন্দুও পান করিস নাই। এ সুরা যদি ভালো হইবে তবে তোরা পান করিলি না কেন? ইহা নিশ্চিত বিষ মিশ্রিত। এইরূপে বোধিসত্ত্ব ধূর্তদিগের দুরভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিলেন।

কথাসরিৎ সাগর

তাম্রলিপ্ত নগরে বসুদত্ত নামে এক ধনাঢ্য বণিক বাস করিত। সে পুত্র কামনায় বহু ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া প্রণাম পূর্বক, যাহাতে তাহার একটা পুত্র সন্তান হয়, তাহার অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করিলে, বিপ্রগণ কহিলেন, "বসুদত্ত! তুমি যে জন্য অনুরোধ করিতেছ, তাহা দুষ্কর কর্ম নহে; ব্রাহ্মণেরা শ্রুতিবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা সমস্তই সাধন করিতে পারেন। পূর্বকালে এক রাজার একশত পাঁচটি বন্ধ্যা মহিষী ছিল। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা জন্তু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিয়া সকল মহিষীর চক্ষে নবেন্দু সদৃশ আনন্দদায়ক হইল। একদা জানু প্রচলনযোগ্য হইয়া ইতস্তত: ক্রীড়া করিতে করিতে বালকের উরুদেশে এক পিপীলিকা দংশন করায় সে চীৎকার করিয়া উঠিলে, অন্ত:পুর হইতে মহান ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। রাজাও 'পুত্র পুত্র' করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বালকের জ্বালা শান্ত হইলে সে পূর্ববৎ ক্রীড়া করিতে লাগিল। এই ঘটনায় রাজা এক পুত্র হওয়ার নানা দোষ সপ্রমাণ করত ব্রাহ্মণ-গণকে আহ্বান করিয়া যাহাতে বহু পুত্র হয়, তাহার উপায় জিজ্ঞাসা

করিলে, ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, 'রাজন্' এক উপায় আছে, আপনি যদি আপনার এই পুত্রকে নষ্ট করিয়া তদীয় মাংস দ্বারা অগ্নিতে হোম করিতে পারেন, তাহা হইলে সেই গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া আপনার যাবতীয় রাজমহিষী গর্ভবতী হইয়া এক এক পুত্র প্রসব করিবেন। রাজা ব্রাহ্মণের এই আদেশ শিরোধার্য করিয়া পুত্রকে বিনাশপূর্বক তদীয় মাংস অগ্নিতে আহুতি দিলেন। রাজমহিষীগণ সেই গন্ধ আঘ্রাণমাত্র গর্ভধারণ করিয়া সকলেই এক এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। অতএব আমরাও হোমদ্বারা তোমার সন্তানলাভ বিষয়ক মনোরথ সিদ্ধ করিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণদিকের এই আদেশে বসুদত্ত হোমের সমস্ত আয়োজন করিলে দ্বিজগণ হোমকার্য সমাধা করিলেন। কিছুদিন পরেই বসুদত্তের এক পুত্র হইয়া গুহসেন নাম ধারণ করিল। গুহসেন শুক্লপক্ষের চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, বসুদত্ত একটি সুযোগ্য স্নুষার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কুত্রাপি মনোমত স্নুষা পাইল না। কিছুদিন পরে স্নুষা অন্বেষণার্থ গুহসেনের সহিত বাণিজ্য ছলে দ্বীপান্তর গমন করিল। তথায় ধর্মগুপ্ত নামক বণিক শ্রেষ্ঠের দেবস্মিতা নাম্নী সর্বগুণভূষিতা যে একটি কন্যা ছিল, বসুদত্ত গুহসেনের জন্য সেই কন্যা প্রার্থনা করিল। কিন্তু কন্যাবৎসল ধর্মদত্ত, তাম্রলিপ্তনগরী বহুদূর বলিয়া কন্যা দিতে অস্বীকার করিলে, দেবস্মিতা গুহসেনের রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পিতামাতা ও আত্মীয়গণকে পরিত্যাগপূর্বক তাহার সহিত পলায়ন করিতে কৃতনিশ্চয় হইল এবং বিশ্বস্ত সখী দ্বারা গুহসেনকে সংকেত করিয়া রাখিল। রজনীযোগে পিতামাতার অগোচরে গুহসেন এবং বসুদত্তের সহিত দ্বীপ হইতে পলায়ন করিল। কয়েকদিনের মধ্যে তাম্রলিপ্ত নগরে উপস্থিত হইয়া বসুদত্ত উভয়ের সম্মতিক্রমে পরিণয় কার্য সম্পাদন করিল। অনন্তর বরবধূ পরস্পর প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া নিরন্তর সুখসম্ভোগে কালযাপন করিতে লাগিল।

দৈবাৎ বসুদত্তের পরলোক হইলে বন্ধুবর্গ গুহসেনকে বাণিজ্যার্থ কটাহদ্বীপে পাঠাইবার বাসনা করিল। কিন্তু পতিপ্রাণা দেবস্মিতা ঈর্ষাকষায়িত চিত্তে অন্য স্ত্রী সংসর্গের আশঙ্কায়, পতিকে বিদেশে পাঠাইতে অস্বীকৃত হইল। গুহসেন বন্ধুগণের প্রেরণেচ্ছায় এবং দেবস্মিতার অনিচ্ছায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া "দেবী আমাকে এ বিষয়ে সৎপরামর্শ দিউন" এই অভিপ্রায়ে উপবাস করিয়া দেবালয়ে হত্যা দিল। পতির সঙ্গে সঙ্গে দেবস্মিতাও উক্ত ব্রত

ধারণ করিল। এইরূপে উভয়ে দেবতার দ্বারে হত্যা দিলে, দেবাদিদেব স্বপ্নে তাহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া পরস্পরকে এক একটি রক্তপদ্ম প্রদানপূর্বক কহিলেন, "তোমরা উভয়েই এক একটি পদ্ম হস্তে ধারণ কর। ইহাতে এই হইবেক যে পরস্পর বিযুক্ত হইলে, তোমাদের মধ্যে যদি কেহ দুঃশীল হও তবে অন্যের হস্তস্থ কমল ম্লান হইয়া যাইবে। সেই ম্লানিমা দর্শনে অন্যের দুঃশীলতা বুঝিয়া লইবে।" এই বলিয়া মহাদেব তিরোহিত হইলে, বণিক দম্পতী প্রবুদ্ধ হইয়া আপন আপন হস্তে এক একটি রক্তপদ্ম দেখিয়া বিস্মিত হইল। তদনন্তর অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া উভয়ে গৃহে চলিয়া আসিল। পরে শুভদিন দেখিয়া গুহসেন বিদেশ যাত্রা করিল। দেবস্মিতা গৃহে থাকিয়া শিবদত্ত কমলের প্রতি সর্বদা দৃষ্টিপাত করত কালযাপন করিতে লাগিল। গুহসেন নির্বিঘ্নে কটাহদ্বীপে পৌছিয়া ক্রয়-বিক্রয় আরম্ভ করিল। কটাহদ্বীপবাসী গুহসেনের মিত্রচতুষ্টয় তদীয় হস্তস্থিত পদ্মটাকে সর্বদাই অম্লান দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং তদীয় গূঢ় বৃত্তান্ত জানিবার জন্য একান্ত ব্যগ্র হইয়া গুহসেনকে একদা সুরাপান করাইয়া দিল। যখন দেখিল বেশ মত্ত হইয়াছে, তখন পদ্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, গুহসেন মদের ঘোরে সমস্ত রহস্য বলিয়া ফেলিল। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুষ্টাশয় বণিকপুত্র চতুষ্টয় এই পরামর্শ করিল যে, "গুহসেন যে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাতে সত্বর গৃহে যাইবে, এরূপ বোধ হয় না; অতএব চল আমরা অলক্ষিতভাবে তাম্রলিপ্ত নগরে গমন করি, এবং গুহসেন পত্নীর চরিত্রে দোষোৎপাদনে সচেষ্ট হই।" এইরূপ পরামর্শের পর সকলে তাম্রলিপ্ত নগরে গমন করিয়া একটি বাসস্থান গ্রহণ করিল, এবং অভীষ্ট সিদ্ধির নানাবিধ উপায় চিন্তা করত পরিশেষে যোগ করণ্ডিকা নাম্নী এক পরিব্রাজিকার শরণাগত হইয়া প্রীতিপূর্বক কহিল, "পরিব্রাজিকে! আমাদের একটি মনোরথ আছে, যদি আপনি তাহা পরিপূর্ণ করিতে পারেন, তবে আমরা বহু অর্থ পুরস্কার দিয়া আপনাকে সন্তুষ্ট করি।" শ্রবণমাত্র, পরিব্রাজিকা কহিল, "বোধহয় তোমরা এই নগরীর কোন স্ত্রীকে ইচ্ছা করিতেছ। তা আমি, সে কার্য সাধনে বিলক্ষণ পটু; আমার অর্থের লোভ নাই। সিদ্ধিকরী নামে আমার যে এক শিষ্যা আছে, সে অতিশয় বুদ্ধিমতী; আমি তাহার কল্যাণে অসংখ্য অর্থ উপার্জন করিয়াছি।" ইহা শুনিয়া বৈদেশিকগণ জিজ্ঞাসা করিল," শিষ্যার প্রসাদে কিরূপে অর্থলাভ করিয়াছেন?" পরিব্রাজিকা

কহিল, "যদি তোমাদের শুনিতে ইচ্ছা থাকে, তবে শুন।" এই বলিয়া আরম্ভ করিল—

কিছুদিন হইল, উত্তরাপথ হইতে এক বণিক এই দ্বীপে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। সিদ্ধিকরী তাহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া ক্রমে অতিশয় বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। একদা সে রাত্রিযোগে বণিকের যাবতীয় সুবর্ণ সম্পত্তি অপহরণ পূর্বক নগর হইতে পলায়ন করিলে, একজন শ্মশানরক্ষক সিদ্ধিকরীর এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া তাহাকে বঞ্চনা দ্বারা অপহৃত অর্থজাত গ্রহণ করিবার মানসে তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল। সিদ্ধিকরী কতকদূর যাইয়া এক বটবৃক্ষ মূলে উক্ত শ্মশানরক্ষককে নিকটবর্তী দেখিয়া দৈন্যভাবে কহিল, "মহাশয়! আমি স্বামীর সহিত কলহে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ করিবার মানস করিয়াছি। যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া একগাছি ফাঁসি তৈয়ার করিয়া দেন, তবে বিশেষ উপকৃত হই।" নির্বোধ শ্মশানরক্ষক সিদ্ধিকরীর এই বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ভাবিল, "যদি এই স্ত্রী উদ্বন্ধন দ্বারা মরে, তবে আমাকে আর স্ত্রীহত্যার পাতকী হইতে হয় না, অথচ অবাধে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।" এই স্থির করিয়া শ্মশানরক্ষক একটি ফাঁসি করিয়া সেই বৃক্ষে ঝুলাইয়া দিল। তদনন্তর সিদ্ধিকরী মুগ্ধভাবে কহিল, "মহাশয়! যদি এতদূর দয়া প্রদর্শন করিলেন, তবে কিরূপে উদ্বন্ধন করিতে হয়, অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হই।" মূর্খ শ্মশানরক্ষক তাহাতেও সম্মত হইল, এবং তাহার নিকট যে একটি মৃদঙ্গ ছিল, সেই মৃদঙ্গের উপর উঠিয়া, "এইরূপে উদ্বন্ধন করিতে হয়।" বলিয়া যেমন আপন গলে ফাঁসি লাগাইয়া দিল, অমনি দুষ্টা সিদ্ধিকরী এক পদাঘাতে সেই মৃদঙ্গটি ভাঙ্গিয়া দিল, অমনি হতভাগ্য শ্মশানরক্ষক ঝুলিয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এই সময় বণিক আপন সর্বনাশ টের পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইল; এবং দূর হইতে সর্বনাশী সিদ্ধিকরীকে সেই বটবৃক্ষমূলে অবলোকন করিল। সিদ্ধিকরীও দূর হইতে বণিককে আসিতে দেখিয়া অলক্ষিতভাবে সেই বৃক্ষে আরোহণ করিল, এবং পত্রসমূহ দ্বারা সর্বশরীর ঢাকিয়া লুকাইয়া রহিল। বণিক ভৃত্যগণসহ বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইয়া কেবলমাত্র উদ্বন্ধন দ্বারা মৃত শ্মশানরক্ষককে দেখিল, সিদ্ধিকরীকে দেখিতে পাইল না। "পাপীয়সী এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছে," এই বলিয়া বণিকের একজন সাহসী ভৃত্য সেই

বৃক্ষ আরোহণ করিল। ধূর্তা সিদ্ধিকরী ভৃত্যকে নিকটবর্তী দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "সুন্দর! আপনার প্রতি বহুকাল আমার ভালবাসা আছে। যখন এই বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছেন, তখন একবার আমার অভীষ্টসিদ্ধি করুন, আমি এই সমস্ত ধন আপনাকেই সমর্পণ করিব।" এই বলিয়া দুষ্টা সিদ্ধিকরী ভৃত্যকে আলিঙ্গনপূর্বক তদীয় মুখচুম্বনে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন দন্ত দ্বারা তদীয় জিহ্বা কাটিয়া লইল, অমনি ভৃত্য শোণিতমুখে "ললল্ল" এই শব্দ করিতে করিতে বৃক্ষ হইতে পড়িয়া গেল। এহ ব্যাপার দর্শনে বণিক ভৃত্যকে ভূতগ্রস্ত মনে করিয়া ভয়ে কম্পান্বিত কলেবর হইল; এবং সেই মুমূর্ষু ভৃত্যকে লইয়া সত্বর গৃহপ্রস্থান করিল। অনন্তর সিদ্ধিকরী আস্তে আস্তে বৃক্ষাগ্র হইতে আরোহণ পূর্বক সমস্ত ধন সঙ্গে লইয়া অবাধে গৃহে আসিল। এইরূপে বহুধন প্রাপ্ত হইয়াছি। সিদ্ধিকরী যে কতদূর কাজের লোক, তোমরা ইহাদ্বারাই তাহা বুঝিয়া লও।"

এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসিনী বিরত হইলে ক্ষণকাল পরে সিদ্ধিকরী তথায় উপস্থিত হইল, পরিব্রাজিকা বণিকপুত্রদিগকে সিদ্ধিকরীর পরিচয় দিয়া কহিল, "বৎস! তোমাদের অভিসন্ধি ব্যক্ত কর, কোন্ কুলকামিনীকে ইচ্ছা কর বল, সত্বর তাহাকে আনিয়া তোমাদের মনোরথ সিদ্ধ করিতেছি।"

কটাহদ্বীপবাসী বণিককুমারগণ প্রব্রাজিকার এইরূপ প্রগল্ভ বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া নগরবাসী গুহসেনের পত্নী দেবস্মিতাকে প্রার্থনা করিল। পরিব্রাজিকা 'তথাস্তু' বলিয়া, বণিকপুত্রদিগের বাসের জন্য আপন গৃহ ছাড়িয়া দিল। তদনন্তর নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী প্রদানদ্বারা গুহসেনের বাটীস্থ সমস্ত লোককে বশীভূত করিয়া সিদ্ধিকরীর সহিত তদীয় ভবনে প্রবেশ পূর্বক দেবস্মিতার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহদ্বারে শৃঙ্খলবদ্ধ যে এক কুক্কুরী ছিল সে তাহাদিগকে রুদ্ধ করিল। দ্বারদেশে পরিব্রাজিকাকে লক্ষ্য করিয়া দেবস্মিতা দাসী প্রেরণ দ্বারা তাহাদিগকে গৃহে লইয়া গেল। পরিব্রাজিকা আশীর্বাদ দ্বারা সাধ্বী দেবস্মিতার সম্বর্দ্ধনা করিয়া অশেষবিধ সমাদর পুরঃসর কহিল, "বৎসে! সর্বদাই তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে না। গতরাত্রিতে স্বপ্নে তোমাকে দেখিয়া চিত্ত অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইল; এজন্য আজ তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। বৎসে তোমাকে স্বামি-বিরহিত দেখিয়া আমার অন্তরে বড়ই কষ্টবোধ হইতেছে। যে স্ত্রীর রূপযৌবন ভর্তার উপভোগ বঞ্চিত হয়, তাহার রূপযৌবন সমস্তই বৃথা।"

ইত্যাদি নানা বাক্যে সাধ্বী দেবস্মিতাকে সমুত্তোজিত ও আশ্বস্ত করিয়া গৃহে চলিয়া আসিল। দ্বিতীয় দিবস পুনর্বার গুহসেনের গৃহে আসিয়া মরিচসম্বলিত মাংসখণ্ড সেই কুকুরীকে খাইতে দিয়া তদীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইল। কুকুরী অত্যন্ত ঝাল সেই মাংসখণ্ড খাইয়া নাসিকা এবং চক্ষুদ্বারা অনবরত বারিমোচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। এই সময় শঠ পরিব্রাজিকা দেবস্মিতার নিকট যাইয়া সহসা রোদন করিতে আরম্ভ করিল। দেবস্মিতা রোদনের কারণ জিজ্ঞাসিলে ধূর্তা অতি কষ্টে বলিল, "বৎস! ঐ যে কুকুরী তোমার দ্বারে বদ্ধ আছে, ও পূর্বজন্মে আমার সতিনী ছিল, আজ আমাকে দেখিয়াই পূর্বজন্ম স্মরণপূর্বক রোদন করিতেছে। যদি প্রত্যয় না হয়, বাহিরে যাইয়া দেখিয়া আইস। আর দেখ, কুকুরীর ক্রন্দন দেখিয়া আমার নেত্রও বারিবর্ষণ করিতেছে।" তাহা শুনিয়া বহির্গমনপূর্বক কুকুরীর নেত্রে অশ্রুধারা দেখিয়া সরলা দেবস্মিতা বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। অনন্তর পরিব্রাজিকা কহিল, "পুত্রি! পূর্বজন্মে এই শুনি এবং আমরা উভয়ে কোন ব্রাহ্মণের দুই ভার্য্যা ছিলাম। পতি রাজকার্য্যোপলক্ষে আমাদিগকে গৃহে রাখিয়া প্রায়ই দূরদেশে গমন করিতেন। সেই সময় আমি স্বেচ্ছানুসারে পুরুষান্তরে রত হইয়া প্রাণী ইন্দ্রিয়গণকে বিবিধ উপভোগ দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতাম। বৎসে! ধর্ম আর কিছুই নহে। প্রাণী এবং ইন্দ্রিয়গণকে পরিতৃপ্ত করাই পরম ধর্ম। সেই হেতু আমি ইহজন্মে জাতিস্মর হইয়াছি, আর এই শুনী পতির প্রবাসাবস্থায় অজ্ঞানতাবশতঃ প্রোষিতভর্তৃকার আচার কিছুমাত্র অতিক্রম করে নাই, এজন্য এ কুকুরযোণিতে জন্মগ্রহণ করিয়া রোদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।" তৎ শ্রবণে সুবুদ্ধি দেবস্মিতা পরিব্রাজিকার ধূর্ততা অনুমান করিয়া কহিল, "ভগবতি, আমি এরূপ ধর্ম অবগত ছিলাম না, আজ আপনার নিকট অবগত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। অতএব আপনি কোন একটা সুপুরুষকে আনিয়া দিউন, আমি তাহাকে ভজনা করিব।"

দেবস্মিতাকে সম্মত সে দেখিয়া পুলকিতচিত্তে কহিল, "দ্বীপান্তর হইতে চারিটি বণিকপুত্র আসিয়া আমার বাটীতে আছে, আমি তাহাদিগকে তোমার নিকট আনিয়া দিব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক।" এই বলিয়া পরিব্রাজিকা গৃহে চলিয়া গেল। অনন্তর দেবস্মিতা আপন দাসীকে আহ্বান পূর্বক কহিল, "সখি! এই ব্যাপারে বেশ অনুমান হইতেছে যে কটাহদ্বীপস্থ প্রাণনাথের হস্তে অম্লানপদ্ম দর্শনে বিস্মিত হইয়া কতিপয় বণিক্সুত কৌশলে

পদ্মের অম্লানতার কারণ অবগত হইয়াছে, এবং তথা হইতে এখানে আসিয়া ধূর্তেরা আমার ধ্বংসের জন্য এই কুট্টিনীকে নিযুক্ত করিয়াছে। ধূর্ততার উপর ধূর্ততা ব্যতিরেকে প্রতীকারান্তর দেখিতেছি না। অতএব তুমি সত্বর যাইয়া ধুস্তুর সংযুক্ত সুরা আনিয়া রাখ, এবং একটা কুক্কুরী-পাদমুদ্রা প্রস্তুত করিয়া রাখ।" ভর্তৃদারিকার এই আদেশ প্রাপ্তিমাত্র চেটীগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পরিব্রাজিকা সিদ্ধিকরীর পরিচ্ছেদে এক বণিককুমারকে দেবস্মিতার গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে রাখিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে কোন চেটী দেবস্মিতার বেশধারণপূর্বক পরম সমাদরে সেই সেই বণিকপুত্রকে ধুস্তুরমিশ্রিত সেই সুরাপান করাইল। বণিকপুত্র সুরাপান করিয়া ক্রমশঃ জ্ঞানশূন্য হইলে, চেটীগণ তাহাকে বিবস্ত্র করিল, এবং তদীয় ললাটদেশে সেই কুক্কুরের পায়ের ছাপ দিয়া একটা পচাখানায় ফেলিয়া আসিল। বণিকপুত্র রাত্রি অবসানে চৈতন্যলাভ করিয়া আপনাকে খ্যাতি নিমগ্ন দর্শনে অনুতাপ করিতে করিতে তথা হইতে উত্থিত হইল; এবং স্নান করিয়া নগ্ন শরীরে পরিব্রাজিকার গৃহে প্রবেশ করিল। "সকলেই আমার মত হউক" এই স্থির করিয়া এই মাত্র কহিল যে, পথে চৌরেরা তাহার কাপড় কাড়িয়া লইয়াছে। অতিজাগরণ এবং অপমানের জন্য অত্যন্ত শিরঃপীড়া হইয়াছে এই ভাণ করিয়া অঙ্কিত মস্তকে বস্ত্রবেষ্টন করিয়া রাখিল। দ্বিতীয় সায়ংকালে দ্বিতীয় বণিকসুত দেবস্মিতার গৃহে গমনপূর্বক ঐরূপ নাকাল হইয়া প্রাতঃকালে উলঙ্গভাবে বন্ধুগণ সমীপে উপস্থিত হইল, এবং এক তস্করে তাহারও সর্বস্ব হরণ করিয়াছে, বলিয়া রহস্য গোপন করিল। আর শিরঃশূল ব্যপদেশে সে-ও ললাটদেশ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিল। ক্রমে দুইটি যুবাও পূর্বরূপ নাকাল হইয়া আসিল। চারি জনের কেহই রহস্যভেদ না করিয়া সকলেই অর্থনাশ ও মনস্তাপ প্রাপ্ত হইল। পাপীয়সী কুট্টিনীও আমাদের মত জব্দ হউক, বণিকপুত্রেরা এই অভিপ্রায়ে তাহার নিকটেও কিছু প্রকাশ না করিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিল।

একদা পরিব্রাজিকা, অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছে, এই জ্ঞানে পরমাহ্লাদিতা হইয়া শিষ্যাসমভিব্যাহারে দেবস্মিতা গৃহে গমন করিল। দেবস্মিতা দুষ্টাশয়া পরিব্রাজিকাকে সমাগত দেখিয়া অন্তরে জলিয়া গেল, কিন্তু বাহিরে আদরপূর্বক বসাইয়া পরমসমাদরে ধুস্তুরসংযুক্ত সেই মদ্য উভয়কেই পান করাইয়া

নাসাকর্ণচ্ছেদনপূর্বক অশুচি পঙ্কে ফেলিয়া দিতে আদেশ করিল। অনন্তর বিদেশস্থ পতির অনিষ্টশঙ্কা করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইল, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত আপন শ্বশ্রূর নিকট প্রকাশ করিল। গুহসেনের মাতা তৎশ্রবণে কহিল "পুত্রি! বেশ করিয়াছে, কিন্তু বণিকপুত্রগণ পাছে বিদেশস্থ গুহসেনের কিছু অনিষ্ট করে এই ভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইতেছি।"

দেবস্মিতা কহিল, 'মাতঃ! পূর্বকালে পতিব্রতা শক্তিমতী আপন বুদ্ধিবলে যেমন নিজ ভর্তাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, সেইরূপ আমিও আমার পতিকে রক্ষা করিব, আপনি ব্যাকুল হইবেন না।' এই বলিয়া শ্বশ্রূকে সান্ত্বনাপূর্বক কহিল "জননি! আমাদের দেশে পূর্বপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভাবসম্পন্ন মণিভদ্র নামে এক মহাযক্ষ আছেন। তত্রত্য যাবতীয় লোক অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রায়ই সেই যক্ষ দেবালয়ে হত্যা দেয় এবং পূর্ণমনোরথ হইয়া গৃহে গমন করে। আর যে পুরুষ পরস্ত্রীর সহিত রাত্রিতে ধৃত হয়, রাজার আদেশে তাহাদিগকে সে-রাত্রি সেই যক্ষদেবের মন্দিরে রুদ্ধ করিয়া রাখা হয় এবং পর দিবস প্রভাতে তাহাকে রাজ-দরবারে আনয়নপূর্বক বিচার হয়। এক দিবস নগররক্ষক, সমুদ্র দত্ত নামে এক বণিককে, কোন পরস্ত্রীতে আসক্ত দেখিয়া, উভয়কেই ধরিয়া আনিল, এবং সেই যক্ষদেবের অন্তর্গৃহে সে রাত্রিতে রুদ্ধ করিয়া রাখিল।

এই ব্যাপার তখনি সমুদ্র দত্তের পতিপরায়ণা পত্নী শক্তিমতীর কর্ণগোচর হইল; সে পতির উদ্ধারে কৃত-সংকল্প হইল; এবং উদ্ধারের উপায়স্বরূপ দেবতার পূজা-গ্রহণপূর্বক দাসীসমভিব্যাহারে তদ্দণ্ডে যক্ষায়তনে গমন করিল। পূজক দক্ষিণার লোভে নগররক্ষককে বলিয়া শক্তিমতীকে দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিল। শক্তিমতী গৃহাভ্যন্তরে যাইয়া পতিকে পরস্ত্রীর সহিত সলজ্জ-ভাবে অবস্থিত দেখিল। অনন্তর বুদ্ধি কৌশলে ধূর্তস্ত্রীকে স্বকীয় পরিচ্ছদ পরাইয়া দাসীসহ বাহিরে যাইতে বলিলে, সে বহির্গত হইয়া পলায়ন করিল। এদিকে শক্তিমতী স্বামীর সহিত সেই দেবালয়ে রুদ্ধ রহিল। প্রভাতমাত্র রাজপুরুষেরা দ্বার উদ্ঘাটনপূর্বক সহধর্মিণীর সহিত বণিক সমুদ্র দত্তকে দেখিয়া প্রমাদ গণনা করিল, এবং রাজসমক্ষে দণ্ডিত হইল। বণিক সস্ত্রীক মুক্তিলাভ করিয়া গৃহে প্রস্থান করিল। মাতঃ! এইরূপে শক্তিমতী নিজ বুদ্ধিবলে পতিকে রক্ষা করিয়াছিল। আমিও কটাহ দ্বীপে গমন করিয়া আপন বুদ্ধিবলে পতিকে রক্ষা করিব।"

শ্বশ্রুদেবীকে এই কথা বলিয়া দেবস্মিতা বণিকের বেশ ধারণ করিল, এবং দাসীগণসহ নৌকারোহণপূর্বক বাণিজ্যচ্ছলে যাত্রা করিয়া কটাহ দ্বীপে উপস্থিত হইল। ক্রমে অনুসন্ধান দ্বারা, গুহসেনের বাসায় উপস্থিত হইয়া বণিকমণ্ডলী মধ্যে তাঁহাকে অবলোকন পূর্বক আশ্বস্ত হইয়া চলিয়া গেল। গুহসেনও পুরুষবেশধারিণী প্রিয়তমাকে দূর হইতে অবলোকন করিয়া ভাবিল, "এই যে বণিকটি দেখিতেছি, ইহার আকৃতি অবিকল প্রিয়ার ন্যায়! হইতেও পারে ঈশ্বরের সৃষ্টি মধ্যে কিছুই অসম্ভব নহে", ইত্যবসরে দেবস্মিতা রাজসমীপে গমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল "আমার একটি নিবেদন আছে, মহারাজ পৌরবর্গকে একত্র করিলে তাহা ব্যক্ত করিব।" এতৎশ্রবণে রাজা কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরবাসিদিগকে একত্র করিয়া কহিলেন, "তোমার কি বক্তব্য আছে বল।" দেবস্মিতা কহিল "মহারাজ! এই প্রজাবর্গের মধ্যে আমার চারিটি ভৃত্য আছে, আমি তাহাদিগকে প্রার্থনা করি।" রাজা কহিলেন, "সমস্ত পুরবাসী একত্র হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে যে চারিটি তোমার ভৃত্য আছে তাহা আমরা জানিনা, তুমি বাছিয়া লও।" রাজার এই আদেশে দেবস্মিতা সেই চারিজন বণিকপুত্রকে বাহির করিয়া কহিল, "মহারাজ! এই চারিটি আমার ভৃত্য। এক্ষণে মহারাজের আদেশ হইলে ইহাদিগকে লইয়া যাই," ইহা শুনিয়া পুরবাসিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল "ইহারা যে তোমার ভৃত্য তাহার প্রমাণ কি?"

দেবস্মিতা কহিল, "ইহারা আমার ছাপ্ মারা ভৃত্য, হয় না হয় উহাদের ললাটদেশ দেখুন; কুকুরের পায়ের থাবা উহাদের কপালে অঙ্কিত আছে।" ইহা শুনিয়া তাহাদের শীর্ষপট্ট উন্মোচনপূর্বক ললাটদেশে সারমেয়পদচিহ্ন দর্শন করিয়া যাবতীয় বণিক লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিল। রাজাও বিস্মিত হইয়া ইহার তথ্য জানিতে উৎসুক হইলে দেবস্মিতা সেই রাজসভায়, সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণনা করিল। লোকের হাস্যধ্বনিতে সভামণ্ডল পরিপূর্ণ হইলে রাজা কহিলেন "হাঁ, ইহারা সত্যই তোমার দাস," তখন পুরবাসিগণ তাহাদের দাসত্বমোচনের মূল্যস্বরূপ ভূরি সম্পত্তি সাধ্বী দেবস্মিতাকে প্রদান করিল এবং তাহার পাতিব্রত্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব ভবনে গমন করিল। অনন্তর সেই দেবস্মিতা সেই প্রসাদলব্ধ অর্থ গ্রহণপূর্বক আপন পতিকে লইয়া তাম্রলিপ্ত নগরী প্রস্থান করিল, এবং পতিবিয়োগশূন্য হইয়া চিরকাল পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

দশকুমার চরিতের গল্প

মহাকবি দণ্ডাচার্য

নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন আমি চম্পা নগরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া জানিলাম, তথায় যথেষ্ট ধনীলোক বাস করে, কিন্তু সকলেই কৃপণ; সৎকর্মে কেহই একপয়সা ব্যয় করে না। পরন্তু দুর্বলের উৎপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। তখন আমি তাহাদিগকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক হইলাম। প্রথমতঃ দ্যূত ক্রীড়াকারীদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলাম। এখন কোন দ্যূতকর ক্রীড়াস্থলে অনবধানতা প্রকাশ করিলে আমি হাসিয়াছিলাম। তাহাতে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্যূতকর ক্রুদ্ধ হইয়া আমার সহিতই দ্যূত ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিল। আমিও সম্মত হইয়া তাহার সহিত খেলা করিতে লাগিলাম এবং তাহার নিকট হইতে ষোড়শ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা জিতিয়া লইলাম, লব্ধ মুদ্রার অর্দ্ধভাগ লইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলাম। অধ্যক্ষ ও দ্যূতকরগণ আমার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং আমার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। অধ্যক্ষমহাশয় পথিমধ্যে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরমাদরে বাটীতে লইয়া গেলেন, সে দিন তাহার অনুরোধে তাঁহার বাটীতেই আহারাদি সম্পন্ন করিলাম। যাহার খেলার অসাবধানতা দেখিয়া আমি হাসিয়াছিলাম, তাহার নাম বিমর্দক; সেই সূত্রে তাহার সহিত আমার অত্যন্ত সদ্ভাব হইল। ক্রমে সে আমার অতীব বিশ্বাসপাত্র দ্বিতীয় হৃদয়স্বরূপ হইয়া উঠিল। তাহার দ্বারা নগরবাসীদিগের কাহার কিরূপ স্বভাব, কে কি কার্য করে এবং কাহার কত আছে—সমস্তই জানিয়া লইলাম এবং চৌর্যবৃত্তির উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া রাত্রিকালে কুকর্মপরায়ণ কোন ধনীর বাড়ীতে গিয়া প্রচুর অর্থ অপহরণ করিলাম। চুরি করিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলাম, এক সর্বাঙ্গ সুন্দরী যুবতী সুসজ্জিত হইয়া গমন করিতেছে। আমি তাহার নিকটবর্তী হইয়া তাহার পরিচয় ও রাত্রিকালে বহির্গত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ভয় গদ্‌গদস্বরে আমাকে কহিল, মহাশয়! এই নগরে কুবের দত্ত নামে এক ধনাঢ্য বণিক আছেন;

আমি তাঁহার কন্যা। আমার নাম কুলপালিকা। আমি জন্মিবামাত্রই আমার পিতা, ধনমিত্র নামক অত্রত্য কোন ধনী-সন্তানের সহিত আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখেন। কিন্তু এক্ষণে সেই ধনী-সন্তান বদান্যতা-গুণে দরিদ্র পোষণ করিয়া নিজেই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, এই কারণে পিতা অর্থপতি নামক অন্য এক ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিয়াছেন। অদ্য রাত্রি প্রভাতেই সেই অশুভ বিবাহ হইবার কথা। কিন্তু আমি ধনমিত্রকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। এবং তাঁহাকে অগ্রেই সমস্ত সংবাদ শুনাইয়া রাখিয়াছি। তাঁহার সঙ্কেতানুসারে অদ্য পলায়ন করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে যাইতেছি। আপনি দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন। এবং আমার এই অলঙ্কার গ্রহণ করুণ" এই বলিয়া সেই যুবতি আমার হস্তে অলঙ্কার-ভাণ্ড সমর্পণ করিল। আমি তাহাকে বলিলাম সাধ্বি! তোমার কোন ভয় নাই; আইস, আমিই তোমাকে তোমার প্রিয়তমের নিকট দিয়া আসি, এই বলিয়া সেই কন্যাটাকে সঙ্গে লইয়া দুই চারি পা অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিলাম, কতকগুলি রক্ষিপুরুষ আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া সেই বালিকা সাতিশয় ভীত হইল। আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলাম, কোন ভয় নাই, আমার এমন ক্ষমতা আছে যে, উহাদিগকে পরাভব করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট সম্ভাবনা; এজন্য আমি এক সহজ উপায় স্থির করিয়াছি। উহারা নিকটে আসিতে না আসিতেই আমি সর্পদষ্টের ন্যায় বিষবিকার প্রদর্শন পূর্বক অচেতনভাবে পড়িয়া থাকি। উহারা নিকটে আসিলে তুমি বিশেষ দুঃখিত ভাবে উহাদিগকে বলিবে, "মহাশয়গণ! ইনি আমার স্বামী; রাত্রিকালে আমরা উভয়ে একসঙ্গে যাইতেছিলাম। পথিমধ্যে ইঁহাকে সর্পে দংশন করিয়াছে; আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি, আপনারা ইহার প্রাণদান করিয়া আমাকে জীবিত করুন।" তখন সেই বালিকা অগত্যা আমার কথামত কার্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমিও সর্পদষ্টের ন্যায় পড়িয়া রহিলাম। সেই রক্ষিগণ নিকটে আসিলে বালিকা আমার কথামত কার্য করিল। তাহাদিগের মধ্যে একজন বিষবৈদ্যাভিমানী আমাকে নাড়িয়া চাড়িয়া অনেক মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য হইতে না পারিয়া কহিল, "ইঁহাকে কালসর্প দংশ করিয়াছে, জীবনের আশা একেবারে নাই। তুমি

আর কাঁদিয়া কি করিবে: গৃহে যাও। কল্য আমরা আসিয়া ইহার সংকারাদির ব্যবস্থা করিব।" এই বলিয়া তাহারা যথাস্থানে গমন করিল। আমিও গাত্রোত্থান করিয়া সেই রমনীকে সঙ্গে লইয়া ধন মিত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। ধনমিত্র প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইল এবং আমার একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িল। আমিও তাহার সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিলাম। তৎপরে ধনমিত্র প্রিয়তমাকে লইয়া দেশত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমি তাহাকে বারণ করিয়া বলিলাম, "দেশ ত্যাগ করিও না; তাহাতে তোমার কাপুরুষতা প্রকাশ পাইবে। যাহাতে তুমি এই স্থানে ইহাকে লইয়া সুখে বাস করিতে পার, তাহার চেষ্টা করা প্রয়োজন। আপাততঃ আইস, ইহাকে ইহার পিতৃগৃহে রাখিয়া ইহার পিতার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া লইয়া আসি।" এই বলিয়া ধনমিত্রকে সঙ্গে করিয়া সেই রাত্রেই কন্যাটিকে কুবের দত্তের গৃহে রাখিয়া সেই কন্যাটির সাহায্যে কুবের দত্তের যথাসর্বস্ব লইয়া বহির্গত হইলাম। পথিমধ্যে কতকগুলি প্রহরীকে আসিতে দেখিয়া আমরা পথিপার্শ্বস্থ কোন মত্তহস্তীর উপরে আরোহন করিলাম এবং সেই হস্তীর সাহাচর্য রক্ষিবর্গের পরাভব করিয়া অর্থপতির গৃহদ্বার চূর্ণবিচূর্ণ করিলাম। তৎপরে এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষের শাখা অবলম্বন পূর্বক হস্তী ছাড়িয়া দিয়া ক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া স্বগৃহে আসিয়া শয়ন করিয়া রহিলাম। ক্রমে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধাপূর্বক নগরমধ্যে বিচরণ করিলাম,—দেখিলাম কুবের দত্ত ও অর্থপতির বাড়ীতে মহাকোলাহল। চারিদিকে চুরির কথা লইয়া আন্দোলন হইতেছে। কুবের দত্তের যথাসর্বস্ব গিয়াছে। কন্যার বিবাহের জন্য সে মহাভাবিত হইল।

অর্থপতি তাহাকে অর্থদানে আশ্বস্ত করিয়া একমাস পরে বিবাহ করিতে সম্মত হইল। আমি তৎপরে এক চর্মভস্ত্রিকা নির্মাণ করিয়া ধনমিত্রকে বলিলাম, "ভাই! তুমি এই চর্মভস্ত্রিকা নিয়া অঙ্গরাজের নিকট বল,— মহারাজ! আপনি বোধ হয় জানেন, আমি অগাধ সম্পত্তিশালী বসুমিত্রের পুত্র, আমার নাম ধনমিত্র। আমি আর্থিবর্গের মনোরথ পূরণ করিয়া দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। কুবের দত্ত আমাকে কন্যাদান করিবেন প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমি দরিদ্র হইয়াছি বলিয়া অর্থপতিকে দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। আমি সেই অভিমানে নিবিড় বনে গিয়া আত্মহত্যা করিতে

উত্তত হইলে এক জটাধর মহাপুরুষ আসিয়া আমাকে বাধা দিয়া বলিলেন, তুমি এইরূপ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেছ কেন? আমি তাহার নিকটে দুঃখের কারণ বলিলে তিনি কৃপা করিয়া আমার উপর অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন—বলিলেন—বৎস! তুমি অতি নির্বোধ। সামান্য অর্থের জন্য তোমার এইরূপ আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হওয়া ভাল হয় নাই। অর্থোপার্জন কত উপায়ে হইতে পারে, কিন্তু একবার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই। তোমার আর চিন্তা নাই, আমি একন মন্ত্রসিদ্ধ। তপোবলে আমি একরত্নপ্রসবিনী চর্মভস্ত্রিকা লাভ করিয়াছি। এই চর্মভস্ত্রিকার প্রসাদে আমি কামরূপ দেশে বহুতর প্রজা প্রতিপালন করিয়াছি। এক্ষেত্রে তোমাকে আমি এই চর্মভস্ত্রিকাটি প্রদান করিতেছি। ইহা বণিক বা বেশ্যার নিকটে থাকিলেই রত্ন প্রসব করে। কিন্তু যে ইহা রাখিবে, প্রথমে তাহার পূর্বোপার্জিত অর্থ দুঃখী দরিদ্রকে দান এবং অন্যায়োপার্জিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। তৎপরে প্রত্যহ এই চর্মভস্ত্রিতা পূজা করিয়া পবিত্র স্থানে রাখিয়া দিলে প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে ইহা রত্নে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই বলিয়া তিনি আমাকে চর্মভস্ত্রিকা প্রদান করিয়া কোন গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। আমি তাহা মহারাজকে নিবেদন না করিয়া রাখিতে পারি না, এই কারণে আপনার নিকট আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে আপনার অনুমতি হইলে, আমি ইহা বাটীতে রাখিয়া দিতে পারি। রাজা ইহা শুনিয়া নিশ্চয়ই তোমাকে অনুমতি দিবেন। তুমি পুনরায় তাঁহাকে বলিবে, "মহাশয়! আমার এই চর্মভস্ত্রিকাটী কেহ যাহাতে চুরি করিতে না পারে, অনুগ্রহপূর্বক আপনাকে তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।" রাজা তাহাও স্বীকার করিলেন। তাহার পরে তুমি বাড়ী আসিয়া দুঃখী-দরিদ্রকে ধন বিতরণ করিতে আরম্ভ করিবে, রাত্রিকালে এই চর্মভস্ত্রিকাটী চৌর্যলব্ধ ধনে পূর্ণ করিয়া রাখিবে এবং প্রাতঃকালে সকল লোককে ডাকিয়া দেখাইবে। তাহার পরে দেখিবে, কুবেরদত্ত অর্থপতিকে তৃণজ্ঞান করিয়া অর্থলোভে তোমাকেই কন্যা দান করিবে, অর্থপতি তখন কুপিত হইয়া ধনগর্বে তোমার উপরে দ্বেষ প্রকাশ করিতে থাকিবে। অতঃপর আমারও তাহাকে অদ্ভুত উপায়ে কৌপীনাবশিষ্ট করিব। এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এবং আমাদের চৌর্যকার্যও কোনরূপে প্রকাশ হইতে পারিবে না।" ধনমিত্র হৃষ্টচিত্তে আমার উপদেশ মত

অন্যায় অর্থ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তাহা ফিরাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে সে প্রায় যথাসর্বস্ব সৎকর্মে ব্যয় করিয়া ফেলিল।

অনন্তর ধনমিত্র আমার পরামর্শে রাজার নিকটে গিয়া বলিল, "মহারাজ! যে কামমঞ্জরী পূর্বে কাহাকেও এক পয়সাও দিত না, সে এক্ষণে অকাতরে দীনদুঃখীকে অজস্র অর্থ দান করিতেছে। আমার বোধ হইতেছে চর্মভস্ত্রিকা তাহারই হস্তগত হইয়াছে।"

রাজা ধনমিত্রের কথা শুনিয়া কামমঞ্জরীকে ডাকাইলেন। আমিও তখন অতিশয় দুঃখিতভাব প্রকাশ করিয়া কামমঞ্জরীকে বলিলাম, "তুমি প্রকাশ্যভাবে অজস্র অর্থরাশি বিতরণ করিতে আরম্ভ করায়, রাজা তোমার নিকটে ধনমিত্রের চর্মভস্ত্রিকা আছে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। এবং সেই কারণেই তোমাকে ডাকিয়াছেন। দেখিতেছি, রাজা জিজ্ঞাসা করিলে তুমি, আমারই নামোল্লেখ করিবে। তাহা হইলে আর আমার বাঁচিবার আশা নাই। আমার বিরহে তোমার ভগিনীরও জীবননাশের সম্ভাবনা। তুমি তো সর্বস্বান্ত হইয়াছ, চর্মভস্ত্রিকার আশাও তোমায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে। সুতরাং বিপদ চারিদিকে। এক্ষণে উপায় কি?" কামমঞ্জরী আমার কথা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "তাই ত বড়ই ভাবনার কথা, তোমার নাম উল্লেখ করিলে, আমাদের চারিদিকে বিপদ। তবে এক উপায় আছে। চর্মভস্ত্রিকা-হরণাপবাদ অর্থপতির স্কন্ধেই রহিয়াছে। এক্ষণে তাহার নাম করিলে তোমাকে রক্ষা করা যাইতে পারে। আমাদের ক্ষতি যাহা হইবার, তাহা তো হইয়াছেই; এক্ষণে তোমাকে রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য। অর্থপতি পূর্বে আমাদের বাড়ীতে গতায়াত করিত, তাহা এখানকার সকলেই জানে। সুতরাং অর্থপতির উপর দোষারোপ করিলে রাজা তাহা অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন। অর্থপতিও সেই অপবাদে কারারুদ্ধ আছে। সুতরাং তাহার উপর দোষারোপের অপলাপও কেহ করিতে পারিবে না।" এই স্থির করিয়া কামমঞ্জরী রাজভবনে গিয়া প্রথমতঃ চর্মভস্ত্রিকা কে দিয়াছে বলিতে সম্মত হইল না, শেষে রাজার যথেষ্ট পীড়াপীড়িতে "অর্থপতি দিয়াছে" বলিয়া প্রকাশ করিল। রাজা হতভাগ্য অর্থপতিকেই দোষী স্থির করিয়া তাহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ধনমিত্র সাধুতা দেখাইয়া রাজার নিকট অনুরোধ করিল, "মহারাজ! আমার এই অনুরোধ, উহাকে প্রাণে মারিবেন না। যদি দণ্ড দেওয়া অত্যাবশ্যক হইয়া থাকে ত যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া

উহাকে চিরদিনের জন্ম নির্বাসিত করিয়া দিন।" রাজা ধনমিত্রের সহৃদয়তা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার কথায় সম্মত হইয়া যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া অর্থপতিকে নির্বাসিত করিলেন। সাধারণের নিকটে ধনমিত্রের সুখ্যাতির অবধি রহিল না। সকলেই ধনমিত্রকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। রাজা কামমঞ্জরীর নিকট হইতে চর্মভস্ত্রিকা লইয়া ধনমিত্রকে প্রদান করিলেন; এবং ধনমিত্রের অনুরোধে কামমঞ্জরীকে অর্থপতির অর্থের কিয়দংশ প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন।

এইরূপে অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া আমি চৌর্য লব্ধ অর্থে রাগমঞ্জরীর গৃহ পূর্ণ করিলাম। ক্রমে তথাকার যাবতীয় কৃপণ ধনিগণকে এইরূপে সর্বস্বান্ত করিলাম, যে সকল দরিদ্র অস্মদত্তধনে ধনী হইয়াছে তাহাদিগের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল।

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা

মহাকবি কালিদাস

বিশালা নগরীতে মহাশৌর্য-বীর্য সমন্বিত নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি নিজ ভুজবল দ্বারা সমস্ত অরি-নৃপতিগণকে নিজ পাদপদ্মের অধীন করিয়া একচ্ছত্রে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই রাজার জয়পাল নামে এক পুত্র, ষড়্বিধ দণ্ড ও আয়ুধাভিজ্ঞ, বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন এক মন্ত্রী এবং ভানুমতী নামে ভার্যা ছিল। সেই ভানুমতী রাজার অত্যন্ত প্রিয়া ছিলেন। ভূপতি তাঁহাতে সর্বদা অনুরক্ত থাকিয়া সুরতসুখ অনুভব পূর্বক বাস করিতেছিলেন। রাজা যখন সিংহাসনে বসিতেন, তখন ভানুমতীকে তাঁহার অর্ধাঙ্গে বসাইতেন, ক্ষণমাত্রও তাঁহার বিরহ সহ্য করিতেন না। একদিন মন্ত্রী মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে রাজা নির্লজ্জ হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনে আপন স্ত্রীকে বসাইয়া থাকেন। সমস্ত লোকই তাঁহাকে দেখিয়া থাকে, সুতরাং ইহা বড় অনুচিত।

এইরূপ চিন্তা করিয়া মন্ত্রী একদিন অবসর পাইয়া রাজাকে কহিলেন, হে রাজন! আপনাকে জানাইবার কোন বিষয় আছে। রাজা কহিলেন, কি, তাহা বল। মন্ত্রী বলিলেন, ভানুমতী যে সভামধ্যে আপনার অর্ধাসনে উপবেশন করেন, ইহা অতিশয় অনুচিত বিষয়। রাজমহিষী অসূর্যম্পশ্যা, ইহা শাস্ত্রকারদিগের বাক্য। এখানে নানাবিধ ব্যক্তিগণ আসিয়া তাঁহাকে

দর্শন করে। রাজা কহিলেন, সকলই জানি, কি করি, ভানুমতীতে আমার অতিশয় প্রীতি, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারি না। মন্ত্রী বলিলেন, তবে এইরূপ করুন। রাজা বলিলেন, কি, তা নিরূপণ করুন। মন্ত্রী বলিলেন, চিত্রকর দ্বারা পটের উপর ভানুমতীর রূপ লিখিয়া সম্মুখস্থ ভিত্তিতে তাহা রাখিয়া দিয়া তাঁহার রূপ দর্শন করিবেন। মন্ত্রীর বাক্য রাজার চিত্ত আকর্ষণ করিল। তখন রাজা চিত্রকরকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, হে চিত্রকর! তুমি ভানুমতীর রূপ চিত্রে অঙ্কিত কর। চিত্রকর বলিল, হে দেব! আমি প্রথমে তাঁহার রূপ প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া পরে যেখানে যেরূপ অবয়ব, সেইরূপ অঙ্কিত করিব। তাহা শুনিয়া রাজা ভানুমতীকে আহ্বান করিয়া চিত্রকরকে দেখাইলেন। সে তাঁহাকে দেখিয়া, ইনি পদ্মিনী স্ত্রী, এইরূপ মনে করিয়া, পদ্মিনী লক্ষণযুক্ত করিয়া অঙ্কিত করিতে লাগিল। পদ্মিনীর লক্ষণ যথা—যে রমণীর দেহ কমলকোরকের ন্যায় মৃদু, যাহার গাত্রগন্ধ প্রফুল্লকমল তুল্য, অঙ্গে দিব্য সৌরভ, যাহার সুরতরসে সুগন্ধ, যাহার নেত্রযুগল চকিত হরিণ-সদৃশ এবং প্রান্তদেশ রক্তবর্ণ, স্তনযুগল বিল্বফল তুল্য শোভাকর ও অত্যুচ্চ, যাহার নাসিকা তিলপুষ্পের ন্যায়, যে নারী সর্বদাই শ্রদ্ধাপূর্বক দ্বিজ, দেবতা ও গুরুপূজা করিয়া থাকে, চম্পকের ন্যায় গৌরবর্ণা, কান্তি কুবলয়দলের ন্যায়, মনোহর পত্রবিশিষ্ট প্রফুল্লকমলের ন্যায় যাহার অঙ্গবিশেষ, যে নারী ক্ষীণাঙ্গী ও রাজহংসীর ন্যায়, লীলাবিলাস সহিত মৃদুমন্দগমনা, হংসের ন্যায় বাণীবিশিষ্টা, যাহার মধ্যদেশে মনোহর ত্রিবল, কেশ মনোহর, এইরূপ সুকেশসম্পন্না এবং যে নারী মৃদু, লঘু ও শুচি আহার করে, যে রমণী ধবলকুসুম তুল্য বসন ভালবাসে, তাহাকে পদ্মিনী স্ত্রী কহে। এইরূপে উক্ত লক্ষণযুক্ত ভানুমতীর রূপ চিত্রিত করিয়া চিত্রকর রাজার হস্তে সমর্পণ করিল। রাজাও তথায় চিত্রলিখিতা ভানুমতীকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং চিত্রকরকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিলেন। তদনন্তর রাজপুরোহিত শারদানন্দ চিত্রপট লিখিতা ভানুমতীকে দেখিয়া চিত্রকরকে কহিলেন, হে চিত্রকর! ভানুমতীর সমস্ত লক্ষণই লিখিত হইয়াছে, কিন্তু তুমি একটি ভুলিয়া গিয়াছ। চিত্রকর বলিল, হে প্রভো! কি ভুলিয়াছি বলুন। শারদানন্দ বলিলেন, তাঁহার বামজঘন স্থলে তিলকসদৃশ মৎস্যচিহ্ন আছে, তাহা তুমি লিখ নাই। রাজাও শারদানন্দের বাক্য শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, শারদানন্দ ইহার গুহ্যদেশস্থিত মৎস্যচিহ্ন কিরূপে দেখিতে

পাইলেন? তাহাতে সর্বদাই বোধ হয় যে, ইহার সহিত তাহার সংসর্গ ঘটিয়াছে। তাহা না হইলে কিরূপে সে জানিতে পারিবে? রাজা এইরূপ বিচারপূর্বক মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া পূর্ববৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। মন্ত্রীও সেই সময়ে রাজার চিত্তের অনুকূলভাবে বলিলেন, হে রাজন্! কাহার মনে কি আছে, তাহা কিরূপে জানা যাইবে? এই বৃত্তান্ত সর্বদা সত্যও হইতে পারে। রাজা বলিলেন, হে মন্ত্রিন! যদি তুমি আমার প্রিয় হও, তবে এই শারদানন্দের প্রাণ বিনাশ কর। মন্ত্রী "তথাস্তু" বলিয়া লোকের সমক্ষে শারদানন্দকে ধৃত করিয়া বদ্ধ করিলেন। সেই সময় শারদানন্দ বলিতে লাগিলেন, হায়! রাজা কাহারও প্রিয় নহেন, এই লোকোক্তি সর্বদাই সত্য। উক্ত আছে যে কোন্ ব্যক্তি অর্থ পাইয়া গর্বিত না হয়? কোন্ বিষয়ী ব্যক্তি আপদে পতিত না হয়? ভূতলে স্ত্রীজাতি দ্বারা কাহার মন খণ্ডিত না হয়? কোন্ ব্যক্তি রাজার প্রিয় হয়? কোন্ ব্যক্তি কালের গোচরীভূত না হয়? কোন্ যাচক গৌরব প্রাপ্ত হয় এবং কোন্ ব্যক্তি দুর্জনের কূটজালে নিপতিত হইয়া মঙ্গল সহকারে উদ্ধার পাইতে পারে?

কাকে শৌচ দ্যূতকারে সত্য, ক্লীবে শূরতা, মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা, সর্পে ক্ষমা, স্ত্রীজনে কামোপশান্তি এবং রাজাতে মিত্রতা কেহ কখনও দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই। রাজা যাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হন, সে শুচি হইলেও অশুচি হয়। উক্ত আছে যে, নরপতির ক্রোধ হেতু মানবগণ শুচি হইলেও অশুচি, পটু হইলেও অপটু, শূর হইলেও ভীরু, দীর্ঘায়ু হইলেও অল্পায়ু এবং কুলজ হইলেও কুলহীন হয়। তৎপরে মন্ত্রী বধ্যস্থানের দিকে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে শারদানন্দ এই শ্লোক পাঠ করিলেন। পুরাকৃত পুণ্য-সমূহ বন ও বনমধ্যে জল ও অগ্নিমধ্যে মহাসমুদ্রে অথবা পর্বতমস্তকে, সুপ্ত, প্রমত্ত অথবা বিষমরূপে অবস্থিত ব্যক্তিকেও রক্ষা করিয়া থাকে। তখন মন্ত্রী মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই বিষয় সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক; ব্রাহ্মণ বধ করা একান্তই অবিধেয়, ইহা অত্যন্ত গর্হিত, এই ভাবিয়া শারদানন্দকে অন্যের অজ্ঞাতে গুপ্ত ভবন মধ্যে লইয়া গিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভাগে রাখিয়া দিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক রাজাকে কহিলেন, হে রাজন! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম। রাজা বলিলেন, উত্তম হইয়াছে। তদনন্তর একদিন রাজকুমার মৃগয়া করিবার নিমিত্ত বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নির্গমন সময়ে নানাবিধ অমঙ্গল দৃষ্ট হইতে লাগিল। যথা,—অকালবৃষ্টি, শবস্তবক,

বজ্রপাত, উল্কাপতন, সুহৃদের নিবারণবাক্য, এই সকল অনিষ্টদর্শন যাত্রাকালে অমঙ্গলসূচক হইয়া থাকে। সেই সময়ে বুদ্ধিসাগর নামক মন্ত্রিপুত্র বলিলেন, হে জয়পাল! আপনি অদ্য মৃগয়ায় যাইবেন না; মহৎ অলক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে। তখন জয়পাল বলিলেন, দুর্লক্ষণ সকলে আমার প্রত্যয় নাই। বুদ্ধিসাগর বলিলেন, হে রাজপুত্র! অনিষ্টকর দুর্লক্ষণ প্রত্যয় সহকারে দর্শন করা বুদ্ধিমান পুরুষগণের একান্তই কর্তব্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষ ভক্ষণ, বিষধরের সহিত ক্রীড়া, যোগিগণকে নিন্দা এবং ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করিবেন না। এইরূপে মন্ত্রিপুত্র নিবারণ করিলেও কুমার তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্বক মৃগয়ায় গমন করিলেন। নির্গমন কালে মন্ত্রিপুত্র পুনর্বার বলিলেন, হে জয়পাল! আপনার বিনাশকাল উপস্থিত, তাহা না হইলে এরূপ বুদ্ধির উদয় হইত না। উক্ত আছে যে, পূর্বে কেহ কখনও কাঞ্চনময়ী কুরঙ্গী দেখে নাই এবং প্রাপ্তও হয় নাই, তথাপি রঘুনন্দনের কাঞ্চনমৃগীর নিমিত্ত তৃষ্ণা জন্মিয়াছিল; অতএব বিবেচনা হয় যে, বিনাশকালে বিপরীতবুদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। উপার্জিত কর্মসমূহের ভোগ ব্যতিরেকে সে সকলের বিনাশ হয় না। বেশ্যাদিগের সদ্ভাব নাই এবং সম্পদের স্থিরতা নাই, মূর্খদিগের বিবেচনা নাই এবং কৃতকর্মেরও বিনাশ নাই। তদনন্তর রাজকুমার মৃগয়ায় যাইয়া বহুতর শ্বাপদ বধ করিয়া একটি কৃষ্ণসার দর্শনপূর্বক তাহার অনুগামী হইয়া মহারণ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, সমস্ত সৈন্য নগরমার্গে চলিয়া গিয়াছে। তখন কৃষ্ণসারও অদৃশ্য হইল। পরে একাকী অশ্বারূঢ় হইয়া এক সরোবরের অগ্রে বন দর্শন করিলেন। সেই স্থানে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৃক্ষশাখায় অশ্ববন্ধন পূর্বক জলপান করিয়া যেমন বৃক্ষের অধঃস্থিত ছায়ায় উপবেশ করিলেন, অমনি অতিশয় ভয়ঙ্কর এক ব্যাঘ্র উপস্থিত হইল। সেই ব্যাঘ্র দেখিয়া অশ্বচর বন্ধনরজ্জু ছিঁড়িয়া নগরমার্গে গমন করিল। রাজকুমারও ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শাখা ধরিয়া বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন। সেই বৃক্ষে ইতিপূর্বে এক ভল্লুক উঠিয়াছিল, রাজপুত্র সেই ভল্লুককে দেখিয়া পুনর্বার অত্যন্ত ভয় প্রাপ্ত হইলেন। তখন ভল্লুক বলিতে লাগিল, হে রাজকুমার! তুমি ভয় করিও না, অদ্য তুমি আমার শরণাগত, অতএব আমি তোমার কিছুই অনিষ্ট করিব না, আমাকে বিশ্বাস কর এবং ব্যাঘ্র হইতে কিছুমাত্র ভয় করিও না। রাজকুমার বলিলেন, ঋক্ষরাজ! অদ্য আমি শরণাগত, বিশেষতঃ ভয়ে ভীত, অতএব শরণাগত রক্ষণ হেতু তোমার

মহৎ পুণ্য হইবে। উক্ত আছে যে, একদিকে উত্তম দক্ষিণাবিশিষ্ট সহস্র যজ্ঞ সমূহ এবং অন্যদিকে ভয়ভীত প্রাণীদিগের প্রাণরক্ষা, এই উভয়ের ফলই সমান। তখন ভল্লুক রাজপুত্রকে আশ্বাস প্রদান করিল। ব্যাঘ্র বৃক্ষতলে থাকিল। রাত্রি সমাগত হইলে অতিশ্রান্ত রাজপুত্র যখন নিদ্রা যাইতে আরম্ভ করিলেন, অমনি ভল্লুক বলিল, "বৃক্ষের তলায় পড়িবে, আইস, আমার ক্রোড়ে নিদ্রা যাও।" এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র ভল্লুকের ক্রোড়ে নিদ্রিত হইলেন। তখন ব্যাঘ্র কহিল, হে ভল্লুক, এই রাজপুত্র গ্রামবাসী, পুনরায় মৃগয়ায় আসিয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। অতএব এ ব্যক্তি আমাদের শত্রু, কি জন্য তুমি ইহাকে ক্রোড়ে লইয়াছ? যেহেতু এ ব্যক্তি মানুষ। উক্ত আছে যে, তির্যগ্‌ যোনিতেও যে সকল কার্য আছে, মনুষ্যজাতিতে তাহা নাই। তুমি ইহার উপকার করিলেও এ ব্যক্তি তোমার অপকারই করিবে; অতএব উহাকে অধঃপতিত কর। আমি উহাকে ভক্ষণ করিয়া সুখে গমন করি; তুমিও আপন আলয়ে গমন কর। ভল্লুক বলিল, এ ব্যক্তি যেরূপ হউক, আমার শরণাগত, ইহাকে আমি ফেলিয়া দিব না। শরণাগত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিলে মহৎ পাপ হয়। বিশ্বাসঘাতক ও শরণাগতঘাতক এই উভয়ই প্রলয়কাল পর্যন্ত ঘোরতর নরকে বাস করিয়া থাকে। তদনন্তর রাজপুত্র জাগরিত হইলেন, তখন ভল্লুক বলিল, রাজকুমার, আমি ক্ষণকাল নিদ্রা যাইব, তুমি অপ্রমত্ত হইয়া ক্ষণকাল সাবধানে অবস্থান কর। রাজপুত্র বলিল, আমি তাহাই করিব। তৎপরে ভল্লুক রাজপুত্রের নিকটে নিদ্রিত হইল। তখন ব্যাঘ্র কহিল, হে রাজকুমার, তুমি ইহাকে বিশ্বাস করিও না যেহেতু, ভল্লুক নখায়ুধ। শাস্ত্রে উক্ত আছে যে নদী, নখী, শৃঙ্গধারী, শাস্ত্রপাণি, স্ত্রী ও রাজকুল এই সকলের প্রতি বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। এই ভল্লুকের চিত্তও চঞ্চলদৃষ্ট হইতেছে। অতএব তাহার প্রসাদও ভয়ঙ্কর জানিবে। উক্ত আছে যে, ক্ষণে তুষ্ট ও ক্ষণে রুষ্ট, এবং ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট বা ক্ষণে ক্ষণে অসন্তুষ্ট এইরূপ অব্যবস্থিত ব্যক্তিগণের প্রসাদও ভয়ঙ্কর। এই ভল্লুক তোমাকে আমা হইতে রক্ষা করিয়া স্বয়ং তোমার সহিত বিদ্রোহিতা করিবে, অতএব তুমি উহাকে ভূতলে ফেলিয়া দাও, আমি ভক্ষণ করিয়া গমন করি, তুমিও নিজ নগরে গমন কর। তাহা শুনিয়া রাজপুত্র যেমন ভল্লুককে ফেলিয়া দিল, অমনি সে পতনের পূর্বেই নিম্নস্থিত শাখা ধরিয়া ফেলিল। রাজপুত্র তাহাকে পুনর্বার দেখিয়া ভয় পাইল। ভল্লুক বলিল, রে পাপিষ্ঠ! ভয় করিতেছ কেন? পূর্বজন্মার্জিত কর্মফল

তোমাকে ভোগ করিতে হইবে। 'তুমি সসেমিরা' এই বাক্য বলিয়া 'পিশাচ হও—' এই বলিয়া অভিশাপ দিল। তৎপরেই প্রভাত হইল। ব্যাঘ্র সেই স্থান হইতে নির্গত হইল। ভল্লুকও রাজকুমারকে শাপ দিয়া নিজ স্থানে গমন করিল। তদনন্তর রাজকুমার পিশাচ হইয়া 'সসেমিরা' এই বাক্য বলিতে বলিতে বনে বনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের অশ্ব রাজপুত্র শূন্য হইয়া নগরে গমন করিলে পর লোকসকল অশ্বমাত্র দেখিয়া রাজার নিকটে তাহাই নিবেদন করিল। তখন রাজা মন্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে মন্ত্রিন! যখন কুমার মৃগয়ার নিমিত্ত বনে গমন করে, তখন বিবিধ অমঙ্গল দৃষ্ট হইয়াছিল, সে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছে, সুতরাং অশ্ব কুমার-শূন্য হইয়া আসাতে বোধ হইতেছে, তাহার অমঙ্গল ঘটিয়াছে; অতএব তাহার অন্বেষণের নিমিত্ত বনে গমন করিব। মন্ত্রী বলিলেন, হে দেব! তাহা করা একান্ত কর্তব্য। তদন্তর রাজা, মন্ত্রী ও পরিবারগণের সহিত রাজপুত্র যে পথ দিয়া বনে গমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই বনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন দেখিতে পাইলেন যে রাজপুত্র পিশাচ হইয়া 'সসেমিরা' এই বাক্য বলিতে বলিতে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া রাজা শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং তাহাকে লইয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অনন্তর মণিমন্ত্র ঔষধাদিবিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগের দ্বারা চিকিৎসা করাইলেও রাজপুত্র সুস্থ হইলেন না। এই সময় রাজা মন্ত্রীকে বলিলেন, হে মন্ত্রিন্! এই সময় যদি শারদানন্দ থাকিতেন, তাহা হইলে ক্ষণমাত্রেই ইহাকে আরোগ্য করিতে পারিতেন, কিন্তু আমি তাহাকে বিনাশ করিয়াছি। পুরুষগণ যে কার্য করে, তাহা পূর্বে বিচার করিয়াই করা কর্তব্য, তাহা না হইলে পরে বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয়। উক্ত আছে যে, বিশেষ বিবেচনা না করিয়া সহসা কোন কর্ম করিবে না, যেহেতু, অবিবেক পরম আপদের আকর। যে ব্যক্তি বিবেচনা পূর্বক কর্ম করে, গুণলোভী সম্পদ স্বয়ং আসিয়াই তাহাকে বরণ করে। পরীক্ষা করিয়া কার্য করা কর্তব্য, পরীক্ষা না করিয়া কার্য করিলে ব্রাহ্মণী যেমন লগুড়ের প্রতি সন্তপ্ত হইয়াছিল, সেইরূপ সন্তাপ প্রাপ্ত হইতে হয়। সেই সময় আমার কেহই নিবারণকর্তা ছিলেন না। মন্ত্রী বলিলেন, যে কার্য হইয়াছে, সে সময় তদনুরূপই ছিল। ভবিতব্যতা যেরূপ হয়, বুদ্ধিও সেইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে। উক্ত আছে যে, ভবিতব্যতা যেরূপ হয়, সেই সময়ে

আশা, বুদ্ধি, মতি, চিন্তা এবং সহায়ও সেরূপ হইয়া থাকে জানিবেন। যদি ভবিতব্যতা না থাকে, তবে তাহা যত্ন করিলেও সংঘটিত হয় না; কিন্তু যত্ন না করিলেও যাহা ভবিতব্যতা তাহা স্বয়ং সংঘটিত হইয়া থাকে। যাহার ভবিতব্যতা নাই, করতলগত হইলেও তাহা বিনষ্ট হয়। রাজা বলিলেন, তাহা কর্মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। এক্ষণে কুমারের বিষয়ে মহৎ প্রযত্ন করা কর্তব্য। মন্ত্রী বলিলেন, তাহা কি প্রকার? রাজা বলিলেন, "যে কোন ব্যক্তি পুত্রের চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করিবে, তাহাকে অর্ধেক রাজ্য প্রদান করিব, রাজ্যমধ্যে এইরূপ ঘোষণা প্রচারিত করুন।" মন্ত্রী সেইরূপ করিয়া নিজগৃহে আগমন পূর্বক শারদানন্দের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। সেই সমস্ত শুনিয়া শারদানন্দ বলিলেন, মন্ত্রিবর! আপনি রাজার সমক্ষে এরূপ স্থির করুন যে আমার এক কন্যা আছে, তাহার সহিত রাজপুত্রের সাক্ষাৎ করিতে হইবে। সে কোন উপায় বিধান করিবে। তাহা শুনিয়া মন্ত্রী রাজার নিকট সেই রূপই বলিলেন। তদনন্তর রাজা সমস্ত সভার সহিত মন্ত্রিভবনে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাজপুত্রও 'সসেমিরা' এই বাক্য বলিতে বলিতে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। তাহা শুনিয়া যবনিকার অন্তরালস্থিত শারদানন্দ এই সকল পদ্য বলিতে লাগিলেন। সদ্ভাবে সম্মিলিত সুহৃদব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া কি নৈপুণ্য প্রকাশ হইয়াছে? যে ক্রোড়ে আরোহণ করিয়া প্রসুপ্ত আছে, তাহাকে বধ করিলে কি পৌরুষ লাভ হইতে পারে? রাজপুত্র সেই পদ্য শুনিয়া চারি অক্ষরের মধ্যে প্রথম "স" এক অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া "সেমিরা" এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

তখন শরদানন্দ দ্বিতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন। সমুদ্রের সেতু অর্থাৎ সেতুবন্ধ রামেশ্বর ও গঙ্গাসাগর সঙ্গমে গমন করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ দূরীভূত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহী ব্যক্তি কোথাও মুক্তিলাভ করিতে পারে না। রাজপুত্র এই পদ্য শুনিয়া 'সসে' এই দুই অক্ষর পরিত্যাগ পূর্বক "মিরা" বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তখন শারদানন্দ তৃতীয় শ্লোক পাঠ করিলেন,—মিত্র-দ্রোহী, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক এই তিনব্যক্তি প্রলয়কাল পর্যন্ত নরকে বাস করিয়া থাকে। তৎপরে রাজপুত্র "সসেমি" এই তিন অক্ষর পরিত্যাগ করিয়া এক অক্ষর মাত্র অর্থাৎ 'রা' বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে শারদানন্দ চতুর্থ শ্লোক পাঠ করিলেন:—রাজন! আপনি যদি নিজপুত্রের কল্যাণকামনা করেন, তবে দ্বিজগণকে দান এবং দেবতাদিগের

আরাধনা করুন। শারদানন্দ এইরূপ বলিলে পর রাজপুত্র সুসহ ও বোধবান হইলেন। তদনন্তর পিতার নিকটে ভল্লুকের পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা বলিলেন, হে কুমারি! তুমি গ্রামে বাস কর, কথনও বনে গমন কর নাই, তবে ভল্লুক ও ব্যাঘ্রের কথা কিরূপে জানিতে পারিলে? তখন যবনিকার মধ্যস্থিত শারদানন্দ বলিলেন, দেবতা ও দ্বিজগণের প্রসাদে আমার জিহ্বাগ্রে সরস্বতী বাস করেন। হে রাজন! সেই হেতুই আমি ভানুমতীর তিলকের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলাম। তাহা শুনিয়া রাজা আশ্চর্যান্বিত হইয়া যেমন যবনিকা উত্তোলন করিলেন, অমনি শারদানন্দকে দেখিতে পাইলেন। তদনন্তর নৃপতি প্রভৃতি সকলেই শারদানন্দকে প্রণাম করিলেন। তখন মন্ত্রী পূর্ববৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সেই বহু বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন বেদজ্ঞ মন্ত্রীকে বলিলেন, হে মন্ত্রিন্! তোমার সংসর্গে কীর্তিলাভ ও দুর্গতি বিনাশ হয়। অতএব সৎসঙ্গ করা পুরুষগণের একান্তই কর্তব্য। তাহাতে উভয় প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

বেতাল পঞ্চবিংশতি

(শিবদাস ভট্টের বেতাল পঞ্চবিংশতি অবলম্বনে)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মা

বারাণসী নগরীতে, প্রতাপমুকুট নামে, এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিল। একদিন রাজকুমার, একমাত্র অমাত্য পুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি, নানা বনে ভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশপূর্বক, ঐ অরণ্যের মধ্যবর্তী অতিমনোহর সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, ঐ সরোবরের নির্মল সলিলে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছে; প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে; মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া গুন্ গুন্ ধ্বনি করতঃ, ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে, তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল, কুসুমসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে; উহাদের ছায়া অতি স্নিগ্ধ; বিশেষতঃ, শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা, পরম রমণীয় হইয়া আছে; তথায় উপস্থিতি মাত্র, শ্রান্ত ও আতপক্লান্ত ব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়।

এই পরম রমণীয় স্থানে, কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া, রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপবর্তী বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহন পূর্বক, দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় মধ্যে এক রাজকন্যাও, স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া স্নান ও পূজা সমাপন পূর্বক, বৃক্ষের ছায়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, তাঁহার ও বজ্রমুকুটের চারিচক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য সন্দর্শনে, নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজকুমারীও, বজ্রমুকুটকে নয়নগোচর করিয়া, কৃতার্থমন্য হইয়া, শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন; অনন্তর, কর্ণসংযুক্ত করিয়া, দন্ত দ্বারা ছেদনপূর্বক, পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন; পুনর্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় প্রিয়বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কুমারী ক্রমে ক্রমে দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, রাজকুমার বিরহবেদনায় অতিশয় অস্থির হইলেন, এবং সর্বাধিকারিকুমারের নিকটে গিয়া, লজ্জানম্র মুখে কহিতে লাগিলেন, বয়স্য! আজ আমি এক পরম সুন্দরী রমণী নিরীক্ষণ করিয়াছি; তাহার নামধাম কিছুই জানিতে পারি নাই; কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে না পাইলে, প্রাণত্যাগ করিব। সর্বাধিকারিতনয়, সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গৃহে প্রত্যানীত করিলেন। রাজপুত্র রাজকার্য পর্যালোচনা ও স্নানভোজন প্রভৃতি আবশ্যক ক্রিয়া পর্যন্ত পরিত্যাগ-পূর্বক, একাকী নির্জনে বিষণ্ণ মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন; পরিশেষে, চিত্তবিনোদনের কোন উপায় না দেখিয়া, স্বহস্তে সেই কামিনীর প্রতিমূর্তি চিত্রিত করিলেন। দিনযামিনী কেবল সেই প্রতিকৃতি সন্দর্শন করেন; কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না; কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর দেন না। সর্বাধিকারিপুত্র, নৃপনন্দনের এতাদৃশী দশা নিরীক্ষণ করিয়া, উপদেশচ্ছলে অশেষপ্রকার ভর্ৎসনা করিলেন।

প্রিয় বয়স্যের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজকুমার কহিলেন, সখে আমি যখন এ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছি, তখন আমার হিতাহিত চিন্তা ও সুখ-দুঃখ বিবেচনা নাই। প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, মনোরথ সম্পন্ন না হইলে, জীবন বিসর্জন করিব। রাজকুমারের ঈদৃশ আক্ষেপবাক্য কর্ণগোচর করিয়া, সর্বাধিকারিকুমার মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আর এখন উপদেশ দ্বারা ধৈর্য-

সম্পাদনের সময় নাই; ইনি নিতান্ত অধীর হইয়াছেন, অতঃপর কোনও উপায় স্থির করা আবশ্যক। অনন্তর, তিনি রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! প্রস্থানকালে, সেই সীমন্তিনী তোমাকে কিছু বলিয়াছিল, কিংবা তুমি তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে। রাজপুত্র কহিলেন, না বয়স্য! আমি তাহাকে কিছু বলি নাই; এবং সেই সর্বাঙ্গসুন্দরীও আমায় কোনও কথা বলে নাই। তখন সর্বাধিকারিপুত্র কহিলেন, তবে তাহার সমাগম দুর্ঘট বোধ হইতেছে। রাজপুত্র কহিলেন, যদি সেই সুলোচনা লোচনানন্দদায়িনী না হয়, আমি প্রাণত্যাগ করিব। তখন তিনি, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, পুনরায় কহিলেন, ভাল বয়স্য! জিজ্ঞাসা করি, প্রস্থানসময়ে, সে কোনও সঙ্কেত করিয়াছিল কি না।

রাজকুমার কমলবৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। তখন সর্বাধিকারি পুত্র কহিলেন, সখে! আর চিন্তা নাই, আমি তৎকৃত সঙ্কেতের তাৎপর্যগ্রহ করিয়াছি, এবং তাহার নাম ধাম জানিতে পারিয়াছি। এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অল্পদিনের মধ্যেই, তাহার সহিত তোমার সমাগম সম্পন্ন করিয়া দিব। অধিক ব্যাকুল হইলেই, অভীষ্টসিদ্ধ হয় না; ধৈর্য অবলম্বন কর। তখন রাজপুত্র কহিলেন, যদি বুঝিয়া থাক, সমুদয় বিশেষ করিয়া বল; শুনিলেও আপাততঃ স্থির হইতে পারি, তিনি কহিলেন, বয়স্য! শ্রবণ কর, পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া, কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল; তদ্দ্বারা তোমাকে ইহা জানাইয়াছে, আমি কর্ণাট-নগর-নিবাসিনী। দন্ত দ্বারা খণ্ডিত করিয়া, ইহা ব্যক্ত করিয়াছে, আমি দন্তবাট রাজার কন্যা; তৎপরে, পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া, এই সঙ্কেত করিয়াছে, আমার নাম পদ্মাবতী; আর, হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছে, তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।

বয়স্যের এই বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজকুমার অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন; এবং ব্যগ্র হইয়া বারংবার কহিতে লাগিলেন, বয়স্য! ত্বরায় আমায় কর্ণাট নগরে লইয়া চল। অনন্তর, উভয়ে, সমুচিত পরিচ্ছদধারণ ও অস্ত্রবন্ধন পূর্বক, অশ্বে আরোহণ করিলেন। কতিপয় দিবসের পরে, কর্ণাট নগরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহারা রাজবাটীর নিকটে গিয়া দেখিলেন, এক বৃদ্ধা আপন ভবনদ্বারে উপবিষ্টা আছে। উভয়ে, অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাহার নিকটে গিয়া কহিলেন, মা! আমরা বাণিজ্যব্যবসায়ী বিদেশীয় লোক; দ্রব্যসামগ্রী সমস্ত পশ্চাৎ আসিতেছে; বাসার অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমরা অগ্রসর হইয়াছি; যদি কৃপা করিয়া স্থান দাও,

ভবে থাকিতে পাই। বৃদ্ধা, তাঁহাদের মনোহর রূপ দর্শনে ও মধুর আলাপ শ্রবণে প্রীত হইয়া প্রসন্নমনে কহিল, এ তোমাদের গৃহ, যত দিন ইচ্ছা, স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর।

এইরূপে, উভয়ে সেই বর্ষীয়সীর সদনে আবাসগ্রহণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বৃদ্ধা তাঁহাদের সন্নিধান আগমন করিয়া, কথোপকথন করিলে, সর্বাধিকারিপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, মা! কয়জন তোমার পরিবার, আর কি প্রকারে বা সংসারযাত্রা নির্বাহ হয়। বৃদ্ধা কহিল, আমার পুত্র রাজ-সংসারে কর্ম করে, রাজার অতি প্রিয় পাত্র। আর, পদ্মাবতী নামে রাজার এক কন্যা আছেন, আমি তাঁহার ধাত্রী ছিলাম। এক্ষণে বৃদ্ধা হইয়াছি, গৃহে থাকি; রাজা অনুগ্রহ করিয়া অন্নবস্ত্র দেন। আর, রাজকন্যা আমায় ভালবাসেন। এজন্যে, প্রতিদিন, এক একবার তাঁহাকে দেখিতে যাই। এই কথা শুনিয়া, রাজপুত্র কহিলেন, কল্য যখন রাজবাটীতে যাইবে, আমায় বলিবে; আমি তোমাদ্বারা রাজকন্যার নিকট কোনও সংবাদ পাঠাইব। বৃদ্ধা কহিল, যদি, প্রয়োজন থাকে, বল, আজই আমি রাজকন্যাকে জানাইয়া আসি। রাজকুমার, এই কথা শুনিবামাত্র, হৃষ্ট হইয়া কহিলেন, তুমি রাজকন্যাকে বলিবে, শুক্লাপঞ্চমীতে, সরোবরতীরে, যে রাজকুমারকে দেখিয়াছিলে, সে, তোমার সঙ্কেত অনুসারে উপস্থিত হইয়াছে।

এই বাক্য কর্ণগোচর হইবামাত্র, বৃদ্ধা যষ্টি গ্রহণপূর্বক রাজভবনে গমন করিল। সে কন্যান্তঃপুরে প্রবেশ করিল, রাজকন্যা একাকিনী নির্জনে উপবিষ্টা আছেন। বৃদ্ধা সম্মুখবর্তিনী হইবা মাত্র রাজকন্যা সমাদর পূর্বক বসিতে আসন দিলেন। সে উপবিষ্ট হইয়া কহিল, বৎসে! বাল্যকালে, অনেক যত্নে তোমায় মানুষ করিয়াছি। এক্ষণে, ভগবানের অনুগ্রহে, তুমি তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার অন্তঃকরণের একান্ত অভিলাষ এই, অবিলম্বে উপযুক্ত পাত্রের হস্তগতা হও। এইরূপ আড়ম্বরপূর্বক ভূমিকা করিয়া, বৃদ্ধা কহিতে লাগিল, শুক্লাপঞ্চমীতে, বাপীতটে, যে রাজকুমারের মন হরণ করিয়া আনিয়াছিলে, তিনি আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং আমাদ্বারা এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন, কমলসঙ্কেত দ্বারা যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলে, তাহা সম্পন্ন কর; আমি উপস্থিত হইয়াছি। আর, আমিও কহিতেছি, এই রাজকুমার সর্বাংশে তোমার যোগ্য পাত্র; তুমি যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী, তিনিও সর্বাংশে তদনুরূপ।

রাজকন্যা শ্রবণমাত্র, কোপ প্রকাশ করিয়া, হস্তে চন্দন লেপন পূর্বক, বৃদ্ধার উভয় গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন, এবং কহিলেন, তুমি এই মুহূর্তে আমার অন্তঃপুর হইতে দূর হও। বৃদ্ধা, এই প্রকার তিরস্কার লাভ করিয়া, বিরক্ত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে মদনে প্রত্যাগমন পূর্বক, পূর্বাকার সমস্ত বৃত্তান্ত রাজকুমারের কর্ণগোচর করিল। শ্রবণমাত্র, রাজকুমার অতিমাত্র ব্যাকুল ও হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক, পার্শ্ববর্তী প্রিয় বয়স্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, সখে! এখন কি উপায় করি; নিতান্ত বুঝিলাম, বিধি বাম হইয়াছেন; মনস্কামসিদ্ধির কোনও সম্ভাবনা আছে, এরূপ বোধ হইতেছে না; নতুবা, সেই বামলোচনা, কি নিমিত্ত তিরস্কার করিয়া, বৃদ্ধাকে বিদায় করিল। অন্তঃকরণে অনুরাগ সঞ্চার হইলে, দূতীর প্রতি এত অনাদর হয় না। তখন তিনি কহিলেন, বয়স্য! মর্মগ্রহ না করিয়া, অকারণে এত ব্যাকুল হও কেন? শ্রীখণ্ডরসে অভিষিক্ত দশ করশাখা দ্বারা প্রহারের তাৎপর্য এই যে, শুক্লপক্ষের দশ দিবস অবশিষ্ট আছে; তদবসানে, অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে, তোমার সহিত সমাগম হইবেক।

শুক্লপক্ষ অতিক্রান্ত হইল। বৃদ্ধা, পুনরায় রাজকুমারীর নিকটে গিয়া, রাজকুমারের প্রার্থনা জানাইল। তিনি শুনিয়া সাতিশয় কোপপ্রকাশ করিলেন; এবং, গলহস্ত প্রদানপূর্বক, বৃদ্ধাকে অন্তঃপুরের খড়কী দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। সে তৎক্ষণাৎ রাজকুমারের নিকটে গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইল। তিনি শুনিয়া, নিতান্ত হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক, অধোমুখে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সর্বাধিকারীর পুত্র কহিলেন, বয়স্য, কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছ, আর ভাবনা নাই, এ অনুকূল গলহস্ত অপ্রশস্ত নহে, তুমি পূর্ণমনোরথ হইয়াছ। অদ্য রজনীযোগে তোমায় সেই খড়কী দিয়া, তাহার অন্তঃপুরে যাইতে সঙ্কেত করিয়াছে। রাজপুত্র, আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া নিতান্ত উৎসুকচিত্তে, সূর্যদেবের অস্তগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

রজনী উপস্থিত হইল। রাজকুমার, বিহারযোগ্য বেশভূষার সমাধান করিয়া, প্রিয় বয়স্যের সহিত অন্তঃপুরের খড়কীতে উপস্থিত হইলেন। সর্বাধিকারীর পুত্র বহির্ভাগে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি, তন্মধ্য দিয়া, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রাজকুমারী তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। নয়নে নয়নে আলিঙ্গন হওয়াতে, উভয়ে চরিতার্থতা প্রাপ্ত

হইলেন। রাজকুমারী, পার্শ্ববর্তিনী বয়স্যার প্রতি, দ্বার রুদ্ধ করিবার আদেশ দিয়া, রাজকুমারের করগ্রহণপূর্বক, বিলাসভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং সুশোভিত স্বর্ণময় পালঙ্কে উপবেশনান্তর, বল্লভের কণ্ঠদেশে স্বহস্তসঙ্কলিত ললিত মালতীমালা সমর্পণ করিয়া, স্বয়ং তালবৃন্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজকুমার কহিলেন, প্রিয়ে, তোমার বদনসুধাকর সন্দর্শনেই, আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে, আর এরূপ ক্লেশস্বীকারের প্রয়োজন নাই; বিশেষতঃ, তোমার কোমল করপল্লব শিরীষকুসুম অপেক্ষাও সুকুমার, কোনও ক্রমে তালবৃন্তধারণের যোগ্য নহে; আমার হস্তে দাও; আমি তোমার সেবা দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করি। পদ্মাবতী কহিলেন, নাথ! আমার জন্য, তোমার অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে; অতএব, তোমার সেবা করাই আমার উচিত হয়।

উভয়ের এইরূপ বচনবৈদগ্ধী শ্রবণগোচর করিয়া, পার্শ্ববর্তিনী সহচরী পদ্মাবতীর হস্ত হইতে তালবৃন্ত গ্রহণ পূর্বক বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, রাজকুমার ও রাজকুমারী, সহচরীদিগকে সাক্ষী করিয়া গান্ধর্ব বিধানে দাম্পত্যবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। অনন্তর, উভয়ের সাত্ত্বিক ভাবের আবির্ভাব দেখিয়া, সহচরীগণ, কার্যান্তরব্যপদেশ, বিলাসভবন হইতে বহির্গত হইলে কান্ত ও কামিনী কৌতুকে যামিনীযাপন করিলেন।

রজনী অবসন্না হইল। রাজকুমার অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তখন রাজকুমারী কহিলেন, নাথ! আমার এ অন্তঃপুরে, সখীগণ ব্যতিরেকে, অন্যের প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; তুমি নির্ভয়ে অবস্থিতি কর। আমি, তোমায় বিদায় দিয়া, ক্ষণমাত্রও প্রাণধারণ করিতে পারিব না। রাজকুমার, প্রিয়তমার ঈদৃশ প্রণয়রসাভিষিক্ত মৃদু মধুর বচন পরম্পরাশ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিয়া, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং তাঁহার সহচর হইয়া, পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, রাজকুমার রাজধানীপ্রতি-গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রাজকন্যা, কোনও মতে, সম্মত হইলেন না। ক্রমে ক্রমে, প্রায় মাস অতীত হইয়া গেল। রাজকুমার তথাপি প্রস্থানের অনুমতি লাভ করিলেন না। এইরূপে, স্বদেশ-প্রতিগমন বিষয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, তিনি, একদিন, নির্জনে বসিয়া মনে মনে এই

আলোচনা করিতে লাগিলেন, আমি নিতান্ত নরাধম; অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়-সুখের পরতন্ত্র হইয়া, পিতা, মাতা, জন্মভূমি প্রভৃতি সকল পরিত্যাগ করিলাম; আর, যে জীবিতাধিক বান্ধবের বুদ্ধি কৌশলেও উপদেশ বলে, ঈদৃশ অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতেছি, মাসাবধি তাহারও কোন সংবাদ লইলাম না; বোধকরি, বন্ধু আমায় নিতান্ত স্বার্থপর ও যারপর নাই অকৃতজ্ঞ ভাবিতেছেন।

রাজকুমার একাকী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়, রাজকন্যা, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সাতিশয় বিষন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, নাথ! আজ কি জন্যে তুমি এমন উন্মনা হইয়াছ। তোমার চন্দ্রবদন বিষণ্ণ দেখিলে আমি দশদিক শূন্য দেখি। অসুখের কারণ কি, বল; ত্বরায় তাহার প্রতি-বিধান করিতেছি। বজ্রমুকুট কহিলেন, পিতার সর্বাধিকারীর পুত্র আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। তিনি আমার পরম সুহৃৎ; মাসাবধি তাঁহার কোনও সংবাদ পাই নাই; জানি না, তিনি কেমন আছেন? তিনি অতি চতুর, সর্বশাস্ত্রে মণ্ডিত ও নানা গুণরত্নে মণ্ডিত। তাঁহারই বুদ্ধিকৌশলে ও মন্ত্রণাবলে তোমার সমাগম লাভ করিয়াছি। তিনিই তোমার সমস্ত সঙ্কেতের মর্মোদ্ভেদ করিয়াছিলেন।

পদ্মাবতী কহিলেন, অয়ি নাথ! ঈদৃশ বন্ধুর অদর্শনে, চিত্ত অবশ্যই উৎকণ্ঠিত হইতে পারে। এতদিন তাঁহার কোনও সংবাদ না লওয়ায়, যৎপরোনাস্তি অভদ্রতাপ্রকাশ হইয়াছে। রহস্যবিদ্ বন্ধু প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর, এবং যারপর নাই, অকৃতজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছ। এখনকার কর্তব্য এই, তাঁহার পরিতোষার্থে, আমি স্বহস্তে নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া পাঠাই; এবং তুমিও, একবার, কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত, তথায় গিয়া, সমুচিত সদ্ভাবপ্রদর্শন করিয়া আইস। রাজপুত্র, তৎক্ষণাৎ সেই খড়কী দিয়া, অন্তপুর হইতে বহির্গত হইয়া বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলেন, এবং, বহু দিবসের পর, অকপটপ্রণয়পবিত্র মিত্র সহ সাক্ষাৎকার লাভে অশ্রুপূর্ণলোচন হইয়া, তাঁহার নিকট পূর্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন।

রাজপুত্রকে বন্ধু দর্শনে প্রেরণ করিয়া, রাজকন্যা মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, এ কেবল বন্ধুর বুদ্ধি কৌশলেই কৃতকার্য হইয়াছে; অতএব, অবশ্যই সকল কথা তাহার নিকট ব্যক্ত করিবেক; আর, সে ব্যক্তিও, আপন বান্ধবগণের নিকট, সমস্ত প্রকাশ করিবেক, সন্দেহ নাই;

এইরূপে আমার কলঙ্ক ঘোষণা, ক্রমে ক্রমে জগদ্ব্যাপিনী হইবার সম্ভাবনা। অতএব, এতাদৃশ ব্যক্তিকে জীবিত রাখা, কোনও ক্রমে শ্রেয়স্কর নহে। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া, পদ্মাবতী, অবিলম্বে নানাবিধ বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া সখী দ্বারা রাজকুমারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

মিষ্টান্ন উপস্থিত হইলে, সর্বাধিকারী পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! এ সকল কি। রাজপুত্র কহিলেন, মিত্র! আজ আমি তোমার জন্য অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম। রাজকন্যা, আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, আমি তোমার সবিশেষ পরিচয় দিয়া ও অশেষবিধ প্রশংসা করিয়া বলিলাম, প্রিয়ে! আমি এই বন্ধুর দর্শনে বিষণ্ণ হইতেছি। রাজকন্যা, তোমার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং আমায় অগ্রে পাঠাইয়া দিয়া, স্বহস্তে এই সমস্ত প্রস্তুত করিয়া, তোমার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। আমায় বলিয়া দিয়াছেন, তুমি আপন সমক্ষে তাঁহাকে মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া আসিবে। অতএব বয়স্য! কিছু ভক্ষণ কর, তাহা হইলে পরম পরিতোষ পাই, এবং যাইয়া তাঁহার নিকটে বলিতে চাই, আমার বন্ধু মিষ্টান্ন আহার করিয়া, তোমার শিল্পনৈপুণ্যের অশেষপ্রকার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া, সর্বধাকিরীপুত্র, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর, রাজপুত্রের মুখে, পুনর্বার মনোযোগ পূর্বক, পূর্বাপর সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! তুমি আমার জন্য কালকূট আনিয়াছ; এ মিষ্টান্ন নহে, সাক্ষাৎ কৃতান্ত, জিহ্বাস্পর্শমাত্রই প্রাণসংহার করিবেক। আমার পরম সৌভাগ্য এই, তুমি খাও নাই। তুমি নিতান্ত ঋজুস্বভাব, কাহার কি ভাব, কিছুই বুঝিতে চেষ্টা কর না। তোমায় এক সারকথা বলি, স্বৈরিণীরা স্বভাবতঃ, আপন প্রিয়ের প্রিয়পাত্রের উপর অতিশয় বিষদৃষ্টি হয়। অতএব, তুমি তাহার নিকট আমার পরিচয় দিয়া, বুদ্ধির কার্য কর নাই।

রাজকুমার কহিলেন, বয়স্য! আমি তোমার এ কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি তাঁহার স্বভাব জান না, এজন্য এরূপ কহিতেছ। এমন সদাশয় স্ত্রীলোক তুমি কখনও দেখ নাই। তাঁহার নাম করিলে, আমার রোমাঞ্চ হয়। আর, আমি, সমবেত সখীগণ সমক্ষে, ধর্ম সাক্ষী করিয়া, গান্ধর্ব বিধানে, তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছি, এমনস্থলে, স্বৈরিনীশব্দে তাঁহার নির্দেশ করা, কোনও মতে, ন্যায়ানুগত হইতেছে না। সে যাহাই হউক,

তিনি যেমন চারুশীলা, তেমনি উদারশীলা; তিনি, তোমার প্রাণসংহারের নিমিত্ত মিষ্টান্নচ্ছলে কালকূট পাঠাইয়াছেন, তুমি কেমন করিয়া এমন কথা মুখে আনিলে, বুঝিতে পারিতেছি না। বলিতে কি, তুমি আরবার এপ্রকার কহিলে, আমি তোমার উপর যারপর নাই, বিরক্ত হইব। ভাল, কথায় প্রয়োজন নাই, আমি তোমার সন্দেহ দূর করিতেছি। এই বলিয়া, এক লাড়ু লইয়া, রাজকুমার বিড়ালকে ভক্ষণ করাইলেন। বিড়াল তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তখন রাজপুত্র চকিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, এরূপ দুর্বৃত্তার সহিত পরিচয় রাখা কদাচ উচিত নহে। আর আমি, জন্মাবচ্ছেদে, সে পাপীয়সীর মুখাবলোকন করিব না। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, না বয়স্য! তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা হইবেক না; কৌশল করিয়া, রাজধানীতে লইয়া যাইতে হইবেক। রাজপুত্র কহিলেন, তাহাও তোমার বুদ্ধিসাধ্য।

অমাত্য পুত্র কহিলেন, বয়স্য! এক পরামর্শ বলি, শুন। আজ তুমি পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া, পূর্ব অপেক্ষা অধিকতর প্রণয় প্রদর্শন করিবে, এবং বলিবে, বন্ধু, মিষ্টান্ন ভক্ষণের অব্যবহিত পরক্ষণেই, অবচেতন প্রায় হইয়া, নিদ্রাগত হইয়াছেন। আমি, তোমায় দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, চলিয়া আসিয়াছি। আমি এখন, তোমায় একক্ষণ নিরীক্ষণ না করিলে, দশদিক শূন্য দেখি। ফলতঃ, আর আমি, বন্ধুর অনুরোধে, এক মুহূর্তের নিমিত্তও, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না। এবম্ প্রকার মনোহর বাক্য প্রয়োগ দ্বারা, তাহারে মোহিত করিয়া, দিবাযাপন করিবে; অনন্তর রাত্রিতে সে নিদ্রাগতা হইলে, তদীয় সমস্ত আভরণ হরণপূর্বক, তাহার বাম জঙ্ঘাতে ত্রিশূলের চিহ্ন দিয়া, চলিয়া আসিবে। রাজপুত্র সম্মত হইলেন, এবং পদ্মাবতীর নিকটে গিয়া বিলক্ষণ প্রীতিদর্শন করিলেন। পরে, রজনীযোগে উভয়ে শয়ন করিলে, রাজকন্যা ত্বরায় নিদ্রাভিভূতা হইলেন। তখন রাজকুমার মন্ত্রিপুত্রের উপদেশানুরূপ সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া বৃদ্ধার আবাসে উপস্থিত হইলেন।

পরদিন, প্রভাতে, মন্ত্রিপুত্র, সন্ন্যাসীর বেশধারণপূর্বক, এক শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। এবং স্বয়ং গুরু হইয়া, রাজপুত্রকে শিষ্য করিয়া কহিলেন, তুমি নগরে গিয়া এই অলঙ্কার বিক্রয় কর। যদি কেহ তোমায় চোর বলিয়া ধরে, তাহারে আমার নিকটে লইয়া আসিবে। রাজপুত্র, তদীয় উপদেশ অনুসারে, নগরে প্রবেশ করিয়া রাজসদনের সমীপবাসী স্বর্ণকারের

নিকট, রাজকন্যার অলঙ্কার বিক্রয়ার্থে উপস্থিত হইলেন; সে দর্শনমাত্র, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুদিন হইল, আমি রাজকন্যার নিমিত্ত এই সকল অলঙ্কার গড়িয়া দিয়াছি; ইহার হস্তে কি প্রকারে আইল। এ ব্যক্তিকে বৈদেশিক দেখিতেছি। অনন্তর, অতিশয় সন্দিহান হইয়া, স্বর্ণকার কারিগরদিগকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা কহিল, হাঁ, এ সমস্ত রাজকন্যার অলঙ্কার বটে। তখন সে রাজকুমারকে চোর স্থির করিয়া, কহিল, এ রাজকন্যার অলঙ্কার দেখিতেছি, তুমি কোথায় পাইলে, যথার্থ বল।

স্বর্ণকার, ভয় প্রদর্শনপূর্বক, বারবার এই প্রকার জিজ্ঞাসা করাতে, রাজপথবাহী বহুসংখ্যক লোক, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া তথায় সমবেত হইল। ফলতঃ, অল্পকাল মধ্যেই ঐ অলঙ্কার লইয়া, বিলক্ষণ আন্দোলন হইতে লাগিল। পরিশেষে, নগরপাল, এই সংবাদ পাইয়া, রাজকুমার ও স্বর্ণকার, উভয়কে রুদ্ধ করিল। পরে, সে অলঙ্কারের প্রাপ্তিবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, রাজকুমার কহিলেন, শ্মশানবাসী গুরুদেব আমায় এই অলঙ্কার বিক্রয় করিতে পাঠাইয়াছেন; তিনি কোথায় পাইয়াছেন, আমি তাহার কিছুই জানি না। যদি তোমাদের আবশ্যক বোধ হয়, শ্মশানে গিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর। পরিশেষে, নগরপাল, গুরুশিষ্য, উভয়কে অলঙ্কার সমেত রাজসমক্ষে লইয়া গিয়া, পূর্বাপর সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল।

রাজা, অলঙ্কার দর্শনে, নানাপ্রকার সন্দিহান হইয়া যোগীকে, নির্জনে লইয়া গিয়া বিনয়বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! আপনি এই সমস্ত অলঙ্কার কোথায় পাইলেন। যোগী কহিলেন, মহারাজ! কৃষ্ণাচতুর্দশী রজনীতে, আমি নগরপ্রান্তবর্তী শ্মশানে ডাকিনীমন্ত্র সিদ্ধ করিয়াছিলাম। মন্ত্রপ্রভাবে ডাকিনী, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, প্রসাদস্বরূপ স্বীয় অলঙ্কারসকল উন্মোচিত করিয়া দিয়াছেন; এবং আমিও, তাঁহার বাম জঙ্ঘাতে, যোগসিদ্ধির প্রমাণস্বরূপ, ত্রিশূলের চিহ্ন করিয়া দিয়াছি। এ সমস্ত সেই অলঙ্কার। রাজা, শুনিয়া, বিস্ময়াপন্ন হইয়া, অবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে বলিলেন, দেখ দেখি, পদ্মাবতীর বাম জঙ্ঘাতে কোনও চিহ্ন আছে কিনা। রাজ্ঞী, সবিশেষ অবগত হইয়া, রাজার নিকটে আসিয়া কহিলেন, এক ত্রিশূলের চিহ্ন আছে।

রাজা, এবম্প্রকার অঘটন ঘটনা দর্শনে, হতবুদ্ধি ও লজ্জায় অধোবদন হইয়া, ভাবিতে লাগিলেন, এতাদৃশী দুশ্চারিণীকে গৃহে রাখা কদাচ উচিত

নহে; ইহাকে অধর্ম আছে। অতএব, এখন কি কর্তব্য। অথবা, পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া, সবিশেষ কহিয়া জিজ্ঞাসা করি; তাঁহারা, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, যেরূপ ব্যবস্থা দিবেন, তদনুরূপ কার্য করিব। কিন্তু শাস্ত্রে গৃহচ্ছিদ্র প্রকাশ করিতে নিষেধ আছে। পণ্ডিতমণ্ডলী সমবেত করিয়া, ব্যবস্থা জিজ্ঞাসিলে, আমার এই কলঙ্ক ক্রমে ক্রমে, দেশে-বিদেশে প্রচারিত হইবেক। তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, সেই সন্ন্যাসীকেই ইহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করি। সন্ন্যাসী সবিশেষ সমস্ত অবগত আছেন; ধর্মতঃ প্রশ্ন করিলে, অবশ্যই যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা দিবেন। অনন্তর, রাজা সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ধর্মশাস্ত্রে দুশ্চরিত্রা স্ত্রীর বিষয়ে কিরূপ দণ্ড নিরূপিত আছে। সন্ন্যাসী কহিলেন, মহারাজ? ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, স্ত্রীলোক, বালক, ব্রাহ্মণ, ইহারা অত্যন্ত অপরাধী হইলেও বধার্হ নহে; রাজা ইহাদের নির্বাসনরূপ দণ্ডবিধান করিবেন।

রাজা, এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া, অন্তঃপুরে গিয়া, রাজ্ঞীকে কহিলেন, পদ্মাবতী অতি দুশ্চরিত্রা, এজন্য, শাস্ত্রের বিধান অনুসারে আমি উহারে দেশবহিষ্কৃতা করিব। রাজ্ঞী কন্যার প্রতি নিরতিশয় স্নেহবতী ছিলেন; কিন্তু পাতিব্রত্যগুণের আতিশয্য বশতঃ, রাজার মতেই সম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। অনন্তর নরপতি, কন্যাকে শিবিকারোহণের আদেশ দিয়া, তাহার অগোচরে, বাহকদিগকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা পদ্মাবতীকে কোনও অরণ্যানীতে পরিত্যাগ করিয়া, ত্বরায় আমায় সংবাদ দিবে। বাহকেরা রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিল। অমাত্যতনয়ও, তৎক্ষণাৎ, রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া, রাজকুমারীর উদ্দেশ্যে চলিলেন; এবং ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে সেই অরণ্যানীতে প্রবেশিয়া দেখিলেন, পদ্মাবতী, একাকিনী বৃক্ষমূলে বসিয়া, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, বিষণ্ণ বদনে রোদন করিতেছেন. অশেষবিধ আশ্বাস প্রদান দ্বারা, তাঁহার শোকাবেগ নিবারণ করিয়া, সঙ্গে লইয়া, উভয়ে স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন, তাঁহারা রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, প্রজাগণ অতিশয় আনন্দিত হইল। রাজা প্রতাপমুকুট, বধূর সহিত পুত্র পাইয়া, আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া, নগরে মহোৎসবের আদেশ করিলেন।

হরিদাসের গুপ্তকথা

ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের উত্তরে গিরিরাজ হিমালয়; পুরাণে পাওয়া যায়, হিমালয়ের উপর দিয়ে স্বর্গে যাবার পথ। আমি মানিকগঞ্জের উত্তরে এসেছি, এখানে স্বর্গের পথ নাই; এখানে যদি আমি অমরকুমারীর সন্ধান পাই, কি দর্শন পাই, তা হোলে এই স্থানকেই আমি স্বর্গধাম বিবেচনা কোরবো। যেখানে অমরকুমারী আছেন, সেই স্থানটি আমার পক্ষে স্বর্গ।

মানিকগঞ্জের উত্তরসীমা অতিক্রম কোরে আমি অনেকদূর এসেছি, সীমা অতিক্রম হোয়ে গেছে, তথাচ আমি মানিকগঞ্জে।...গ্রামের মধ্যে আমি প্রবেশ কোল্লেম। গ্রাম নিতান্ত ক্ষুদ্র নয়। অনেকগুলি বড় বড় বাড়ী জনশূন্য হয়ে খাঁ খাঁ কোচ্ছে। ইমারতের উপর বৃক্ষলতায় সঙ্গে বন্যজন্তু বাসা কোরেছে, স্থানটি নির্জন।

বিষণ্ণ নয়নে ইতঃস্তত দৃষ্টিসঞ্চালন কোত্তে কোত্তে বিষণ্ণ বদনে বিষণ্ণ হৃদয়ে মন্থরগতিতে আমি অগ্রসর হোতে লাগলেম। পথে এতক্ষণ একটিও মনুষ্য দৃশ্য হয় নাই, এই সময় আমার সম্মুখে দুইটি লোক।...লোকদুটী পরস্পর বলাবলি কোচ্ছে, "তাই তো ভাই! তুমি ঠিক কথা বোলেছো।...পঙ্কহ্রদে পদ্মফুল! তেমন সুন্দরী মেয়েটি এমন জায়গায় কেমন কোরে এলো, যারা এনেছে,.. তাদের মতলব নিশ্চয় দুষ্ট মতলব!"

—"সে কথা আর বোলতে?...জান না বুঝি তুমি?...মেয়েটিকে তারা বেচে ফেলবে! দাম ধার্য হয়েছে দু'হাজার টাকা! ও পাড়ার সেই বংশী পোদ্দার দু'হাজার টাকা পণ দিয়ে সেই মেয়েটিকে কিনে নেবে! কথাবার্তা সব ঠিক, কেবল লেখাপড়া বাকী।"

...আমি তখন প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়িয়ে ছিলেম, লোক দুটিকে দেখে আরও একটু সাবধান হয়ে লুকিয়ে ছিলেম।...তারা চোলে গেল; কথা বলাবলি কোত্তে কোত্তে অনেক দূর এগিয়ে গেল; শেষে তারা আর কি কি কথা বোল্লে, সেগুলি শুনতে পেলেম না।'

পদ্মজলে পদ্মফুল! কোন্ পদ্মের কথা এরা বোলে গেল! বোধ হচ্ছে যেন, আমারি হৃদয়-সরোবরের পদ্মফুল! আমি যেন জানতে পারছি, এইখানেই আমার ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে।...আরোও কিছু জানতে পারা যায় কিনা এই আশায় গ্রামের দিকে খানিকদূর অগ্রসর হোলেম।...রাস্তার বামদিকে পূর্বে-পশ্চিমে লম্বা একখানা বৃহৎ বাড়ী দেখতে পেলেম। সেই বাড়ীখানা বহুদিনের পুরাতন, অর্দ্ধেকের অধিকাংশ অব্যবহার্য, পূর্বদিকের অল্পাংশমাত্র নূতন মেরামত করা হয়েছে, কপাট-জানালা বদল করা হয় নাই, এক একটি জানালা গরাদে-শূন্য, কীট-জীর্ণ, ভগ্নকপাটে ঢাকা। বোধ হলো, সেই অংশে মানুষ আছে; ছাদের উপর থেকে লম্বিতভাবে খানকতক ধুতি-শাড়ী রবিতাপে বিস্তৃত ছিল, সেই নিদর্শনেই আমি বুঝলেম, সেই অংশে মানুষ আছে। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে সেই বাড়ীখানার দিকে আমি চেয়ে চেয়ে দেখছি, এমন সময় দেখি, একজন অর্দ্ধবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি গাভীর বন্ধনরজ্জু ধারণ কোরে সেই পথ দিয়ে আসছেন। আমি সেই ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "এ বাড়ীখানি কার?'

ব্রাহ্মণ নীরবে আমাকে দেখলেন কিছুক্ষণ। তারপর বোল্লেন, "বাবুদের বাড়ী। বাবুরা পূর্বে এখানকার বিখ্যাত জমিদার ছিলেন, প্রজা-লোকেরা এই বাড়ীর কর্তাকে রাজা বোলে গৌরব কোত্তো, বাড়ীখানার নাম ছিল রাজবাড়ী। এখন অবস্থা খারাপ।...অতিকষ্টে দিন চলে। এখন আছেন কেবল তিনটি বাবু আর গুটিকতক বিধবা। বাবু তিনটির মধ্যে দুটি এখনো নাবালক, যিনি এখন কর্তা, তিনিই ঐ নাবালক ভাই-দুটার অভিভাবক। কর্তার নাম রমণীবল্লভ ভৌমিক।"

ব্রাহ্মণের কথায় উৎসাহ এলো। গাভীর দড়িখানি তার হাত থেকে নিয়ে একটা গাছের ডালে বাঁধলেম। ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "বংশী পোদ্দারের বাড়ী এখান থেকে কত দূর?"

আমার প্রথম প্রশ্নে ব্রাহ্মণ যেমন চকিত নেত্রে আমার বদন নিরীক্ষণ কোরেছিলেন, এবারও তাই কোল্লেন। তারপর জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বোল্লেন, "তুমি বুঝি হুগলী জেলার ছেলে?"...

তার প্রশ্ন শুনে আমিও অবাক হোলেম। তিনি দুই তিনবার মস্তক সঞ্চালন কোরে বোল্লেন, 'হুঁ-হুঁ-হুঁ। বংশী পোদ্দারকে এখন অনেক ছেলেই খুঁজবে। বংশী পোদ্দারের এখন জোর কপাল।"

—'কেন মহাশয় ?'

—…"ঐ বাগানের ভিতর একখানি আটচালা ঘর আছে, সেইখানে চল। পথের মাঝখানে সে সব কথা গল্প করা ভাল নয়।"

আটচালার বারান্দায় এসে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "বংশী পোদ্দার এতদিন সোনা-রূপা বিক্রী কোত্তো, চোরেদের কাছে চোরামাল কিনে কিনে রাখতো, সেই বংশী এবার একটি মা-লক্ষ্মী কিনে ফেলবে।"

—মা-লক্ষ্মী কেনা কি রকম ?

—কে জানে বাপু, কোথাকার কারা আমাদের এই গ্রামে একটি মা-লক্ষ্মী এনে রেখেছে……দরস্তুর হোয়ে গিয়েছে, দু' হাজার টাকা পণ।"

—ব্যাপারীরা এখন আছে কোথা ?

—কে জানে বাপু, কোথা তারা চোলে গিয়েছে, এই মাসের শেষাশেষি এসে কাজটা নির্বাহ কোরে দিয়ে যাবে, এই রকম আমি শুনেছি।

—লক্ষ্মী এখন আছেন কোথায় ?

—তা আমি তোমায় বোল্‌বো না।

—লক্ষ্মীটির নাম কি ?

—তাও আমি বোল্‌তে পারব না। কেনাবেচার কথা ঠিক হবার সময় আমি একজন সাক্ষী ছিলেন। ব্যাপারীরা আমাকে দুটি টাকা প্রণামী দিয়ে গেছে, কথা প্রকাশ করা নিষেধ।

আমি,—(প্রণাম করিয়া) ঘটকঠাকুর আপনি ? আপনাকে দণ্ডবৎ।… আমি আপনাকে পাঁচটি টাকা দিচ্ছি। দয়া কোরে সেই লক্ষ্মীর নামটি আমায় বলুন।

—নাম আমি কিছুতেই বোল্‌বো না। শেষ ব্যাপারের দিন ব্যাপারীরা আমাকে আরও দশ টাকা দিয়ে যাবে, অঙ্গীকার আছে।

—আচ্ছা, দশ টাকাই আমি দিচ্ছি, নামটি আপনি বলুন।

—বাপ্‌ রে! তাও কি হয় ? ঘটক আমি হোতে পারি, বিশ্বাস-ঘাতক হোতে পারি না।

—আচ্ছা লক্ষ্মীর ঠিকানা বলুন, তাতেও আপনি দশ টাকা পাবেন। ব্রাহ্মণ, (হস্ত বিস্তার করিয়া) অগ্রে দক্ষিণা দাও, তারপর—

…টাকা নিয়ে, টাকাগুলি খুব শক্ত কোরে কোঁচার কাপড়ে বেঁধে রেখে, প্রফুল্ল বদনে ব্রাহ্মণ বোল্লেন, "ঠিকানাটি তুমি তো জানতে পেরেছ, তবে আর

আমার মুখে নূতন শুনবার আকিঞ্চন কেন? কর্ণ অপেক্ষা চক্ষের গুণ বেশী!"

...বিস্ময় প্রকাশ কোরে তৎক্ষণাৎ তাঁরে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সে কি মহাশয়! ঠিকানা আমি জানতে পেরেছি, এটা আপনি কি রকম কথা বলেন?

...ব্রাহ্মণ তখন যেন চঞ্চল হয়ে উত্তর কোল্লেন, "কেন? যে বাড়ীর সম্মুখে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে, যে বাড়ীর ছাদে সেই সকল কাপড় শুকচ্ছে, সেই বাড়ী, সেই বাড়ীতেই এখন মা লক্ষীর অধিষ্ঠান। আমি যাই—চোল্লেম।"

—আর একটি মাত্র কথা। যদি কোন বিশেষ আপত্তি না থাকে, অনুগ্রহ কোরে বলুন, আপনার নামটি কি?

—শ্রীধনঞ্জয় ঘটক ন্যায়ভূষণ।

ব্রাহ্মণ চোলে গেলেন।...বেলা অধিক হয়েছিল। বাসায় ফিরে চোল্লেম। বাড়ী ফিরে ভাবতে লাগলেম, অতঃপর কি করা উচিত। পুলিশ মোতায়েনের জন্য মণিভূষণকে দিয়ে দরখাস্ত করাব? যদি আমার অনুমান মিথ্যা হয়, তাহলে দরখাস্তকারী মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হবে। না, যে কার্য ভাল নয়।...

নির্ণয় করবার উপায় কি?—হয় স্বচক্ষে অমরকুমারীকে দর্শন করা, না হয় অন্য কোন উপায়ে অন্য কাহার দ্বারা সেই বিদেশিনী কন্যার নামটি অবগত হওয়া।

কি করা যায়। আদালতের সাহায্য নিয়ে অমরকুমারীর অনুসন্ধানে আমি এসেছি, ক্রমশই দিন গত হোচ্ছে, আসল কাজ হোচ্ছে না।

...আর তিনদিন অতিবাহিত। যা কিছু জান্‌তে পাচ্ছি, আপনার মনে মনেই রাখছি। হরিবাবুকেও জানাচ্ছি না, মণিভূষণকেও কিছু বলেছি না। শেষে ঠিক কোল্লেম, আর একটু অগ্রসর হওয়া ভাল। কিভাবে অগ্রসর হওয়া ভাল। কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়, সেটিও মনে মনে অবধারণ কল্লেম।

মুর্শিদাবাদ থেকে যখন আমরা আসি, তখন তিন প্রস্থ ছদ্মবেশ, দুই জোড়া পিস্তল, আর গুলীবারুদ আমার সঙ্গে ছিল, এইবার ছদ্মবেশ ধারণের প্রয়োজন উপস্থিত। চতুর্থদিবসে অপরাহ্নে বাসা থেকে আমি বেরুলেম, একপ্রস্থ ছদ্মবেশ আমার সঙ্গে থাকলো। ধনঞ্জয় ঘটকের সঙ্গে যে বাগানের আটচালায় কথাবার্তা হয়েছিল, সেই বাগানের সারিসারি আম্রবৃক্ষের অন্তরালে অতি সাবধানে বসন পরিবর্ত্তন কোল্লেম। স্ত্রীলোকের বেশ। বক্ষআবরণের যোগ্য কাঁচুলি-ধরণের ছোট একটি জামা; যেন অনেকদিনের ব্যবহার করা, একটু

একটু মলিন, ঠাঁই ঠাঁই একটু একটু দাগ। পরিধানে একখানি আধময়লা শাড়ী; মাথায় পরচুল-কবরী; অলঙ্কারের মধ্যে কেবল দুহাতে দুগাছি পিতলের বালা।

বেশ পরিবর্তনের পর আমার পুরুষবেশের সজ্জাগুলি একখণ্ড ক্ষুদ্রবস্ত্রে বন্ধন কোরে একটি পুঁটলীপ্রস্তুত কোল্লেম। সন্ধ্যার পরেই আকাশে চন্দ্রোদয় হলো, সেই বাগান পেরতেই রাস্তা, ওপারে সেই গৃহের ফটক, রাস্তার পরেই একটা পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ঘাটে একটি মাত্র স্ত্রীলোক। গাত্রপ্রক্ষালন কোরে জলকুম্ভ কক্ষে সিক্ত বসনে সেই স্ত্রীলোকটা ঘাটের চাতালে এসে উঠলো। ঠিক চাতালের ধারেই আমি। আমাকে দেখে কেমন একরকম অবাক স্বরে জিজ্ঞেস কোল্লে, কে তুমি?"

মুখে আমার ঘোমটা ছিল না, বুকে আমার কাঁচুলি ছিল। মুখের কথা না শুনে, চেহারা দেখে, হঠাৎ কাহারো মনে হোতে পারে খোট্টার মেয়ে। আমি বাঙ্‌লা কথাতেই বোল্লেম, আমি 'আমি বিদেশিনী, এই গ্রামে নূতন এসেছি, পথে শুনলেম, এইখানে একখানি রাজবাড়ী আছে; বিদেশী গরীব-দুঃখী দৈবাৎ এখানে এসে উপস্থিত হোলে সেই বাড়ীতে আশ্রয় পায়। তুমি যদি বলে দাও, কোথায় সেই রাজবাড়ী, কোন দিকে যেতে হবে, তবেই—"

স্ত্রীলোকটি অর্ধ-বয়সী; বোল্লে, আর বাছা রাজবাড়ী! রাজাদের কি আর সেকাল আছে? তা তুমি এসেচো, থাকতে পারে, আমার সঙ্গে। সেই বাড়ীতেই আমি থাকি, কাজকর্ম করি, বড় বৌমা ভালবাসে, সেই খাতিরেই থাকি, অনেকদিন আছি, ছেড়ে যেতেও মন চায় না। এসো তুমি আমার সঙ্গে।"

স্ত্রীলোকটি সেই রাজবাড়ীর দাসী। দাসীর নাম রেবতী। দাসীর কাছে সবশুনে সেই বাড়ীর বৌমা আমাকে নিশাকালে সেই বাড়ীতে আশ্রয় দিতে সম্মত হোলেন; মনে মনে আনন্দ অনুভব কোরে আমি আশ্বাস প্রাপ্ত হোলেম।

…আহারাদি হলো। বৌমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পও হলো। তারপর একটি শূন্য ঘরের মধ্যে আমি বিশ্রাম কোত্তে লাগলেম। রেবতীকে বলে-ছিলেম, আমার দু একটা বলবার আছে, তাই কিছুক্ষণ পরে রেবতী এসে বোল্লে, 'কি তুমি আমারে তখন বোলবে বোল্‌ছিলে? বল দেখি শুনি কথাটা কি?

—বাবু কোথায় ?

—ছোটবাবু দুটী তাঁদের ঘরেই আছেন, বড়বাবু বাড়ী নাই।

—কোথায় তিনি ?

—তিন দিন হলো, সহরে বেরিয়েছেন, একটা কারবার করবার ইচ্ছে আছে, সেই চেষ্টাতেই ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বোলে এ সংসারের দুরবস্থার কথা শুনালো রেবতী।

—কিন্তু লক্ষ্মীর সংসারে ততটা কষ্ট হয় না, যদিও কিছু কিছু হয়, লোকে সেটা পায় না। বিশেষ এই বৌমাটী দেখছি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী; ঐ লক্ষ্মীর দয়াগুণে দুঃখিনী বিদেশিনীরা আজিও এ সংসারের আশ্রয় পায়।

রেবতী (বিস্ময়ে চাহিয়া) কেন তুমি এমন কথা বোল্লে? তুমি বিদেশিনী, তুমি আজ রাত্রে এই বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েছো, সেই জন্যই কি ?

—না, না, না, শুধু সেই জন্যই নয়, কত দুঃখিনী বিদেশীই তো আসে।

—এ সব তুমি কি কথা বোল্‌ছো ? নাম আছে পদ্মপুকুর, পদ্মফুল নাই। এ বাড়ীতে এখন বিদেশিনীর অক্লেশে আশ্রয় পাওয়া এটা তোমার কি রকম অনুমান ?

—অনুমান বল কেন ?···ঠিক কথাই আমি বোলছি; পদ্মপুকুরে পদ্মফুল আছে, সম্প্রতি একটি বিদেশিনী কুমারীও—

রেবতী (বিস্ময়ে) ওমা গো! সেই কথা বুঝি তুমি বোল্‌ছো? সেকথা তুমি কেমন করে জানলে ?

—কোন্ কথা ? পদ্মফুলের কথা।

রেবতী। বল যদি, পদ্মফুল বোলতে পারো, বটেও একটি পদ্মফুল; পদ্মফুলের মত একটি বিদেশিনী সম্প্রতি এই বাড়ীতে এসেছো।

—পদ্মফুলটি কিরকমে এলো ?

—পশ্চিমদেশের তিনজন লোক একটি সুন্দরী মেয়েকে এই বাড়ীতে রেখে গিয়েছে।

—তারা কোথায় ?

—বাবু হয়তো শুনে থাকবেন, আমি কেমন কোরে শুনবো ?

—বিদেশিনী মেয়েটি কি অবস্থায় আছে ?

—আহা-হা। বাছা কেবল রাতদিন কাঁদে, খায় না, ঘুমায় না, কথা কয় না, কেবল কাঁদে, কেবল কাঁদে।

—আহা-হা। তোমাদের সেই বিদেশিনী মেয়েটাকে একবার দেখতে পাই না?

—কেন পাবে না? তুমি বিদেশিনী, সেও তো বিদেশিনী।

—দেখাও না একবার। সেই দুঃখিনীকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ কেমন আকুল হয়ে উঠছে।

—দেখে তুমি কি কোরবে?

—কে কার কি করে তা তো তুমি জান।…সমান সমান কষ্টভাগিনী একটি সঙ্গিনী হব…সেই বিদেশিনীকে একটু সান্ত্বনা দিব।

—তা তুমি পারবে। তোমার যেরকম মধুর বচন…আনব তারে এইখানে, না, তুমি সেই ঘরে যাবে?

—তারে তুমি এইখানেই এনে দাও।

রেবতী গেল। এদিকে আমার নারীবেশ। কণ্ঠস্বরে ধরা পড়ার ভয় ছিল। বিধাতা আমার প্রতি সদয় হয়ে আমার কণ্ঠে যেরূপ স্বর দিয়েছেন, বেশী বয়সে কিরকম হয় বলা যায় না, কিন্তু এই পঞ্চদশবর্ষ পর্যন্ত স্বদেশের অল্পবয়স্কা বালিকাদের স্বরের সঙ্গে সেই স্বরে—আমার এই কণ্ঠস্বরে সুন্দর মিলন হয়।… …আমি ঠিকঠাক হয়ে চিবুক-দেশ পর্যন্ত ঘোম্‌টা দিয়ে ঢেকে রাখলেম।

……বোসে আছি, ঘরের একধারে একটি প্রদীপ জ্বলছে, এমন সময় বিদেশিনী এলেন। সঙ্গে সঙ্গে রেবতী।

রেবতী বোল্লে, 'ওমা! এ কিগো? মেয়েমানুষকে মেয়েমানুষের লজ্জা! কি রকম বিদেশিনী! ঘোমটা ঢাকা কালা—বৌ।"

বিদেশিনী বোস্‌লো। রেবতীও। কিছুক্ষণ পরে আমি চাপা কণ্ঠস্বরে ধীরে ধীরে বোল্লেম, "বিদেশিনী আমি গণনা জানি। তুমি এখানে আছো, তাও জানি।…কেমন কোরে তুমি এখানে এসেছো, কারা তোমাকে এখানে এনেছে, গণনা কোরে তাও আমি জানতে পেরেছি।

বিদেশিনী সুমধুর স্বরে বোল্লেন, "আমার দুর্ভাগ্যের কথা তুমি জানতে পেরেছো, মুখখানি একবার খোলো, তারপর তোমার সঙ্গে আমার কথা হবে?'

—আমি বোল্লেম, গণনার শেষফল সুসিদ্ধ না হোলে স্ত্রীলোকের কাছে স্ত্রী-গণনাকারীর মুখের কাপড় খুলতে নাই। এখানে এ যে তুমি দিন রাত্তির কাঁদো, আর যারা তোমায় এনেছে, আবার তারা আসবে, সেইবার তোমার ভাগ্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ হবে।

—কি রকম যুদ্ধ হবে আর কেন আমি কাঁদি তোমার গণনা কি তার উত্তর দিতে পারে?

—পারে। যারা তোমারে এনেছে, তারা তোমারে বেচে ফেলবার মন্ত্রণা কোরেছে। দু হাজার টাকা পণ ধার্য হয়েছে। খরিদ্দার এখানকার বংশী পোদ্দার। সেই বিক্রয় উপলক্ষেই তোমার ভাগ্যযুদ্ধ। আর কোথায় তুমি ছিলে, কোথায় তুমি এসেছ, কারে তুমি হারিয়েছ, তার সঙ্গে আর দেখা হবে কি না, এরপর তোমার কি হবে, এইসব ভেবে তুমি কাঁদো।

রেবতী হঠাৎ একটু উচ্চকণ্ঠে বললে, ও বাপু। এ মেয়ে তো কম মেয়ে নয়।...যা যা বোলে দিলে সব ঠিক।

—তোমার গণনা আর কি বলে?

—আর কি বলে, শুনবে? তুমি মুক্ত হবে। শীঘ্রই তুমি এখানকার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। রেবতী বোল্লে, আজ আমাদের বাবু এখানে থাকলে—"

এমন সময় বৌমা এসে দেখা দিলেন। রেবতীর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল। বৌমা বোল্লেন, এই যে বেশ হয়েছে। দুটি বিদেশিনীরই একঠাঁই। কিগো বিদেশিনী, তোমাদের আলাপ-পরিচয় কেমন হলো?

রেবতী বোল্লে 'মা গো মা, এই নূতন বিদেশিনী চমৎকার গণনা জানে, আশ্চর্য গণৎকার। এই ব্রজকিশোরীর আগাগোড়া সকল কথা এক এক কোরে বোলে দিলে।

বৌমা খানিকক্ষণ সুস্থির-দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে থাকলেন, চেয়ে চেয়ে আমারে জিজ্ঞাসা কোরলেন, সত্যই কি তুমি গণনা শিখেছ? বল দেখি, আমাদের সংসারে এ দুর্দশা আর কতদিন থাকবে?

—যে দিন ব্রজকিশোরীর ভাগ্যযুদ্ধের অবসান হবে। সেইদিন আমি এই বাড়ীতে আর একবার আসবো রাজলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি দর্শন করবো। ......বাবু যদি পূর্বপুরুষের ধর্মপথ পরিহার না করেন, যারা বিপদে পড়ে, তাদের যদি সহায় হন, অবস্থাচক্রে মানুষের যেমন কুমতি ঘটে, বাবু যদি সেরূপ কুমতির দাসত্ব না করেন, তাহলেই আপনার এই ধর্মের সংসারে এ দুর্দিন কখনই স্থায়ী হবে না। আপনার তুল্য দয়াময়ী যে সংসারের লক্ষ্মী, সে সংসার অবশ্যই সর্বসৌভাগ্যে সমুজ্জ্বল হবে।"

বৌমা বিস্মিত হোলেন। কিন্তু কোন কথা বোল্লেন না।



……ভোরবেলা। বাড়ীর কেহই যখন জাগরণ করেন নাই, সেই সময় আমি আমার কাপড়ের পুঁটুলীটি কক্ষে লয়ে উপর থেকে নেমে এলেম। রেবতী উঠেছিল, নীচের প্রাঙ্গণে রেবতীর সঙ্গে দেখা হলো। বল্লেম, "দেবতারা এ সংসারের মঙ্গল করুন, এই আশ্রমে নিরাপদে একরাত্রি আমি আশ্রয় পেলেম, কৃতজ্ঞতা বিস্মৃত হব না। ভাগ্যে যদি থাকে পুনরায় আর একবার সাক্ষাৎ হবে, বৌমাকে এই কথাগুলি তুমি বোলে রেখো। সূর্য্যোদয়ের পর রাস্তায় আমি বাহির হব না। চোল্লেম।

(২)

…রাত্রে বাসায় না ফেরায় হরিহরবাবু ও মনিভূষণ দুজনেই অতিশয় চিন্তাগ্রস্থ হোয়েছিল। হরিহরবাবুকে বোল্লেম, "কার্য্যগতিকে স্থানান্তরে আটক থাকতে হয়েছিল, ফলাফল একটু পরেই আপনি জানতে পারবেন। মণিভূষণকে বোল্লেম, "সকাল সকাল প্রস্তুত হও, কালবিলম্ব না কোরে ঢাকা যেতে হবে। শত্রু মিত্রের পরিচয় সেইখানেই পাবে।

মণিভুষণ, 'সন্ধান কিছু পেয়েছ কি?'

আমি উত্তর কোল্লেম, ''হাতের বস্তু যতক্ষণ হাতে না আসে, সন্ধান হয়েছে বোলে ততক্ষণ শ্লাঘা প্রকাশ করা উচিত নয়।" হরিহরবাবুর কাছে গিয়ে বোল্লেম, 'অমরকুমারীর সন্ধান হয়েছে। দুদিন একটু একটু উড়ো ভাষা সন্ধান। গতরাত্রে নিঃসংশয়।…আমরা এখন ঢাকায় যাব। আমি আর মনিভূষণ। আপনি অনুগ্রহ কোরে দুটি লোক আমাদের সঙ্গে দিন, অচেনা জায়গায় আমরা যেন ফাঁপরে না পড়ি। এখন আপনি কেবল এইটুকু জেনে রাখুন, এই মাণিকগঞ্জের উত্তর প্রান্তে একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে অমরকুমারী আছেন।'

—বাহাদুর তুমি। ঈশ্বর তোমার মনস্কামনা পুর্ণ করুন। দেখো, ঢাকায় যাচ্ছ, সাবধান। সাবধানে সকল কাজ কোরো। ঠোকো না।… আর ঢাকা কোর্টের উকিল শিবশঙ্কর মল্লিকের সঙ্গে দেখা কোরো, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু।

ঢাকায় এলেম। শিবশঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা কল্লেম। দরখাস্ত লেখা হলো, দাখিল হলো, এবং উকীল সেরস্তাদার-পেস্কারের সহায়তায় সেইদিনেই হাকিমের হুকুমমত পুলিশের নামে পরোয়ানা বাহির হয়ে গেল। এরপর

শিবশঙ্করবাবুর প্রচেষ্টায় পুলিশের সঙ্গে একজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার প্রার্থনাও মঞ্জুর হলো।

শিবশঙ্করবাবুর বাড়ীতে রাত্রিবাস করে পরদিন পুলিশের দারোগা, জমাদার, বরকন্দাজও সকলের উপর ডেপুটীবাবুকে নিয়ে আমরা মাণিকগঞ্জে পৌঁছলেম। সঙ্গে একজন উকিলও এলেন।

সেই আমবাগান। সেই আটচালা। ডেপুটিবাবু জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "সনাক্ত করবার লোক কেহ এখানে আছে?

আমি বোল্লেম, আছে। দরখাস্তকারী মণিভূষণ ও আমি সে মেয়েটিকে উদ্ধার করতে আমরা যাচ্ছি, সেই বালিকা যদি আমাদের দুজনকে চিনতে পারে, তা হোলে আপনার হৃদ-প্রত্যয় জন্মিবে তো?

এরপর দারোগা আমাকে অজস্র প্রশ্ন কোত্তে লাগলেন। সে মেয়েটি চুরি গিয়েছে কতদিন? তার সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? কতদিন হলো আমি এই গ্রামে এসেছি? কেমন করে জেনেছি মেয়েটি এই বাড়ীতেই আছে? মেয়েটির বয়স কত? ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা সকলে একত্র হয়ে রমণীবল্লভের বাড়ীর নিকটে গিয়া উপস্থিত হোলেম। দালানে এসে উঠতেই রেবতী আঁৎকে উঠলো, 'ওমা! এরা সব কেগো? এখানে এসব থানা পুলিশ কেন গো?' —আতঙ্কে এই সব কথা বোলতে বোলতে রেবতী বাড়ীর ভেতর ছুটে পালালো।

রেবতীর নাম ধরে আমি ডাকলেম। রেবতী আমায় চিনতে পাল্লো না। অবাক হলো। ভয় পেলো। ডাকাডাকিতে ছোট ছোট দুটি বাবু আদুরগায়ে বেরিয়ে এসে বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেন।

আমি বোল্লেম, তোমার দাদাবাবু কি বাড়ী এসেছেন?

—এসেছেন। শেষরাত্রে এসেছেন, একটু অসুখ আছে, আহার করেন নি, ঘুমুচ্ছেন।

—তাকে বলো ঢাকা সদর দপ্তরের ডেপুটিবাবু এসেছেন, বিশেষ দরকার, সংবাদ দাও।

ছোটবাবুদের একজন ভেতরে চলে গেল। ডেপুটিবাবু অপর বালককে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, 'ব্রজকিশোরী নামে একটি মেয়ে তোমাদের বাড়ীতে আছে?'

—আছে।

—কোথা থেকে এসেছে ?

—তিনজন লোক আমার দাদার কাছে তারে রেখে গিয়েছে। বিয়ে হবে।

—মেয়েটি এখানে কি করে ?

—কাঁদে।

—কার সঙ্গে বিয়ে হবে ?

—ঐ দাদা আসছেন।

দুই হস্তে নয়ন মার্জন কত্তে কত্তে বালকের দাদাটি সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। বিরক্ত বদনে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আপনারা কে? আপনারা কেন এখানে এসেছেন ? বাহিরে পুলিশের লোক খাড়া আছে। ওরাই বা এখানে কেন ? ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তর দিলেন, আপনি বসুন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের আদেশে আমরা এখানে এসেছি। পুলিশও এসেছে। ···এখানে, মানে আপনার বাড়ীতে ব্রজকিশোরী নামে একটি বালিকা আছে, যারা তাকে এখানে এনে রেখে গিয়েছে, তাদের আপনি জানেন কিনা ?

—আমার উপর এরূপ প্রশ্ন করবার আপনার কি অধিকার ?

—ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ। আমার কাছে উত্তর দিতে আপনি বাধ্য। বলুন, তাদের আপনি জানেন কিনা ?

—পূর্বের জানাশোনা ছিল না, হঠাৎ একদিন একটি মেয়ে সঙ্গে কোরে তিনটি ভদ্রলোক এখানে আসেন। সেই তিনজনের মধ্যে একজন সেই মেয়েটির পিতা। তিনি গরীব, এই গ্রামে একজন ধনবান পাত্রে মেয়েকে তিনি সম্প্রদান কোরবেন।

—মেয়েটিকে একবার আমার কাছে আনয়ন করুন।

—তা আমি পারি না। পিতা যারে বিশ্বাস কোরে আমার কাছে গোছিয়ে রেখে গিয়েছেন, তারে আমি পুলিশের কাছে হাজির কোত্তে অসম্মত।

—বেশ। সেই তিনজন লোককে আপনি হাজির করুন।

—যতদিন পরে তাদের আসবার কথা ততদিন পরে যদি আবশ্যক হয়, তবে আমি তাদের হাজির কোত্তে পারবো। এখন পারি না।

—উত্তম। সে ভার পুলিশ নেবে। আপনি এই মেয়েটিকে আমাদের কাছে হাজির করুন। সেই মেয়েটির মুখের কথাগুলি আমি শ্রবণ করবো।

—তা আপনি পারেন না।

—উত্তম। আপনার নিজ পরিবারের রমণীগণকে অন্য গৃহে সরে যেতে বলুন, আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ কোরে সেই কুমারীর এজাহার গ্রহণ করবো।

—আমি খুন করি নাই, ডাকাতি করি নাই, আমার নামে কোন নালিশ নাই। আপনি আমার বাটীতে খানাতল্লাশ কোত্তে চান, এটা কি আইনের মর্ম নয়।

—আপনি একটু সাবধান হয়ে কথা কবেন। মেয়ে-চুরি মামলা, আপনি সেই মামলার আসামীগণের বানিকার। আমি বে-আইনী কার্য কোত্তে এসেছি, বা উন্মত্ত হচ্ছি, এমন কথা যদি পুনরায় আপনি বলেন, তা হলে—

—তা হলে আপনি কি কোরবেন?

—কুইন ভিক্টোরিয়ার নামে আমি আপনাকে পুলিশের হেপাজাতে সমর্পণ করবো।

—করুন, আমি প্রস্তুত আছি।

—এখনো আমি ভালো কথায় বলছি, মেয়েটিকে আপনি এইখানে হাজির করুন।···আমি জানি, একজন স্বুবর্ণ-বণিকের সঙ্গে সেই মেয়ের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির কোরেছেন, মধ্যস্থ হয়ে মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছেন, দু'হাজার টাকায় মেয়েটিকে বিক্রয় করবার বন্দোবস্ত করেছেন, এ সব কথা কি আপনি অস্বীকার কোত্তে পারেন?

রমণীবাবুর আরক্ত বদন অকস্মাৎ পাণ্ডুবর্ণ হয়ে এলো। ডেপুটিবাবু দারোগাবাবুকে সম্বোধন করে বোল্লেন, "এই গ্রামে ধনঞ্জয় ঘটক আর, বংশী পোদ্দার নামে দুটি লোক আছে, আপনার বরকন্দাজদের বলুন, অবিলম্বে সেই দুইজনকে এখানে যেন হাজির কর।"

রমণীবাবু কাঁপতে কাঁপতে কম্পিত স্বরে বোল্লেন, অত ফ্যাসাদে দরকার নাই,···ব্রজকিশোরীকে আমি আনিয়ে দিচ্ছি। ব্রজকিশোরীকে দেখুন, যে যে কথা জিজ্ঞাসা করবার করুন, ঘটককে পোদ্দারকে তলব দিবার দরকার নাই।

—তিনটাই আমার দরকার। ব্রজকিশোরীকে যারা এখানে রেখে গিয়েছে, তারা চোর; যারা যারা চোরের সহায়তা করে, জ্ঞানেই হোক, অজ্ঞানেই হোক, বিচারস্থলে তাদের সকলকেই আকর্ষন করা অবশ্য কর্তব্য।

কিছুক্ষণ পরেই অবগুণ্ঠনবতী একটি বালিকাকে নিয়ে রমণীবাবু এলেন। ডেপুটিবাবু বোল্লেন, "মা, আমি এখানকার মেজিষ্ট্রেট, তোমার কোন ভয়

নাই। যে যে কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো, কাহারও উপরোধ-অনুরোধ মনে না করে নির্ভয়ে তুমি সেই কথাগুলির উত্তর দিও।"

—তোমার নাম কি ?

—অমরকুমারী।

—তোমার আর কোন নাম আছে ?

—না।

—এখানে ব্রজকিশোরী নামে আর কোন বালিকা আছে ?

—এই বাড়ীর লোকেরা আমাকেই ব্রজকিশোরী বলেন।...

—কারা তোমারে এখানে এনেছে ?

—তাদের সকলকে আমি চিনি না। একজনকে চিনি, সে লোকটাও নিজের নাম প্রকাশ করে নাই।

—তুমি তার আসল নাম জান ?

—জানি। জটাধর।

—তাদের সঙ্গে তুমি কেন এখানে এসেছিলে ?

—চোখমুখ বেঁধে তারা আমাকে চুরি কোরে এনেছে।

—কোথা থেকে এনেছে ?

—মুর্শিদাবাদ থেকে।

—এ বাড়ীর বাবুকে তুমি আর কখনও দেখেছিলে ?

—না।

—এ বাড়ীতে এখন তুমি থাকতে ইচ্ছা কর ?

—না থেকে আর কোথায় যাব! আমার কেহ নাই।

—তবে যে শুনেছি তোমার পিতা তোমাকে এই বাবুর কাছে গোছিয়ে রেখে গিয়েছেন ?

—মিথ্যা কথা। আমার জন্মের পর অবধি আমার পিতা নিরুদ্দেশ।... মা ছিলেন, সম্প্রতি তিনিও স্বর্গে গিয়েছেন।

ডেপুটিবাবু বোল্লেন,...কেমন বাবুজী, মেয়েটির কথাগুলি শুনলেন।... আইনের চক্ষে এখন আপনিও অপরাধী হোতে পারেন।

তারপর আমাদের কাছে ডেকে, আমাদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, দেখ দেখি অমরকুমারী, দেখ দেখি মা, এই বাবু দুটিকে তুমি চিনতে পারো কিনা ?

অমরকুমারীর উজ্জল চোখ সজল হলো। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে মৃদুগুঞ্জনে···সে বোল্লে, হরিদাস! মণিভূষণ! দাদা!

ডেপুটিবাবু বোল্লেন, কেঁদো না মা, কেঁদো না। এই দুটি বালক তোমার আত্মীয়। এই দুটি বালক তোমারে উদ্ধার-নিমিত্ত বিস্তর আয়াস, বিস্তর কষ্ট, বিস্তর অর্থব্যয় স্বীকার কোচ্ছেন। তোমারে উদ্ধার কোরে এই দুই বালকের হস্তেই সমর্পণ করা হবে; তুমি কেঁদো না।'

বঙ্গের গুপ্তকথা

অম্বিকাচরণ গুপ্ত

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপন জেলায় ইংরেজিনবিশ দারোগা বহাল করিবার সখ করিয়া হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেটকে একজন ইংরাজী-জানা লোক পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করেন,—হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট আপন আমলাদিগের মধ্যে সকলকেই মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের অভিপ্রায় অবগত করিয়া তাহাদের কেহ যাইতে ইচ্ছা করেন কিনা জানিতে চাইলে, অনুপচন্দ্র প্রার্থনা করেন। এবং সে কালের দেবদুর্লভ দারোগাগিরি লইয়া মেদিনীপুর যাত্রা করেন। বৈকালে জল ঝড়ের সময় অনুপচন্দ্র নৌকা করিয়া উলুবেড়ের পৌছেন—জল ঝড় থামিলে আহারাদির পর সেই রাত্রেই ডাক পাল্কীতে কয়েকজন চৌকিদার সঙ্গে মেদিনীপুর যাত্রা করেন, এবং উলুবেড়ে ছাড়িয়া রাত্রি আন্দাজ দুই তিনটার সময় দামোদর তীরে উপস্থিত হ'ন। তখন নৌকা পরপারে ছিল। ডাকের পাল্কী শুনিয়া মাঝি তাড়াতাড়ি পশ্চিম পার হইতে নৌকা পাড়ি দিল; নৌকা যতই কিনারার নিকট আসিতে লাগিল, ততই একটা চীৎকার শব্দ শোনা গেল। অনুপচন্দ্র পাল্কীতে নিদ্রা যাইতে ছিলেন, চীৎকার শব্দে তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিল। অনুপচন্দ্র পাল্কী হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিলেন নৌকাখানি দামোদরের মাঝামাঝি আসিয়াছে। নৌকার উপরে একটি পাল্কী—পাল্কীর চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া একদল লাঠিয়াল লাঠি খাড়া করিয়া দণ্ডায়মান আছে—পাল্কীর নিকট একটি ভদ্রবেশধারী পুরুষ, সগর্বে দণ্ডায়মান—নৌকাখানি ক্রমশঃ কূলের অতি নিকটে আসিল; তখন স্পষ্টই

বুঝিতে পারা গেল সেই চীৎকার পাক্কীর ভিতর হইতেই বাহির হইতেছিল —"কেহ থাকেন স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা করুন,—দস্যু—দস্যু—দস্যু"—এই শব্দে অভিনব দারোগা অনুপচন্দ্র নূতন কার্যক্ষেত্রে আপনার গুণ গরিমার সুন্দর পরিচয় দিবার সুবিধা পাইলেন। তিনি আপনার চৌকিদারদিগকে বলিলেন "এই সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করতে হবে"—ইতিপূর্বে তাঁহার ডাকে পাক্কীর বেহারা পরিবর্তন হইয়াছিল। পরিবর্তিত বেহারা সমেত ষোলজন তাহার সঙ্গে। তাহাদিগকে বলিলেন, 'গ্রেপ্তার করিতে পারিলে তিনি পুরা বকশিস্ দিবেন।—তাঁহার সঙ্গে একজন বরকন্দাজও ছিল। তাহাকে দিয়া নিকটবর্তী ফাঁড়িতে বলিয়া পাঠাইলেন যে একদল চৌকিদার লইয়া ফাঁড়িদার তাহার সাহায্যার্থে ত্বরায় উপস্থিত হয়—বরকন্দাজ দৌড়িল; বেহারা চৌকিদার সারি বাঁধিয়া নদীর ধারে খাড়া হইয়া গেল। আর তিনি আপনি একটি রিভলভারে টোটা পুরিয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা তীরে আসিয়া লাগিল। তখন নদীতে ভাঁটা। নদীর জল কমিয়া কূল ভূমির অনেক নীচে গিয়াছিল। অনুপচন্দ্র সদলে কিনারার উপরে দণ্ডায়মান, নীচে নৌকা,—নৌকা হইতে যে অবিশ্রান্ত চীৎকার শব্দ আসিতেছিল তাহার উত্তর দিয়া তিনি বলিলেন, "ভয় নাই, ঈশ্বর রক্ষা করবেন।"

চীৎকার শব্দ আবার বলিল, "ভগবান কি এ অভাগীর দিকে মুখ তুলে চাইবেন ?

অনু। স্থির হ'ন উপায় হচ্ছে।

এই কথা বলিয়া তিনি বন্দুকে একটা আওয়াজ করিলেন; সেই নিস্তব্ধ নিশীথে বন্দুকের শব্দে বায়ু কাঁপিল, কাঁপিতে কাঁপিতে যত দূর গেল সেই শব্দকে বহিয়া ছুটিল; গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত করিল, অনুপ সদম্ভে বলিলেন, "সৎ হও অসৎ হও—ডাকাইত হও, দস্যু হও, ধীরে ধীরে নৌকা হ'তে নামিয়া এস,—নতুবা নিস্তার নাই'—এই কথায় লাঠিয়াল দিগের মধ্যে একজন নৌকার মাঝিকে সাংঘাতিক আঘাত করিয়া নদীর জলে ফেলিয়া দিল, আপনি হাল ধরিয়া দক্ষিণ দিকে নৌকা ভাসাইয়া দিল। ভাঁটার জোরে নৌকা দক্ষিণ মুখে ভাসিয়া চলিল। দারোগাবাবু অনুচরগণ সহিত কিনারা দিয়া অনুধাবন করিলেন। অনুপ যুবা পুরুষ, নূতন ক্ষেত্রে নূতন উদ্যমে অসীম সাহসে, বিপুল বলে ছুটিতে লাগিলেন,—লক্ষ্যে অলক্ষ্যে গুলি চালাইতে লাগিলেন— নৌকা হইতে তিন চারিজন অচেতন বস্তুর ন্যায় ঝুপ ঝুপ জলে পড়িয়া গেল;

স্ত্রী। গত রাত্রিতে দুই-তিন দণ্ডের সময়, যখন খুব ঝড়-বৃষ্টি হয়—আমি পলাইয়া একটি ভদ্রলোকের আশ্রয় লই, বোধহয় তিনিও একজন পথিক ; এরা তার কাছ থেকে আমাকে জোর করে এনেছে।

অনু। সেই ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারেন ?

স্ত্রী। ভালরূপ নয়—তখন আমি অজ্ঞান ছিলাম, ভাল করে তাঁকে দেখি নাই—

অনু। আপনি লেখাপড়া জানেন ?

স্ত্রী। জানি। সামান্য রূপ—

অনু। আপনার স্বামীর নাম লিখিয়া দেন দেখি,—অনুপচন্দ্র আপনার পাল্কী হইতে কাগজ কলম আনিয়া লিখিতে দিলেন। স্ত্রীলোকটি তাহার স্বামীর নাম 'বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়, হেড কেরাণী ওয়াটসন কোম্পানীর কুটি—গড়বেতা' এইমাত্র লিখিয়া দিলেন। নামটি পাঠ করিয়া অনুপচন্দ্র শিহরিয়া উঠিলেন—বিষাদ-হর্ষে তাহার চক্ষে জল আসিল। রিষড়ার বিপিন তাহার সহধ্যায়ী ছিলেন, তাঁহারই বিপদ—সেই বিপদে তিনি উদ্ধারকর্তা। যুবতী জিজ্ঞাসা করিল, নাম শুনিয়া আপনার চক্ষে জল আসিল কেন ?

অনু। সে কথা এখন আপনার শুনে কাজ নেই—পরে শুনবেন। আপনি এই যুবা দস্যুকে কখনও দেখেছিলেন ?

স্ত্রী। উনি আমার স্বামীর সম্বন্ধে ভ্রাতুষ্পুত্র। অনেকদিন হতে আমার প্রতি আসক্ত—সময়ে সময়ে আমার সতীত্ব অপহরণেরও প্রয়াস পায়—স্বামী বিদেশে থাকেন, তাঁকে পত্রে লিখি, এতদিন তিনি আমাকে আপনার কাছে লইয়া যান এমন সুবিধা পান নি, অল্প বেতন পেতেন, এখন বেতন বেড়েছে—

অনু। আপনার স্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম কি ?

স্ত্রী। বিনোদ।

থানার দারোগা মহাশয় যখন রূপনারায়ণের তীরে পৌঁছিলেন তখন বেলা পাঁচটা বাজিয়াছে। তিনি যাইবার পূর্বে রূপনারায়ণের তীরে লোক ধরে না—এগারটা খুন—নানা ভাবনায় গ্রামের কাহারও বাড়ীতে সে রাত্রি হাঁড়ি চড়ল না।

দারোগা মহাশয় পাল্কী হইতে অবতীর্ণ হইয়া সৌদামিনীর এজাহার লইলেন, তাঁহাকে দিয়া লাশ সনাক্ত করাইলেন, সৌদামিনী একে একে আপনার দারওয়ান, বেহারা, ও দাসীর লাশ চিনিলেন। যে দোকানে পলাইয়া

গিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহাও দেখাইয়া দিলেন—খুনী মোকর্দ্দমার তদন্ত চলিতে লাগিল।

অনুপচন্দ্র রাত্রিতে আহারান্তে মেদিনীপুর রওনা হইবেন। চক্কমলা গ্রামের জমিদার একজন কায়স্থ—তাহার বাড়ি দারোগা তেজচন্দ্র ঘোষের আদি অবস্থিতি। গ্রামের জমিদার নজরবন্দী, এবং মণ্ডল, গোমস্তা, পাইক সকলে এক দড়িতে বদ্ধ পড়িলেন; যতক্ষণ মোকর্দ্দমার কিনারা না হয়, ততক্ষণ তাহাদিগের গ্রহ সুপ্রসন্ন নহে।

জমিদার বাড়িতে দারোগা মহাশয় ও অনুপবাবু আহারাদি সমাপন করিলেন। সৌদামিনী সীতারামের অন্তঃপুরে থাকিলেন।

চককমলা গ্রামের তালুকদার সীতারামের বাটীতে দারোগা-মহোৎসবের দুই দিন কাটিয়া গেল। স্থির হইল সকাল সকাল দারোগাবাবুদিগের স্নানের আয়োজন করিয়া দিবেন। এমন সময় দারোগা তেজচন্দ্রের বরকন্দাজ ডুমন সিং ধীরে ধীরে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। দারোগা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি ডুমন সিং, খাবার-দাবার কোন অসুবিধে হচ্ছে না ত?

—'আজ্ঞে না। বিশ্বাস মশায়ের এখানে আমাদের কখন কষ্ট হয় না।" দারোগার পানে চাহিয়া বলিল, 'আপনাকে একবার আসতে হবে, একটা কথা আছে।'

ডুমন দারোগা মহাশয়কে বাটীর বাহিরে অনেক দূরে লইয়া গিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া কিয়ৎক্ষণ স্থির হইয়া রহিল,—কোন কথা কহিল না, দারোগা তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ডুমন সব ভাল তো?'

ডুম। আজ্ঞা না। ভারি বিপদ, এতদিন আপনার কাছে আছি, এমন কখন হয় না। বড় বড় দায় চলে গেছে—তায় কিছু ভাবনা করি না, আজ ভাবিয়েছে।

দার। ব্যাপারটা কি বল দেখি—

ডুম। এমন কিছু সঙ্গীন ব্যাপার নয়, তবে এই বেকারবাবী নূতন লোকটা থেকেই গোল বেঁধেছে—নাহলে সব চুকে যেতো—

দার। হয়েছে কি?

ডুম। আসামী ক'টা কাল রাত্রে সরেছে—

দার। সে কি ডুমন, খুনী-মোকর্দ্দমার আসামী পালাল কি? কখন?

ডুম। কাল রাত্রে?

দার। রাত্রে ত জানি। কেমন সময় ?

ডুম। তা জানতে পারা গেলে কি ধরা পড়তে বাকী থাকে।

দার। কে পাহারায় ছিল ?

ডুম। এই গ্রামের সাত বেটা চৌকিদার ছিল।

দার। ডুমন, শেষ বয়সটায় বড়ই বিপদ দেখছি, ছটা বছর গেলে পেন্সন নিয়ে বার হতেম, তা আর অদৃষ্টে ঘটলো না বোধ হচ্ছে।

ডুম। আপনি অত ভাববেন না। এই ডুমন থাকতে আপনার কিছু হবে না।

দার। তা তো জানি। কিন্তু আসামী কোথা পাব ? এখন সাক্ষীদেরও সনাক্ত করা হয় নি,—তাইত, কি হবে ?

ডুম। আমি ত চৌকিদার দিয়ে ধরতে পাঠিয়েছি।

এই সকল কহিতে কহিতে দারোগা তেজচন্দ্র বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। বড় ভয়ানক কথা, খুনী-মোকর্দ্দমার আটজন আসামী ফেরার। দারোগা আকাশ-পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। তাহার ভাবনা দেখিয়া ডুমন বলিল, বাবু, ভাববেন না, একটা উপায় করা আছে।

দারোগা। কি বল দেখি ?

ডুম। একবার এদিকে আসুন।

ডুমন দারোগা মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া যেখানে আসামীরা আবদ্ধ ছিল সেইখানে লইয়া গেল। গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দারোগা মহাশয় দেখিলেন আটজন লোক আবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা দারোগা মহাশয়কে দেখিয়া মাত্র বলিয়া উঠিল, "দোহাই দারোগা মহাশয়, আমরা কালীজোড়া পরগণার লোক, গঙ্গামায়িদর্শনে যাচ্ছিলাম, আমাদিগে ধরে এনেছে—ধর্ম অবতার আমরা কিছুই জানি না, আপনি আমাদের মা বাপ।" এই সকল কথা শেষ না হইতে হইতে ডুমন বলিল, "চুপ রও,—ঘাবরাও, মৎ।"

দারোগা মহাশয় গৃহ হইতে বাহির হইয়া ডুমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা একবার করে না ?" ডুমন উত্তর করিল, "চেষ্টা হচ্ছে।—"

দার। একবার কল্লেও টিক্‌বে না—সাক্ষীরা ত সোনাক্ত করবে না—

ডুম। একবার ত করুক, তাহলে সাক্ষীরা আর কতক্ষণ সোনাক্ত না করে থাকতে পারে—

দার। সোনাক্ত অরূপবাবুর সোনাক্ত—তা ওই ও ডুজন লোকও জল-

ঝড়ের দিন রাত্রে ঘোর অন্ধকারে দেখেছিল, তাও চকিতের ন্যায়—সে সোনাক্ত ততটা প্রমাণযোগ্য নয়।

হুম। অনুপবাবুও ত পুলিশ তিনি কি আর অন্য কথা বলতে পারেন—

হুমনের অবলম্বিত পন্থা তাঁহার প্রীতিকর হইল না। কিন্তু না হইলেও আপনি মারা পড়েন, কি করিবেন, সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে আপনার চৌকীতে গিয়া বসিলেন। চৌকীদারেরা পূর্ব্ববৎ আসামীদিগের সতৈল হস্তে তাহার অঙ্গসেবা করিতে লাগিল। দারোগামহাশয় অনুপের সঙ্গে কথা কহিতেছেন বটে, সর্বদাই অন্যমনস্ক,—প্রাচীন দারোগা লোকটা বড় বিচক্ষণ, বিশেষ সাবধান লইতেছেন অনুপ কোনমতে তাহাকে ধরিতে না পারেন।

দারোগামহাশয় পান চিবাইতে চিবাইতে ফরসীর মুখনল চুম্বন করিতেছেন—পার্শ্বে অনুপবাবু একটা তাকিয়া হেলান দিয়া কাত হইয়া পড়িয়া আছেন। সম্মুখে দারোগা মহাশয়ের মুন্সী লক্ষণের ফল ধরার ন্যায় কাগজ কলম ধরিয়া বসিল। হুমন যে আসামীটিকে আনিল তাহার নাম, "রমানাথ গুছাইত।"

হুমন বলিল, রমানাথ যা যা করেছিস দারোগা মহাশয়ের কাছে সব বল। কিছু ভয় নাই।

রমানাথ হুমনের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তবে বলবো ?"

হুম। "হাঁ, বলবি বই কি, খুব সাহস করে বল, ভয় কি ?"

রমা। 'বলবো ?'

হুম। "বলবি বই কি"

রমা। তবে বলি, আমার নাম রমানাথ (থামিল)

হুম। বল, বল, ভয় কিসের ?

রমা। চুপ—আমি হাজিরা বিপিন বাবুর সঙ্গে এদেশে এসে (থামিল)

হুম। বলতে বলতে থামিস্ কেন ?

রমা। খুন করেছি,—

দারোগা। সে বিপিন বাবু কই ?

হুমন এই আসামীকে পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরাইয়া বাহ্যিক সভ্য-ভব্য করিয়া আনিয়াছিল, দ্বিতীয় আসামীকে আনিয়া হুমন রমানাথকে বলিল, এর দিকে চেয়ে দেখ দেখি ?

রমা উত্তর করিল—"ও আমার পিসতুতো ভাই, হরে জানা।"

ডুমন তখন বলিল, "বেশ করে দেখ ?"

রমা বলিল, "বেশ করে দেখেছি, ওর সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে গোরু চরিয়েছে, একত্রে হাল করেছি, আর আমার চিনতে দেরী লাগবে !

ডুমন। "এই যে তুই আমার কাছে বল্লি, ওর নাম বিপিনবাবু"—

রমা। "হাঁ, হাঁ, বিপিন"—

ডুম। "তুই ব্যাটা কি ন্যাকাম করবি নাকি ?"

দারোগা মহাশয় ডুমনকে চক্ষুর ইঙ্গিতে বলিলেন, রমানাথকে যেন স্থানান্তর করা হয়।

অনুপবাবু একটু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "এত বিপিন নয়,—বরকন্দাজ তবে আর কাকেও এনে থাকবে।"

তেজচন্দ্র উত্তর করিলেন, "এ উৎকণ্ঠার সময় কাজ নাই, আহারান্তে তখন দেখা যাবে।"

অনুপ একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আমি আর থাকতে পারছি না, আপনি আজ রাত্রে বিদায় করে দিন।'

দার। 'আপনাকে আজ রাত্রেই বিদায় দেব।'

আহারের পর সীতারামের বৈঠকখানায় অনুপ শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময় এক ব্যাক্তি তাহার নিকট আসিয়া বলিল, 'শুনেছেন, মোকর্দ্দমা ফায়ের।'

অনুপ। সে কেমন ?

—আসামীসব কালরাত্রে সরেছে।

অনুপ তাকিয়ার মাথা দিয়াছিলেন, উঠিয়া বলিলেন, কেমন করে ?

—বরকন্দাজ চৌকিদার সকলে ঘুমুছিল, ফাঁক পেয়ে তারা পিট্টান দিয়েছে —ভোরের সময় এক চৌকীদার জেগে উঠে দেখে যে আসামী নাই— তারপর বরকন্দাজকে জাগায়, সে উঠে চৌকীদারকে সঙ্গে করে নিয়ে কটক রোডের ধার হতে কতকগুলো নিরীহ লোককে ধরে এনে পুরেছে—

অনু। ঠিক—ঠিক—আমিও ত তাই ভাবি—এ সকল আসামী নূতন লোক ; আমি যাদিগে গ্রেপ্তার করেছি, তাদের চেহারা আমার বেশ মনে আছে—কাল, মোটা মোটা লোক তারা, তাদের এক এক জনে দশ দশ জনকে কাত কত্তে পারে—আর এরা নিতান্ত রুক্ষের জীব—

এই সকল কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময় দারোগা মহাশয় আসিয়া পৌঁছিয়া গেলেন।

দার। একবার কেবল সৌদামিনীকে এনে বাবুদের সোনাক্ত নিতে হবে তা হলেই আর কিছু বাকি রহিল না।

অনু। আসামীদিগে চিনবেন না।

দার। প্রয়োজন নাই।

অনু। সে কি মশায়, ওরা প্রধান সাক্ষী—

দার। ওদের সাক্ষী ততদূর বিশ্বাসযোগ্য হবে না—

অনু। তবে সৌদামিনীর সোনাক্ত কেমন করে বিশ্বাস যোগ্য হবে?

রূপনারায়ণের তীরে এক দোকানে যে ভদ্রলোকের আশ্রয়ে সৌদামিনী স্থান পাইয়াছিল—সেই বসন্তবাবু ও বলরামকে উপস্থিত করা হইয়াছিল।

দার। বসন্তবাবু ক্ষণেকের জন্য রাত্রিকালে আসামীদের দেখেছিলেন, সেই মুহূর্তের মধ্যে তাদিগে চিনে রেখেছিলেন, একথা শুনলেই হাকিমদের অবিশ্বাস হবে। মোকর্দ্দমা খাস হয়ে যাবে।

দারোগা মহাশয় সীতারামকে বলিলেন, অবিলম্বে অবগুণ্ঠবতী সৌদামিনী বাহিরে আসিলেন। আসিয়া বসন্ত ও বলরামকে দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ, বোধহয় এরাই সে রাত্রিতে আমার প্রাণদান করেছিলেন।

বসন্তকুমারের অনুরোধে সৌদামিনী রাত্রির ঘটনা আনুপূর্বিক সমস্তই বলিলেন। তখন বসন্ত এবং বলরাম তাহা ঠিক বলিয়া স্বীকার করিলেন।

অনুপ, দারোগার অভিসন্ধি জানিতে পারিয়া বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার চাতুরী সাধারণ্যে প্রকাশ পায়, তাহারই বিশেষ প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। বলিলেন, দারোগা মহাশয়, এই সময় একবার বিপিনকে আনলে হয়,—সে কি বলে দেখা যেতো?

দার। রহস্য দেখাবার কাজ নয়। এত ভদ্রলোকের সমক্ষে তাকে এনে অপদস্থ করতে ইচ্ছে করি না।

অনুপ। ভালোই বিবেচনা করেছেন, কিন্তু আপনার বরকন্দাজ ছমন যে বিপিনকে এনেছিল, সে আমার গেরেপ্তারী আসামী বিপিন নয়—

দার। সে কি কথা বলেন, যখন সে আপন মুখে একবার করেছে, তখন আপনি 'না' বল্লেই 'না' হবে? যদি বলেন, তাহলে আপনাকেই মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হতে হবে।

'মিথ্যাবাদী' শব্দটীতে অনুপ বড়ই মর্মবেদনা পাইলেন, বলিলেন, কে মিথ্যাবাদী আদালতে সাব্যস্ত হবে? এ গ্রামের সকল লোকই জানে—আপনি কখনও সত্য গোপন রাখতে পারবেন না, আগুন কখনও কাপড় চাপা দিয়ে লুকান যায় না।

দার। শেষ কালটায় আপনি এরূপ ব্যবহার করবেন, স্বপ্নেও চিন্তা করি না।

অনুপ সীতারামকে ডাকিয়া বলিলেন, আপনি অনুগ্রহ করে আমাদের যাবার ব্যবস্থা করে দিন, আমরা এখনই যাবো। বেহারা-পাল্কী আনাইতে সন্ধ্যা হইল; রাত্রির আহার সমাপন করিয়া অনুপ, বলরাম, বসন্ত, সৌদামিনী সকলেই চককমলা হইতে বিদায় লইলেন।

নকল রাণী

প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়

অদ্য আমি যে ঘটনাটির বিষয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি তাহা কলিকাতার ঘটনা নহে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটি পল্লীর ঘটনা। এই মকর্দমার অনুসন্ধানের ব্যাপারে আমি উপরিতন কর্মচারীর নিকট এইরূপ বিবরণে পত্র পাই—কমলার বাড়ি বর্দ্ধমান জেলায়। কমলার পিতা এখানে বর্ত্তমান নাই। তিনি ধনী ছিলেন। যত কিছু পাপ এ জগতে থাকিতে পারে বৃদ্ধ সমুদয়েরই অধিকারী হইয়া এই অতুল ধনরাশি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বৃদ্ধের কেবল একটিমাত্র কন্যা, নাম কমলা। কমলার বিবাহ হইয়াছে, স্বামী অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী। নিজে তিনশত টাকা মাহিনার চাকুরী ও নীলকুঠির ম্যানেজার হিসাবে মাসে হাজার টাকা রোজগার করেন। তিনি বিহার অঞ্চলে থাকেন। কর্মস্থলে স্ত্রীকে রাখিবার তাদৃশ সুবিধা না থাকায় কমলাকে পিত্রালয়েই রাখেন মাসে মাসে আসিয়া দেখিয়া যান। কমলা পূর্ণ যুবতী—সুন্দরী, হৃদয় দয়া-দাক্ষিণ্যপূর্ণ, কমলা আদর্শ স্ত্রী।

কমলার স্বামী সরোজকান্ত সেদিন শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছেন। তিনি

তখন বৈঠকখানায় তাম্রকূটসেবনে ব্যস্ত। বৃদ্ধ শ্বশুর পার্শ্বের ঘরে আরো দুটি লোকের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন। উৎসুক্য বশতঃ সরোজবাবু কপাটের ছিদ্র দিয়া দেখিলেন ভীষণাকৃতি দুইটি লোক তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুরের সঙ্গে কি যেন গোপন পরামর্শ করিতেছেন।

সরোজ শুনিলেন, বৃদ্ধ সাক্ষাৎ যমদূত সদৃশ দুইজনকে বলিতেছেন—দুজনকে কুড়ি টাকা দেবো, পারবি ত?

—কর্তা, আমাদের অসাধ্য কিছু আছে।

—তোরা আছিস বলে আমি আজও বেঁচে আছি।

—তবে কি জানেন, জামাই বাবু—

—নে, নে, অনেক জামাইবাবু দেখেছি—টাকার কাছে কেউ নয়।

'জামাইবাবু'—এই কথা শুনিয়া সরোজকান্ত শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, জামাইবাবু ত আমি! আমায় কি এরা হত্যা করিবে? বিশ্বাস নাই। দেখি আর কি কথাবার্তা হয়।

বৃদ্ধ বলিলেন—তবে তোরা যা, ঠিক সময়ে আসিস্।

—আজ্ঞে কর্তা তা আর বলতে হবে না।—বলিয়া সেই দুই ব্যক্তি পার্শ্বের দরজা দিয়ে চকিতের ন্যায় চলিয়া গেল। বৃদ্ধ একাকী রহিলেন।

সরোজকুমার চিন্তা-নিমগ্ন, ঘোর সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান,—প্রতিমুহূর্তে তিনি মৃত্যু কল্পনা করিতে লাগিলেন।

কমলার রান্না হইয়া গিয়াছে, প্রাণ ভরিয়া আজ স্বামীকে অনেক দিনের পর খাওয়াইবে। সরোজকুমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহার করিলেন। কমলা কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন,—সমস্ত দিনের পর আহারে তেমন ইচ্ছা নাই।

আহারাদির পর সরোজকুমার কমলার ঘরে শয়ন করিলেন। কমলা গুড়গুড়িতে তামাক সাজিয়া দিয়া গেল। বৃদ্ধ পিতার জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া কমলা স্বয়ং খাইতে বসিল।

পরদিন রজনী প্রভাত। কমলা উঠিল। উঠিয়া দেখে সরোজকুমার নাই।—দরজা খোলা।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একজন পুলিশকর্মচারী আসিয়া সরোজ বাবুর খোঁজ করে। তখন বৃদ্ধ আর ইহজগতে নাই। কমলা একাকী। পুলিশকর্মচারীকে দেখিয়া কমলা ভীত হয়। সে বিবেচনা করে যে

এখানে আর একাকী থাকা ভালো নয়। পিতাঠাকুর মন্দ লোক ছিলেন। ইহারা কোনরূপে তাহার মুলুক সন্ধান পাইয়া এবং আমাকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী জানিয়া পাছে আমার উপর জুলুম করে এই ভাবিয়া কমলা পরদিন গ্রাম ত্যাগ করিয়া কাশীতে আসিল। কিন্তু সেই পুলিশকর্মচারীকে তাহার অনুসন্ধান করিতে আর কেহ দেখিল না। কমলা এখন কাশীতে বাস করিতেছে। অভিযোগ এই যে, কমলা তাহার পিতার সাহায্যে ধনলোভে পতি হত্যা করিয়া কাশীতে রাণী পরিচয়ে আপনার কলঙ্ক বিমোচনের চেষ্টা করিতেছে।

কমলার পতিহত্যা রহস্তের আসল সমাধান এইরূপ—

কমলার পিতা দুর্বৃত্ত দস্যু দুইজনের সঙ্গে স্বীয় দুহিতার শয়নমন্দিরে প্রবেশ পূর্বক কোন দ্রব্যবিশেষের দ্বারা উভয়কে অচেতন করণান্তর জামাতা সরোজকুমারকে হত্যা করিয়া দামোদরের জলে নিক্ষেপ করে। কিন্তু যাহার পরমায়ু থাকে তাহাকে বিনষ্ট করে কে! জামাতাকে মৃত ভাবিয়া দস্যুদ্বয় চলিয়া যায়। কিন্তু ভগবানের কৃপায় সরোজকুমার দামোদরের জলে ভাসিতে ভাসিতে কয়েকজন মৎসজীবির সাহায্যে শুশ্রূষায় প্রাণ ফিরিয়া যান। তিনিই শেষ পর্যন্ত তাঁহার স্ত্রী কমলাকে কাশীতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার অপরাধ স্খালন করেন।

ডমরু-চরিত

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ছয় মাস পরম সুখে অতিবাহিত হইয়া গেল। পাশেই শ্বশুরবাড়ী। সে স্থানে সর্বদাই আমার নিমন্ত্রণ হইত। আমার আদরের সীমা ছিল না। যখন আহার করিতে বসিতাম, তখন এটা খাই কি সেটা খাই, সর্বদাই এই গোলে পড়িতাম। এত দ্রব্য তাঁহারা আমার সম্মুখে দিতেন।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। একদিন বেলা নয়টার সময় আহার করিয়া দোকানে যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় আমার শ্বশুরবাড়ীর নীচের তলায় ঠিক আমার ঘরের পাশের ঘরে একটা ভয়ানক কোলাহল পড়িয়া গেল। আমার নীচের তলায় গোলকবাবু নামে আমাদের একজন স্বজাতি

বাস করিতেন। এ বাড়ীতে আমার ঘর, সে বাড়ীতে তাহার ঘর, ঠিক গায়ে গায়ে ছিল। এ বাড়ীতে আমার ঘর যেরূপ স্যাঁতসেঁতে কদর্য্য গোলকবাবুর ঘর সেরূপ ছিল না। তাহার ঘরটি খটখটে শুষ্ক ফিটফাট ছিল। তিনি নিজে সরকারী আফিসে কাজ করিতেন, পশ্চিমে কোথায় তাহার পুত্র কাজ করিত। তাহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না। গোলকবাবুর বয়স হইয়াছিল। কলিকাতায় কেবল তিনি নিজে ও তাঁহার বয়স্কা গৃহিণী থাকিতেন। গোলক-বাবুর ঘরেই এই কোলাহল হইয়াছিল।

গোল শুনিয়া আমি আমার শ্বশুরবাড়ীতে দৌড়িয়া যাইলাম, মনে করিলাম, হয়তো কোন বিপদ ঘটিয়া থাকিবে। সে স্থানে গিয়া দেখিলাম যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর সমুদয় লোক নীচে আসিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া মালতী উপরে পলায়ন করিল। অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা ঘোমটা টানিয়া দিলেন। আমার শ্বশুর মহাশয়ের নিকট শুনিলাম যে, গোলকবাবুর পুত্র মাঝে মাঝে পিতার নিকট টাকা পাঠাইতেন। পিতা সেই টাকায় মোহর গাঁথাইয়া তাঁহার ঘরের প্রাচীরের গায়ে যে আলমারী আছে, একটা বগ্‌লি অর্থাৎ থলি করিয়া তাহার ভিতর রাখিয়া দিতেন। ক্রমে ক্রমে তিনি একশত মোহর গাঁথাইয়া আলমারির ভিতর রাখিয়াছিলেন। ঘরের প্রাচীরের গায়ে আলমারি, তাহাতে চারিটী তক্তার থোপ ছিল, সম্মুখে কাঠের কপাট ছিল, কপাট সর্বদা চাবি-বন্ধ থাকিত। গোলকবাবুর এই একশত মোহর চুরি গিয়াছে। তাহার জন্যই এ গোলমাল। গোলকবাবু মনের দুঃখে নীরবে বসিয়া আছেন, তাঁহার স্ত্রী কাঁদিতেছেন। কবে চুরি গিয়াছে তাহা তিনি বলিতে পারেন না। তিনি বলিলেন যে এক বৎসর পূর্বে ঐ মোহরগুলি তিনি আলমারির ভিতর রাখিয়া-ছিলেন। তাহার পর আর তিনি নূতন মোহর ক্রয় করিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন যে এ ঘরে কেবল তিনি ও তাঁহার স্ত্রী থাকেন, অন্য কেহ এ ঘরে প্রবেশ করে না। সেজন্য কাহাকেও তিনি সন্দেহ করিতে পারেন না। আমার শ্বশুর মহাশয় পুলিশে খবর দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু আমি তাহাতে আপত্তি করিলাম। আমি বলিলাম যে, "কখন কবে চুরি গিয়াছে, তাহার কোন ঠিক নাই, কাহারও প্রতি গোলকবাবুর সন্দেহ হয় না, তখন মিছামিছি পুলিশে আর সংবাদ দিয়া কি হইবে?" পুলিশে আর সংবাদ দেওয়া হইল না।

সন্ধ্যার পর যখন আমি দোকান হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তখন আমার

শ্বশুর প্রহ্লাদবাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"ডমরুধর! বড় বিপদের কথা। পাশের বাড়ীতে যে ঘরে তুমি বাস কর, এ বাড়ীতে গোলকবাবু যে ঘরে বাস করেন, এই দুই ঘরের কেবল একটী প্রাচীর, দুই ঘরের কড়ি সেই এক দেওয়ালের উপর। গোলকবাবুর ঘরে যে স্থানে সে আলমারি আছে সে স্থানের দেওয়ালটি কাজেই অতিশয় পাতলা। আজ তিনি আলমারির ভিতর ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতেছিলেন, যে স্থানে তিনি মোহর রাখিয়াছিলেন, তাঁহার হাত লাগিতেই সেই স্থানের দেওয়ালটি ভাঙ্গিয়া গেল। তখন তিনি দেখিলেন যে, সে স্থানে দেওয়ালের ইট ছিলনা, কেবল একটু বালি খাস ছিল। সেই বালি ভাঙ্গিয়া প্রাচীরে ফুটা হইয়া গেল। দুই ঘরের এক দেওয়াল, সুতরাং সেই ছিদ্র তোমার ঘরেও হইল। তোমার উপর এখন বিলক্ষণ সন্দেহ হইয়াছে। যদি মোহরগুলি তুমি বাপু লইয়া থাকো তাহা হইলে আস্তে আস্তে ফিরাইয়া দাও। তাহা হইলে সকল কথা মিটিয়া যাইবে। তা না হইলে বড় গোলমাল হইবে।"

এই কথা শুনিয়া আমি যেন আকাশ হইতে পড়িলাম। আমি বলিলাম, —"সে কি মহাশয়! আমি ভদ্র সন্তান, আমি চোর নহি। তাহার পর আপনি আমার শ্বশুর! আমাকে ওরূপ কথা বলিবেন না।"

তাহার পর গোলকবাবু নিজে এবং তাহার গৃহিণী আমাকে অনেক মিনতি করিয়া বলিলেন,—"বাপু! ভুল-ভ্রান্তিক্রমে যদি মোহরগুলি তোমার হাতে পড়িয়া থাকে, তামাসা করিয়া যদি রাখিয়া থাকো, তাহা হইলে ফিরাইয়া দাও, তোমার পায়ে পড়ি, মোহরগুলি ফিরাইয়া দাও।"

তাঁহাদের উপর আমি রাগিয়া উঠিলাম "আমাকে আপনারা চোর বলেন। আপনারা ভাল মানুষ নহেন।" ইত্যাদি।

ক্রমে এ কথা আমার মনিব হর ঘোষের কানে উঠিল। মোহর ফিরাইয়া দিতে তিনিও আমাকে অনেক অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, মহাশয়! আজ কয়েক বৎসর আপনার দোকানে কাজ করিতেছি, আর কয় বৎসর আপনার বাটিতে বাস করিতেছি। একটা পয়সা কখনও কি আপনার লইয়াছি? আমার প্রতি সন্দেহ হয়, এমন কাজ কখন কি আমি করিয়াছি?"

দিন কয়েক বিলক্ষণ গোল চলিল। দেখ, লম্বোদর! মানুষ হাজার বুদ্ধিমান্ হউক, এরূপ কাজে একটা না একটা ভুল করে। আমিও তাহাই

করিয়াছিলাম। এ অনেক দিনের কথা হইল, এখন আর প্রকাশ করিতে দোষ নাই। প্রকৃত ঘটনা এই হইয়াছিল,—মশার দৌরাত্ম্যে রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইত না। অনেক কষ্টে পাঁচ সিকা দিয়া একটা মশারি কিনিয়াছিলাম। মশারিটা খাটাইবার নিমিত্ত দেওয়ালে একদিন পেরেক মারিতেছিলাম। পেরেক মারিতে হঠাৎ দেওয়ালের কতকটা বালি ভাঙ্গিয়া পড়িল। সেই স্থানটিতে একটা ছিদ্র হইল। ছিদ্রের ভিতর আমি হাত দিলাম। হাতে কি এক ভারী দ্রব্য ঠেকিয়া গেল; বাহির করিয়া দেখিলাম যে মোহরপূর্ণ বগলি। তৎক্ষণাৎ আমি আমার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার পর পুনরায় গর্তের ভিতর হাত দিয়া দেখিলাম যে, তাহার অপর পার্শ্বে কাঠ, হাতে সেই কাঠ ঠেকিয়া গেল। তখন ইহার অর্থ কিছু বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার পর প্রকাশ হইল যে, আমার ঘরের ও গোলকবাবুর ঘরের এক প্রাচীর, প্রাচীরের অপর পার্শ্বে গোলকবাবুর ঘরে আলমারি। আমার হাতে আলমারির কপাট ঠেকিয়াছিল।

বলা বাহুল্য যে, মোহরগুলি পাইয়া আমার যেন স্বর্গলাভ হইল। চুপি চুপি সেইগুলি গনিতে লাগিলাম। পাছে শব্দ হয়, সেজন্য একটি একটি করিয়া গনিলাম, একশত মোহর। চিরকাল পরিশ্রম করিলেও কখনো আমি এতটাকা উপার্জ্জন করিতে পারিতাম না। দেখিলাম যে, এ সেকালের মোহর নহে, বিলাতি মোহর, যাহাকে লোকে গিনি বলে। পরদিন একটু বালি ও চুন আনিয়া দেওয়ালের ছিদ্রটা বুঝাইয়া দিলাম। তাহার পর বাজারে গিয়া মোহরগুলি বিক্রয় করিলাম। পনর শত টাকার অধিক হইল। দেশে গিয়া তেরশত টাকা কোন এক নিভৃত স্থানে পুঁতিয়া রাখিলাম। বিবাহের নিমিত্ত বাকী টাকা কাছে রাখিয়া দিলাম। মোহর যে গিয়াছে, ভাগ্যে গোলকবাবু ছয়মাস পর্যন্ত দেখেন নাই। যে সময় মোহর আমার হস্তগত হইয়াছিল, সে সময় যদি তিনি খোঁজ করিতেন, তাহা হইলে আমার আর বিবাহ হইত না।

বলিতেছিলাম যে, এই মোহর সম্বন্ধে আমি একটা ভুল করিয়াছিলাম। বড় বাজারে আমাদের কাপড়ের দোকানের পার্শ্বে এক পোদ্দারের দোকান ছিল। সেই দোকানে আমি মোহরগুলি বিক্রয় করিয়াছিলাম। একটু দূরে গিয়া যদি এ কাজ করিতাম, তাহা হইলে আর বিশেষ কোন গণ্ডগোল হইত না। পাশেই দোকান, সেজন্য পোদ্দারের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে

আমার মনিব হর ঘোষ মহাশয় আমি যে মোহর বেচিয়াছিলাম তাহা জানিতে পারিলেন। প্রহ্লাদবাবুকে তিনি বলিয়া দিলেন। সকলে জটলা করিয়া আমাকে মোহর বিক্রয়ের টাকা গোলকবাবুকে দিতে বলিলেন। আমি বলিলাম যে,—"এ মোহর আমার মায়ের ছিল মৃত্যুকালে মা আমাকে দিয়া গিয়াছিলেন। বিবাহে ও অন্যান্য বিষয়ে মোহর বিক্রয়ের টাকা আমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি। সে টাকা আমি এখন কোথায় পাইব। আর যদি থাকিত, তাহা হইলে কেনই বা দিব?"

অবশ্য আমার একথা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না। যখন নিতান্ত আমার নিকট হইতে তাঁহারা টাকা আদায় করিতে পারিলেন না, তখন আমাকে পুলিসে দিবার নিমিত্ত তাঁহারা স্থির করিলেন। আমি মনে মনে ভাবিলাম,—"তাহাতে ক্ষতি কি? এক বৎসর দুই বৎসর যদি আমার জেল হয়, তাহা হইলে মেয়াদ খাটিয়া পরে সেই টাকা লইয়া কোনরূপ ব্যবসা করিব। আর এখন যদি টাকাগুলি দিয়া দিই, তাহা হইলে আমার দশা কি হইবে? ভগবান আমাকে মোহরগুলি দিয়াছেন! সে টাকা ফিরিয়া দিলে আমার মহাপাতক হইব।"

কিন্তু আমাকে পুলিসে দেওয়া হইল না। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী কাঁদিয়া কাটিয়া কুরুক্ষেত্র করিলেন। অবশেষে সকলে মিলিয়া আমার নিকট হইতে গোলকবাবুর পুত্রের নামে একহাজার টাকার হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া লইলেন। আর আমি মালতীকে যে গহনা দিয়াছিলাম, প্রহ্লাদবাবু সেগুলি গোলকবাবুকে দিয়া দিলেন। তাঁহারা আরও অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, আমার বিবাহের সময় যে জমিজেরাত বাগান-বাগিচার কথা বলিয়াছিলাম, সে সমুদয় মিথ্যা।

প্রতিশোধ

স্বর্ণকুমারী দেবী

১

শীতের সন্ধ্যা; আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে। চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক কালীপ্রসাদ গঙ্গাতীরের এক বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছে। সমস্ত দিন উপবাস-পীড়িত, বহু পর্যটনে পরিশ্রান্ত। সম্মুখে সুদীর্ঘ অন্ধকার রজনী, কোথায় যাইবে, তাহার আশ্রয় কোথা?

সুদূরে চিতা জ্বলিতেছিল, ভাবিতে ভাবিতে ক্রোধে, প্রতিশোধস্পৃহায় সেই চিতার মতই তাহার হৃদয় দপ্‌দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। পিতার প্রতিদিনের কষ্ট, তাঁহার অর্ধ অনশন, তাঁহার অকাল মৃত্যু, এবং মৃত্যুকালের প্রত্যেক কথা তাহার মনে পড়িতেছে, আর ক্ষুধাতৃষ্ণার জ্বালা ভুলিয়া প্রতিশোধ প্রতিশোধ বলিয়া সে ভূমে পদাঘাত করিতেছে।

মুষলধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল, বেগে বায়ু বহিতে লাগিল, চিতাগ্নি ইতস্তত: ক্ষিপ্ত-বিক্ষিপ্ত হইয়া নিবিয়া নিবিয়া জ্বলিতে লাগিল, বালক বৃষ্টিতে আর্দ্র, শীতে কম্পমান হইয়া দ্বিগুণ ক্রোধপ্রজ্বলিত হৃদয়ে শপথ করিতে লাগিল! প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! আমাদের যে দশা করিয়াছে, হে ভগবান, তাহার দণ্ডবিধান কর প্রভু।'

ভিজিতে ভিজিতে কাঁপিতে কাঁপিতে শপথ করিতে করিতে বালক উঠিল, অদূরের দীপালোক লক্ষ্য করিয়া সেই পথে চলিতে লাগিল। দীপালোক এক রুদ্ধ মন্দিরের ছিদ্রপথে প্রকাশিত হইয়াছিল, বালক তাহার প্রাঙ্গণে আসিয়া মন্দির-সংলগ্ন আচ্ছাদনের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে নিদ্রামগ্ন হইল। স্বপ্নে দেখিল, পিতা সৌম্যমূর্তিতে প্রসন্নভাবে তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিতেছেন, 'বৎস উঠ, অসহায়ের সহায়, অন্যায়ের বিচারক স্বয়ং ভগবান, তোমার কোন ভয় নাই।" বালক 'প্রতিশোধ, প্রতিশোধ' বলিয়া জাগিয়া উঠিল; উঠিয়া দেখিল, তাহার মস্তকে হাত রাখিয়া সত্যই কে তাহার নিকটে দণ্ডায়মান। বালক চমকিয়া উঠিয়া বসিল, সত্যিই কি তাহার পিতা

আসিয়াছেন নাকি? তখন ঝড়-বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, অপরিচিত ব্যক্তি বাম হস্তে প্রদীপ লইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, দীপালোকে হঠাৎ যেন সেই স্বপ্নদৃষ্ট স্নেহময় মুখই তাহার নয়নে পড়িল। সে উঠিয়া বসিতেই অপরিচিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস তুমি কে?'

"আমি ব্রাহ্মণকুমার।"

"একাকী এখানে?"

"আমার কেহই নাই, আমি অনাথ।"

সম্প্রতি অপরিচিতের একটি পুত্র মরিয়াছে। তিনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার নাম কি?"

"কালীপ্রসাদ।"

"কালীপ্রসাদ! বৎস, কালী এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, তাঁহার প্রসাদ তোমার উপর বর্ষিত হইয়াছে, তুমি আজ হইতে আমাকে পিতা বলিয়া জানিও।

২

কালীপ্রসাদের আর দুঃখ-কষ্ট নাই, মন্দিরপতি দেবীপ্রসন্নের মৃতপুত্রের স্থান সে অধিকার করিয়াছে। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই তাহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন। দেবীপ্রসন্নের যে দুইটি পুত্র কন্যা জীবিত, তাহারাও যুবকের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহশীল, কন্যা মেঘমালা দেবীপ্রসাদের বাগ্‌দত্তা।

কালীপ্রসাদের এমন কতকগুলি গুণ আছে, যাহাতে সহজেই লোকের অনুরাগ আকর্ষণ করে। তাহার একটি প্রধান গুণ, সে করুণহৃদয়। দীন-দুঃখী অনাথ আতুরের কষ্ট নিবারণ করিতে সে সর্বদাই সচেষ্ট। তাহার করুণায় ঝড় বৃষ্টি-দুর্যোগের দিনও নিরাশ্রয় পথিকের জন্য মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত থাকে। এই সহৃদয়তায় পাড়া-প্রতিবেশী পরিচিত অপরিচিত সকলেই তাহার মনে জাগরুক। প্রতিদিন সে নিস্তব্ধ নিশায় একাকী মন্দিরে গিয়া কালীবন্দনা করে এবং প্রতিশোধ ভিক্ষা চাহে। মনুষ্যস্বভাব কি বিচিত্র বিরোধীভাবাপন্ন, অন্যের প্রতি সে একদিকে করুণাশীল, ন্যায়গত অধিকার দানে সে আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত। প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থের জন্য সে বজ্রকঠোর।

সম্প্রতি দেবীপ্রসন্নের বালকপুত্র রোগশয্যায় শয়ান, পিতামাতার কষ্টের সীমা নাই। অনেকগুলি পুত্রকন্যার মধ্যে সবেধন নীলমণি এই দুইটি পুত্রকন্যা

মাত্র তাহাদের বর্তমান। সুতরাং দুশ্চিন্তায় ঔৎসুক্যে তাহারা মুমূর্ষবৎ। তাহাদের বিশ্বাস কালীপ্রসাদ কালীদেবীর বিশেষ অনুগ্রহভাজন; সুতরাং বালকের মঙ্গল-উদ্দেশ্যে দেবীকে প্রসন্ন করিবার ভার তাহার উপর অর্পিত হইয়াছে।

কালীপ্রসাদ হোম করিতেছে, প্রজ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক আহুতি দিতেছে। অগ্নি ব্যোমভেদী শব্দে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বিস্তার করিয়া শতমূর্তিতে ঊর্ধ্বগামী হইল, বালক সেই অগ্নিময় মূর্তিরাশির দিকে চাহিয়া ভুলিয়া গেল যে, হোম করিতেছে কেন? উদ্দীপ্ত হৃদয়ে সেই শতমূর্তি লক্ষ্য করিয়া কালীপ্রসাদ বলিয়া উঠিল, 'প্রতিশোধ, প্রতিশোধ,' শতমূর্তি যেন একত্রে 'তথাস্তু' বলিয়া মুহূর্তে অন্তর্হিত হইল।

৩

বালক মৃত, পিতা শোকোন্মত্ত, মাতার আর্তনাদে চতুর্দিক বিদারিত। কালী প্রসাদের হৃদয় অনুতাপ যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত; সে ভাবিতেছে, পূর্ণহৃদয়ে সে দেবীর নিকট বালকের জন্য প্রার্থনা করিতে পারে নাই, সেইজন্যই এইরূপ ঘটিল।

চারিদিকের এই শোকবিষাদের মধ্যে বালিকা মেঘমালার হাসিও বিলুপ্ত, কাঁদিতে কাঁদিতে একদিন সে-ও শয্যাশায়ী হইল।

বড় দুর্যোগ। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে, সোঁ সোঁ করিয়া বাতাস বহিতেছে, ঘন ঘন মেঘশব্দে পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিতেছে। কালীপ্রসাদ মন্দিরের দ্বারদেশে বসিয়া করযোড়ে আকুলভাবে প্রার্থনা করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে চমকিয়া মন্দিরসংলগ্ন অদূরস্থিত রুগ্নকক্ষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতেছে।

একবার সহসা যেন আর্তনাদী ক্রন্দন শুনিতে পাইল, সচকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, মন্দিরাধিপতি এই ঝড়-বৃষ্টিতে গৃহত্যাগ করিয়া উন্মত্তবেশে ছুটিয়াছেন; কালীপ্রসাদ তীরবেগে নিকটে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল, 'মেঘমালা?'

দেবীপ্রসন্ন হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "ছাড়িয়া দাও, স্বপ্ন হইয়াছে।" যুবক দেখিল, তিনি উন্মাদ। সবলে হাত ধরিয়া কহিল, 'কি স্বপ্ন?'

তিনি আবার বলিলেন, 'ছাড়িয়া দাও, খুঁজিতে যাই।'

'কাহাকে ?'

'যাহাদিগের দুর্দশা করিয়াছি।'

'কাহাদিগের ? কি দুর্দশা করিয়াছেন।"

'যাহারা এই মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী, মিথ্যা কৌশলে যাহাদিগকে সর্বস্বান্ত করিয়া তাড়াইয়াছি, তাহাদিগকে খুঁজিতে যাই।" হায়, হায়! স্বামী-স্ত্রীতে শিশু সন্তানটি লইয়া অসহায় নিঃসম্বল সেই রাত্রে কোথায় যে পলাইয়া গেল, আর দেখি নাই, ছাড়িয়া দাও—'

"এখন তাহাদিগকে কোথায় পাইবেন ?"

"হায় হায়। সেই পাপে আমার সমস্ত ছারখার। সব গিয়াছে, কেহ নাই, একমাত্র মেঘমালা—আমাকে ছাড়িয়া দাও, খুঁজিয়া আনি।"

"তাঁহাদের কোথায় পাইবেন ? তাঁহারা ইহলোকে আর নাই।"

"না, না, আছে, আছে। দেবীর আদেশ, তাহাকে—সেই শিশু সন্তানকে খুঁজিয়া আনিব, তাহার শাপ ঘুচিলে আমার মেঘমালা বাঁচিবে।

সবলে হাত ছাড়াইয়া মন্দিরস্বামী ধাবমান হইলেন।

যুবক আবার তাহার গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইতেই দেবীপ্রসন্ন থমকিয়া বলিলেন, 'তুমি কে ?'

উত্তর হইল, 'আমিই সেই শিশু, আর খুঁজিতে যাইবেন না।"

"তুমিই সেই! তোমার শাপে আমার সমস্ত ছারখার!" দেবীপ্রসন্ন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

বালক বিদীর্ণহৃদয়ে বলিল, "দেবী রক্ষা কর, কি করিলে যাহা ছিল ফিরিবে ? আমার জীবনগ্রহণ করিয়া আমার পূর্ব প্রার্থনা বিফল কর।"

অদূরে আর্তনাদ উঠিল, "মেঘমালা আর নাই।'

যুবক ক্ষিপ্ত হইয়া বিদ্যুৎবেগে মন্দিরে কালীর সম্মুখীন হইয়া তাঁহার হস্তের শাণিত কৃপাণ সজোরে খুলিয়া লইয়া তাঁহাকে ছিন্নমস্তা করিয়া বলিল, 'পাষাণী, রক্তপিয়াসী, আজ হইতে পৃথিবীর প্রতিশোধস্পৃহা, তাহার রক্তপিপাসা নিবৃত্ত হউক।" তাহার পর শাণিত কৃপাণ আমূল নিজবক্ষে সঞ্চালিত করিয়া বালক দেবী পদমূলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

আত্মরক্তে তাহার প্রতিশোধ-বাসনা চরিতার্থ, নির্বাপিত হইল।

চুরি না বাহাদুরী?

শ্রীনগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

অনেকদিন পর বাড়ী যাইতেছিলাম। দুই বৎসরের অধিক প্রবাসে অর্থোপার্জন করিতেছিলাম। দুই বৎসরের সঞ্চিত অর্থ সঙ্গে লইয়া দেশে যাইতেছিলাম। রেলের পথে দুই দিন লাগে। অবশিষ্ট পথ গাড়ীর ডাকে আসিয়াছিলাম। রেলে উঠিয়া অতিশয় সাবধানে যাইতেছিলাম। সঙ্গে যে অর্থ ছিল, তাহার অধিকাংশ নোট। সেগুলি বাক্সে অথবা ব্যাগে রাখিতে সাহস হয় নাই। কোমর হইতেও অনেক টাকা অনেক সময় চুরি যাইতে শুনিয়াছি। সেজন্য নোটগুলি বাঁধিয়া একখানা বড় রেশমের রুমালে পৈতার মত করিয়া কাঁধে বাঁধিয়াছিলাম। নোটের তাড়া বুকের উপর রহিল, তাহার উপর কাপড়-চোপড় পরিলাম। আমার অজ্ঞাতে টাকা চুরি যাইবার আর কোন ভয় রহিল না। দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়া রেলে উঠিলাম। পথ খরচের যে কয়টা টাকা আবশ্যক তাহা একটা কুরিয়র ব্যাগে ছিল, রাত্রে সেটা মাচার তলায় রাখিলাম। সেটা গেলেও বিশেষ ক্ষতি হইত না।

ঘোড়ার গাড়ীতে যতটা পথ আসিয়াছিলাম কোন ভয়ই ছিল না। সে অঞ্চলে লোকে আমাকে বিলক্ষণ চিনিত। কাজকর্মের উপলক্ষ্যে সে পথে আমার প্রায়ই যাওয়া আসা ঘটিত। সঙ্গে কিছু টাকা আছে জানিয়া কয়েক-জন চাপরাসী সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহারা আমাকে রেলে তুলিয়া ফিরিয়া গেল। রেলের পথ যে নির্বিঘ্নে কাটিয়া যাইবে, তাহাতে আমি কোন সন্দেহ করি নাই।

যে শ্রেণীর গাড়ীতে আমি চড়িয়াছিলাম, তাহাতে অধিক লোকজন উঠে না। আমি প্রায়ই একা ছিলাম, কখন কখন দুই একজন উঠে আবার দুই-চার ষ্টেশন পরে নামিয়া যায়। দীর্ঘ কালের জন্য সঙ্গী না থাকাতে আমি বরং খুসী হইলাম। যতই একা থাকি ততই নিশ্চিন্ত থাকি। বিশেষ যে কোন ভয় হইতেছিল তাহা নহে। তবে আর কেহ আমার গাড়ীতে আসিলেই মনটা খুঁৎখুঁৎ করিতেছিল, যে আসিতেছিল তাহাকেই যে চোর

মনে হইতেছিল এমত নহে, হয়ত তাহাদের মধ্যে অনেকে আমার অপেক্ষাও ভদ্রলোক, হয়ত আমার পক্ষে চুরী করা যেমন সম্ভব, তাহাদের পক্ষে চুরী করা তাহার অপেক্ষা কম সম্ভব। কিন্তু বিচার করিয়া মনকে বুঝান যায় না। যখন কেহ আমার গাড়ীতে আসে আমি তখনই মনে করি, কেন, এই বই কি আর অন্য গাড়ী নাই? মুখে কিছু বলিতে পারি না। কি করিয়াই বা বলিব? একখানি টিকিট লইয়া একখানা গাড়ী সমুদয় দখল করিবার আমার অধিকার কি?

প্রথম দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। আর এক রাত্রি কাটিলেই বাড়ীতে পঁহুছি। কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল। বাড়ীতে আত্মীয় বন্ধুদিগের পুনর্দর্শন লালসা যেন কত প্রবল হইয়া উঠিল। আর একটা দিন যেন কাটে না। এত দিনের পর সহধর্মিনীকে কি করিয়া সম্ভাষণ করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। শেষবারের চিঠি পকেটে ছিল, বাহির করিয়া আবার পড়িতে লাগিলাম। ছেলে দুটির মুখ মনে পড়িতে লাগিল। তাহারা এখন কত বড় হইয়াছে? আবার কি আমায় চিনিতে পারিবে? বড়টি বোধহয় চিনিতে পারিবে। ক্রমে ক্রমে আর সব ভুলিয়া গেলাম। প্রিয়জনদিগের পরিচিত কণ্ঠস্বর অস্পষ্ট ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় শ্রবণে পশিতে লাগিল। প্রিয়তমার আলিঙ্গন স্পর্শ যেন হৃদয়ে অনুভব করিতে লাগিলাম। সন্তানের মুখচুম্বন শব্দ শুনিলাম। বন্ধুদিগের সাদর সম্ভাষণ শুনিলাম, সস্নেহ আগ্রহ সহস্র প্রশ্ন শুনিতে পাইলাম। অনতিদূর ভবিষ্যতের গাঢ় কল্পনায় বর্তমান বিস্মৃত হইলাম।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মাঠের ভিতর দিয়া, পুষ্করিণীর সম্মুখ দিয়া, নদীর উপর দিয়া গাড়ী চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার চারিদিক আচ্ছন্ন করিল। আকাশে একে একে নক্ষত্র উঠিতে লাগিল।

অন্ধকার হইলে গাড়ী একটা ষ্টেশনে লাগিল। আমি এককোণে বসিয়া নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিলাম। এমন সময় ষ্টেশনের একজন লোক গাড়ীর দরজা খুলিল। আমি মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আরও কোণ ঘেঁসিয়া বসিলাম। শেষ রাত্রিটা যে একলা থাকিব, তাহার যো নাই। আবার একজন সঙ্গী জুটিল। কিছুক্ষণ আমার সঙ্গীর কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কেবল জিনিসপত্র গাড়ীতে বোঝাই হইতে লাগিল। একজন লোককে গাড়ীতে এত জিনিসপত্র লইয়া উঠিতে আমি কখনও দেখি নাই। গাড়ীর

মধ্যে একটুও স্থান রহিল না। পোঁটলা পুটলী পর্বতের সমান হইয়া উঠিল। আমি বিস্মিত হইয়া একজন কুলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কয়জন উঠিবে ?"

"একজন।"

"একজনের এত আসবাব ? ব্রেকভ্যানে কিছু দেওয়া হয় নাই কেন ?"

কুলিরা অতশত জানে না। তাহাদের পয়সা লইয়া কাজ। ব্রেকভ্যানে তুলিলে তাহারা কিছু পায় না। তাহারা ব্যস্ত হইয়া আসবাবের স্তূপ সাজাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ষ্টেশন মাষ্টার আরোহীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। দরজা খুলিয়া ষ্টেশন মাষ্টার বলিলেন, "মহাশয়, এই গাড়ী।"

লোকটা কৃষ্ণবিষ্ণুর মধ্যে হইবে। ষ্টেশন মাষ্টার স্বয়ং গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

আমাকে গাড়ীতে দেখিয়াই সে ব্যক্তি যেন একটু অপ্রসন্ন হইল। ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিল, "খালি গাড়ী নাই ? এ গাড়ীতে যে লোক দেখিতেছি।" ষ্টেশন মাষ্টার কহিল, "আজ কিছু ভিড়। অন্য গাড়ীতে আরও লোক। আপনার এই গাড়ীতেই সুবিধা হইবে। আমি দেখিয়া শুনিয়াই আপনাকে এই গাড়ীতে উঠিতে বলিয়াছি।"

আর একদিকে ষ্টেশন মাষ্টারের ডাক পড়িল। আমি মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিলাম। সে ফিরিল। আমি বলিলাম, "মহাশয়, গাড়ীতে যেরকম জিনিস বোঝাই হইয়াছে তাহাতে বসিবার স্থান পাওয়া ভার। কতক বোঝা ব্রেকভ্যানে পাঠাইলে ভাল হয়।"

ষ্টেশন মাষ্টার উঁকি মারিয়া গাড়ীর ভিতর দেখিল। বলিল, 'তাইত', তারপর দ্বিতীয় আরোহীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপনি কি বলেন ?' সে লোকটি শশব্যস্তে কহিল, "তাহা হইবে না। আমার সমুদয় জিনিস আমার সঙ্গে যাইবে।"

ষ্টেশন মাষ্টার আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। কহিল, "মহাশয়, আপনি ভদ্রলোক ; এত মাল লইয়া গাড়ীতে উঠিবার নিয়ম নাই বটে, কিন্তু আপনার বোধহয় অসুবিধা হইবে না। আর কেহ বোধহয় এ গাড়ীতে উঠিবে না। আর সময়ও নাই। জিনিস বাহির করিতে, টিকিট মারিতে, ব্রেকভ্যানে তুলিতে বিলম্ব হইবে। আপনি এখন আর পীড়াপীড়ি করিবেন না।"

আমারও পীড়াপীড়ি করিবার বড় ইচ্ছা ছিল না। আর একটা রাত বই ত নয়। যেমন তেমন করিয়া কাটিয়া যাইবেই। বিশেষ ষ্টেশন মাষ্টার যেরকম করিয়া আমাকে বুঝাইয়া বলিল তাহাতে আমি নিরুত্তর হইলাম।

ষ্টেশন মাষ্টার আরোহীর দিকে চাহিয়া বলিল, 'আপনি গাড়ীতে উঠুন। গাড়ী ছাড়ে।' এই বলিয়া সেকহ্যাণ্ড করিয়া চলিয়া গেল। আরোহী গাড়ীতে উঠিল।

গাড়ীতে উঠিয়া সে ব্যক্তি তাহার বোঁচকা বুঁচকি গুনিতে লাগিল। খানিকক্ষণ কুলিদিগের সহিত বচসা করিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিল।

॥ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥

আমি একধারে বসিয়া নবাগত লোকটিকে দেখিতেছিলাম। তাহাকে দেখিলে বড ভয় হইবার কথা নহে। লোকটা কিছু বেঁটে, মোটাসোটা, ছোটরকম একটু ভুঁড়ি আছে। গায়ে আঁটা পোশাক, ভুঁড়ির উপর একগাছা মোটা চেন ঝুলিতেছে। লোকটিকে দেখিলে সঙ্গতিশালী বোধহয়। অর্থ এবং পদের যে ক্ষুদ্র অভিমান তাহাও বোধহয় যথেষ্ট পরিমাণ আছে। লোকটি দেখিতে কিন্তু ডেপুটির মত, কিন্তু বোধহয় ডেপুটির অপেক্ষা অধিক ধনী। গাডীতে উঠিয়া ব্যস্ত সমস্ত ভাবে তাহার অসংখ্য পুঁটুলী সাজাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অলক্ষিতে আমার প্রতি ঘন ঘন কটাক্ষপাত করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে কুলিরা জিনিসপত্র অসাবধানে রাখিয়াছে বলিয়া তাহাদিগকে গালি দিতে লাগিল।

ঘণ্টা বাজিল, বাঁশি ডাকিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়, কোথা যাইবেন?

"কলিকাতা। আপনি কোথায় যাইবেন?"

আমি বলিলাম, শ্রীরামপুর। মনে করিয়াছিলাম এ লোক অল্পদূর গিয়া নামিয়া যাইবে। দেখিলাম আমার সাধের সাথী।

আমি শ্রীরামপুরে যাইব শুনিয়া লোকটি তাহার লটবহর ছাড়িয়া আর এক কোণে বসিয়া পড়িল। বসিয়া বলিল, 'আর'। শব্দটা সন্তোষ অথবা অসন্তোষজনক ভাল বুঝিতে পারিলাম না। ঐ শব্দটি করিয়া লোকটি আমায় ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল।

আমাকে কতকটা বিদেশীর মত দেখাইতেছিল। বসন ভূষণের বড় পারিপাট্য ছিল না। বেশভূষার উপর অনুরাগ আমার কোনকালেই বড় নাই তাহাতে রেলের পথে অতি সামান্য বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলাম। ঘড়ি ও চেন বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার আকৃতি দীর্ঘ, শরীর বলিষ্ঠ। বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া ছিলাম।

খানিকক্ষণ আমাকে দেখিয়া বোধহয় সে ব্যক্তি বড় আশ্বস্ত হইল না। জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়ের এ পথে যাতায়াত আছে ?' আমি বলিলাম, 'না'।

"আপনি রেলে বড় একটা উঠিয়া থাকেন ?"

বড় নয়। লোকটার কথায় আমার একটু বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। কোথায় সহজ কথাবার্তা কহিবে না আমায় পরীক্ষা করিতে আরম্ভ করিল।

কিছু পরে আমার সঙ্গী আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি গাড়ীতে এত জিনিসপত্র লইয়া কেন উঠিয়াছি জানেন ?'

'সম্প্রতি ব্রেকভ্যান হইতে অনেক সামগ্রী চুরি গিয়াছে। গার্ড বলে, সে কিছু জানে না। তাহার মেয়াদ হইয়াছে বটে কিন্তু সে যে চুরি করিয়াছে তাহার কোন প্রমাণ নাই।'

কথাটা শুনিয়া আমার ঔৎসুক্য জন্মিল। বুকের উপর হাত ছিল, হাত দিয়া নোটের তাড়া একবার টিপিয়া দেখিলাম। কিছু কুতুহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কতদিনের কথা।"

'এক সপ্তাহ হইবে।'

'যদি ব্রেকভ্যান হইতে চুরি যায় ত গাড়ী হইতে চুরি যাওয়াই বা আশ্চর্যের কি ?'

"আশ্চর্য কি", এই বলিয়া আমার সঙ্গী কাতর দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। একবার তাহার জিনিসপত্রের দিকে তাকায়, একবার গাড়ীর চারদিকে তাকায়, একবার গাড়ীর বাহিরে অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার দিকে তীব্র অথচ অলক্ষ্য কটাক্ষ করে। একটা ছোট বাক্স পায়ের কাছে ছিল, থাকিয়া থাকিয়া সেইটাকে আরও কাছে টানিয়া আনে। অবশেষে বাক্সটাকে তুলিয়া পাশে রাখিল। আমাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিতেছে অথবা অকারণ সন্দেহ করিতেছে ভাল বুঝিতে পারিলাম না। স্থির হইয়া বসিয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলাম।

এইরূপে কিছুক্ষণ যায়। আমি একটু অন্যমনস্ক হইলাম। এক একবার আমার সঙ্গীর দিকে চাহিয়া দেখি। সে লোকটা নির্নিমেষচক্ষে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইলেই অন্যদিকে চক্ষু ফিরায় আমি অন্য দিকে তাকাইলেই নিস্পন্দ হইয়া আমায় দেখে। আমার মনটা একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। হঠাৎ আমার সঙ্গী আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কি অস্ত্র লইয়া পথ চলেন ?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "ইংরেজের রাজ্যে কেহ সশস্ত্র হইয়া রেলে উঠে না।" আমার ক্ষুদ্রকায় সঙ্গী একটু রুক্ষস্বরে কহিল, "আমি অস্ত্র লইয়াই ভ্রমণ করি, এই যে আমার পাশে বাক্স দেখিতেছেন তাহাতে একজোড়া ভরা পিস্তল আছে।"

আমি হাস্যমুখে বলিলাম "আপনি কি শিকারে যাইতেছেন ?"

সে ব্যক্তি কিছু কঠোর হাস্য করিয়া বলিল, "আপাততঃ কোন শিকার নাই, তবে আমাদের গাড়ীতে যদি কোন চোর উঠে ত তাহাকে শিকার করিব। তাহাকে প্রাণে না মারি, তাহার পা ভাঙ্গিয়া রাখিব।" এই বলিয়া অত্যন্ত সাহসীপুরুষের ন্যায় বুক ফুলাইয়া আমার প্রতি প্রখর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আমার বড় হাসি পাইল। লোকটা আমায় তস্কর বিবেচনা করিতেছে অথবা সেইরূপ সন্দেহ করিতেছে বেশ বুঝিতে পারিলাম। একটু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "পিস্তল ছোঁড়া আপনার অভ্যাস আছে ?"

তাহার মুখ একটু মলিন হইল, কহিল, "একরকম অভ্যাস আছে। এ গাড়ীতে চোর আসিলে তাহাকে অবশ্য ঘায়েল করিতে পারি।"

আমি গম্ভীরভাবে কহিলাম, "আপনার কাছে দুইটা পিস্তল আছে বলিতেছেন। আপনি একটা পিস্তল আমাকে দিন, আর এই দুআনিটা জানালার সম্মুখে ধরুন। আমি গাড়ীর অন্য ধার হইতে পিস্তল ছুঁড়িয়া দু-আনি উড়াইয়া দিতেছি। আপনার হাতে কিছু লাগিবে না।"

আমার কথা শুনিয়া সে বেচারির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বাক্সটা আরও কাছে টানিয়া লইল। হাত একটু কাঁপিতেছিল আমি দেখিতে পাইলাম। বলিল, "আপনার বোধহয় বন্দুক ও পিস্তল ছুঁড়িবার বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।"

আমার মনে প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল যে বাক্সটি দেখিতে পিস্তলের

বাক্সের হইলেও তাহাতে পিস্তল নাই। আমার সঙ্গী যে মিথ্যা বলিতেছে তাহা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এই সময়ে আমরা একটা ছোট ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইলাম। আমি ষ্টেশনের অপরদিকে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দিয়া দেখিতে লাগিলাম। নিশীথের শীতলপবন মুখে লাগিতে লাগিল। আকাশে চতুর্দিকে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, বিস্তৃত মাঠ, দূরে লোকালয়। দূর হইতে প্রদীপের আলোক দেখা যাইতেছে। অন্ধকারে কখন বাদুড় উড়িয়া যাইতেছে, কখন পেচক ডাকিতেছে, কখন কোন নিশাচর জন্তুর রব শোনা যাইতেছে। ষ্টেশনে গোলমাল, বারান্দায় লোকজন দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কেহ জল চাহিতেছে, কেহ কোন সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, কেহ অনর্থক চিৎকার করিতেছে। আমি সে দিকে মুখ ফিরাইলাম না।

দুই মিনিটের পর গাড়ী ছাড়িল। আমি ঘুরিয়া বসিলাম—দেখিলাম গাড়ীতে আর একজন লোক উঠিয়াছে। অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। দরজা খুলিবার শব্দ অথবা অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই। এত নিঃশব্দে যে কেহ গাড়ীতে উঠিতে পারে আমি না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। বিস্ময় কিছু অপনীত হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি এই ষ্টেশনে উঠিলেন?"

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনি বুঝি আমায় উঠিতে দেখেন নাই?

আমি বলিলাম, "দেখা দূরে থাকুক, দরজা খোলার অথবা বন্ধ হইবারও কোন শব্দ শুনি নাই। গাড়ীতে, যদি ছাদ না থাকিত ত বলিতাম, আপনি আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।"

আগন্তুক হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "মহাশয়, হালকা বোঝা মাথায় করিলে মুটে কিছু ভার বোধ করে না। চারগাছা মল পায়ে না পড়িলে যুবতীর পায়ে শব্দ হয় না। আমি যদি আপনার বন্ধুর মত রাজ্যের সামগ্রী লইয়া উঠিতাম, তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেও পাইতেন, দেখিতেও পাইতেন।"

'আমার বন্ধু' এতক্ষণ হাঁ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনিও আগন্তুককে আসিতে দেখেন নাই। কিন্তু আর একজন লোক দেখিয়া তাহার ধড়ে প্রাণ আসিল। আমার হাত হইতে রক্ষা পাইল। তৃতীয় ব্যক্তিকে

এইরূপে কিছুক্ষণ যায়। আমি একটু অন্যমনস্ক হইলাম। এক একবার আমার সঙ্গীর দিকে চাহিয়া দেখি। সে লোকটা নির্নিমেষচক্ষে আমার দিকে চাহিয়া আছে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হইলেই অন্যদিকে চক্ষু ফিরায় আমি অন্য দিকে তাকাইলেই নিস্পন্দ হইয়া আমায় দেখে। আমার মনটা একটু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। হঠাৎ আমার সঙ্গী আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনি কি অস্ত্র লইয়া পথ চলেন?"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "ইংরেজের রাজ্যে কেহ সশস্ত্র হইয়া রেলে উঠে না।" আমার ক্ষুদ্রকায় সঙ্গী একটু রুক্ষস্বরে কহিল, "আমি অস্ত্র লইয়াই ভ্রমণ করি, এই যে আমার পাশে বাক্স দেখিতেছেন তাহাতে একজোড়া ভরা পিস্তল আছে।"

আমি হাস্যমুখে বলিলাম "আপনি কি শিকারে যাইতেছেন?"

সে ব্যক্তি কিছু কঠোর হাস্য করিয়া বলিল, "আপাততঃ কোন শিকার নাই, তবে আমাদের গাড়ীতে যদি কোন চোর উঠে ত তাহাকে শিকার করিব। তাহাকে প্রাণে না মারি, তাহার পা ভাঙ্গিয়া রাখিব।" এই বলিয়া অত্যন্ত সাহসীপুরুষের ন্যায় বুক ফুলাইয়া আমার প্রতি প্রখর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। আমার বড় হাসি পাইল। লোকটা আমায় তস্কর বিবেচনা করিতেছে অথবা সেইরূপ সন্দেহ করিতেছে বেশ বুঝিতে পারিলাম। একটু রঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "পিস্তল ছোঁড়া আপনার অভ্যাস আছে?"

তাহার মুখ একটু মলিন হইল, কহিল, "একরকম অভ্যাস আছে। এ গাড়ীতে চোর আসিলে তাহাকে অবশ্য ঘায়েল করিতে পারি।"

আমি গম্ভীরভাবে কহিলাম, "আপনার কাছে দুইটা পিস্তল আছে বলিতেছেন। আপনি একটা পিস্তল আমাকে দিন, আর এই দুআনিটা জানালার সম্মুখে ধরুন। আমি গাড়ীর অন্য ধার হইতে পিস্তল ছুঁড়িয়া দু-আনি উড়াইয়া দিতেছি। আপনার হাতে কিছু লাগিবে না।"

আমার কথা শুনিয়া সে বেচারির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। বাক্সটা আরও কাছে টানিয়া লইল। হাত একটু কাঁপিতেছিল আমি দেখিতে পাইলাম। বলিল, "আপনার বোধহয় বন্দুক ও পিস্তল ছুঁড়িবার বিলক্ষণ অভ্যাস আছে। কিন্তু পরীক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।"

আমার মনে প্রথমেই সন্দেহ হইয়াছিল যে বাক্সটি দেখিতে পিস্তলের

বাক্সের হইলেও তাহাতে পিস্তল নাই। আমার সঙ্গী যে মিথ্যা বলিতেছে তাহা পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এই সময়ে আমরা একটা ছোট ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইলাম। আমি ষ্টেশনের অপরদিকে জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দিয়া দেখিতে লাগিলাম। নিশীথের শীতলপবন মুখে লাগিতে লাগিল। আকাশে চতুর্দিকে নক্ষত্র জ্বলিতেছে, বিস্তৃত মাঠ, দূরে লোকালয়। দূর হইতে প্রদীপের আলোক দেখা যাইতেছে। অন্ধকারে কখন বাদুড় উড়িয়া যাইতেছে, কখন পেচক ডাকিতেছে, কখন কোন নিশাচর জন্তুর রব শোনা যাইতেছে। ষ্টেশনে গোলমাল, বারান্দায় লোকজন দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কেহ জল চাহিতেছে, কেহ কোন সামগ্রী বিক্রয় করিতেছে, কেহ অনর্থক চিৎকার করিতেছে। আমি সে দিকে মুখ ফিরাইলাম না।

দুই মিনিটের পর গাড়ী ছাড়িল। আমি ঘুরিয়া বসিলাম—দেখিলাম গাড়ীতে আর একজন লোক উঠিয়াছে। অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। দরজা খুলিবার শব্দ অথবা অন্য কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই। এত নিঃশব্দে যে কেহ গাড়ীতে উঠিতে পারে আমি না দেখিলে বিশ্বাস করিতাম না। বিস্ময় কিছু অপনীত হইলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি এই ষ্টেশনে উঠিলেন?"

আগন্তুক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, আপনি বুঝি আমায় উঠিতে দেখেন নাই?

আমি বলিলাম, "দেখা দূরে থাকুক, দরজা খোলার অথবা বন্ধ হইবারও কোন শব্দ শুনি নাই। গাড়ীতে, যদি ছাদ না থাকিত ত বলিতাম, আপনি আকাশ হইতে পড়িয়াছেন।"

আগন্তুক হাসিতে লাগিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "মহাশয়, হালকা বোঝা মাথায় করিলে মুটে কিছু ভার বোধ করে না। চারগাছা মল পায়ে না পড়িলে যুবতীর পায়ে শব্দ হয় না। আমি যদি আপনার বন্ধুর মত রাজ্যের সামগ্রী লইয়া উঠিতাম, তাহা হইলে অবশ্য শুনিতেও পাইতেন, দেখিতেও পাইতেন।"

'আমার বন্ধু' এতক্ষণ হাঁ করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনিও আগন্তুককে আসিতে দেখেন নাই। কিন্তু আর একজন লোক দেখিয়া তাহার ধড়ে প্রাণ আসিল। আমার হাত হইতে রক্ষা পাইল। তৃতীয় ব্যক্তিকে

দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দের সহিত কহিল, "আসুন মহাশয়, যেমন করিয়াই আসুন—আসিয়াছেন, বেশ করিয়াছেন। আপনি কলিকাতায় যাইতেছেন ত' ?" আগন্তুক আবার হাসিয়া কহিল, তাহা হইলে কি এমন করিয়া যাইতাম। অন্ততঃ আপনার আসবাবের দশভাগের একভাগ লইয়া আসিতাম। আর তাহা হইলে আমার অলক্ষ্য আগমনও সম্ভব হইত না, আপনাও বিস্মিত হইতে না। আমি মোটে এক স্টেশন যাইব, তাহার পরে আপনারা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইবেন।"

কলিকাতার যাত্রী কিছু বিষণ্ণ হইল ; দুই একবার আমার দিকে চাহিয়া দেখিল। আমি অন্ধকার কোণে ঠেসান দিয়া বসিয়া আগন্তুককে ভাল করিয়া দেখিতেছিলাম।

আগন্তুক যুবাপুরুষ। বয়ঃক্রম ত্রিশ বৎসরের উর্ধ্বে হইবে না, বরং কম হইবে। আকৃতি মাঝারি রকম, ঈষদ্দীর্ঘও বলা যাইতে পারে। শরীর ক্ষীণ কিন্তু অত্যন্ত স্ফূর্তিব্যঞ্জক। মুখের শ্রী অত্যন্ত মনোহর, হাস্যও বড় মধুর। পরিধানে পরিচ্ছন্ন বস্ত্র, হাতে একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ। কিন্তু যুবকের চক্ষু দেখিতে পাইলাম না। রেলে লোকে যেমন নীল রঙের চশমা পড়ে চক্ষে সেই রকম চশমা রহিয়াছে। রাত্রিকালে চোখে চশমা দেখিয়া একটু আশ্চর্য বোধ হইল। যুবক আমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আমার দিকে চাহিয়া কহিল, "রাত্রে আমার চক্ষে চশমা দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। চক্ষে কিছু বেদনা হইয়াছে সেইজন্য চশমা পরিয়াছি।"

এ ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার মন একটু চঞ্চল হইল। বলিতে পারি না কেন, মনে একটু বিপদের আশঙ্কা হইল। বোধহয় অন্যমনে দুই একবার বুকে হাত দিয়া নোটের তাড়া স্পর্শ করিয়া থাকিব। যুবক দেখিয়াছিল কিনা তাহার চক্ষে চশমা থাকাতে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সে এদিকে ওদিকে না চাহিয়া আমার পূর্ব পরিচিত সঙ্গীর সহিত কথাবার্তা কহিতেছিল। একবার হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, আপনার ও বাক্সের ভিতর কি ? পিস্তল নাকি ?"

আমার সঙ্গী অত্যন্ত বিস্মিত ও কিছু শঙ্কিত হইয়া কহিল, "হ্যাঁ, আপনি কি করিয়া জানিলেন ?"

যুবক কহিল, "পিস্তলের বাক্স দেখিয়া কহিলাম। আপনি কি চোরের ভয়ে পিস্তল লইয়াছেন ?"

সে ব্যক্তি আরও বিস্মিত হইল, বলিল," আপনি কিভাবে জানেন? যুবক আবার হাস্য করিল; তাহার দশন পঙতি শুভ্র ও সুন্দর। কহিল, "আমি কিছুই জানি না। কিন্তু চোর যদি আসে ত কি আপনাকে বলিয়া চুরি করিবে?"

আমার সঙ্গী অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "চোর ত বাহির হইতে আসিবে না। যদি চোর আসে ত এই গাড়ীতেই আসিবে?"

যুবক আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের দুইজনের মধ্যে কাহাকেও সন্দেহ হয়?"

"না। না। আপনাদের কথা হইতেছে না। যদি আর কেহ ওঠে!"

যুবক কহিল, "তা ও বটে।"

আমার সন্দেহ ও আশঙ্কা বাড়িতে লাগিল। আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না তথাপি অত্যন্ত শঙ্কা হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অন্য স্টেশন আসিল। যুবক উঠিয়া দাঁড়াইল। আমাদের দুইজনকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, "আপনার এখন নিশ্চিন্তে নিদ্রার চেষ্টা করুন। চোরের ভয়ে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবেন না।" এই বলিয়া নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া যুবক নামিয়া গেল।

অকারণে এইরূপ আশঙ্কা হওয়াতে আমার অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু যুবক নামিয়া গেলে স্বচ্ছন্দ বোধ হইতে লাগিল। বিছানার উপর পা ছড়াইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শুইলাম।

॥ তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥

আমাকে শুইতে দেখিয়া আমার সঙ্গী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি নিদ্রা যাইবেন?"

আমি বলিলাম, "সমস্ত রাত্রি কি বসিয়া থাকা যায়?"

আমার সঙ্গী কহিল, "আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিব।"

'আপনার যেমন অভিরুচি হয় করিবেন' বলিয়া আমি পাশ ফিরিলাম।

শুইলাম বটে কিন্তু চক্ষে নিদ্রা আসিল না। ঘণ্টা কয়েক পরেই বাড়ী পঁহুছিব—এমন সময় নিদ্রা হয়ও না। যে আরোহী এক স্টেশন আমাদের সঙ্গে আসিয়াছিল তাহার বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। রাত্রে চক্ষে চশমা কেন?

তাহাকে দেখিয়া মনে মনে আশঙ্কাই বা কেন হইল? লোকটি দেখিতে মন্দ নয়, কথাবার্তা শিক্ষিত ভদ্রলোকের মত। তথাপি সে নামিয়া গেলে নিশ্চিত বোধ হইল কেন? ভাবিয়া কিছু স্থির করিতে পারিলাম না।

একবার আমার সঙ্গীর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম সে বাক্সটি মাথার কাছে লইয়া প্রাণপণে জাগিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কিছুতেই বসিয়া থাকিতে পারিতেছে না। অবশেষে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাভূত হইল। আমার তখনও নিদ্রাবেশ হয় নাই!

...ক্রমে ক্রমে আমার শরীর শিথিল হইল। মনে হইল তন্দ্রাকর্ষণ হইতেছে। কিন্তু এরূপ নিদ্রাবেশ পূর্বে কখনও অনুভব করি নাই। বোধ হইল যেন অনন্ত শরীর গুরুভারাক্রান্ত হইতেছে, নেত্রদ্বয় যেন কে চাপিয়া ধরিয়াছে। একবার চক্ষু উন্মীলন করিবার চেষ্টা করিলাম—চক্ষু নিমীলিত রহিল। ক্রমে চৈতন্য লুপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু একেবারে অচৈতন্য হইলাম না।...দেখিতে দেখিতে সমস্ত শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমি অচৈতন্য হইলাম।

কতক্ষণ এরূপ রহিলাম বলিতে পারি না। যখন আবার চৈতন্যোদয় হইল তখন রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে, অন্ধকার তত গাঢ় নাই।...আমি একেবারে উঠিয়া বসিতেই অভ্যাসবশতঃ বুকে হাত পড়িল। আমি তীরের মত উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বুকে নোটের তাড়া নাই।

সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল। চক্ষে কিছু দেখিতে না পাইয়া বসিয়া পড়িলাম।...বিছানার নীচে, বেঞ্চের নীচে চারিদিকে খুঁজিলাম, কোথাও কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না।

...গাড়ীতে কেবল সেই একজন সঙ্গী, তৃতীয় ব্যক্তি নাই। আমি দ্বিতীয় আরোহীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। গাড়ীর আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।

আমি ক্ষিপ্তের মত হইয়া উঠিয়াছিলাম।...আমার সঙ্গীকে ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করিলাম। সে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বকিতে বকিতে উঠিয়া বসিল। আমার মূর্তি দেখিয়া সে অত্যন্ত ভীত হইল—সম্পূর্ণ জাগরিত হইল। আমি বলিলাম, "এ কেমন তামাসা? আমার টাকা?"

তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কহিল, "টাকা, আমার কাছে কিছু টাকা নাই।"

…আমি চীৎকার করিয়া কহিলাম, "আমার নোট কোথায় আছে বল।" ভয়ে ও বিস্ময়ে আকুল হইয়া সে কহিল, "তোমার নোট আমার কাছে?" এই কথা বলিয়াই তাহার শিয়রের দিকে দৃষ্টি পড়িল। অত্যন্ত কাতর স্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "আমার বাক্স?"

আমি দেখিলাম তাহার বাক্সটি নাই।…সে শোকে ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িল। কিছু পরে অতি করুণ স্বরে আমায় কহিল, "আমার বাক্সটি কোথায় রাখিয়াছ?"

আমি বুকে হাত দিয়া কহিলাম, "আমার নোট?"

সে ব্যক্তি কহিল "আমার বাক্স?"

আমি ভাবিতে লাগিলাম "আমাদের দুইজনের মধ্যে কেহ চোর নয় বেশ বুঝিতে পারিলাম। দুইজনেরই চুরি গিয়াছে।"…আমি কিছু স্থির হইয়া আমার সঙ্গীকে বলিলাম, "মহাশয়, আমিও চোর নই, আপনিও চোর নন। দুইজনেরই চুরি গিয়াছে। কে চুরি করিয়াছে সেইটে জানা কঠিন।"

সে ব্যক্তি বোধহয় আমার একটা কথাও বিশ্বাস করিল না। আমার দিকে চাহিয়া কেবল বলিল, "আমার বাক্স?"

আমি কহিলাম, "আপনার কত গিয়াছে আমি জানি না। আমি সর্বস্বান্ত হইয়াছি। আমার প্রতি আপনার যে সন্দেহ হইতেছে তাহা শীঘ্রই দূর হইবে, কিন্তু আর কিছু গেল কিনা দেখি?"

বাক্স ব্যাগ যেমন তেমনি রহিয়াছে, আমার আর যে সামান্য টাকাকড়ি ছিল তাহাও তেমনি রহিয়াছে। আমার সঙ্গীর বাক্সটি ছাড়া আর কিছু যায় নাই। তাহার ঘড়িটিও যেমন তেমনি রহিয়াছে, তবে চেনে কিছু তফাৎ হইয়াছে। সোনার চেনের বদলে একগাছি লোহার চেন রহিয়াছে। নূতন ধরনের চুরি বটে?

তাহার পরের স্টেশনে আমার সঙ্গীটি বড় গোল বাধাইল। আমি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলাম, স্টেশন মাস্টার আসিলে বলিলাম, "আমাদের দুইজনেরই চুরি গিয়াছে।"

স্টেশনের লোক দেখিয়া আমার সঙ্গীর সাহস বাড়িল। আমার কথায় বাধা দিয়া কহিল! নোট ফোট কিছু নয়। এই ব্যক্তি চোর! আমার বাক্সে দুই হাজার টাকার গহনা ছিল।

আমি স্টেশন মাষ্টারকে কহিলাম, "আমার কাছে দশহাজার টাকার নোট

ছিল, নোটের নম্বর আমার কাছে আছে। আমার পরিচয় আমার কর্মস্থানে টেলিগ্রাম পাঠাইলেই পাইবেন। নোট ট্রেজারি হইতে লইয়া আসিয়াছি। জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।" এই বলিয়া স্টেশনমাষ্টারকে কাগজ-পত্র দেখাইলাম, রাত্রে যে বিশেষ অদ্ভুত ব্যাপারে ঘটিয়াছিল সেটা কেহ বিশ্বাস করিবে না বলিয়া আর বলিলাম না।

ষ্টেশন মাষ্টার কহিল, "আপনার কথায় আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেছি। কিন্তু এখানে আপনাকে কেহ চেনে না। যতক্ষণ টেলিগ্রামের উত্তর না আসে ততক্ষণ আপনাকে এইখানে থাকিতে হইবে।"

আমি কহিলাম, "অবশ্য।"

আমার সঙ্গী ষ্টেশন মাষ্টারের প্রতি চাহিয়া কহিল, "আমাকেও কি থাকিতে হইবে? আমাকে এদিকে অনেকে চেনে।"

ষ্টেশন মাষ্টার কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, লোকনাথবাবুকে অনেকে চেনে।"

আমি মৃদু মৃদু কহিলাম, "লোকনাথবাবু! নিবাস?"

"সোমড়া। মহাশয়ের নামটা কি বলিলেন?"

আমি বলিলাম, "অমরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।"

লোকনাথবাবু আমার নিকটে সরিয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নিবাস শ্রীরামপুর বলিলেন না?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"ঠাকুরের নাম?"

"মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"কর্মস্থান?"

"ফরাক্কাবাদ।"

"এতক্ষণ বলিতে নাই। আমার নাম লোকনাথ মুখোপাধ্যায়। নিবাস সোমড়া। আমায় চিনিতে পার?"

আমি প্রণাম করিয়া বলিলাম, "আপনাকে পূর্বে দেখি নাই। আপনি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আপনার কন্যা দান করিয়াছেন।"

লোকনাথবাবু ব্যস্ত হইয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকাইলেন। বলিলেন, "ইহার উপর কোন সন্দেহ নাই। ইনি আমার আত্মীয় লোক। আমাদের দুইজনেরই চুরি গিয়াছে।"

ষ্টেশন মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিল, "ইহার উপর আপনার কোন সন্দেহ নাই?"

লোকনাথবাবু সবেগে বলিলেন, "কিছু না।"

ষ্টেশন মাষ্টার আমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "তবে টেলিগ্রামের উত্তরের অপেক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই।"

আমরা দুইজনে আবার গাড়ীতে উঠিলাম।

॥ চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥

গাড়ীতে উঠিয়া আমি একটু কুণ্ঠিতভাবে কহিলাম, "আপনাকে চিনিতে না পারিয়া রাত্রে সদ্ব্যবহার—"

লোকনাথবাবু কথাটা সমাপ্ত হইতে দিলেন না। কহিলেন, "বিলক্ষণ তোমার ত কোন দোষই নাই। আমি যে তোমাকে দশজনের সাক্ষাতে চোর বলিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "অমন অবস্থায় সকলেই বলে। আমিও ত প্রথমে আপনাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম।"

লোকনাথবাবু কহিলেন, "সে কথা যাক্। চোর কেমন করিয়া ধরা যাইবে? এত সাধারণ চুরি নয়?"

লোকনাথবাবু একজন প্রসিদ্ধ ধনী এবং অত্যন্ত কৃপণ। সেইজন্য তাঁহাকে অনেকে চিনিত। আমার সর্বস্ব গিয়া যত না বিপদ হইয়াছে, দুই হাজার টাকার গহনা গিয়া তাঁহার ততোধিক বিপদ। একমাত্র কন্যার জন্য এই গহনা গড়াইয়াছিলেন।

রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল অবিকল লোকনাথবাবুকে তাহা বলিলাম। শুনিয়া তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। বলিলেন, 'আমি বরাবর ঘুমাইয়া ছিলাম, কিছু টের পাই নাই।'

আমি বলিলাম, "আমাদের সঙ্গে সেই যে একজন চশমাপরা লোক উঠিয়াছিল, তাহাকে মনে পড়ে?"

লোকনাথবাবুর মুখ এবং চোখ খুলিয়া গেল। "হ্যাঁ, পড়ে বই কি! সে ত বেশ লোক বোধ হইল। আর সে এক ষ্টেশন বই ত আর আসে নাই।"

আমি বলিলাম, "তাহাকে দেখিয়া আমার কেমন ভয় হইয়াছিল বলিতে পারি না। তাহাকেই আমার সন্দেহ হইতেছে।"

লোকনাথবাবু বলিলেন, "তোমার বুক থেকে কেমন করিয়া রুমাল খুলিয়া লইল। আর তুমি যাহা বলিতেছ এরকম আশ্চর্য ব্যাপার আমি কখনও শুনি নাই।"

শ্রীরামপুরে আমি নামিয়া গেলাম। ষ্টেশনে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাকে সব বলিলাম। তিনি লোকনাথবাবুকে নামিয়া আহার করিয়া কলিকাতায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। লোকনাথবাবু বলিলেন, "আর একদিন আসিব। এখন এই চুরির একটা উপায় করি।"

গাড়ী ছাড়িলে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কহিলেন, "ব্যাঙ্কে টেলিগ্রাম পাঠাও। নোটের নম্বর তোমার কাছে আছে। ব্যাঙ্কে নোট গেলে ধরা পড়িবে। আহার করিয়া আমরা কলিকাতায় যাইব।"

তখন মনে হইতে লাগিল সঙ্গে টাকা আনিয়া কি মূর্খের কাজই করিয়াছি। …এখন গিয়া মাকে কি বলিব? বাড়ী ফিরিবার এত আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হইল।

মা বড় বুদ্ধিমতী। সমস্ত টাকা চুরি গিয়াছে শুনিয়া মনে যাহাই হউক, মুখে কোন দুঃখ প্রকাশ করিলেন না। বলিলেন, "অমর, বেঁচে থাক, টাকার ভাবনা কি? পুরুষ মানুষ আবার কত টাকা রোজগার করবে।"

আহারাদির পর দুপুরের গাড়ীতে আমরা দুই ভাই কলিকাতায় গেলাম। রেলওয়ে পুলিসে চারিদিকে সন্ধান করিতেছিল, কিন্তু তাহারা যে তদন্ত করিতে পারিবে আমাদের সে ভরসা বড় ছিল না। আমরা একজন বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভের কাছে গেলাম। তাহাকে সকল কথা আদ্যোপান্ত বলিলাম। সে একটু চুপ করিয়া রহিল, পরে জিজ্ঞাসা করিল, "সে ব্যক্তির চক্ষু আপনি দেখতে পাননি?"

আমি বলিলাম, "একবারও না।"

ডিটেক্‌টিভ বলিল, "তাহা হইলে তাহাকে চেনা দুষ্কর। মানুষের চোখ না দেখিলে তাহাকে চেনা যায় না।…আমরা ইহাতে কিছু করিতে পারি না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন? যে চুরি আর কেহ ধরিতে পারে না সেই চুরি ধরাই তো তোমার ব্যবসা।"

ডিটেক্‌টিভের দুটি দাঁত বাহির হইল, কহিল, "চুরি হইলে ত? এ চুরি নয়।"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি ?"

'বাহাদুরী।'

'সে কি ?'

ডিটেক্‌টিভ বাম হস্তে দক্ষিণ হস্তের দুই অঙ্গুলী রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল, "আপনারা একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন। এ সহজ কৌশলের চুরি নয়। যখন চুরি কোনমতে সম্ভব নয়, তখন চুরি হইল। আপনি জাগিয়া ছিলেন, আপনাকে কোন কৌশলে ঘুম পাড়াইয়া রাখিল। আপনার সঙ্গীরও সেই দশা। যে নোটের তাড়ার জন্য আপনি বড় ভীত সেই নোটের তারা গেল। আপনার সঙ্গী যে বাক্সটির জন্য ভয়ে সারা, সেই বাক্সটি গেল। আপনার ঘড়ি, খুচরা টাকা, আপনার সঙ্গীর ঘড়ি কিছু গেল না। চেন ছড়া লইল সেটা যেন তামাসা করিবার জন্য। এমন সুবিধা পাইয়া কোন্ চোর দুই দুইটা ঘড়ি রাখিয়া যায় ?"

আমি একথাগুলো আগে ভাবি নাই। এখন নিরুত্তর রহিলাম।

ডিটেক্‌টিভ বলিতে লাগিল, 'যার চোখে চশমা ছিল, আমারও তাহাকেই সন্দেহ হইতেছে, কিন্তু তাহাকে চিনিবার কোন উপায় নাই।"

বোধহয় চুরি করা তাহার কাজ নয়। আর যদি এরকম চুরি করে ত তাহাকে কোনকালে কেহ ধরিতে পারিবে না। যদি ব্যাঙ্কে আপনার নোট ভাঙ্গাইতে যায় কিম্বা চশমা পরিয়া কেবল রেলে বেড়ায় তাহা হইলেই ধরা পড়িবে। কিন্তু তাহাকে এমন বোকা বোধ হয় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে তুমি চেষ্টা করিবে না ?"

ডিটেকটিভ বলিল, "চেষ্টা অবশ্য করিব, কিন্তু আপনাকে কোন আশা দিতে পারি না। আমাকে নিযুক্ত করিয়া আপনাদের কোন লাভ হইবে না।"

আমরা হতাশ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

॥ পঞ্চম পরিচ্ছেদ ॥

সংবাদপত্রে এই ঘটনা নানারূপ অলঙ্কারবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশিত হইল। আমি প্রকৃত ঘটনা একখানি পত্রে লিখিয়া পাঠাইলাম। কেবল যেটুকু সাধারণের বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহাই গোপন করিলাম। নোটগুলো যে আর কখন পাইব সে আশা কিছুমাত্র ছিল না।

দুই মাসের বিদায় লইয়া বাড়ি আসিয়াছিলাম। দুইমাস দেখিতে দেখিতে গেল। আমি কর্মস্থানে ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম। দুই বৎসর পূর্বে যেমন রিক্ত হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলাম, এখনও সেইমত বাহির হইলাম। রাত্রি দশটার সময় গাড়ীতে সেই রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত মনে পড়িতে লাগিল। দুই মাস ভাবিয়া আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই—চুরি না বাহাদুরী।

দ্বিতীয় দিবস সন্ধ্যার সময় গাড়ী বদল হয়। আমি নূতন গাড়ীতে উঠিতে গেলাম। দেখিলাম, গাড়ীতে বড় ভিড়। একখানি গাড়ীতে কেবল একজন লোক, আর কেহ নাই। আমি সেই গাড়ীতে উঠিলাম।

সে লোকটা মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। আমাকে উঠিতে দেখিয়া ফিরিয়া চাহিল। আমি আর এক বেঞ্চে গিয়া বসিলাম। অপর ব্যক্তি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। সে পর্যন্ত আমি তাহার মুখ দেখি নাই, তাহার অবয়ব দেখিয়া বোধ হইল, যেন তাহাকে পূর্বে কোথাও দেখিয়াছি। কোথায় দেখিয়াছি মনে করিতে লাগিলাম।

সে আবার ফিরিয়া চাহিল। দেখিলাম যুবা পুরুষ। অকস্মাৎ স্মরণ হইল, যে ব্যক্তি লোকনাথবাবু ও আমার সঙ্গে এক স্টেশনে আসিয়াছিল সেও এইরূপ যুবা পুরুষ। অলক্ষিতে নিরীক্ষণ করিতে! লাগিলাম। মনে মনে সন্দেহ হইবামাত্রই শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

যুবক আমার দিকে ফিরিয়া বসিল। চক্ষে চশমা নাই। আমি তাহার চক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। গাড়ীর বাহিরে অন্ধকার হয় নাই, গাড়ীর ভিতরে আলোক জ্বলিতেছে।

যুবকের চক্ষু দীর্ঘ। দৃষ্টি শান্ত। চক্ষের পাতা কিছু ভারি। আর কিছু লক্ষ্য করিতে পারিলাম না। আমি একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া আছি

এমন সময় সে মুখের দিকে চাহিল। আমি কিছু অপ্রতিভ হইয়া চক্ষু নত করিলাম। যুবক আমায় জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, কোথায় যাইবেন?"

আমি আবার বিস্মিত হইলাম। এ স্বর কোথাও শুনিয়াছি না? বলিলাম, "ফরাক্কাবাদ।"

যুবক আমার প্রতি কটাক্ষ করিল। বলিল, "ফরক্কাবাদ? সম্প্রতি সেখানে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছিল না?"

আমি যুবকের প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক কটাক্ষ লক্ষ্য করিতেছিলাম। বলিলাম, "ফরক্কাবাদ নয়। ফরক্কাবাদের একজন লোকের রেলে চুরি গিয়াছিল।"

যুবক বলিল, "হঁ্যা, মনে পড়িয়াছে। আপনি অমরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে চেনেন?"

"অমরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় আমারই নাম।"

যুবক আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিল। আমার বোধ হইল তাহার চক্ষু পূর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়াছে।

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, এ পর্যন্ত চুরির কোন সন্ধান পাইয়াছেন?

"কিছু মাত্র না।"

"পাইবার কোন আশা আছে?"

"কোন আশা নাই।

"কেন?"

"এরকম চোর ধরা যায় না।"

যে যুবক লোকনাথবাবু ও আমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠিয়াছিল সে রঙ্গপ্রিয়, চঞ্চল; এ ব্যক্তি গম্ভীর, মুখে হাসি নাই। তাহাকে দেখিয়া আমার মনে শঙ্কা হইয়াছিল, ইহাকে দেখিয়া কোন শঙ্কা হয় নাই। তথাপি আমার বোধ হইতেছিল এ দুইজন একই ব্যক্তি।

আমার কথা শুনিয়া যুবক যেন একটু হাসিল। কহিল পুলিশে কিছু করিতে পারিল না?

আমি বলিলাম, পুলিশের "সে ক্ষমতা নাই।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হয় সেইমতই কি আনুপূর্বিক ঘটিয়াছিল? না আপনি কিছু অপ্রকাশিত রাখিয়াছেন?"

একবার উত্তর দিব কি না মনে করিয়া আমি একটু ইতঃস্তত করিতে লাগিলাম। যুবক বুঝিতে পারিয়া বলিল, "অপরিচিত ব্যক্তিকে সব কথা বলিতে পারা যায় না। যদি কোন কথা গোপনীয় থাকে ত প্রকাশ করিবার আবশ্যক নাই।"

যুবক সেকথা ছাড়িয়া দিল। কহিল, আপনার সঙ্গে গাড়ীতে আর কে ছিলেন?

"আমার একজন আত্মীয় —লোকনাথবাবু।"

"বড় ধনী?"

"হাঁ।"

"কৃপণ!"

"লোকে বলে বটে।"

"তাহার কি চুরি গিয়াছিল?"

দুই হাজার টাকার গহনা।

আপনার কত গিয়াছিল!

"দশ হাজার টাকা। আমার সর্বস্ব।"

যুবক আমার প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি সর্বস্বান্ত হইয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "দুই বৎসরে যাহা উপার্জন করিয়াছিলাম তাহাও সমুদয়ই গিয়াছে! আমার কিছুই নাই।"

যুবক সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "নোটের নম্বর আপনার কাছে আছে"।

আমি কিছু বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "আছে।"

যুবক জিজ্ঞাসা করিল, "সে রাত্রে আপনাদের গাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি কেহ ছিল?"

আমি কহিলাম, "একজন লোক এক স্টেশন আমাদের গাড়ীতে আসিয়াছিল। তারপর আর কেহ ছিল না।"

লোকটি দেখিতে কি রকম?

"চোখে চশমা পরা, দেখিতে অনেকটা আপনার রকম।" এই বলিয়া যুবকের মুখ দেখিতে লাগিলাম।

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করিল। কহিল, "আপনার ভ্রম হইয়াছে। আপনি যাহাকে দেখিয়াছিলেন, আমি তাহাকে চিনি।"

এবার আর কুতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আগ্রহাতিশয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে ব্যক্তি কে? তাহার নাম কি?"

যুবক উত্তরে কেবল কহিল, "রাত্রে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল অবিকল বর্ণনা করুন।"

আমি সব কহিলাম, পরিশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে লোকটি কে?" যুবক কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু আপনার টাকা চুরি যায় নাই। আপনি টাকা ফিরিয়া পাইবেন।"

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলাম, "আমার সে আশা নাই। তখনি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয় এ পর্যন্ত আপনার নাম শুনিতে পাইলাম না।

যুবক কহিল, "নাম শুনিলেও আমার পরিচয় পাইবেন না। আমাকে অপরিচিত বিবেচনা করুন।"

এই কথা শুনিয়া আমার নানা সন্দেহ হইতে লাগিল। এ ব্যক্তি আপনার নাম গোপন করিতেছে কেন? আমি আমার টাকা ফিরিয়া পাইব এ কথাই বা কেমন করিয়া বলিতেছে?

কিছু পরে একটা বড় স্টেশনে গাড়ী লাগিল। আমি কোন প্রয়োজনে গাড়ী হইতে নামিলাম, একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া দেখি যে যুবক আর গাড়ীতে নাই। স্টেশনে খুঁজিলাম, সব গাড়ীতে খুঁজিয়া দেখিলাম, কোথাও কোন সন্ধান পাইলাম না। স্টেশনে কতলোক আসিতেছে কত লোক যাইতেছে কে তাহার খবর রাখে।

গাড়ীতে আবার উঠিয়া নিজের সামান্য জিনিসপত্র ভাল করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম কিছু চুরি যায় নাই। অপরিচিত যুবক যাহাই হউক, চোর নহে।

রাত্রে চক্ষে নিদ্রা আসিল না। রাত্রি অনেক হইল তথাপি নিদ্রার লেশমাত্র নাই। আমার সঙ্গী যাহা যাহা বলিয়াছিল সব কথাই ভাবিতে লাগিলাম। সে যেরূপে অদৃশ্য হইল তাহাতে আরও অনেক ভাবনা বাড়িল।

অকস্মাৎ উঠিয়া বসিলাম। যে নোটগুলা রাত্রে চুরি যায় সেইরাত্রে যেমন শরীর অবসন্ন হইয়াছিল, এখনত সেইরূপ বোধ হইতে লাগিল। মনে অত্যন্ত ভয় হইল, ভিতরে চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম, কোথাও কিছু নাই। ক্রমে শরীর অবশ হইয়া পড়িল, আর বসিয়া থাকিতে

পারিলাম না। চক্ষু মুদ্রিত করিলাম, মুখে যেন কাহার নিশ্বাস লাগিল, চক্ষু খুলিয়া যে দেখিব সে সাধ্য নাই। কয়েকমুহূর্ত পরে নিদ্রা আসিল, গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইলাম।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম প্রভাত হইয়াছে। আমি চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিলাম। বসিলে বোধ হইল যেন বুকে কি বাঁধা রহিয়াছে। বুকে হাত দিয়া দেখিলাম উঁচু মতন যেন কি ঠেকিল। নোট নহে ত? নিমেষের মধ্যে অঙ্গবস্ত্র খুলিয়া ফেলিলাম দেখিলাম আমার সেই রেশমের রুমালে যেমন করিয়া আমি উঠিয়া রাখিয়াছিলাম সেই রকম নোটের তাড়া বাঁধা রহিয়াছে। খুলিয়া গণিয়া দেখিলাম। নোটের নম্বর মিলাইয়া দেখিলাম, সব ঠিক আছে। যেমন টাকা তেমনি ফিরিয়া পাইলাম।

ফরক্কাবাদে পঁহুছিয়া কাহাকেও কিছু বলিলাম না। যে কথা শুনিয়া সকলে হাসিবে সেকথা না বলাই ভাল। নোটগুলি রেজিষ্টারি করিয়া মার কাছে পাঠাইয়া দিলাম।

কয়েকদিন পরে লোকনাথবাবুর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি লিখিতেছেন, "বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়াছে। পরশু রাত্রের গাড়ীতে আমি বাড়ী যাইতেছি। পথে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি, যে গহনার বাক্স চুরি গিয়াছিল সেই বাক্স আমার শিয়রে রহিয়াছে। তাহার কাছে নীল রঙের এক জোড়া চশমা। যে বাক্স ফিরাইয়া দিয়াছে আমি তাহাকে দশ টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকার করিয়াছি, কিন্তু কেহই সে পুরস্কার লইতে আসে নাই। চশমা জোড়া কি করিব বুঝিতে পারিতেছি না। গহনাগুলি পাইলাম, ভাল হইল। আমার কন্যার জন্য নূতন গহনা গড়াইতে হইবে না।"

ডিটেকটিভ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমি পুলিশের ডিটেকটিভ কর্মচারী। আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল—আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্বে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম, সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন, অতএব সহসা সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আনা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনো নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের ক্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্ট লক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পুলিশ বিভাগে সামান্য ভাবে প্রবেশ করিলাম, অবশেষে ডিটেকটিভ-পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উজ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কজ্জলপাত হয় তেমনি আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও ঈর্ষা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কাজের কিছু ব্যাঘাত করিত; কারণ পুলিশের কাজে স্থানাস্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না, বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চা অধিক করিয়া করিতে হয়—তাহাতে করিয়া আমার স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ আরো যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, "তুমি এমন যখন-তখন যেখানে-সেখানে যাপন কর, কালেভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়, আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না?" আমি তাহাকে বলিতাম, "সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।"

স্ত্রী বলিত, সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে, উহা আমার স্বভাব, আমাকে তুমি লেশমাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি।"

ডিটেকটিভ লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব, এ

প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় ছিল। এ সম্বন্ধে যত বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনোটাই পড়িতে বাকি রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু নির্বোধ, অপরাধগুলা নির্জীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরুহতা, দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোনো মতেই নিজের মধ্যে সংবরণ করিতে পারে না। জালিয়াত যে-জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদমস্তক জড়াইয়া পড়ে, অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূট কৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নির্জীব দেশে ডিটেকটিভের কাজে সুখও নাই, গৌরবও নাই।

বড়োবাজারের মাড়োয়ারী জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেফতার করিয়া কতবার মনে মনে বলিয়াছি, 'ওরে অপরাধীকুলকলঙ্ক, পরের সর্বনাশ করা গুণী ওস্তাদ লোকের কর্ম; তোর মতো আনাড়ি নির্বোধের সাধুতপস্বী হওয়া উচিত ছিল।' খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি, 'গবর্মেন্টের সমুন্নত ফাঁসিকাষ্ঠ কি তোদের মতো গৌরব-বিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল—তোদের না আছে উদার কল্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্ধা করিস!'

আমি কল্পনাচক্ষে যখন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীতবাষ্পাকুল অভ্রভেদী হর্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত। মনে মনে ভাবিতাম, এই হর্ম্যরাজি এবং পথ-উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত কর্মস্রোত সৌন্দর্যস্রোত অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্বত্রই একটা হিংসাকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ঙ্কর অপরাধ-প্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে; তাহারই সামীপ্যে য়ুরোপীয় সামাজিকতার হাস্য কৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাটভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর, আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্তবাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রান্নাবাটনা, গৃহকার্য, পরীক্ষার পাঠ, তাসদাবার বৈঠক, দাম্পত্য কলহ, বড়োজোর ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই—কোনো একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনো একথা মনে হয় না যে, হয়তো এই মুহূর্তেই এই গৃহের কোনো একটা কোণে শয়তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিমগুলিতে তা দিতেছে।

আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্যবেক্ষণ করিতাম; ভাবে ভঙ্গিতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি। তাহাদের নাম ধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি—তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালো মানুষ, এমন কি তাহাদের আত্মীয় বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোনো প্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সবচেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমন কি যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, এইমাত্র সে কোনো একটা উৎকট দুষ্কর্ম সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি—সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত, তখনই অধ্যাপনকার্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই সকল লোকেরাই অন্য-কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোরডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিতি করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন লইয়া মরে; বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোনো অতিক্ষুদ্র ঘটি-বাটি-চোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যা বেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাস-পোস্টের নিচে একটা মানুষ দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে উৎসুকভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে। তাহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, সে একটি কোনো গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারাখানা বেশ ভালো করিয়া দেখিয়া লইলাম—তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী; আমি মনে মনে কহিলাম, দুষ্কর্ম করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত চেহারা; নিজের মুখশ্রীই যাহাদের সর্ব প্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী তাহারা যেন সর্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্বপ্রযত্নে পরিহার করে; সৎকার্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে, কিন্তু দুষ্কর্ম দ্বারা সফলতালাভও তাহাদের পক্ষে দুরাশা। দেখিলাম, এই ছোকরাটির চেহারাই ইহার সর্বপ্রধান বাহাদুরি, সেজন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম; বলিলাম, 'ভগবান তোমাকে যে দুর্লভ সুবিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পারো, তবে তো বলি সাবাস।'

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাতপূর্বক বলিলাম, 'এই যে, ভালো আছেন তো ?' সে তৎক্ষণাৎ প্রবলমাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, 'মাপ করিবেন, 'ভুল হইয়াছে, হঠাৎ আপনাকে অন্য লোক ঠাওরাইয়াছিলাম, তাই বটে।' কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল, ইহাতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম। নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরো অধিক দখল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধী শ্রেণীর মধ্যেও বিরল। চোরের সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে।

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাসপোস্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পিছনে পিছনে গেলাম; দেখিলাম, ছোকরাটি গোল দিঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িল; আমি ভাবিলাম, উপায়চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাস পোস্টের তলদেশ অপেক্ষা অনেকাংশে ভালো—লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে তো বড়োজোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম, সে কলেজের ছাত্র। পরীক্ষায় ফেল করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়, এই লোকটিকে কোন্ দুষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না সেটা বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল কেমন একরকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ভাবটা ভালো বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে, এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে, ইহাকে সোজাভাবে ফস্ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেষ্টা করিলাম তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল, সে-ও আমাকে সুতীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে দেখে, সে-ও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতুহল, ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড়ো খুশি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধূর্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদ্‌গদকণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, 'ভাই, একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালোবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসে না।'

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল, 'এরূপ দুর্যোগ বিরল নহে। এই প্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।'

আমি কহিলাম, 'তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহি।' সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম; সে সাগ্রহে কৌতুহলে সমস্ত কথা শুনিল, কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালোবাসার, বিশেষত গর্হিত ভালোবাসার, ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া ওঠে; কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ছোকরাটি পূর্বাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল, অথচ সকল কথা মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এদিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে দ্বার রোধ করিয়া কী করে এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না। অথচ অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কী একটা নিগূঢ় ব্যাপারে সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ব হইয়াছে, তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্‌ক খুলিয়া দেখিয়াছি। তাহাতে একটা অত্যন্ত দুর্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বক্তৃতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্য আত্মীয়স্বজন বারম্বার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে; তথাপি, তৎসত্ত্বেও বাড়ি না যাইবার একটা সংগত কারণ অবশ্য আছে; সেটা যদি ন্যায়সঙ্গত হইত তবে নিশ্চয় কথায় কথায় এতদিনে ফাঁস হইত। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত

হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে—যে অসামাজিক মনুষ্য সম্প্রদায় পাতালতলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুষ্যসমাজকে সর্বদাই নিচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহু পুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ, এ সামান্য একজন স্কুলের ছাত্র নহে; এ জগৎ বৃক্ষ বিহারিণী সর্বনাশিনীর একটি প্রলয় সহচর, আধুনিককালের চশমাপরা নিরীহ বাঙালী ছাত্রের বেশে কলেজের পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে। নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না; আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পুলিশের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম, আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছুদিন গোলদিঘির ধারে মন্মথর পার্শ্বচর হইয়া 'আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে' কবিতাটি বারম্বার আবৃত্তি করিলাম; এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলা সহকারে জানাইল যে, তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে। কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না। মন্মথ সুদূর নির্লিপ্ত অবিচলিত কৌতূহলের সহিত সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেঝেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। জোড়া দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যটুকু আদায় করিলাম, 'আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসায়'—অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠিল; মাটির মধ্য হইতে কোনো বিলুপ্ত বংশ প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম, আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপারখানা কী? ছেলেটির যেমন সাহস তেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যদি কোনো গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোনো একটা বিশেষ হাঙ্গামা সেইদিন অবকাশ বুঝিয়া করা ভালো। প্রথমত প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে, দ্বিতীয়ত যেদিন যেখানে কোনো বিশেষ সমাগম

আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্বক কোনো গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নূতন বন্ধুত্ব এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনয়, ইহাকে মন্মথ আপন কার্যসিদ্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে; এইজন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না, আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কায হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি; সকলেই মনে করিতেছে যে, সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছে—সেও সে ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলো একবার ভাবিয়া দেখো। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয়-স্বজনের অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূন্য বাসায় একলা পড়িয়া থাকে, নির্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে কাহারো সংশয় থাকিতে পারে না, অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জনতা ভঙ্গ করিয়াছি; এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নূতন উপদ্রব সৃজন করিয়াছি; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে না—অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য, এমন কি তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারম্বার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য এই যে, সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মতো নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সবাপেক্ষা সদুপায়; এবং কোনো বিষয়ে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মতো এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই। ইতিপূর্বে মন্মথর আচরণ যেরূপ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু এতটা দূরের কথা মুহূর্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড়ো মতলবী লোক যে আমাদের বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল—মন্মথ কিছু যদি মনে না করিত, তবে আমি বোধহয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথর সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, 'আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সঙ্কল্প করিয়াছি। শুনিয়া সে

একটু চমকিয়া উঠিল, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল, "ভাই, মাপ করো, আমার পাকযন্ত্রের অবস্থা আজ বড়ো শোচনীয়।" হোটেলের খানায় মন্মথর কখনো কোনো কারণে অনভিরুচি দেখি নাই। আজ তাহার অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চয়ই নিতান্তই দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল। কোনো তর্কের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হরিমতিকে আজ আনিতে যাইবে না?" আমি সচকিতভাবে কহিলাম, 'হাঁ, হাঁ, সেকথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ভাই, আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখো, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।" এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

আনন্দের নেশা আমার সর্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথর যে প্রকার ঔৎসুক্য দেখিলাম আমার ঔৎসুক্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না। আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রেয়সী সমাগমোৎকণ্ঠিত প্রণয়ীর ন্যায় মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধূলির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জ্বলিবার সময় হইল এমন সময় একটি রুদ্ধদ্বার পাল্‌কি আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ওই আচ্ছন্ন পাল্‌কিটির মধ্যে একটি অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠিত পাপ, একটি মূর্তিমতী ট্র্যাজেডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গুটিকতক উড়ে বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া সমুচ্চ হাঁই-হাঁই শব্দে অত্যন্ত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্বশরীরে অপূর্ব পুলকসঞ্চার হইল।

আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল, গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া শুনিয়া লইব, কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ সিঁড়ির সম্মুখবর্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়াছিল। এবং গৃহের অপরপ্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগুণ্ঠিতা নারী বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে। তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম 'ভাই আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি। ভাই

লইতে আসিলাম।" মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তখনি সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কৌতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, 'ভাই, তোমার অসুখ করিয়াছে নাকি?' সে কোনো উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুণ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মথর কে হন?" কোনো উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন! তাহার পর কী হইল সকলে জানেন।

এই আমার ডিটেকটিভ পদের প্রথম চোর ধরা।

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেকটিভ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজবিরুদ্ধ না হইতেও পারে।"

মহিম কহিল, 'না হওয়াই সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাক্স হইতে মন্মথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।' বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল—

সুচরিতাসু,

হতভাগ্য মন্মথর কথা তুমি বোধ করি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে যখন কাজিবাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সর্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙিয়া গেছে। তুমি জান কিনা বলতে পারি না, একসময় ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ চেষ্টাও করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষের কর্তারা কোনক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে পাঁচ বৎসর তোমার আর কোনো সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতায় পুলিশের কর্ম লইয়া শহরে বদলি হইয়াছেন, খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই এবং অন্তর্যামী জানেন তোমার গার্হস্থ্যসুখের মধ্যে উপদ্রবের মতো প্রবেশ লাভ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্তী একটি গ্যাসপোস্টের

তলে আমি সূর্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি। তুমি ঠিক সাড়ে সাতটার সময় একটি প্রজ্জলিত কেরসিন ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দক্ষিণদিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর; সেই সময়ে মুহূর্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র যেরূপ দেখিলাম তাহাতে বুঝিতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন সুখের নহে। তোমার প্রতি আমার কোনো প্রকার সামাজিক অধিকার নাই, কিন্তু যে-বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে পরিণত করিয়াছেন তিনিই সে দুঃখমোচনের চেষ্টার ভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্ধা মাপ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যেবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পালকি করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপনকথা বলিতে চাহি, যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি। এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি; আমি ভগবানকে অন্তরে রাখিয়া আশা করিতেছি, সেই পরামর্শমতে চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে।

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে। ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব এবং তোমার চরণস্পর্শতলে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য সুখস্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব। এ আকাঙ্খাও আমার অন্তরে আছে। আর যদি আমাকে বিশ্বাস না কর, তবে সেকথা আমাকে লিখিয়ো। আমি তদুত্তরে পত্রমধ্যে সেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইয়ো, তাহার পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তাঁহাকেই বলিব।

নিত্যশুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার

চিঠি চুরি

পাঁচকড়ি দে

১

যখন শ্রীমান্ অক্ষয়কুমারকে প্রবেশিকার দ্বার-সম্মুখে উপনীত দেখিয়া মা সরস্বতী দুই হস্ত আন্দোলন করিয়া তাহাকে দুই তিনবার বিতাড়িত করিলেন, তখন শ্রীমান্‌ও মা সরস্বতীর প্রতি একেবারে ভক্তিশূন্য হইয়া পড়িল। এবং পড়াশুনা বন্ধ করিয়া প্রায় তিন চারিটি বৎসর বাটীতে বসিয়া অতিবাহিত করিল।

সংসারের ভার দাদার স্কন্ধে ছিল, সুতরাং সংসারের ভাবনা অক্ষয়কে কিছুমাত্র ভাবিতে হইত না। এই তিন চারিটি বৎসর হাসিয়া, খেলিয়া, বেড়াইয়া, গল্প করিয়া তাহার পরম নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

বহুদিন পূর্বে পিতার কাল হইয়াছিল, তখন অক্ষয়ের বয়স আট বৎসর মাত্র। অক্ষয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়কুমার বয়সে অক্ষয়ের অনেক বড়, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশ বৎসর; তিনি তখন চিকিৎসা বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া কিছু কিছু উপার্জন আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে স্নেহে অষ্টমবর্ষীয় শ্রীমান অক্ষয়কুমার লালিত পালিত এবং কথঞ্চিৎ শিক্ষিত হইয়া এখন দ্বাবিংশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের শিক্ষার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ স্কন্ধে কাষ্ঠ স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বলা বাহুল্য, জ্যেষ্ঠ সেজন্য যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন।

যখন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে হস্তপদ ধৌত করিয়া অক্ষয়কুমার উঠিয়া বসিল, তখন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাক্তার বিনয়কুমারেরর পশার এমন অপরিসীম হইয়া উঠিল যে, মস্তক কণ্ডুয়নের অবসরও তাঁহার ঘটিয়া উঠিত না। সুতরাং বেকার অক্ষয়কুমারের সম্বন্ধে কোন চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। দিনে দিনে মাস—মাসে মাসে বৎসর অজ্ঞাতভাবে কাটিতে লাগিল।

কিন্তু শেষে বসিয়া বসিয়া অক্ষয়কুমারের দিন আর কাটে না। যখন বিদ্যালয়ে গমনাগমন ছিল তখন দিনগুলা এত শীঘ্র কাটিয়া যাইত যে, খেলা করিবার সময় না পাইয়া অক্ষয় অতিশয় বিস্মিত হইত। কিন্তু এখন

এক-একটা ঘণ্টাকে দিনের মত দীর্ঘ হইতে দেখিয়া ততোধিক বিস্মিত হইল এবং এখন তাহা তাহার পক্ষে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হইতে লাগিল। তখন অক্ষয়কুমার স্বয়ং এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। প্রথমে রেণল্ডস্-রচিত ইংরাজী উপন্যাসগুলি কিনিয়া কিনিয়া পাঠ করিতে লাগিল, তখন পুনরপি খঞ্জ পায়ে-হাঁটা দিনগুলি যেন অশ্বারোহণে সবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। পড়িয়া পড়িয়া যখন রেণল্ডসে অরুচি ধরিল, তখন চিত্তোত্তেজক ডিটেকটিভ স্টোরী (Detective story) পাঠে মনোনিবেশ করিল। পাঠকালে গল্প লেখকদিগের অদ্ভুত কল্পনার অসাধ্যসাধক ডিটেকটিভদিগের অসম্ভব কার্য-কলাপে অক্ষয়কুমারের মন তন্ময় হইয়া উঠিত। এবং তাহাদিগের আলৌকিক চরিত্র প্রত্যেক পৃষ্ঠায় অক্ষয়ের হৃদয়ে অতুল মহিমময় ও গৌরবময় বলিয়া অনুভূত হইত। তখন নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করিতে তাহাকে আর বিশেষ চেষ্টা করিতে হইল না। মনে মনে স্থির করিল, যেমন করিয়া হউক, পুলিশ বিভাগে ঢুকিতে হইবে।

২

যখন মনের এই আগ্রহটা একান্ত অদম্য হইয়া উঠিল, তখন অক্ষয়কুমার দাদাকে সুযোগমত নিরিবিলি পাইয়া, তাঁহার নিকট অত্যন্ত উৎসাহের সহিত প্রস্তাব করিল ; এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিল।

দাদা বিনয়কুমার প্রথমে সাতিশয় বিস্ময়ের সহিত কথাটা শুনিলেন এবং ভ্রাতার মুখের দিকে ক্ষণকাল আকুলভাবে চাহিয়া রহিলেন। এমন কি, তখন তাঁহার নিজের চক্ষু কর্ণকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি রহিল না। অনেকক্ষণ পরে কহিলেন, "অকু, কি হইয়াছে বল্ দেখি? ডিটেকটিভদের কথা কি বলিতেছিস্?"

দাদার মুখের ভাব দেখিয়া মনের ভাব বুঝিতে অক্ষয়ের কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। জড়িত কণ্ঠে কহিল, "মনে করিতেছি, ডিটেকটিভের কাজ করিব—কতদিন আর বসিয়া বসিয়া কাটাইব?"

এবার দাদা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, "ডিটেকটিভের কাজ? আমার ভাই হইয়া তুই পুলিশে কাজ করিবি?"

অক্ষয় মৃদুহাস্যে বলিল, "হুঁ, আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, আপনি কি বলেন?"

দাদা কিছুই বলিলেন না। স্তম্ভিতবৎ তাহার মুখের দিকে অবাঙ্‌মুখে চাহিয়া রহিলেন। দাদাকে সেইরূপভাবে নিজের দিকে চাহিতে দেখিয়া অক্ষয়কুমার বলিতে লাগিল, "দেখুন দাদা, আমি যদি বেশ কাজের লোক হইতে পারি, এ কাজে বেশ উপায় আছে। এমন কি, তাহা হইলে পুলিশের কাজ ছাড়া বাহির হইতেও দুই-একটা সন্ধান সুলভের কাজ মধ্যে সংগ্রহ করিয়া বেশ উপায় করিতে পারিব, এমন মনে হয়। তাছাড়া আর কি করিব? এই ত কতদিন বাড়ীতে বসিয়া রহিয়াছে, নিজের তেমন টাকা নাই যে, কোন একটা ব্যবসা করিব আর আমি যেরূপ কাজের লোক, আপনি তাহা সবিশেষ জানেন; তাহাতে কোন ব্যবসায়ের জন্য যে আপনি আমাকে কিছু টাকা বিশ্বাস করিবেন, সে বিশ্বাস আমার আদৌ নাই। যাই হোক, ডিটেকটিভগিরি কাজের জন্য আমার মনে অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছে—যাহার যে কাজে বিশেষ আন্তরিকতা এবং আগ্রহ থাকে, সে অধিকাংশ স্থলেই সেই কাজে যথেষ্ট উন্নতি করিতে পারে। আমারও মনে হয়, একদিন হয়ত আমিও মাথা তুলিয়া উঠিতে পারিব।"

বিনয়কুমার কহিলেন, "বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া তোর মাথা যেরূপ বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছে দেখিতেছি, তাহাতে ও মাথা আর কোন কালে খুলিবে না। নতুবা আমার ভাই হইয়া তোর এমন নীচ প্রবৃত্তি! তোর মনের যে এমন একটা দুর্গতি হবে, তা আমি স্বপ্নেও একবার ভাবি নাই।"

অক্ষয়কুমার বিষণ্ণভাবে কহিল, "তবে দাদা, আপনি যদি—"

বাধা দিয়া হস্ত ও মস্তক যুগপৎ আন্দোলন করিয়া দাদা বলিলেন, "এখন যা, এখন যা—আর কোন কথা শুনতে চাই না, আর কোন কথা নয়।" এই বলিয়া ডাক্তার বিনয়কুমার একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র টানিয়া লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন; আর কোন কথা না কহিয়া অক্ষয়কুমার ধীরে ধীরে নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া গেল।

ভাই তাহার যখন একবার 'না' বলিয়াছেন, তখন দৈবানুগ্রহ ব্যতিরেকে 'হ্যাঁ' হইবার সম্ভাবনা একেবারে নাই।

৩

পরদিন সায়াহ্নে অক্ষয়কুমার বেড়াইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় পুরাতন ভৃত্য বৃদ্ধ বংশী আসিয়া সংবাদ দিল, "বড়বাবু আপনাকে একবার ডাকিতেছেন। তিনি বাহিরের ঘরে আছেন?"

অক্ষয়কুমার কহিল, "হঠাৎ আমাকে ডাক পড়িল কেন ? কি হইয়াছে ?"

বংশী কহিল, "কি জানি কি হইয়াছে, বাবু, তিনি রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন।"

অক্ষয়কুমার কহিল, "দাদার রাগের কথা আমি বেশ জানি, একটা কিছুতেই বাড়ী মাথায় করিতে থাকেন। আচ্ছা, আমি এখনই যাইতেছি।"

অক্ষয়কুমার তাড়াতাড়ি দাদার সহিত দেখা করিতে চলিল এবং যেমন সে দ্বিতলের সোপানাবতরণ আরম্ভ করিয়াছে, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ডাক্তার বিনয়কুমারের একমাত্র পুত্র দশম-বর্ষীয় সুশীল এক হাতে কাকার জামা টানিয়া ধরিল। তাহার অপর হাতে একটা প্রকাণ্ড লাটাই ও একখানা তদধিক প্রকাণ্ড ঘুড়ী। ঘুড়ীখানার দুই-এক জায়গায় ছিঁড়িয়া গিয়াছে—সংস্কার প্রয়োজন।

নৃত্যভঙ্গী সহকারে সুশীল আবদার করিয়া বলিতে লাগিল, "কাকাবাবু, আমার ঘুড়ী উড়িয়ে দেবে, এস না, মা আমার ঘুড়ী ছিঁড়ে দিয়েছে, তুমি চল না, কাকাবাবু, আমার ঘুড়ী উড়িয়ে দেবে।

অক্ষয়কুমার প্রবোধ দিয়া বলিল, "তাইত, আজ একবার ঘুড়ী উড়াইতে হইবে বই কি। কিন্তু এখন নয়, এখন ছাদে বড় রোদ।" বলিতে বলিতে সবেগে অক্ষয়কুমার সিঁড়ি হইতে নামিয়া গেল।

তাড়াতাড়ি দাদার ঘরে গিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে অক্ষয়কুমার সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে, আজ একটা কিছু বেশি রকমের দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, দাদা একবার চেয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছেন, একবার টানিয়া বসিতেছেন, উঠিয়া বসিয়া কিছুতেই তিনি চিত্ত স্থির করিতে পারিতেছেন না।

দাদাকে অক্ষয়কুমার যেমন অতিশয় ভক্তি করে, তেমনি আবার তদপেক্ষা ভয়ও করে। দাদার সেইরূপ ভাব দেখিয়া সে প্রথমে কথা কহিতে পারিল না। তাহার পর কিছু সাহস সংগ্রহ করিয়া বলিল, "বংশীর মুখে শুনিলাম, আপনি আমাকে ডাকিয়াছেন।"

বিনয়কুমার কহিলেন, "হাঁ, হাঁ, তাহাই বটে, তা এত দেরি হইল ? বড়ই আশ্চর্য্যব্যাপার অক্ষু, বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার! কেবল আশ্চর্য ব্যাপার নয়, একেবারে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, এই টেবিলের উপরে একখানা কাগজ

—কাগজ কেন? একখানা গোপনীয় চিঠি রাখিয়াছিলাম। সেখানা এখন কোথায় গেল, কিছুতেই খুঁজিয়া পাইতেছি না।"

"কখন্ রাখিয়াছিলেন?"

"এইমাত্র।"

"দাদা, আমি আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।"

"কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতেছি।" বলিয়া বিনয়কুমার বলিতে লাগিলেন, "কাল তুই ডিটেকটিভগিরি কাজ শিখিবার জন্য আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলি, আজ থেকে আমার সেই চিঠিখানার ডিটেকটিভগিরি কর দেখি। তোর মনে ধারণা, পুলিশের কাজে তুই মাথা তুলিয়া একজন বেশ পাকা নামজাদা ডিকেটটিভ হইতে পারিবি; আজ আমার চিঠিখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিলে তোর সে ধারণা যে কতদূর সত্য, বেশ বুঝিতে পারিব। আর তোর বিদ্যাবুদ্ধির কতদূর দৌড়, জানা যাইবে।"

অক্ষয়কুমার অভিনিবেশ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ক্ষণকাল দাদার মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিল, তাঁহার তখনকার সে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা মিথ্যা নহে। বরং তিনি তাহা ঢাকিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

বিনয়কুমার বলিলেন, "ঝি আমাকে ডাকিতে আসিলে, পত্রখানা টেবিলের উপর রাখিয়া একবার বাড়ীর ভিতরে উঠিয়া গিয়াছিলাম।"

অক্ষয়কুমার। পত্রখানিতে কি লেখা ছিল?

বিনয়কুমার। যাহাই লেখা থাকুক না কেন, সে কথার দরকার কি? বিশেষ গোপনীয় পত্র, যে লোকের পত্র সে কিংবা আমি ছাড়া আর কাহারও নজরে যদি সে পত্রখানা পড়ে, তাহা হইলে আমাকে ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইবে। এমন কি তাহা হইলে আমার মান-সম্ভ্রম আর কিছুতেই থাকবে না, একেবারে সকল দিকে সর্বনাশ ঘটিবে।

অক্ষয়কুমার। কে আপনাকে সে পত্র লিখিয়াছেন?

বি। কেহ লেখেন নাই—আমিই কোন লোককে লিখিতেছিলাম। লিখিয়া প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিলাম, এমন সময় ঝি মাগী আমাকে ডাকিতে আসিয়া এই গোল বাধাইয়া দিল।

অ। কোন্ ঝি আপনাকে ডাকিতে আসিয়াছিল?

বি। মঙ্গলা। তাহার উপর সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখি না। আমি যখন এখান হইতে উঠিয়া যাই, তখন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে উপরে

গিয়াছিল। উপরের শোবার ঘরে এখনও সে কাজ করিতেছে—নীচে নামে নাই।

অ। কতক্ষণ আপনি এখানে অনুপস্থিত ছিলেন?

বি। দশ মিনিট, দশ মিনিট? দশ মিনিটও হবে না। সেই পত্রখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া গিয়াছিলাম বলিয়া আমি আরও তাড়াতাড়ি এই ঘরে ফিরিয়া আসি।

অ। যাইবার সময়ে কি আপনি দরজা বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন?

বি। হ্যাঁ। ফিরিয়া আসিয়াও আমি সেইরূপ বন্ধ থাকিতে দেখিয়াছিলাম।

অ। পত্রখানা ছাড়া কি আর কোন জিনিস চুরি গিয়াছে?

বি। আর কিছু না, আর কোন জিনিসে কেহ হাত দেয় নাই। এমন কি টেবিলের উপরে যেখানে যে জিনিসপত্র যেমন ভাবে থাকিতে দেখিয়া গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিয়া ঠিক তেমনই দেখিয়াছি?

অ। টেবিলের উপর ঠিক কোন্ স্থানে আপনার চিঠিখানা ছিল?

বি। ব্লটিং প্যাডের উপরে ছিল। মঙ্গলা যখন আমাকে ডাকিতে আসে, তখনও আমি লিখিতেছিলাম, যাইবার সময় ব্লটিং প্যাডের উপর চিঠিখানা চাপিয়া, উঠিয়া যাই।

অ। আপনি বেশ জানেন যে, উঠিয়া যাইবার সময়ে চিঠিখানা ব্লটিং প্যাডের উপর চাপিয়া গিয়াছিলেন?

বি। না, সেকথা আমি এখন ঠিক বলিতে পারি না। আমার এখন ঠিক তাহা মনে পড়িতেছে না।

অ। মঙ্গলা কি আপনাকে সেই চিঠি লিখিতে দেখিয়াছিল?

বি। দেখিয়াছিল; সে যখন ঘরের ভিতরে আসিয়াছিল, তখন সে অবশ্যই দেখিয়াছিল। কিন্তু আমি কি লিখিতেছি, কি না লিখিতেছি, সে কি করিয়া জানিবে? আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহার উপর সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

অ। আমি তাহাকে সন্দেহ করিতেছি না। আপনি যে এরকম একটা গোপনীয় চিঠি এ সময়ে লিখিবেন, সে কথা বাড়ীর আর কেহ জানেন?

বি। কেহ না—কেহ না—জনপ্রাণীও না। বলিতে বলিতে ডাক্তার বিনয়কুমারের উদ্বেগ ক্ষোভ যুগপৎ সীমাতিক্রম করিয়া উঠিল, "যেমন করিয়া

হউক, পত্রখানি তোকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে। এমন বিপদে আমি আর কখনও পড়ি নাই। তোর উপরই চিঠিখানার সন্ধান করিবার ভার রহিল।"

অ। দাদা, আপনি আমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। আপনার সে চিঠিখানার একটা প্রতিকার না করিয়া আমি ছাড়িব না। এখন বলুন আপনি, যখন এখানে আপনি অনুপস্থিত ছিলেন, তখন আর কোন লোক কোন কারণে এ ঘরে ঢুকিয়াছিল কিনা, সে সন্ধান লইয়াছেন কি?

বি। সে সন্ধান আমি আগেই লইয়াছি। বংশীকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, আমি খুব জানি বাবু, আপনার ঘরে আর কেহ যায় নাই।"

অ। বংশী আর কি বলিল?

বি। আর কিছু নয়। কেন, তাহার উপর কোন সন্দেহ হয় না কি?

অ। না, তাহাকে আমি সন্দেহ করিতেছি না, বংশীকে আমি খুব ভাল জানি। সে আমাকে বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। কিন্তু সে কিরূপে এমন নিশ্চয় করিয়া বলিল যে, আপনার এঘরে তখন আর কেহ প্রবেশ করে নাই।

বি। তখন সে এই সামনের ঘরে কাজ করিতেছিল। আমার ঘরে ঢুকিলে সে অবশ্যই তাহাকে দেখিতে পাইত। বিশেষতঃ এ ঘরের দরজাটা ঠেলিয়া খুলিবার সময় একপ্রকার শব্দও হয়।

অ। তাহা যেন হইল। কিন্তু দরজা দিয়া না আসিয়া কেহ যদি জানালা দিয়া আসিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

বি। জানালা এখন যেমন খোলা আছে, তখনও এমনি খোলা ছিল। জানালা দিয়া কেহ আসে নাই। জানালাগুলি অনেকদিনের পুরাতন হইলেও গরাদগুলি এখনও বেশ মজবুত আছে।

অক্ষয়কুমার তথাপি নিজে একবার প্রত্যেক গরাদটি পরীক্ষা করিয়া দেখিল—দাদার কথা সত্য।

অনন্তর অক্ষয়কুমার দাদার নিকটে ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সেই সময় উপরিস্থিত কোন একটি দ্রব্যের উপর তাহার নজর পড়িল। চকিতে সেইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'এ কি এ?'

বিনয়কুমার সেইদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, টেবিলের এক পার্শ্বে গঁদ বা তৈলের মত কি একটু লাগিয়া রহিয়াছে। বলিলেন, "কি জানি বলিতে পারি না। যখন আমি উঠিয়া যাই, কই, তখন ইহা ছিল না। বোধহয়, কোন আঠা হইবে।"

অক্ষয়কুমার অবনত দেহে ভূন্যস্তজানু হইয়া সেই তৈলবৎ পদার্থ বিশেষ বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে উঠিয়া বলিল, "দাদা আপনার কথাই ঠিক, গঁদের আঠা। এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, কিরূপে আপনার পত্র চুরি গিয়াছে। বাঁখারিতে গঁদের আঠা মাখাইয়া কেহ জানালার বাহির হইতে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়াছে। হয়ত কোন লোকের পরামর্শে কেহ এই কাজ করিয়া থাকিবে?"

বিনয়কুমার নির্নিমেষ নেত্রে ক্ষণেক নীরবে অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিয়া পরে বলিলেন, "কে এমন কাজ করিবে? কাহাকে তোমার সন্দেহ হয়? সেই চিঠিখানাই যে, ঠিক সেই সময়ে টেবিলের উপর পড়িয়া থাকিবে, সে কিরূপেই বা জানিতে পারিল? এমন অনেকদিন অন্যান্য পত্রও ত টেবিলের উপর পড়িয়া থাকে। আজ আমি ঠিক ঐ চিঠিখানাই লিখিব। লিখিতে লিখিতে হঠাৎ ফেলিয়া উঠিয়া যাইব, এ সকল কে আগে জানিতে পারিবে? একথা ঠিক নহে।"

অক্ষয়কুমার কহিল, "আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা ঠিক। সে যাই হোক, যেমন করিয়া পারি, আমি আপনার চিঠিখানি সন্ধান করিয়া বাহির করিবই; আপনার কি বেশ মনে হয় যে, আপনি এই টেবিলের উপরেই চিঠিখানি ফেলিয়া গিয়াছিলেন?"

বিনয়কুমার বলিলেন, "হাঁ, আমার এখন মনে পড়িতেছে যেন যাইবার সময়ে আমি তাড়াতাড়ি চিঠিখানা ব্লটিংপ্যাডের উপর দুই একবার উল্‌টাইয়া চাপিয়া রাখিয়া যাই।"

অক্ষয়কুমার কিছুক্ষণ নীরবে কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর বলিল, "যদি আমি আপনার চিঠিখানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া দিই, দাদা, আমাকে আপনি কি পুরস্কার দিবেন, বলুন দেখি? সে চিঠি কেহ পড়ে নাই, আপনি ভিন্ন আর কেহ তাহার মর্ম জানিবে না, এইরূপ অবস্থায় সে পত্র আপনি ফিরিয়া পাইবেন।"

বিনয়কুমার বলিলেন, "তাহা হইলে তুই জানিস্ সে চিঠিখানা কোথায়?"

অক্ষয়কুমার বলিল, "কিছুই না। আপনার মত আমি এখন অন্ধকারে আছি। তথাপি আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব, আপনার এই অপহৃত পত্রের পুনরুদ্ধারের ভার আমার উপরেই রহিল। যদি আমি আপনাকে আমার ডিটেকটিভ বুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতে পারি, বলুন, আপনি কি পুরস্কার দিবেন? আমি আর কোন পুরস্কার চাই না। বলুন, আমাকে পুলিশ লাইনে ঢুকিতে আপনি সম্মতি দিবেন?"

বিনয়কুমার অপরিসীম আগ্রহের সহিত বলিলেন "তাহাই হইবে; সেই চিঠির মর্ম আর কেহ না জানিতে পারে, এমন অবস্থায় যদি তুই চিঠিখানি আনিয়া আমার হাতে দিতে পারিস, তাহা হইলে আমি যে তোকে কেবল পুলিশ-কর্মচারী হইতে সম্মতি দিব—তা নয়, তোর এই ডিটেকটিভগিরির ফী: বা পারিশ্রমিক স্বরূপ তোকে আরও আড়াইশত টাকা দিব। খুব ডিটেকটিভ বই কিনিবি। দেখি, তোর ডিটেকটিভ বুদ্ধির দৌড় কত!"

"আমিও দেখি আপনার পত্রখানার কোন কিনারা করিতে পারি কি না।" এই বলিয়া অক্ষয়কুমার গমনোদ্যত হইল।

বাধা দিয়া বিনয়কুমার বলিলেন, "তাড়াতাড়ি কোথায় যাইতেছিস্—সে চিঠি কোথায় আছে?"

অক্ষয় উপন্যাসের ডিটেকটিভদের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক গম্ভীরভাবে কহিল, "এখন আমার কাছে কোন কথা পাইবেন না, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করিবেন; যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তখন সকল কথাই আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া বলিব।" বলিতে বলিতে অক্ষয়কুমারের প্রস্থান।

অক্ষয়কুমার চলিয়া গেলে, তাহার দাদা অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই অপহৃত পত্রের সন্ধানে বহু ইতস্ততঃ করিলেন। কোন ফল হইল না। ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরের বাহির হইয়া দ্বারে চাবি লাগাইলেন এবং বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তৎপরে বিনয়কুমার বিশ্রামার্থ শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন, তাহার গৃহিণীর বাক্যসুধাবর্ষণে তাঁহার উদ্বিগ্নহৃদয় অনেকটা পরিমাণে আপাততঃ প্রকৃতিস্থ হইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে বিনয়কুমার শয়নগৃহ হইতে বাহির হইলেন। এবং সেই সময়ে বংশীকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া—যেন বংশী আজন্ম বধির, এমন অপরিমিত উচ্চকণ্ঠে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, "কিরে বংশী, ছোটবাবু গেল কোথা রে?"

বংশী বলিল, "কৈ বাড়ীতে নাই, বোধহয় বাহিরে গেছেন।"

বিনয়কুমার বিরক্ত হইয়া পূর্ববৎ কণ্ঠে কহিলেন "বাহিরে কোথায় ?"

বংশী কহিল, "তা বাবু, আমি ঠিক বলিতে পারি না, এই কতক্ষণ আগে তিনি বাহির বাড়ীর উঠানে বেড়াইতেছিলেন।"

বিনয়কুমার ভিতরবাটী হইতে পুনরপি বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলেন। ঘরের ভিতর সকল স্থান তন্নতন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে, সুতরাং পত্রের সন্ধানে পরিশ্রম স্বীকারের আর তিনি কোন আবশ্যকতা দেখিলেন না। একখানা চেয়ারের উপর করতল লগ্নশীর্ষ হইয়া বসিলেন এবং আপন মনে বলিতে লাগিলেন, "কি আপদ, আমি অক্ষুর কথায় নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত আছি, আমার মত নির্বোধ আর দুটি নাই। যে চিঠি চুরি করিয়াছে, সে এতক্ষণে তিনক্রোশ তফাতে চলিয়া গিয়াছে। কি সর্বনাশ! চিঠিখানির জন্য আমার মানসম্রম সকলই নষ্ট হইবে, দেখিতে পাই। যেমন করিয়া হোক্‌, চিঠিখানি আমার পাওয়া চাই। কি করি, আর নিশ্চিন্তে থাকিলে চলিবে না। এখনই আমি একজন ভাল ডিটেকটিভের জন্য টেলিগ্রাফ করিব।" এমন সময়ে বাহিরে কাহার পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। মাথা তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে ওখানে ?'

"আমি।"

বিনয়কুমার চাহিয়া দেখিলেন, সম্মুখে ঈষদুন্মুক্ত দরজায় কড়ার উপর হাত রাখিয়া অক্ষয়কুমার দাঁড়াইয়া। দেখিয়া বিনয়কুমার আরও বিরক্ত হইলেন। বলিতে লাগিলেন, "দেখ্‌, অক্ষয়, আমি এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি, তোর কথার উপর নির্ভর করিয়া আমি ভাল কাজ করি নাই। ব্যাপারটা বড় সহজ নহে, এমন কি চিঠিখানা যদি না পাওয়া যায়, আমার মানসম্রম সকলই যাইবে। আমি লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না। তোর নিজের অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তির উপর আমার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি, সে সম্বন্ধে কোন কথা তোর কাছে এখন প্রকাশ করিয়া আমি তোকে নিরুদ্যম করিতে চাহি না। আমি মনে করিতেছি কোন একজন ভাল ডিটেকটিভের জন্য টেলিগ্রাফ করিব।"

সেই সময়ে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যের সহিত অক্ষয়কুমার বলিল, "মন্দ কি দাদা, আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন, তাহাই করিবেন। কিন্তু আমি জানিতে চাই, আপনি সেই চিঠিখানা পাইবার পূর্বে না পরে টেলিগ্রাফ করিবেন ?"

"এ আবার কি কথা—আমি বুঝিলাম না।"

"প্রকৃত কথা—সেই চিঠিখানা পাওয়া গিয়াছে।"

"পাওয়া গিয়াছে! সত্য না কি!" বলিতে বলিতে বিস্ময়স্তম্ভিত বিনয়কুমার চেয়ারে বসিয়াছিলেন, আরও বসিয়া গেলেন। তাহার পর একেবারে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কৈ সে চিঠি? কে চুরি করিয়াছিল? অক্ষয়কুমার কহিল, "আপনার চিঠি আপনি নিজে চুরি করিয়াছিলেন।" "আমি চুরি করিয়াছি! অকু, এখন আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, পূর্বজন্মকৃত মহাপাতকের ফলেই আমি তোর দাদা হইয়াছি। তুই আমার সামনে দাঁড়াইয়া আমার অপমান করিস।" বলিতে বলিতে অতি দুঃখিতভাবে বিনয়কুমার একখানা চেয়ার টানিয়া পুনরুপবেশন করিলেন।

অক্ষয় কহিল, "দাদা, আপনি আমার উপর রাগ করিবেন না, আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।"

বিনয়কুমার আরও রাগিয়া উঠিয়া, রাগে-দুঃখে মহা খাপ্‌পা হইয়া বলিলেন, "আমি চোর? তুই আমার সামনে থেকে এখনই স'রে যা।" মুখভঙ্গী সহকারে "সত্য কথা বলিয়াছি" স'রে যা, চালাকি করিবার জায়গা নাই বটে, তুই না আমার সহোদর ভাই! ভাল, সে চিঠি যদি পাওয়া গিয়াছে, কৈ, নিয়ে আয় দেখি।"

"এই দেখুন আপনার সেই চিঠি।" বলিয়া অক্ষয়কুমার দরজাটা সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত করিয়া বলিল, "সুশীল, একবার আমার সঙ্গে ঘরের ভিতর এস ত।"

সুশীল এতক্ষণ বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল। এখন অক্ষয়কুমারের সহিত সে সভয়ে পিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার বামহস্তে একটা মস্ত লাটাই, এবং দক্ষিণ হস্তে তেমনি এক প্রকাণ্ড ঘুড়ি, এবং সেই প্রকাণ্ড ঘুড়িখানার তদধিক প্রকাণ্ড একটা লেজুড় ভূলুণ্ঠিত হইতেছে। অক্ষয়কুমার তাহার হাত হইতে ঘুড়িখানা লইয়া দাদার সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "এই দেখুন, আপনার সেই পত্র।"

তাড়াতাড়ি চশমাখানি চোখে লাগাইয়া বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে ঘুড়ির দিকে চাহিতে চাহিতে বিনয়কুমার বলিলেন, "কৈ কৈ সে পত্র?"

"এই যে, দেখিতে পাইতেছেন না?" অক্ষয়কুমার ঘুড়িখানি দাদার টেবিলের উপর ফেলিয়া দুইপদ পশ্চাতে হটিয়া দাঁড়াইল। অক্ষয়কুমারের ভয়

হইয়াছিল এইবার বুঝি সবেগে দাদার রুলটা তাহার মাথায় সশব্দে আসিয়া পড়ে। নিতান্ত নিরীহ দাদার রুল অনেকবার তাহার মাথায় পড়িয়াছে। কিন্তু দাদা আপাততঃ তাহা করিলেন না এবং ঘুড়ির দিকে চাহিয়াও দেখিলেন না। নিতান্ত মর্মভেদী কণ্ঠে বলিলেন, "দেখ অকু, তুই মনে নিশ্চয় জানিস্, অপরাপর লোকের ন্যায় তোর দাদারও সহ্যগুণের একটা সীমা আছে।"

অক্ষয়কুমার বলিল, "আপনার সহ্যগুণের সীমা আছে কিনা, তাহাতে আমার কোন আবশ্যকতা নাই। আমি আপনাকে মিথ্যা বলি নাই।" অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া—"ঐ দেখুন, আপনার সেই পত্র রহিয়াছে। সুশীলের ঘুড়ির যে লম্বা লেজুড় দেখিতেছেন—সুশীলের প্রতি,—"ঘুড়িটায় লম্বা লেজুড় লাগাইয়া দিলে ঘুড়িখানা কোনদিকে কান্নিক না টলিয়া বেশ উড়িতেছিল, না সুশীল? পুনরপি দাদার প্রতি—"সুশীল কাগজের লম্বা ফালিতে ঘুড়ির প্রকাণ্ড লেজুড় তৈয়ারি করিয়াছে, আপনি নীচের দিক্‌কার আধখানা লেজুড় কাটিয়া নিন। তাহা হইলেই আপনি আপনার সেই চুরি যাওয়া পত্রখানা দেখিতে পাইবেন।"

বিনয়কুমার কহিলেন, "আর চালাকি করিতে হইবে না, তুই যা, আর আমার রাগ বাড়াসনি।"

অক্ষয়কুমার কহিল, "আপনি না কাটেন, আমি কাটিয়া দেখাইতেছি। পত্রখানা যে এখনও কেহ পড়ে নাই, আপনি নিজে কাটিয়া দেখিলে তাহা বুঝিতে পারিবেন বলিয়া আমি ঘুড়ি এবং ঘুড়ির মালিককে শুদ্ধ আপনার সম্মুখে আনিয়াছি, নিজে কাটিতে সাহস করি নাই। এখন আপনার সম্মুখে আমি কাটিলে তেমন কোন দোষ হইবে না।"

দশ-বার টুকরা কাগজের সরু সরু ফালিতে সুশীল সুতার গাঁট দিয়া দিয়া তাহার ঘুড়ির মস্তবড় লেজুড় তৈয়ারী করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার সেই লেজুড়ের নীচে দিক্‌কার অনেকটা অংশ কাটিয়া লইয়া সহাস্যমুখে দাদার হাতে দিল।

বিনয়কুমার সেই ঘুড়ির ছিন্ন লেজুড়টা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিতে লাগিলেন, 'তাইত—তাইত—এ যে আমারই—" তখন তাঁহার মনের যেরূপ অবস্থা হইল, তাহা মুখে তিনি কিছুতেই প্রকাশ করিতে পারিলেন না—বলিতে বলিতে থামিয়া গেলেন। ক্ষণেক পরে সুশীলের প্রতি গর্জন করিতে করিতে চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "পাজী ছেলে! এই চিঠিতে তুই হাত দিতে গিয়েছিলি কেন?"

অক্ষয়কুমার তাড়াতাড়ি দাদাকে ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "সুশীলের উপর আপনি কেন রাগ করিতেছেন। সুশীল আপনার পত্র চুরি করে নাই। আপনি স্থির হইয়া বসুন—যাহা ঘটিয়াছে, সমুদয় আপনাকে বুঝাইয়া বলিতেছি।" বলিয়া সুশীলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "সুশীল, এই তোর ঘুড়ি নে। তুই এখন এখান থেকে যা। আমি একটু পরে গিয়ে তোর ঘুড়ির আবার একটা এর চেয়ে খুব বড় লেজুর করিয়া দিব।"

অক্ষয়কুমারের মুখের কথা শেষ হইতে-না-হইতে সুশীলচন্দ্র তাহার অগ্নিশর্মা পিতার ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সে এখনও নিজের ভয়ের কারণ ভালরকম বুঝিতে না পারিলেও, পিতার রুদ্রচণ্ডী মূর্তি দেখিয়া যথেষ্ট ভীত হইয়াছিল। পলায়নপর সুশীলচন্দ্র দৃষ্টি বহির্ভূত হইয়া গেলে, তাহার পিতা সেই পত্রের ছিন্ন টুকরাগুলি লইয়া অতি সন্তর্পণে নীরবে পরপর সাজাইতে লাগিলেন। মানসিক আনন্দাতিশয্যে তখনও কোন কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

দাদাকে নীরব দেখিয়া অক্ষয়কুমার কহিল, "দাদা, এখন বোধ হয়, আমি আপনার নিকট আমার প্রাপ্য পুরস্কার দাবী করিতে পারি।

দাদা কহিলেন, "অবশ্য, আমি আরও আড়াইশত টাকা বেশি দিব।" এই বলিয়া ড্রয়ারের ভিতর হইতে একখানা চেক্-বুক টানিয়া বাহির করিলেন এবং চেক লিখিবার জন্য এক কলম কালি লইয়া প্রস্তুত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ পত্র যে কেহ পড়ে নাই, তাহা কিরূপে আমি বিশ্বাস করিব?'

অ। আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, কেহই আপনার এ পত্র পড়ে নাই। যখন আমি প্রথম এ পত্রের সন্ধান পাইলাম, তখন দেখি, ইহা আকাশমার্গে বিরাজ করিতেছে। আমি জানি, আমি যে আপনার বিনানুমতিতে কোন কাজ করি না, সে বিশ্বাস আপনার খুব আছে। সুতরাং আমার সম্বন্ধে আপনাকে কোন কথা বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ সুশীল যেরূপভাবে পত্রখানি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াছে, তাহাতে পুনরায় ঠিক করিয়া জুড়িয়া না লইলে এ পত্র কাহারও পাঠযোগ্য হইতে পারে না। সেইজন্য আমি ঘুড়িশুদ্ধ ঘুড়ির মালিককে আনিয়া আপনার কাছে হাজির করিয়া দিলাম। সে কথা যাক্; যখন আপনার মুখে প্রথম শুনিলাম যে, আপনি আজ এই পত্রখানি লিখবেন, তাহা কেহই জানে না, তখন আমি বুঝিতে পারিলাম, আপনি উঠিয়া গেলে আপনার এ পত্র চুরি করিবার জন্য জানালা বা দরজা দিয়া কেহই ঘরের

ভিতরে আসে নাই। এরূপস্থলে এ চুরির জন্য আপনিই একমাত্র দায়ী, আর কেহ নহে।

"তবে কি ভূতে চুরি করিতে আসিয়াছিল?"

অক্ষয়কুমার বলিতে লাগিল, "তাহার পর যখন টেবিলে ঐ গঁদের দাগ দেখিতে পাইলাম, আপনার পত্রখানি কিরূপে অদৃশ্য হইয়াছে, তখন সেটা আর আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।"

বি। কিন্তু আমি ত এখনও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।

অ। না পারিবারই কথা। কথাটা অতি সহজ। এখন যাহা আপনার ভোজবাজির মত নিতান্ত বিস্ময়জনক বোধ হইতেছে, কিন্তু ব্যাপারটা শুনিলে ইহাতে বিস্ময়ের বিন্দুমাত্র দেখিবেন না। ইতিপূর্বে আমি আপনার আলমারীতে গঁদের এই ভাঙা-ফাটা শিশটা দেখিতে পাই। এই দেখুন, শিশির এই ফাটা মুখ দিয়া ঝরিয়া অনেকটা গঁদ আলমারীতেও পড়িয়াছে।

বি। হাঁ, হাঁ ঠিক বটে, ঐ আলমারী হইতে তখন ঐ রিপোর্ট বইখানা বাহির করিতে যাই। শিশিটা আমরা পায়ের উপর পড়িয়া যায়। কিন্তু শিশিটা যে ফাটিয়া গিয়াছে, ব্যস্ত থাকায় তখন আমি তাহা অত লক্ষ্য করি নাই।

অক্ষয়কুমার কহিল, "তাহাই হইবে। যাই হোক্, তাহার পর টেবিলের উপরও এই গঁদের দাগ দেখিয়া আমি বুঝিতে পারিলাম, যখন আপনি রিপোর্ট-বইখানা আলমারী হইতে টানিয়া বাহির করিতেছিলেন, সেই সময়ে হউক বা পরে যখন উহা পুনরায় যথাস্থানে রাখিতে যান, ঐ গঁদ আপনার কামিজের আস্তানায় লাগিয়াছে, আপনি তাহা কিছুই জানিতে পারেন নাই।"

এই বলিয়া অক্ষয়কুমার দাদার কামিজের দক্ষিণ হস্তের আস্তিনটা ঘুরাইয়া দিলে বিনয়কুমার দেখিলেন, বাস্তবিক তাহাই বটে।

অক্ষয়কুমার বলিতে লাগিল, "তাহার পর যখন আপনি চিঠিখানি ব্লটিং প্যাডের উপর উল্টাইয়া দুই-একবার ডান হাত দিয়া চাপিয়াছিলেন, সেই সময়ে চিঠিখানা আপনার জামার আস্তিনের গঁদে লাগিয়া যায়। এবং বাড়ীর ভিতরে যাইবার জন্য আপনি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়েন, সেজন্য চিঠিখানার উপর তখন আপনার নজর পড়ে নাই। তখন আমি মনে করিলাম, আপনার অজ্ঞাতসারে আস্তিন হইতে চিঠিখানা কোথায় খুলিয়া পড়িয়াছে, সন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে। এই ঘরের ভিতরে যখন চিঠিখানা

পড়ে নাই, তখন অবশ্যই বাহিরে কোনস্থানে পড়িয়া থাকিবে। দ্বিতলে উঠিবার পূর্বেই চিঠিখানা আস্তিন হইতে খুলিয়া পড়াই সম্ভব। কেন না, দ্বিতলে উঠিলে বউদিদি অবশ্যই চিঠিখানা আপনাকে দেখাইয়া দিতেন। তাহার পর আমি ইতস্ততঃ করিতে করিতে দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ির নীচে কতকগুলা কাগজের টুকরা দেখিতে পাইলাম। তন্মধ্যে আপনার চিঠির মত কিছু দেখিতে পাইলাম না। তখন সহসা সুশীলচন্দ্রের কথা মনে পড়িল। তাহার ঘুড়ি উড়িতে চায় না দেখিয়া সে বিব্রত হইয়াছিল এবং আমাকেও সেজন্য একবার বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। অবশ্যই সে আপনার পত্রখানিতে তাহার ঘুড়ির লেজুর করিয়া থাকিবে মনে করিয়া আমি তাহার সন্ধানে ছাদের উপরে উঠিলাম। উঠিয়া দেখিলাম, এক দীর্ঘ লেজুর লইয়া সুশীলচন্দ্রের ঘুড়ি আকাশে নিঃশব্দে বিচরণ করিতেছে। তাহার পর ঘুড়িখানা নীচে নামাইয়া আনিয়া দেখি, যাহা সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিয়াছে। তখন আমি সলাঙ্গুল-ঘুড়ি লাটাই-সমেত সুশীলকে আপনার কাছে লইয়া আসিলাম। আপনার চিঠিখানা যে আর কেহ পড়ে নাই, এখন বোধ করি, আপনি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবেন। আমি সুশীলকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "সেখানা সে সিঁড়ির পাশে কুড়াইয়া পাইয়াছে। "আপনার হাতের লেখা পাঠ সম্বন্ধে সুশীলের ক্ষমতা যে কতদূর, তাহা আপনি সবিশেষ জানেন। পত্রখানি অদৃশ্য হওয়ায় আপনি প্রথমে যতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, এখন বোধ করি, ইহাতে আশ্চর্য্যের তেমন কিছুই নাই, দেখিতেছেন ?"

"আশ্চর্য্যেরই কিছুই নাই বটে কিন্তু পত্রখানি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন দশম-দশা প্রাপ্ত হইবে, তাহা কে জানিত !" বলিতে বলিতে বিনয়কুমার পুনরায় এক কলম কালি লইয়া চেক্ লিখিতে লাগিলেন। পাঁচশত টাকার একখানি চেক অক্ষয়কুমারের হাতে দিয়া কহিলেন, "আমার হাতে এই তোর ডিটেকটিভগিরির বৌনী হইল। যাহাতে এখন অপরের নিকট হইতে এই কাজে তোর আরও চেক-প্রাপ্তি ঘটে, সেজন্য চেষ্টা কর গিয়া—আমার আর অমত নাই।"

অক্ষয়কুমার চেক লইল না। দাদাকে ফেরৎ দিয়া বলিল, "আমি পুলিস-বিভাগে কাজ করিবার জন্য আপনার সম্মতিমাত্র পাইবার আশা করিয়াছিলাম। চেকের আশা করি নাই। টাকা আমি লইব না।"

বিনয়কুমার আর কোন প্রতিবাদ করিলেন না। লিখিত চেকখানি

লইয়া পুনরায় ড্রয়ারের ভিতরে রাখিয়া দিলেন। সেইবার শারদীয়া পূজার সময়ে বিনয়কুমার তাঁহার ভ্রাতৃবধুকে পাঁচ শতাধিক টাকার স্বর্ণবলয় কিনিয়া দিলেন।

বলা বাহুল্য, তখন অক্ষয়কুমার দাদার অনুমতিক্রমে পুলিশ কর্মচারী শ্রেণীভুক্ত।

জাল ডিটেক্‌টিভ

দীনেন্দ্রকুমার রায়

চাকরির উপর আমার আজীবন কাল ঘৃণা। বাবা বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া আমার কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন; অনেক টাকা মূল্যে কয়েকখানা মূল্যহীন সার্টিফিকেট ক্রয় করা গিয়াছিল; আমি বি-এ; বাবার ইচ্ছা আমি ডেপুটিম্যাজিষ্টরী পরীক্ষা দিয়া মফস্বলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইয়া বসি। ডেপুটিগিরির সুখ আমার জানা ছিল। একদিকে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, অন্যদিকে সেসন জজ, এই দুই নৌকায় পা দিয়া অনেক ডেপুটির প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে; শ্যাম ও কুল উভয়ই মধ্যে মধ্যে অরক্ষণীয় হয়। বি-এল পাশ করিয়া মুনসেফী লাভ হইতে পারে, কিন্তু আমার ততদূর উৎসাহ ও অধ্যবসায় ছিল না; তদ্ভিন্ন বহুমূত্র রোগটিকে আমি অত্যন্ত ভয় করিতাম। খাটিতে খাটিতে যে মুন্সেফের বহুমূত্র না হয়, ঈশ্বর এই কলিযুগে তাহাকে নিশ্চয়ই মার্কণ্ডেয়ের পরমায়ু দিয়া পাঠাইয়াছেন। ওকালতির ঝঞ্ঝাট অনেক। আমি স্থির করিলাম, যাহাতে স্বাধীনতা আছে সে রকম কোন কাজে লিপ্ত হইব। "বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী": আমি লক্ষ্মীলাভের আশায় বাবার ব্যবসায়ে যোগ দিলাম।

বাবা তখন খাণ্ডোয়ায় তুলার কারবার করিতেন। কারবারে বেশ লাভ ছিল। আমি খাণ্ডোয়া হইতে বোম্বে যাইতেছিলাম। বোম্বের প্রসিদ্ধ গুজরাটি বণিক মাণিকচাঁদ রতনচাঁদের সঙ্গে ভাগে সেখানে একটা 'এজেন্সি' খুলিবার সংকল্প ছিল।

ফাল্গুন মাসের রাত্রি। রাত্রি নয়টার পর মেলট্রেনে আমি একটা সেকেণ্ড ক্লাশ কম্পার্টমেণ্টে উঠিয়া পড়িলাম। ট্রেন ধূম্র উদ্গীরণ করিতে করিতে শত দীপ দীপ্ত বক্ষে দক্ষিণ পশ্চিমমুখে ছুটিয়া চলিল। একটু শ্রান্তি দূর হইলে আমি গ্লাডষ্টোন ব্যাগটায় ঠেস দিয়া সেই প্রভাতের একখানি প্রবাসী সংবাদপত্র পাঠ করিতে লাগিলাম। এ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান মহাশয়েরা আমাদের নেটিভদের প্রতি যে একটু ঘৃণা মিশ্রিত ব্যঙ্গোক্তি প্রয়োগ করেন, তাহা উপেক্ষণীয় হইলেও, তাহার সহিত পরিচয় রাখা অকর্তব্য নহে।

দেখিলাম, গাড়ীতে আর দুইজন আরোহী রহিয়াছেন। দুইজনই মারাঠা যুবক। একজনের পাগড়ীটা গদির উপর পড়িয়া আছে। মাথার চারিদিকে সমান করিয়া কামানো, টিকিটা গোছাকরা মস্ত লম্বা। চীনেদের মত বেণী পাকানো নয়; বৃহৎ চন্দনচিহ্ন তখনও কপাল হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; গায়ে একটা লম্বা কোট। যুবক একবার মুখ তুলিয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমার মুখের দিকে চাহিলেন; নীল চশমার সোনার ফ্রেম উজ্জ্বল গ্যাসালোকে ঝকমক করিয়া উঠিল। তাহার পর তিনি পূর্ববৎ বাহিরের "চন্দ্রমাশালিনী বা মধু যামিনী"র দিকে চাহিয়া রহিলেন। আর একজন যুবক সাহেবী পোষাক পরা; তিনি নিবিষ্টচিত্তে একখানি ইংরেজি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন; বাঁশের সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মত মোটা একটা সিকটাকার চুরুট জ্বলিয়া জ্বলিয়া কুণ্ডলীকৃত ধূম উদ্গীরণ পূর্বক সাহেবের সংবাদপত্র মনঃসংযোগের পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

লোকদুজন আমার সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইল। আমি বাঙ্গালী মানুষ। গাড়ীতে নূতন লোক দেখিলেই ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলি, "মশায়ের কোথায় যাওয়া হবে?" নিবাস এবং বাপের নাম জিজ্ঞাসা করা অনেকদিন 'আউট অব্ ফ্যাসন' হইয়া গিয়াছে। 'এটিকেট' আইন জারী হইয়া নিবাস ও বাপের নাম প্রভৃতি অনেক শ্লীল জিনিস অশ্লীলের মত পরিত্যক্ত হইয়াছে। ইউরোপে, যাহাদের গৃহ এবং পিতার নাম উভয়েরই অভাব আছে, তাহাদের কাছে এরূপ প্রশ্ন অত্যন্ত অশ্লীল কৌতুহল বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা এখন সাহেব হইয়াছি!

সুতরাং আমি চুপ করিয়া কাগজই পড়িতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে, যে যুবকটি কাগজ পড়িতেছিলেন, তিনি তাঁহার কাগজখানা হাতে লইয়া উঠিয়া আসিলেন। ইংরাজীতে বলিলেন, "মশায়, আমায় একস্কিউজ

করিবেন; আপনার কাগজখানা বোধকরি পড়া হইয়াছে। আমরা পরস্পর কাগজ বদলাইতে পারি কি?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, 'অনায়াসে।'—মুহূর্ত মধ্যে তাঁহার Bombay Hereld নামক সংবাদপত্র আমার হাতে আসিল। আমার প্রবাসী কাগজ লইয়া তিনি স্বস্থানে গিয়া বসিলেন।

কাগজখানা হাতে লইয়াই দেখিলাম এককোণে একটা নীল পেন্সিল দিয়া ইংরাজীতে লেখা আছে, 'আমি বোম্বের একজন ডিটেকটিভ; আমাদের অন্য সহযাত্রীটি বিট্টলরাও খারে। আপনি জানেন, খারে কে? তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বোম্বে ওয়ারেণ্ট রহিয়াছে। কিন্তু সেখানে পঁহুছিবার পূর্বেই ইহাকে গ্রেপ্তার করা আবশ্যক! আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হইবে; বরহাউপুরের 'রিফ্রেসমেণ্টরুমে' এসকল কথা হইবে।'

বিট্টলরাও খারে! বোম্বের প্রসিদ্ধ জহরৎ ব্যবসায়ী সাপুরজী জাহাঙ্গীজির দোকান হইতে বিশ হাজার টাকা দামের একখানি হীরক সে চুরি করিয়াছে; চুরি বাটপাড়িতে বোম্বে অঞ্চলে সে সময় কেহই বিট্টলরাওর সমকক্ষ ছিল না। আমার সঙ্গেও কিছু টাকাকড়ি ছিল; ভাবিলাম, আচ্ছা বদমাইসের সঙ্গে একগাড়িতে উঠা গিয়াছে। মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হইল, কাগজে মনঃ সংযোগ করিতে পারিলাম না।

দুই একবার চক্রদৃষ্টিতে বিট্টলরাওরের দিকে চাহিলাম। প্রায় একমাস হইল সে সতর্ক পুলিশের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে; তাহার সঙ্গে সঙ্গে যে ডিটেকটিভ ঘুরিতেছে, হয়ত সে তাহার কিছুই জানে না; কিন্তু তাহার চক্ষে চশমা। মুখে একটুও উদ্বেগের চিহ্ন ধরিতে পারিলাম না। সংবাদপত্রে তাহার কথা লইয়া হলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল; এমন কি আমি যেদিনের কথা বলিতেছি সেদিনও Bombay Hereld-এ তাহার সম্বন্ধে এক প্যারা দেখিলাম; পুলিশের কর্তব্য কার্যে শিথিলতা দেখিয়া সম্পাদকমহাশয় অনেক আক্ষেপ করিয়াছেন।

রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ট্রেন ষ্টেশনে পঁহুছিল; পাঁচমিনিট এখানে গাড়ী থামিবে। এখানে রিফ্রেসমেণ্ট রুমে না জানি কি দায়িত্বভার ঘাড়ে পড়িবে! আমি ভারি চঞ্চল হইলাম। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াইতেই সেই Bombay Hereld খানা পকেটে ফেলিয়া আমি ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলাম! অনতিবিলম্বে ডিটেকটিভ মহাশয় আমার সঙ্গে যোগদান করিলেন।

ডিটেকটিভ যুবক অতি নিম্নস্বরে বলিলেন, 'খুব সাবধান।' যাহাতে আসামীর সন্দেহ হয়, এমন কোন ব্যবহার করিবেন না। এখন পলাইলে তাহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইবে। ভুসাওয়াল ষ্টেসনে বোধহয় তাহার কোন বন্ধু আসিয়া জুটিবে; সে জব্বলপুর হইতে টেলিগ্রাম করিয়াছে, খবর পাইয়াছি।

"তাহা হইলে এখন কি করা কর্তব্য?" আমি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। "বদমাইসের দল বৃদ্ধি হইবার আগেই তাহাকে আটক করা দরকার; ট্রেনে উঠিয়াই ইহাকে বাঁধিয়া বেঞ্চির নীচে ফেলিয়া রাখা যাইবে। তাহারপর ভুসাওয়ালে যদি তাহার কোন বন্ধু আসে, তাহার গতিবিধির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আবশ্যক হইলে তাহাকেও 'এরেষ্ট' করিবার ব্যবস্থা করিব। আমি জানি না, বামাল কাহার কাছে। এই বামালের জন্যই আমাদের অধিক চেষ্টা।" —আমি বলিলাম, 'যদি এ গাড়ীতে অন্য প্যাসেঞ্জার উঠে, তাহা হইলে তো আমাদের কাজের ব্যাঘাত জন্মিতে পারে।"

ডিটেকটিভ উত্তর দিলেন, 'এ গাড়ীতে অন্যলোক উঠিবে না, আমি তাহার বন্দোবিস্ত করিয়াছি। আর সময় নাই, আমি চামড়ার একটা ষ্ট্র্যাপ কিনিয়া লই। বাঁধিতে দরকার হইবে, লোকটা ভারি জওয়ান। দরকার হইলে সাহায্য করিবেন। "আমি হাসিয়া বলিলাম, অবশ্য।" ব্যাপারটা ক্রমে রোমান্টিক হইয়া উঠিতেছিল; এ যে আস্ত একখানা উপন্যাস।

ট্রেন ছাড়িবার ঘন্টা পড়িল। আমরা প্ল্যাটফর্মে বাহির হইয়া আসিলাম, গার্ডকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ট্রেন ভুসাওয়ালে ক'টার সময় পৌছিবে?'

গার্ড বলিল, 'বারোটা পাঁচ মিনিট।' বুঝিলাম নিশীথ রাত্রে এই দ্রুতগামী মেলট্রেনের মধ্যে উপন্যাসের আর এক পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইবে।

বিট্টলরাও প্ল্যাটফর্মে পাদচারণা করিতেছিল। ট্রেন ছাড়িবার সময় গাড়ীতে লাফাইয়া উঠিল। ডিটেকটিভ ও আমি উভয়ে একবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। আমার বুকের মধ্যে ধপ্‌ধপ্ করিতে লাগিল; এখনি একটা ছোটখাট যুদ্ধ ব্যাপার উপস্থিত হইবে। আমি ভাল করিয়া বিট্টলরাওএর সর্বাঙ্গ দেখিয়া লইলাম; জোয়ানটি বড় কম নয়। ডিটেকটিভ লোকটা ক্ষীণকায়, আমিও তথৈবচ, দুজনে তাহাকে পারিয়া ওঠা দুষ্কর। ট্রেন ছোটখাটো গোটা দুই ষ্টেশন পার হইয়া গেল। ডিটেকটিভ একমনে খবরের

কাগজ পড়িতেছিলেন; সহসা তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, পকেট হইতে একখানা লাল রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিলেন; তাহার পর জানালার কাছে আসিয়া একলম্ফে বিট্টলরাওএর উপর পড়িলেন; তাঁহার দুই হস্ত বিট্টলরাওএর উভয় স্কন্ধে এবং তাঁহার জানুদ্বয় তাহার বক্ষের উপর চাপাইয়া দিলেন। বিট্টলরাও তাড়াতাড়ি তাহার দক্ষিণ হস্ত পকেটে ফেলিবে, এমন সময় ডিটেকটিভ আমাকে বলিলেন, "শিগ্গির আসুন, রাসকেলের হাতদুখানা আটকাইয়া ফেলুন।"

আমি মুহূর্তমধ্যে দৃঢ়বলে তাহার উভয় হস্তের মণিবন্ধ চাপিয়া ধরিলাম। দেখিতে দেখিতে ডিটেকটিভ মহাশয় পকেট হইতে আর একখানি রুমাল বাহির করিয়া বিট্টলরাওএর মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন, রুমালে অত্যন্ত উগ্র ক্লোরোফরমের গন্ধ। বিট্টলরাও প্রায় একমিনিট কাল আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল; তাহার পর ক্লোরোফর্মে অভিভূত হইয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

ডিটেকটিভ বলিলেন, নির্বিঘ্নে কার্যোদ্ধার হইয়াছে। আপনি ঠিক সময়ে আমাকে সাহায্য না করিলে নিশ্চয়ই ও পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইত। জানালা খুলুন, শীঘ্র খুলুন, নতুবা ক্লোরোফর্মের গন্ধে আমরাও আবার এখনি অজ্ঞান হইয়া পড়িব।

তাই ত! আমার মাথাটাও ঘুরিয়া উঠিয়াছিল। উৎসাহ ও উত্তেজনায় এতক্ষণ একথা মনেই ছিল না। আমি এক লম্ফে গাড়ীর দরজা জানালা খুলিয়া দিলাম। গাড়ীর মধ্যে নৈশবায়ুর অবাধপ্রবাহ আরম্ভ হইল।

ডিটেকটিভ বলিলেন, "আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, তাহা মনে থাকিবে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার ঊর্দ্ধতম কর্মচারীর নিকট আপনার এই সহায়তার উল্লেখ করিতে পারি।'

আমি আমার নাম বলিয়া বলিলাম, 'যদি আপনার কিছু কাজ করিয়া থাকি, সেকথা লইয়া আন্দোলন না করাই আমার কাছে ভাল বোধ হয়।"

ডিটেকটিভ অন্য প্রসঙ্গ তুলিলেন, বলিলেন, "আমাদের তস্কর বন্ধুকে আর এভাবে এখানে ফেলিয়া রাখা সঙ্গত নয়; আসুন ধরাধরি করিয়া ইহাকে বেঞ্চির পাশে নামাইয়া রাখা যাক্।"

বিট্টলরাও তখনো অজ্ঞান; তাহাকে নীচে নামাইয়া ফেলিলাম। ডিটেকটিভ তাহার কালো ব্যাগটা তাহার মাথার নীচে বালিশের মত স্থাপন

করিলেন। গাড়ীর বাহির হইতে যাহাতে সহসা কাহারো তাহার প্রতি নজর না পড়ে, এজন্য একখানা কম্বল টাঙ্গাইয়া তাহাকে আমরা আড়াল করিয়া রাখিলাম।

আমি বলিলাম, "চেতনা পাইলেই রাসকেল চেঁচাইতে আরম্ভ করিবে।" ডিটেকটিভ হাসিয়া বলিলেন, "তাহারও ব্যবস্থা হইবে, আমি উহার মুখ বাঁধিয়া দিতেছি। আপনার কোন ভয় নাই।"

রাত্রি বারোটার পর ট্রেন ভুসাওয়াল ষ্টেশনে পৌছিল। দেখিলাম প্ল্যাটফর্মে সকলের আগে একজন মধ্যবয়স্ক মারাঠা পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। ভারি জোয়ান, গালপাট্টা, চোখ দুটো গোলাকার দুটি ভাঁটার মত, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, সোনালী আঁচলাটা ষ্টেশনের তীব্র আলোকে ঝকমক্ করিতেছে।

চক্ষুর নিমেষে আমার দিকে চাহিয়া ডিটেকটিভ মহাশয় বলিলেন, "এ সেই, বিট্টলরাও যাহাকে টেলিগ্রাম করিয়াছিল। আপনি গাড়ীর মধ্যে কিছুকাল অপেক্ষা করুন, আমি এ কামরা গার্ডকে বলিয়া রিজার্ভ করিয়া লইতেছি। এ লোকটা ইহার মধ্যে প্রবেশ করে এরূপ আমার ইচ্ছা নয়।"

ডিটেকটিভ নামিয়া গেলেন। চোরের সঙ্গে একাকী গাড়ীতে বসিয়া রহিলাম। তাহার মুখটি বাঁধা বটে। কিন্তু যেরকম টানিয়া টানিয়া সে নিশ্বাস ফেলিতেছিল, তাহাতে তাহার শীঘ্রই চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। মনটা ভারি অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল।

প্রথম ঘণ্টা পড়িল। আমি ডিটেকটিভকে দেখিবার জন্য প্ল্যাটফর্মে নামিয়া পড়িলাম। গার্ডের গাড়ীর কাছে গিয়া তাহাকে পাইলাম না। এদিক ওদিক চারদিক খুঁজিলাম, লোকটার কোন খোঁজ পাইলাম না। ঠং ঠং করিয়া গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড বাঁশিতে ফু দিল; আমি দ্রুতবেগে আসিয়া গাড়ীতে উঠিলাম।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এতক্ষণ দেখি নাই, সেই জমকালো পাগড়ীওয়ালা জোয়ান লোকটা এই গাড়ীতেই উঠিয়াছিল। কি সর্বনাশ! সে একলম্ফে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল; আমার মুখের উপর একটা পাঁচনলা পিস্তল উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, "স্থিরভাবে বসিয়া থাক, নড়িয়াছ কি মরিয়াছ।"

আমার ডিটেকটিভ বন্ধু গাড়ীতে নাই; আমি নিরস্ত্র একা, সম্মুখে এই

দুর্জ্জয় জোয়ান সশস্ত্র পার্শ্বে অর্দ্ধচেতন বিট্টলরাও। মেলট্রেন নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। বুঝিলাম, আর রক্ষা নাই; সমস্ত গাড়ীখানা আমার চক্ষুর উপর ঘুরিতে লাগিল; নত মস্তকে মুক্তির উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মুক্তিলাভ অসম্ভব। তুলার ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া কেহ এ পর্যন্ত বোধকরি এমন বিপদে পড়ে নাই। বিধাতার বিড়ম্বনা। আমাকে চিন্তামগ্ন দেখিয়া আগন্তুক বিকট হাসি হাসিয়া বলিল, 'বৃথা চিন্তা, নিজে যে ফাঁদ পাতিয়াছ, তাহারই মধ্যে পা পড়িয়াছে। এখন আমি যাহা বলি শুন, অন্যথা করিলে মাথার খুলি একগুলিতে উড়াইয়া দিব। আমার বন্ধুর মাথার দিকটা ধর, তাহাকে উপরে তুলিতে হইবে। পলায়নের চেষ্টা করিও না।"

আমি জড়ের ন্যায় তাহার আদেশ পালন করিলাম। বিট্টলরাওর চৈতন্যোদয় হইল; সে শুইয়া শুইয়া দুই হাতে চক্ষু মুছিতে লাগিল। আগন্তুক বলিল, কেমন আপাজি, বেশ সুস্থ হইয়াছ ত?"

আপাজি কি বিট্টলরাওর আর একনাম? আপাজি উত্তর করিল "কে ভাস্কর? তুমি আসিয়াছ, বদমায়েসেরা কি ভাগিয়াছে?"

"না একজন জালে পড়িয়াছে, আর একজন সরিয়াছে।"

আপাজি উঠিয়া বসিল। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে পালাইল? পালাইবে ভাবিয়াই আমি তোমাকে অনেক আগে লোকজন সঙ্গে লইয়া স্টেশনে উপস্থিত থাকিতে বলিয়াছিলাম।"

ভাস্কর বলিল, "আমি প্রথমে তোমাকে দেখিতে না পাইয়া কিছু আশ্চর্য হইয়াছিলাম। সহজেই বুঝিয়াছিলাম বদমায়েস বিট্টলরাও তোমার উপর কোনরকম কৌশল খাটাইয়াছে। শেষে আমি যখন এই গাড়ীতে উঠিয়া তোমার অবস্থা দেখিলাম, তখন বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ইত্যবসরে আসামী কিরূপে সরিয়া পড়িল বুঝিতে পারিলাম না; তাহার সঙ্গী গাড়ী ছাড়িবার সময় আসিয়া আপনি ধরা দিয়াছে।"

আমার কপালে ঘর্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। আপাজি কি বিট্টলরাও নহে? ইহাদের কথার কোন মর্ম গ্রহণ করিতে না আমি হতবুদ্ধির ন্যায় বসিয়া রহিলাম; বুঝিলাম ভিতরে একটা ভয়ানক রহস্য লুকান রহিয়াছে।

কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকা চলে না। আমি আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "মহাশয়, আমি বুঝিতেছি, আমি একটা কি বিষম ভুল করিয়া বসিয়াছি। আপনারা কে?"

ভাস্কর বিদ্রূপপূর্ণ স্বরে বলিল, "আমরা যে হই, সে খোঁজে আবশ্যক? তোমার ভুল শীঘ্রই ভাঙ্গিবে। তোমার নাম কি?"

অন্য সময় হইলে হয়ত এরূপ অভদ্র প্রশ্নের উত্তর দিতাম না। কিন্তু তখন এ অপমানও পকেটস্থ করাই সঙ্গত বোধ হইল। আমি নাম ও নিজের ব্যবসায়ের পরিচয় দিলাম।

ভাস্কর বলিল, "ও ত গেল নকল পরিচয়, আসল পরিচয় দাও। দেখিতেছি ত বাঙ্গালী, বিট্টলরাওর সঙ্গে কতদিন জুটিয়াছ? অনেক বাঙ্গালী আমাদের এ অঞ্চলে আসিয়া কেবল নিজের মুখে কালি লেপিয়া বেড়ায়, তুমিও তাহাদের একজন। চোরা মাল কোথায়?"

এবার আমার বড় রাগ হইল। বলিলাম, 'তোমাদের এই রকম অভদ্র আচরণের প্রতিশোধ দিতে হইলে জুতা মারিয়া গাড়ীর বাহিরে ফেলিয়া দেওয়াই উচিত। ভদ্রলোকের কাছে চোরা মালের কথা জিজ্ঞাসা করিতে প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই লজ্জা হইয়া থাকে।'

আপাজি বলিল, "ভদ্রলোককে হঠাৎ ক্লোরোফর্ম দ্বারা অজ্ঞান করিয়া ফেলিতে ভদ্রলোকের লজ্জা হয় না?" আপাজির স্বর গম্ভীর।

আমি বলিলাম, সে ক্লোরোফর্ম আমি দিই নাই ডিটেকটিভ দিয়াছিল। বদমাসকে বাঁধিবার জন্য আমি তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলাম মাত্র। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক ভদ্রলোকই এরূপ কাজ করিতেন।"

"ডিটেকটিভ? কোন ডিটেকটিভ?"

"আমার সহযাত্রী বন্ধু, যিনি জব্বলপুর হইতে আসিতেছিলেন।" আমি বলিলাম, "হাঁ, তুমি যাহাকে আপাজি বলিতেছ, ডিটেকটিভ আমাকে বলিয়াছে সে স্বয়ং বিট্টলরাও। তাহাকে বাঁধিবার জন্য ডিটেকটিভ আমার সাহায্য লইয়াছিল। এখন তাহাকে পলাইতে দেখিয়া আমার মনে নানা সন্দেহ হইতেছে।" আপাজি বলিল, জাল ডিটেকটিভ। সে নিজেই বিট্টলরাও। আমি তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য তাহার সঙ্গ লইয়াছি। চোরা মাল তাহার সঙ্গে আছে জানি। পথের মধ্যে একা গোলযোগ করিলে তাহা হাতছাড়া হইতে পারে বলিয়া আমি ভাস্করকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলাম। পথিমধ্যে তোমার প্রিয়বন্ধু বোধকরি তাহা বুঝিয়া এইরকম করিয়া আমাদের চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়াছে। যাহা হউক, তোমাকে এখন প্রমাণ করিতে হইবে তুমি প্রকৃত তুলার ব্যবসায়ী, জাল ডিটেকটিভ নহ।" জাল ডিটেকটিভের

স্বহস্তে নোট করা সেই Bombay Herald তখনও আমার পকেটে ছিল; আমি তাহা বাহির করিয়া আমার সহযাত্রীদ্বয়কে সেই নোট দেখাইলাম।

আপাজি বলিল, "এ যথেষ্ট প্রমাণ নহে; তোমার নির্দোষিতার সন্তোষজনক প্রমাণ না দেখাইলে অব্যাহতি লাভের আশা নাই। তোমার ব্যাগ খোল।"

আমি তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলিতে গেলাম। উঠিয়া ব্যাগটা হাতে করিয়া তুলিয়াই আমি তাহা নীচে ফেলিয়া দিয়া আমি বসিয়া পড়িলাম!

আমার সর্বনাশ হইয়াছে! আমার ব্যাগটা জাল ডিটেকটিভ হাতে করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে, তাহার ভিতর যে পাঁচ হাজার টাকার নোট ছিল!

আপাজি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া আবার বলিল, "একবার প্রতারণা করিয়াছ, দ্বিতীয়বার আমার চোখে ধূলি দেওয়া অসম্ভব।"

আমি বলিলাম, "এ ব্যাগ আমার নহে, জাল ডিটেকটিভের। আমার ব্যাগটা সে কখন লইয়া সরিয়া পড়িয়াছে দেখি নাই, আমার পাঁচ হাজার টাকা গিয়াছে।"

আপাজি বলিল "এ বিট্ঠলরাওর ব্যাগ!—দেখি"—সে তৎক্ষণাৎ একটা রিং সন্নিবদ্ধ একতাড়া চাবি বাহির করিয়া তাহার একটা দিয়া ব্যাগ খুলিয়া ফেলিল। কতকগুলি কাগজপত্র উলটাইতেই সেই চোরা হীরকখণ্ড বাহির হইয়া পড়িল। তাহাতে গ্যাসোলাকরশ্মি নিপতিত হইয়া আমার ভীতিবিস্ময়সমাকুল চক্ষে প্রতিফলিত হইতে লাগিল।

আমি স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলাম। ব্যাগ বদলানটা বিট্ঠলরাওর জ্ঞাতসারে, কি অজ্ঞাতসারে হইয়াছে আমি বুঝিতে পারিলাম না। বোম্বে আসিলে আমাকে লইয়া পুলিসে একবার টানাটানি করিয়াছিল। সহজেই আমার নির্দোষিতা প্রমাণ হইল; বিচারক আমার বুদ্ধিবৃত্তির অশেষ দোষারোপ করিয়া আমার মুক্তিদান করিলেন।

তাহার পর বিট্ঠলরাওর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। যথাসময়ে সপুরজী সাহাঙ্গীরজী তাঁহার হীরক ফিরিয়া পাইলেন। পাঁচ হাজার টাকা খোয়াইয়া আমার কেবল কাদা মাখাই সার হইল।

সখের ডিটেকটিভ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শীতকাল। রাত্রি ৮টা ২২ মিনিটে ডায়মণ্ডহারবার হইতে আগত কলিকাতাগামী প্যাসেঞ্জার গাড়িখানি সংক্রামপুর ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইল। অল্প কয়েকজন আরোহী ওঠানামা করিতেই ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িল।

ঠিক সময়েই ব্যাগহস্তে একজন মধ্যবয়স্ক স্থূলকায় ভদ্রলোক দৌড়িয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাহার উদ্যম বৃথা হইল। পোঁ করিয়া বাঁশী বাজাইয়া, ইঞ্জিন মহাশয় বাবুটিকে উপহাস ছলেই যেন "ধেৎ ধেৎ" করিতে করিতে ছুটিতে আরম্ভ করিল। বাবুটি হতাশ হইয়া চলন্ত ট্রেনখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন—আর, হাঁফাইতে লাগিলেন।

গাড়ী বাহির হইয়া গেলে বাবুটি ধীরপদে আবার ফটকের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে গোল লণ্ঠন হাতে ছোট ষ্টেশন মাষ্টার বাবু দাঁড়াইয়া আগন্তুক আরোহীগণের নিকট টিকিট লইতেছিলেন। বাবুটি পাশে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শেষ ব্যক্তি ফটক পার হইয়া গেলে ছোটবাবুকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, আবার ক'টায় ট্রেণ ?"

ছোটবাবু বাতির আলোকে টিকিটগুলি দেখিতে দেখিতে বললেন, "কোথাকার ট্রেণ ?"

"কোল্‌কাতায় ফেরবার।"

"আবার সেই রাত্রে ১টা ১৮ মিনিটে।"

বাবুটি আপন মনে হিসাব করিতে লাগিলেন—"একটা আঠারো।" আমাদের হল, আঠার প্লাস চব্বিশ—একটা বিয়াল্লিশ মিনিট—পৌনে দুটোই ধর। তাই ত!"

ইত্যবসরে ছোটবাবু সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন। একজন খালাসী চাকাওয়ালা মই ঘড় ঘড় করিয়া টানিতে টানিতে প্লাটফর্মের আলোগুলি নিবাইয়া দিতেছিল। বাবুটি ধীরে ধীরে ফটকের বাহির হইয়া সিঁড়ি নামিয়া

নিয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে একটি হালুইকরের দোকানে মিটি-মিটি করিয়া আলোক জ্বলিতেছে—তাহার পর যতদূর দৃষ্টি চলে, কেবল অন্ধকার। নিকটতম গ্রামও এখান হইতে অন্ততঃ একক্রোশ দূরে অবস্থিত—রাস্তাটির দুইধারে কেবল গাছ ও জঙ্গল। সেই জঙ্গলে ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে ; মাঝে মাঝে শৃগালের হুকাহুয়া রবও শুনা যাইতেছে।

সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বাবুটি অনুভব করিলেন, কিঞ্চিৎ আহার্য সামগ্রী অভ্যন্তরভাগে প্রেরণ না করিলে সমস্ত রাত্রি কাটিবে না। যদিও যাহাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সেখানে সান্ধ্য জলযোগটা একটু গুরুতর গোছই হইয়াছিল, এবং তাহাদের আয়োজনে বিলম্বের জন্যই গাড়ীটি ফেল হইয়া এই বিপত্তি উপস্থিত—তথাপি সারারাত্রির উপযুক্ত বোঝাই ত লওয়া হয় নাই।

হালুইকরের দোকানটি আছে তাই রক্ষা, নচেৎ অর্দ্ধাশনেই রাত্রি কাটাইতে হইত। ভাবিতে ভাবিতে বাবুটি হালুইকরের দোকানের সম্মুখে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।

বৃদ্ধ হালুইকর চশমা চোখে দিয়া রামায়ণ পড়িতেছিল, বলিল, "আস্তাজ্ঞে হোক্, আসুন।" দোকানের ভিতর দেয়াল ঘেঁষিয়া একটি সরু বেঞ্চি ছিল, তাহার উপর বাবুটি উপবেশন করিয়া বলিলেন, "কি কি আছে ?"

হালুইকর বলিল, "আজ্ঞে বাবুর কি চাই বলুন। রসগোল্লা আছে, পান্তুয়া আছে, মিহিদানা আছে, কচুরি আছে, সিঙ্গাড়া আছে—তাজা, আজই ভেজেছি।"

ইচ্ছামত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া বাবুটি আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সুযোগে ইহার পরিচয়টি দেওয়া আমাদের কর্তব্য হইতেছে। সুখের বিষয়, তজ্জন্য আমাদিগকে বিশেষ শ্রম স্বীকার করিতে হইবে না, নামটি প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইবে। কারণ বিজ্ঞাপন অনুসারে "বঙ্গসাহিত্যে ইহার নূতন পরিচয় দেওয়া সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।"

আপনারা নিশ্চয়ই ইহার লেখনী-প্রসূত কোন না কোন ডিটেকৃটিভ উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন। স্বয়ং না পড়িয়া থাকেন, বাড়ীর মেয়েদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।

ইহার নাম শ্রীযুক্ত গোবর্ধন দত্ত। কলিকাতায় বাস করেন। এই ষ্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে কোন এক গ্রামের একজন ভদ্রলোকের কন্যার সহিত

ইহার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে। আজ বেলা তিনটার গাড়ীতে ইনি কলিকাতা হইতে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। মেয়ে দেখিয়া আট্টা চব্বিশের গাড়ীতে যদি রওনা হইতে পারিতেন, তবে রাত্রি পৌনে দশটায় কলিকাতায় পৌছিয়া গরম গরম লুচি, ঘনবুটের ডাল, সদ্যভর্জিত রোহিত মৎস্য, হংসডিম্বের কালিয়া প্রভৃতি ভক্ষণান্তে নিরাপদে লেপমুড়ি দিয়া শয়ন করিতেন। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে?

· বাসি কচুরি, ভিতরে আঁটিওয়ালা রসগোল্লা প্রভৃতি যথাসাধ্য ভক্ষণ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু হাতমুখ ধুইয়া ফেলিলেন। হালুইকরকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার দোকান কতক্ষণ খোলা থাকে?" হালুইকর বলিল, "রাত্তির ন'টা বড়জোর সাড়ে ন'টা।"

"তারপর?"

"তারপর দোকান বন্ধ করে গিয়ে আহার করি। আহারাদি করে শয়ন করি।"

গোবর্দ্ধনবাবু ব্যাগটি হাতে করিয়া উঠিলেন। হালুইকর বলিল, "বাবু তাহলে ইষ্টিশান চল্লেন?"

"করি কি?"—বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ধীরে ধীরে আবার ষ্টেশনে গিয়া উঠিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সংগ্রামপুর ছোট ষ্টেশন। তার অফিস, টিকিট অফিস, প্রভৃতি সমস্ত একই কামরায় অবস্থিত। ওয়েটিং রুম পর্যন্ত নাই।

গোবর্দ্ধনবাবু প্লাটফর্মে পৌছিয়া দেখিলেন, সেই আপিসকামরা তালাবন্ধ। বাহিরে কম্বল গায়ে দিয়া একজন খালাসী বসিয়া ঝিমাইতেছে। একটিমাত্র লণ্ঠন জলিতেছে, তাহারও আলোক অত্যন্ত কমাইয়া দেওয়া।

গোবর্দ্ধনবাবু খালাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবু কোথা রে?"

"খেতে গেছেন, বাসায়।"

"কখন আসবেন?"

"এই এলেন বলে।"

একখানি বেঞ্চি ছিল, গোবর্দ্ধনবাবু তাহারই উপর উপবেশন করিলেন। ব্যাগটি খুলিয়া পানের ডিবা বাহির করিলেন, সিগারেট ও দিয়েশলাই বাহির করিলেন। জুতা খুলিয়া রাখিয়া, পা দুটি বেঞ্চির উপর তুলিয়া গাত্রবস্ত্রখানি বেশ করিয়া ঢাকাদিয়া বসিয়া, তাম্বুল চর্বন ও ধূমপানে প্রবৃত্ত লইলেন।

চারিদিকে খোলামাঠ, হু হু করিয়া হাওয়া আসিতেছে। কিছুক্ষণ পরেই গোবর্দ্ধনবাবুর শীতবোধ হইতে লাগিল। কোথায় বাড়ীতে এতক্ষণ চারিদিকে দুয়ার জানলা বন্ধ করিয়া লেপ মুড়ি দিয়া শয়ন, কোথায় এই তেপান্তরের মাঠে এই কষ্টভোগ! যদি না মেয়ে দেখিতে আসিতেন তাহা হইলে তো এই কর্মভোগ হইত না! মেয়ের বাপেরা জলযোগের অনাবশ্যক আড়ম্বর করিয়া গাড়ী ফেল করিয়া দিয়াছে বলিয়া তাহাদের উপর রাগ হইল; বিধবা ভ্রাতৃজায়ার উপর রাগ হইল:—ছেলের বিবাহের জন্য এত তাড়া কেন তাহার? গোবর্দ্ধনবাবু বলিয়াছিলেন, এ বছরটা যাক্, আসছে বছর তখন দেখা যাবে—সে কথা তিনি কোন মতেই শুনিলেন না। বধূ আসিয়া কি চতুর্ভুজ করিয়া দিবে? বাল্যবিবাহের উপরও তাঁহার রাগ আসিতে লাগিল।

শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবার বাল্যবিবাহকে আচ্ছা করিয়া গালি দিয়া একখানি নূতন ধরণের উপন্যাস তিনি লিখবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সিঁড়িতে জুতার শব্দ উঠিল। প্লাটফর্মের উপর খানিকটা আলোক আসিয়া পড়িল। বাতি হাতে করিয়া ছোটবাবু আসিলেন; আপিস-কামরা খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দরজাটি ভেজাইয়া দিলেন।

আরো কিয়ৎক্ষণ শীতভোগ করিবার পর গোবর্দ্ধনবাবু ধৈর্য হারাইলেন। উঠিয়া গিয়া দরজাটি ফাঁক করিয়া বলিলেন, "ষ্টেশন-মাষ্টারবাবু, পৌনে দুটোর গাড়ীর ত এখনও অনেক দেরী; বাইরে বড্ড শীত, ভিতরে এসে কি বসতে পারি?'

বাবুটি ষ্টেশন-মাষ্টার নহেন, 'ছোটবাবু' মাত্র তাহা গোবর্দ্ধনবাবু জানিতেন; কিঞ্চিৎ খোসোমোদ করার অভিপ্রায়েই ওরূপ সম্ভাষণ করিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন; "আসুন।"

প্রবেশ করিবার পর গোবর্দ্ধনবাবু একখানি পিঠভাঙ্গা চেয়ারে বসিলেন। এইবার ভাল করিয়া দেখিলেন, ছোটবাবুর বয়স ৪০ বৎসরের উপরে উঠিয়াছে। সাদা জিনের প্যাণ্টালুনের উপর কালো মোটা গরম কোট পরিয়া

রহিয়াছেন। মোটা মোটা বোতামগুলাতে কি সব ইংরিজি অক্ষর লেখা। টেলিগ্রাফের কলের কাছে বসিয়া খুট্ খাট্ করিয়া কাজ করিতেছেন।

গোবর্দ্ধনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, তাহার কাছে লম্বা গোছের একটা টেবিল, তাহার উপর ঘষা কাঁচের একটি সরু উচ্চ লণ্ঠন রক্ষিত, লাইন ক্লিয়ার বহি ও অন্যান্য খাতাপত্র যথাতথা ছড়ান, একটি টিনের গঁদ-দানি, অপর একটি টিনের আধারে তেলকালীর প্যাড এবং ষ্টেশনের একটি মোহরছাপ, সীসার কাগজ চাপা, একগাছা রুল—এই সব দ্রব্য রহিয়াছে।

ছোটবাবু তারের কাজ শেষ করিয়া, আগন্তুকের প্রতি চাহিয়া একটি হাই তুলিলেন। দাঁড়াইয়া উঠিয়া, হাতদুটি পিঠের দিকে করিয়া গা ভাঙ্গিলেন। তাহার পর একটি দেরাজ ধরিয়া খড়্ খড়্ করিয়া টানিয়া, তাহার মধ্য হইতে একখানি বহি বাহির করিয়া, আলোকের নিকট সরিয়া আসিয়া পড়িতে বসিলেন। গোবর্দ্ধনবাবু গলাটি বাড়াইয়া দেখিলেন,—বইখানি তাঁহারই প্রণীত "ভীষণ রক্তারক্তি" নামক উপন্যাস।

গোবর্দ্ধনবাবু নূতন লেখক নহেন; যাহাদের বহি বৎসরের পর বৎসর সিন্ধুক বা আলমারিতে কীটভোগ্য হইয়া বিরাজ করে সে শ্রেণীর গ্রন্থকার নহেন; তথাপি এই দূর পল্লীতে একজনকে নিজ পুস্তকপাঠে নিবিষ্টচিত্ত দেখিয়া তাঁহার মনটা উলসিয়া উঠিল। তাঁহার শীত কোথায় চলিয়া গেল।

ছোটবাবু একমনে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। গোবর্দ্ধনবাবু একদৃষ্টে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। আত্মপ্রসাদে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মনে মনে বলিলেন—"বিজ্ঞাপনে যে লিখি"—"একবার পড়িতে বসিলে তাহার নিদ্রাত্যাগ"—সেটা কি নিতান্ত মিছেকথা লিখি ?"

কিছুক্ষণ এইরূপে কাটিলে, এই ভক্ত পাঠকটির নিকট আত্মপরিচয় দিবার জন্য গোবর্দ্ধনবাবু প্রাণটা ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। ভাবিলেন, "পুরাতন একখানা মলিদা গায়ে দিয়া, কাদামাখা জুতা পায়ে দিয়া, নিরীহ ভাল মানুষটির মত বসিয়া রহিয়াছি—আমি যে কে, জানিতে পারিলে বাবুটির কি বিস্ময়ের অবধি থাকিবে! ইহার পর চিরদিন উনি লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইবেন না কি—"একবার বিখ্যাত ডিটেকটিভ ঔপন্যাসিক গোবর্দ্ধনবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। লোকটি এমন সাদাসিধে যে দেখলে গোবর্দ্ধনবাবু বলে মনেই হয় না। অতি মহাত্মা লোক!—না হয় আমি উহার নামটি প্রথমে

জিজ্ঞাসা করি। তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার নামও উনি জিজ্ঞাসা করবেন।"

গলা বাড়াইয়া গোবর্দ্ধনবাবু দেখিলেন, ছোটবাবু তখন ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ পড়িতেছেন যেখানে প্রসিদ্ধ গুণ্ডা মির্জাবেগ পঞ্চদশবর্ষীয়া সুন্দরী নায়িকা বকুলমালাকে তাহার পিতৃগৃহ হইতে গভীর রাত্রে ডাকাতি করিয়া লইয়া যাইতেছে।—

এই পরিচ্ছেদটি বিশেষভাবে 'চমকপ্রদ'। সুতরাং রসভঙ্গ করিতে ইচ্ছা হইল না। পরিচ্ছেদটি শেষ হওয়া মাত্র গোবর্দ্ধনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নামটি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

বাবুটি পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন, "শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দাসঘোষ।"—বলিয়া চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে মনোনিবেশ করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু সহজে ছাড়বার পাত্র নহেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নিবাস?"

বাবু পূর্ববৎ বলিলেন,—"হুগলীর কাছে।"

"কোন গ্রামে?"

"শঙ্করপুর"—এই বলিয়া তিনি চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা উন্মোচন করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু মনে মনে বলিলেন, "কোথাকার অভদ্র লোক!"—প্রকাশ্যে বলিলেন— "আপনার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করছি বলে আপনি বিরক্ত হচ্ছেন না তো মশাই? আজকাল ইংরাজি ফ্যাসান অনুসারে এগুলো বেয়াদপি বলে গণ্য তা জানি। কিন্তু আমরা মশায় সেকেলো লোক—অত মেনে চলতে পারিনে। কিছু মনে করবেন না।"

বাবুটি তাঁহার পানে একটি নজর মাত্র চাহিয়া, একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, "না"।

গোবর্দ্ধনবাবু তখন আত্মপরিচয়দান সম্বন্ধে হতাশ হইয়া কড়িকাঠ গণিবার অভিপ্রায়ে উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিলেন কড়িকাঠ নাই, ঢেউখেলান করোগেটেড্ লোহার ছাদ মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছোটবাবু যখন বইখানি শেষ করিলেন তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে বারোটা। বহি বন্ধ করিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া প্রায় একমিনিট কাল তিনি সম্মুখস্থ দেওয়ালের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর গোবর্দ্ধন বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "সেই অবধি বসে রয়েছেন ?"

"আজ্ঞে কি করি বলুন!"

"ভারি কষ্ট হল ত আপনার। পান খাবেন ?"—বলিয়া পকেট হইতে পানের ডিবাটি বাহির করিয়া আগন্তুকের নিকট ধরিলেন। পান লইয়া গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিলেন "হায় এ ব্যক্তি জানিতেও পরিতেছেন না যাহাকে পান দিতেছে সে লোকটা কে এবং কত বড়!

ছোটবাবু বলিলেন, "মশায় মাফ করবেন। আপনি প্রায় তিনঘণ্টা এখানে বসে আছেন, আপনাকে কোনও খাতির করি নি। ঐ বইখানা নিয়ে এমনি ইয়ে হয়ে পড়েছিলাম—একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। কোথা থেকে আসছেন ? মহাশয়ের নামটি কি ?

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন—কলকাতা থেকে এসেছিলাম। আমার ভাইপোর জন্যে কাছেই একটি গ্রামে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম; আমার নাম শ্রীগোবর্দ্ধন দত্ত।"

নামটি শুনিবামাত্র ছোটবাবু পূর্বপঠিত বহিখানির সদরপৃষ্ঠাটি খুলিয়া আলোকের নিকট ধরিলেন। বহি নামাইয়া গোবর্দ্ধনবাবুর পানে চাহিলেন। আবার বহিখানির সদরপৃষ্ঠাটি দেখিতে লাগিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া গোবর্দ্ধনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি ভাবছেন ?"

বাবুটি সঙ্কোচের সহিত বলিলেন, "মশায়—আপনিই কি—এই বই লিখেছেন ?"

গোবর্দ্ধনবাবু নেকা সাজিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কি বই ওখানা ?"

"ভীষণ রক্তারক্তি।"

"ও:—হ্যাঁ—আমারই একখানা বই বটে।"

ছোটবাবু বলিলেন, "অ্যাঁ—আপনি!—আপনিই গোবর্দ্ধনবাবু? মশায়, আপনার সঙ্গে যে রকম অন্যায় ব্যবহার আমি করেছি, তারি অন্যায় হয়ে গেছে। ছি ছি।

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "না না—কিছুই অন্যায় ত আপনি করেন নি। কি অন্যায় করেছেন?

"অন্যায় করি নি? আপনি এখানে তিনঘণ্টাকাল ধরে বসে আছেন, আপনাকে জিজ্ঞাসাও করি নি মশায় আপনি কে, কোনও অসুবিধা হচ্ছে কিনা—বই নিয়ে এমনই মেতেছিলাম। অন্যায় করি নি!"

"কিছু না কিছু না। বরং আমার বই নিয়ে আপনি মেতে উঠেছিলেন সেটা ত আমার পক্ষে কমপ্লিমেণ্ট। আমার আর কোন্ কোন্ বই আপনি পড়েছেন?"

"আজ্ঞে আর কিছু পড়ি নি, তবে পাঁজিতে আপনার অনেক বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখেছি বটে। এবার আনাতে হবে এক একখানা করে। আজই কি এই বইখানা পড়া হত? বইখানি একজন প্যাসেঞ্জার ফেলে গেছে। পাঁচটার গাড়ীতে এসেছিল কলকাতা থেকে—মস্ত একদল। বাইরে প্ল্যাটফর্মে ঐ যে বেঞ্চিখানি রয়েছে—তারই উপর জনকতক বসেছিল। তারা চলে গেলে দেখি, বইখানি বেঞ্চির নীচে পড়ে রয়েছে। এনে পড়তে আরম্ভ করলাম। বাপ্! আরম্ভ করলে কি আর ছাড়বার যো-টি আছে? আচ্ছা মশায়, ওসব ঘটনা কি সত্যি; না আপনি মাথা থেকে বের করেছেন?"

আসল কথাটা বলিতে গেলে বলিতে হয় ইংরাজি নভেল হইতে 'না বলিয়া বলিয়া গ্রহণ'—তাই গোবর্দ্ধনবাবু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন, "মাথা থেকে বের করেছি।"

"আপনার খুব মাথা কিন্তু! কি অসাধারণ কৌশল! আপনি যদি পুলিস লাইনে ঢুকতেন ত খুব ভাল ডিটেকটিভ হতে পারতেন। হ্যাঁ—ভাল কথা মনে পড়ে গেল। আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে, আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। দেখুন, বইখানার ভিতর এক চিঠি ছিল। আশ্চর্য চিঠি। আমি ত মশায় পড়ে কিছুই বুঝতে পারলাম না। আপনি দেখুন দেখি।"

—বলিয়া দেরাজ খুলিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া তিনি গোবর্দ্ধনবাবুর হাতে দিলেন। ব্যাগ হইতে চশমা বাহির করিয়া, চোখে দিয়া, আলোর কাছে ধরিয়া গোবর্দ্ধনবাবু পত্রখানি পাঠ করিলেন—

ভাই কৃষ্ণ,

মঙ্গলবার রাত্রে শত্রুদুর্গ আক্রমণ, মনে আছে ত? তুমি সদলবলে ঐদিন বিকাল পাঁচটার গাড়ীতে আসিয়া পেঁছিবে, অন্যথা না হয়। সকলে এখানে সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পরই মার্চ করিতে হইবে। রাত্রি দশটায় যুদ্ধারম্ভ। কার্য সমাধা করিয়া ভোর তিনটার গাড়ীতে তোমরা ফিরিয়া যাইবে।

ইতি—

তোমাদের

নিতাই।

পত্রখানি পড়িয়াই গোবর্দ্ধনবাবুর মনে হইল, ইহা স্বদেশী ডাকাত ভিন্ন আর কিছুই নহে। জিজ্ঞাসা করিলেন—"তারা একদল এসেছিল বললেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ক' জন?"

"জন কুড়ি হবে।"

"বয়স কত সব? ছেলেরা কি রকম?"

"বয়স—পনেরো ষোল থেকে উনিশ কুড়ির মধ্যে। চেহারাগুলো ষণ্ডা ষণ্ডা—খুব হাসি স্ফূর্তি গোলমাল করতে করতে গেল!"

"ভদ্রলোকের ছেলে সব?"

"হ্যাঁ। বেশ ফিট্‌ফাট্ কাপড় চোপড়। কারু কারু চোখে সোণার চশমা।"

"কোন ক্লাসের টিকিট নিয়ে এসেছিল?"

"ইণ্টারক্লাস।"

"সিঙ্গল না রিটার্ণ?"

"রিটার্ণ।"

"তাদের টিকিটগুলো বের করুন।"

ছোটবাবু একটা দেরাজ টানিয়া একগাদা টিকিট হইতে লাল রঙের আধখানা টিকিটগুলি বাছিয়া বাছিয়া গোবর্দ্ধনবাবুর সমুখে ফেলিতে লাগিলেন। শেষ হইলে গোবর্দ্ধনবাবু গনিয়া দেখিলেন, সর্বসুদ্ধ উনিশখানা আছে। প্রত্যেকখানিই কলিকাতা হইতে, নম্বরগুলি পর পর। পকেট বুক বাহির করিয়া টিকিটের নম্বর ও ছাপগুলির বিবরণ গোবর্দ্ধনবাবু নোট করিয়া লইয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন—"স্বদেশী ডাকাতী।"

ছোটবাবু বলিলেন, "স্বদেশী ডাকাতি! অ্যা! স্বদেশী ডাকাতি! বলেন কি?"

"পরিষ্কার স্বদেশী ডাকাতি। আপনার কাছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে?"

"না কেন বলুন দেখি?"

চিঠিখানির একটি স্থানে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "এই দেখুন, খামের উপর যে মোহর পড়ে, তারই সাদা দাগ এ চিঠিতে রয়েছে। একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস পেলে ছাপটা পড়তাম।"

ছোটবাবু চোখে চশমা দিয়ে দাগটা পড়িতে চেষ্টা করিলেন। শেষে বলিলেন, "কিছু পড়া গেল না।" গোবর্দ্ধনবাবু সেই ঘষা কাঁচের লণ্ঠনটির দ্বার খুলিয়া ভিতরে কি যেন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। শেষে এক টুকরা কাগজ লইয়া লণ্ঠনের একটা স্থানে ঘষিতে লাগিলেন। কাগজটুকু ভুষা কালিমাখা হইয়া গেল। বাহির করিয়া, তাহার উপর জোরে দুই তিনটা ফুঁ দিয়া গোবর্দ্ধনবাবু সেখানি চিঠির সেই শাদা ছাপপড়া অংশে লঘুহস্তে বুলাইতে লাগিলেন। ছোটবাবু অবাক হইয়া ইহার কার্যপরম্পরা দেখিতেছিলেন।

ছাপটি পরীক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, 'আজই ৯টার ডেলিভারীতে বৌবাজার পোস্টাপিস থেকে এ চিঠি বিলি হয়েছে।"—বলিয়া চিঠিখানি ছোটবাবুর হস্তে দিলেন। ছোটবাবু আপনি আলোকে ধরিয়া দেখিলেন, কালো জমির উপর শাদা অক্ষরে OW AZA তাহার নিম্নে 9A, তাহার নিম্নে 5JY ফুটিয়া উঠিয়াছে। চিঠিখানি গোবর্দ্ধনবাবুর হস্তে প্রত্যার্পণ করিয়া রূঢ়স্বরে বলিলেন, "ধন্য আপনার বুদ্ধি। নইলে আর অমন সব নভেল আপনার মাথা থেকে বেরোয়।"

গোবর্দ্ধনবাবু বলিতে লাগিলেন "এই ডাকাতের অন্ততঃ একজন যার নাম কৃষ্ণ, বউবাজারে থাকে। নিতাই বলে' দলের একজন পূর্বেই এসেছিল যা কিছু দেখবার শোনবার খবর নেবার সমস্ত ঠিকঠাক করে এই চিঠি লিখেছে। এই অঞ্চলের কোন ধনী লোকের বাড়ী আজ রাত্রি দশটার সময় তারা ডাকাতি করছে। ভোর তিনটের গাড়ীতে তারা ফিরে যাবে।"

এমন সময় কলিকাতা হইতে ট্রেন আসিয়া পৌছিল। ছোটবাবু লণ্ঠন হাতে সেখানি পাশ করিতে ছুটিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোবর্দ্ধনবাবু একাকী বসিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 'এ ডাকাতগণকে যে কোন উপায়ে হউক ধরিতে হইতেছে। ধরিতে পারিলে গভর্মেণ্টের কাছে যথেষ্ট সুনাম হইবে। চাই কি একটা রায়বাহাদুরী খেতাব ও মিলিতে পারে।—অনেক দিন হইতেই রায়বাহাদুর হইবার জন্য গোবর্দ্ধন বাবুর আকাঙ্খা। নভেল লিখিয়া অর্থোপার্জন যথেষ্টই করিয়াছেন, কিন্তু সাহিত্য-ক্ষেত্রে তেমন মানসম্রম হইল কৈ? ইহার পুস্তক সংখ্যার তুলনায় অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক বই যাঁহারা লেখেন নাই, যাঁহাদের বহি আলমারিজাত হইয়া থাকে, বৎসরে ২৫ খানির বেশি বিক্রয় হয় না, তাঁহাদের কত মান, কত সম্রম; মাসিকপত্রে ছবি বাহির হইতেছে, কত সভার সভাপতি হইয়া তাঁহারা বক্তৃতা করিতেছেন—কিন্তু গোবর্দ্ধনবাবুকে কেহ ত ডাকিয়াও জিজ্ঞাসা করে না!—তিনি ইহার একমাত্র কারণ নির্দেশ করেন—ঐ সকল লোক কেবলমাত্র গ্রন্থকার নহেন, সাহিত্যক্ষেত্র গ্রন্থকার এবং অপর কোনও ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ। তাই অনেকদিন হইতেই তাহার মনে হইতেছে যদি কোন একটা সুযোগে রায় বাহাদুর বা অন্তত: একটা রায় সাহেবও তিনি হইতে পারেন, তাহা হইতে বোধ হয় তাঁহার এই, 'কেবলমাত্র গ্রন্থকার" এই অপবাদটি ঘুচিয়া যায়—সমাজে নিজ প্রাপ্য সম্মান তিনি আদায় করিয়া লইতে পারেন। তাঁহার মনে হইল, বোধহয় এই সুযোগেই তাহা হইবে। নহিলে ভগবান তাঁহারই একখানি গ্রন্থের মধ্যে মূলসূত্র স্বরূপ এই চিঠিখানা পাঠাইয়া দিবেন কেন?

ট্রেন চলিয়া গিয়াছিল। ছোটবাবু যাত্রীদের টিকিট কালেক্ট করিয়া আফিসে ফিরিয়া আসিলেন। পকেট হইতে ডিবা বাহির করিয়া পান খাইলেন, গোবর্দ্ধনবাবুকেও দিলেন। নিকটস্থ চেয়ারখানিতে বসিয়া বলিলেন, 'তাইত মশায় কার সর্বনাশ হল কে জানে?'

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, 'দেখুন, আজ এ ডাকাতদের ধরতে হবে।'

ছোটবাবু বলিলেন, 'কে ধরবে?'

'আপনি ও আমি।'

'আমি? সর্বনাশ!'—তাদের কাছে রিভলভার আছে, মাথার খুলি উড়িয়ে দেবে না!'

গোবর্দ্ধনবাবু হাসিয়া বলিলেন, 'না এখন আর তাদের কাছে রিভল্‌ভার নেই। সে সব কোথাও লুকিয়ে রেখে তারা আসবে।'

"তাহলেও ধরা কি সোজা কথা মশায়? তারা উনিশ কুড়িজন লোক—"

"ঝাপটে ধরতে গেলে কি আর হবে? কৌশলে ধরতে হবে।"

"তারপর?"

"তারপর পুলিশ ডেকে তাদের হ্যাণ্ডোভার করিয়ে দেওয়া।"

"তারপর?"

"তারপর সকলের শ্রীঘর?"

"তারপর?"

"তারপর আবার কি?"

"ওদের দলের অন্য লোক যারা আছে, তারা যে আপনাকে আমাকে কুকুর মারা করে 'মারবে'।" একথা শুনিয়া গোবর্দ্ধনবাবুর মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইল। তিনি কয়েক মুহূর্ত নীরবে চিন্তা করিলেন। কিন্তু রায় বাহাদুরীর প্রলোভনই অবশেষে জয়লাভ করিল। বলিলেন, 'আপনি কি বলছেন মশায়! আমরা কি মগের মুল্লুকে বাস করছি যে আমাদের অমনি কুকুর মারা করবে! এ কার্য্য করে যদি আমরা সফল হই, আমাদের যাতে কোন অনিষ্ট না হয় সে বন্দোবস্ত গভর্নমেণ্ট করবেন। তার জন্য লাখটাকা যদি খরচ হয় তাতেও তারা পিছপাও হবেন না। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আসুন, এ কাজে আমার সাহায্য করুন। দেখুন দেখি, এই স্বদেশী ডাকাতেরা দেশের কি মহা অনিষ্ট করছে। নিরীহ লোকদের সর্বনাশ করছে—এই কি ধর্ম, এই কি স্বদেশপ্রেম?' প্রত্যেক রাজভক্ত প্রজারই কর্তব্য তাদের কাযে বাধা দেওয়া, তাদের সমুচিত প্রতিফল দেওয়া।'

ছোটবাবু গালে হাতদিয়া বসিয়া রহিলেন। কোন উত্তর করিলেন না কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "কি বলেন? আমায় সাহায্য করবেন?" হাতদুটি জোড় করিয়া ছোটবাবু বলিলেন, 'গোবর্দ্ধনবাবু আমায় মাপ করতে হচ্ছে; আমি ছাপোষা মানুষ, অনেকগুলি কাচ্ছাবাচ্ছা আমি ও কাজটি পারব না। আমায় বাঁচান।"

"আমি বাঁচাবার কে? আপনি যদি আমার সাহায্য না করেন, আমি নিজেই অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখব। কিন্তু এ স্থান আমার অপরিচিত আমি একা কি করতে পারব? আমায় সাহায্য না করলেই কি আপনি

বাঁচবেন মনে করেছেন? গভর্নমেণ্ট যথন শুনবে যে আপনি আমায় সাহায্য করতে অস্বীকার করাতেই ডাকাতগুলো ধরা পড়ল না, তথন গভর্নমেণ্ট কি ভাববে বলুন দেখি? ভাববে, আপনিও ষড়যন্ত্রকারীদের দলের লোক, তাই সাহায্য করেন নি। উল্টে বোধহয় আপনারই জেল হয়ে যাবে।"—এই কথা বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু মনোযোগের সহিত ছোটবাবুর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের ভাব নির্ণয়ে সচেষ্ট হইলেন।

ছোটবাবু হঠাৎ উঠিয়া গোবর্দ্ধনবাবুর পদযুগল ধারণ করিলেন। বলিলেন, 'আপনি বড়লোক—মহাত্মা লোক—নভেলিষ্ট—এ গরীবকে দয়া করুন। আমায় জড়াবেন না, দোহাই আপনার। যদি কিছুর জন্য আপনার সাহায্য দরকার হয় তা বরং আমায় অনুমতি করুন। গোপনে যা পারি তাতে প্রস্তুত আছি। প্রকাশ্যে কিছুই পারব না।"

"উঠুন, উঠুন—বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ছোটবাবুকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বলিলেন, আচ্ছা, আপনার যদি এতই ভয়, তাহলে কাজ নেই। আমি একাই যা হয় করব। যা' বলি তা শুনুন।"

গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিতেছিলেন, 'সাহায্য যদি এ করে, তবে কার্য সফল হইলে গৌরবের ভাগটা না-ই লইল।"—বলিলেন, "দেখুন, কাছাকাছি এমন কোন বাড়ী আছে যার মধ্যে তাদের পুরে আটক করতে পারি?"

ছোটবাবু বলিলেন, "আছে, আছে, খুব ভাল জায়গাই আছে।"

"কোথা?"

"বাইরে চলুন, দেখাই।"

কিছু পূর্বে চন্দ্রোদয় হইয়াছিল। গোবর্দ্ধনবাবুকে প্ল্যাটফর্মের প্রান্তদেশে লইয়া গিয়া ছোটবাবু বলিলেন, "ঐ যে মস্ত বাড়ীটা দেখছেন, ধানের আড়ত করিবার জন্য রেলি ব্রাদারেরা এটা নূতন তৈরী করেছে। মস্ত একখানা গুদামঘর আছে ওর মধ্যে, প্রায় ৪০ ফুট লম্বা ২৫ ফুট চওড়া। খালি আছে, এখনও ওদের আড়ত খোলে নি। যদি কোন কৌশলে সেই দলকে ওই ঘরখানার মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালাবন্ধ করতে পারেন, তাহা হলেই কার্য হাসিল। পুলিস আসা পর্যন্ত ঐখানে ওরা আটক থাকবে এখন।

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, অনুগ্রহ করে আপনার লণ্ঠনটা নিয়ে আসুন, ঘরখানা দেখি। ছোটবাবু লণ্ঠন আনিতে চলিয়া গেলেন, গোবর্দ্ধনবাবু সেই অন্ধকারে দাঁড়াইয়া কৌশল চিন্তায় ব্যাপৃত হইলেন।

ছোটবাবু লণ্ঠন নিয়া আসিলে উভয়ে গিয়া ঘরখানি দেখিলেন। একটি মাত্র দরজা। উপরে, ছাদের প্রায় কাছে এদিকে দুইটি ওদিকে দুইটি বায়ু চলাচলের জন্য জানলা কাটা রহিয়াছে। তাহাতে এখনও শার্সি বসান হয় নাই। গোবর্দ্ধনবাবু দেখিলেন, সেগুলি মেঝে হইতে প্রায় ২০ ফুট উচ্চে ওখান দিয়া পলায়নের সম্ভাবনা নাই। বলিলেন, এই ঠিক হবে।"

ঘরের বাহিরে আসিয়া গোবর্দ্ধনবাবু দরজাটি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পুরু শালকাঠের ফ্রেমে আড়ভাবে সেই কাঠের ছোট ছোট তক্তা বসান. আগাগোড়া রিপিট করা। উপরে একটি নিম্নে একটি মোটা শিকলও আছে। খুব মজবুত। সহজে ভাঙ্গিয়া বাহির হইতে পারিবে না। ছোটবাবু বলিলেন, রেলের ভাল তালা আছে, আপনাকে দিই চলুন।'

"চলুন। আরও সব সরঞ্জাম দরকার। চলুন আপিসে বসে তার পরামর্শ করি গে।" ফিরিবার পথে ছোটবাবু মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, 'কিন্তু আমি যে আপনাকে কোন বিষয়ে সাহায্য করছি, তা যেন ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ না হয়, দোহাই আপনার।'

"না, তা হবে না।"

আপিসে ফিরিয়া ঘণ্টাখানেক ধরিয়া পরামর্শ চলিল। ইতিমধ্যে পৌনে দুইটার গাড়ী আসিয়া চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা নিবাসী সেই নীরিহ যুবকেরা আসিয়াছিল, তাহাদের বন্ধু নিতাইয়ের বিবাহে বরযাত্রী হইয়া। নিতাই ছেলেটি অনেকদিন হইতেই কিঞ্চিৎ মিলিটারীভাবাপন্ন। রঙ্গ করিয়া যখন নিজ বিবাহকে "যুদ্ধারম্ভ" এবং শ্বশুর-বাড়ীকে "শত্রুদুর্গ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিল, তখন স্বপ্নেও জানিত না, তদ্দারা, বন্ধুগণকে যে কি বিপজ্জালে জড়াইতেছে।

যে গ্রামে বিবাহ হইল, তাহা স্টেশন হইতে দুই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বিবাহ ও আহারাদির পর, বরের নিকট সকলে বিদায় গ্রহণ করিল। তাহাদের জন্য গো-যান প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেগুলি তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া যুবকেরা পদব্রজেই স্টেশন অভিমুখে অগ্রসর হইল। বরাবর সরকারী

রাস্তা-পথ ভুল হইবার আশঙ্কা ছিল না। জ্যোৎস্নালোকে গান গাহিতে গাহিতে অতি আনন্দেই তাহারা পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

রাত্রি যখন দুইটা তখন স্টেশনের আলোক তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। একজন বলিল, 'এস ভাই, বঙ্গ আমার জননী আমার গাহিতে গাহিতে যাই—তালে তালে পা ফেলিয়া দশ মিনিটের মধ্যে তাহারা স্টেশনে পৌছিল।

প্ল্যাটফর্মে পৌছিয়া দেখিল, এক ভদ্রলোক মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া মলিদা গায়ে দিয়া প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়াইয়া আছেন। একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ট্রেনের আর দেরী কত মশাই?"

বাবুটি বলিলেন, 'আপনারাই কি আজ বিকেল পাঁচটার গাড়ীতে এসেছিলেন?'

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনাদের দলের কেউ কলকাতা থেকে ছাড়বার সময় গাড়ী মিস করেছিল?"

"তাত জানিনে, তবে আরও তিনজনের আসবার কথা ছিল বটে, তারা আসেনি, হয়ত সময়মত স্টেশনে এসে জুটতে পারে নি, কেন মশায়?"

বাবুটি বলিলেন, তবে ঠিক হয়েছে। আপনাদেরই দলের লোক। তিনজন নয়, দুজন লোক সন্ধ্যা সাতটার গাড়ীতে এসে পৌছেছিলেন। তাদের একজনের ভয়ানক জ্বর।

"কোথায়? কোথায় তারা?"

ঐ রেলিব্রাদার্সের আড়তে তাঁরা আছেন, যিনি সুস্থ, তিনি আমাদের এসে বল্লেন, মশায় এইত বিপদ, একটু আশ্রয় দিতে পারেন? কোথায় আশ্রয় দিই, ঐ রেলিব্রাদার্সের আড়ত দেখিয়ে দিলাম। বাসা থেকে তক্তপোষ, লেপ, বিছানা সব পাঠিয়ে দিলাম। দু'তিনবার গিয়ে দেখেও এসেছি, খুব জ্বর। ১০৫ এর কমত হবে না। আর, কি পিপাসা—দশ মিনিট অন্তর খালি বলে জল দাও। সুস্থ লোকটির কাছেই শুনলাম আপনারা রাত্রি তিনটের গাড়ীতে কলকাতা ফিরবেন।

যুবকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, ওহে বোধহয় শান্তি আর শৈলেন! শান্তিরই বোধহয় জ্বর হয়েছে—তার ত ম্যালেরিয়া লেগেই আছে কিনা। পাগড়ী বাঁধা বাবুটি বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ শান্তিবাবুরই জ্বর হয়েছে।

নামটি ভুলে গিয়েছিলাম। চলুন, দেখবেন।"—বলিয়া তিনি অগ্রসর হইলেন। বলা বাহুল্য ইনি আমাদের গোবর্দ্ধনবাবু ভিন্ন আর কেহ নহেন।

যুবকেরা পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, জ্বর যদি একটু কম থাকে, গাড়ীতে নিয়ে যাবার মত অবস্থা থাকে, তবে নিয়েই যাব; নৈলে আমাদের সকলকেই এখানে থাকতে হবে।

রেলিব্রাদার্সের আড়তে পৌঁছিয়া বাবুটি বলিলেন, ঐ ঘরে আছে চলুন—দ্বারের ফাঁক দিয়া একটু একটু আলো আসিতেছিল।

দ্বার ঠেলিয়া মাথাটি ভিতরে প্রবেশ করাইয়া বাবুটি বলিলেন, ঘুমুচ্ছে বোধহয়। ফীবার মিক্সচারটায় কিছু উপকার হয়ে থাকবে। দুজনেই ঘুমুচ্ছে। পা টিপে টিপে আপনারা যান।

যুবকগণ দেখিল সেই লম্বাঘরের প্রান্তভাগে পালঙ্ক পাতা রহিয়াছে। পাশে একটি টেবিলের উপর গোটা দুই অষুধের শিশিও দেখা গেল। দেওয়ালে একটা ল্যাম্প মিটিমিটি করিয়া জ্বলিতেছে। যুবকগণ জুতার গোড়ালি শূন্যে তুলিয়া নিঃশব্দে প্রবেশ করিতে লাগিল।

সকলে প্রায় একসঙ্গেই শয্যার নিকটে পৌঁছিল। একজন লেপের প্রান্তটি আস্তে আস্তে উঠাইতে লাগিল। ক্রমে অনেকখানি উঠাইয়া ফেলিয়া বলিল, "কৈ"?

দুই তিনজনে লেপটা টানিয়া বলিল, গেল কোথা?

আর সকলে বলিল, "সে বাবুটি কৈ? তিনি গেলেন কোথা?"

কেহ কেহ বলিল, 'দেখত দেখত বাইরে বোধহয় আছেন।'

তিন চারজন দ্বারের কাছে গিয়া দ্বার টানিল, তাহা বাহির হইতে বন্ধ। চীৎকার করিয়া তাহারা বলিল, ওহে বন্ধ যে।

বাকি সকলে তখন দ্বারের নিকটে গেল। সকলেই দ্বার ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, দ্বার একচুলও নড়িল না। সকলেরই মনে তখন একটু ভয় হইল। কেহ কেহ বলিল, 'ওহে কুঞ্জ—এ কি ব্যাপার?'

কুঞ্জ বলিল, "কিছুই বুঝতে পারছি নে। আমাদের এ রকম করে বন্ধ করলে কেন? লোকটার উদ্দেশ্য কি?"

অভয় বলিল, "একবার ডেকে দেখা থাক্।" বলিয়া সে দরজার কাছে মুখ রাখিয়া চীৎকার করিতে লাগিল—"ও মশাই, ও পাগড়ী মাথার বাবুটি, বলি শুনছেন? দোরটা বন্ধ করে দিলেন কেন? খুলে দিন খুলে দিন!"

একে একে দুয়ে দুয়ে তখন তাহারা এই প্রকার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিতে লাগিল। কিন্তু কোনই ফল হইল না। কেহ কেহ তখন হতাশ হইয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়াছে।

অবনী বলিল, "ওহে গতিক ভাল নয়। এর মধ্যে বন্ধ থাকলে প্রাণে মারা যাব যে। এ মজবুত কপাট ভাঙ্গা যাবে না। ঐ ল্যাম্পটা নিয়ে এস। ওর তেলটা কবাটের গায়ে মাখিয়ে আগুন ধরিয়ে দাও। কবাট পুড়িয়ে ফেল।"

কুঞ্জ বলিল, "সর্বনাশ, তাহলে ধোঁয়ায় শেষকালে জন্মান্ধ হয়ে মারা যাব যে। জানালা নেই, শুধু ছাদের কাছে ছোট ছোট ঐ দুটি ভেন্টিলেটর, তাও কাচবন্ধ বলে বোধহচ্ছে, অন্য উপায় চিন্তা কর।"

শ্যামাপদ বলিল, "সে বোধহয় পালিয়েছে। চেঁচামেচি করি এস, কারু না কারু সাড়া পাব।"

কেশব বলিল, "এই শীতের ভোরে কে আছে এখানে যে আমাদের সাড়া পেয়ে এসে আমাদের উদ্ধার করবে?"

সকলে তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল।

আধঘণ্টা পরে বাহির হইতে ভস্ ভস্ করিয়া একটা শব্দ আসিল। অভয় বলিল, "ঐ আমাদের ট্রেনও বেরিয়ে গেল।"

জল্পনায়-কল্পনায় আরও ঘণ্টাখানেক কাটিল। কেন যে লোকটা এরূপ ব্যবহার করিয়া গেল তাহাই সকলে নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও কূলকিনারা পাইল না। অবশেষে স্থির হইল, লোকটা বোধহয় পাগল হইবে।

কুঞ্জ ঘরের মধ্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। খাটখানি ধরিয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, কিছুক্ষণ পর সকলকে সে ডাকিয়া বলিল, "দেখ উপরে যে ঐ ভেন্টিলেটর রয়েছে, ওতে শার্সি-টার্সি বোধহয় নেই। আমি অনেকক্ষণ থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছি। ঐ দিয়ে ছাড়া বেরুবার আর কোন উপায় নেই কিন্তু।"

অভয় বলিল, "ও ত বিষম উঁচু, ওখানে পৌছান যায় কেমন করে?"

কুঞ্জ বলিল, "এ নেওয়ারের খাটখানা ভাঙ্গা যাক। খাটের কাঠ চারখানা, টেবিলের পায়া চারটে, নেওয়ার দিয়ে খুব কষে বাঁধা যাক এস। একটা মইয়ের মত হবে। দেওয়ালের গায়ে সেটা দাঁড় করালে জানালার ও ফুটো অবধি পৌছান যাবে বোধহয়।"

তিন চারজন দেখিয়া অনুমান করিয়া বলিল, "বোধহয়।"

ছোটবাবু বলিলেন, "না, এক বেটা খালাসীকেও দেখতে পাচ্ছি নে।"

"আমি নিজেই যাব না কি? থানা এখান থেকে কত দূর?"

"এক মাইল হবে।"

"আচ্ছা মশাই, এক কাজ করি না কেন? থানায় খবর না পাঠিয়ে, বরং কলকাতায় একখানা টেলিগ্রাম করে দিই, পুলিসের ইনস্‌পেক্টর জেনারেলের নামে, মিলিটারি পুলিস নিয়ে, একেবারে বন্দুক-টন্দুক নিয়ে তারা সব আসুক। এ সব স্থানীয় পুলিসকে বিশ্বাস নেই মশায়। আমি যে এত কষ্ট করে ধরলাম, দারোগা নিজে নাম নেবার জন্যে শেষে হয়ত আমায় আমলই দেবে না। টেলিগ্রাম একখানা করে দিই, কি বলেন?"

"সে মন্দ নয়। বেশত, আপনি বসে টেলিগ্রাম লিখুন, আমি ততক্ষণ বাসায় গিয়ে আপনার চায়ের যোগাড় করে আমি।"

"আঃ—এমন সময় এক পেয়ালা গরম চা পেলেও বেড়ে হয় মশায়—একে এই শীত, তাতে সমস্ত রাত্রি জাগরণ!"

ছোটবাবু বাসায় গেলেন। গোবর্দ্ধনবাবু কাগজ কলম লইয়া টেলিগ্রাম লিখিতে বসিলেন। অনেক কাটাকুটি করিয়া শেষে মুসাবিদাটা এই প্রকার দাঁড়াইল—

> ''আমি কার্য্যবশতঃ এ অঞ্চলে আসিয়া অদূরে কোনও গ্রামে একটা ভীষণ স্বদেশী ডাকাতি হইয়াছে জানিতে পারিয়া অনেক কষ্টে এবং কৌশলে উনিশজন ডাকাইতকে ধৃত করিয়া একটা ঘরে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। মিলিটারি পুলিশ লইয়া শীঘ্র আসুন।"
>
> গোবর্দ্ধন দত্ত।

মুসাবিদাটি দুই-তিনবার পড়িয়া গোবর্দ্ধনবাবু অবশেষে নিজ স্বাক্ষরের নিম্নে লিখিয়া দিলেন, 'বেঙ্গলি নভেলিষ্ট।' বাঙ্গালা ঔপন্যাসিক। দুইটি উদ্দেশ্য ছিল, ইন্‌সপেক্টর জেনারেল সাহেব মনে না করেন যে কোন দায়িত্ব-জ্ঞানহীন লোক এই টেলিগ্রাম পাঠাইতেছে; দ্বিতীয়তঃ, কে ধরাইয়া দিল সে সম্বন্ধে ভবিষ্যতে কোনও গোলযোগ না হয়।

এই সময় বাহিরে গোবর্দ্ধনবাবু অনেক লোকের কোলাহল ও জুতার আওয়াজ শুনিয়া, টেলিগ্রামখানি হাতে করিয়া কৌতূহলবশতঃ বাহিরে গেলেন।

যা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল।

সেই তাহারা—সেই দল—কাঁধে তাহাদের খাটভাঙ্গা টেবিলভাঙ্গা বড় বড় কাঠ। একজন বলিয়া উঠিল—"ঐরে, পাগড়িমাথায় ঐ শালা।"

গোবর্দ্ধনবাবু বুঝিলেন, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। কিন্তু প্রাণ বড় ধন। সেটা বাঁচাইবার জন্য একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হয়। সুতরাং তিনি ছুটিলেন। 'ডাকাইতগণ'ও 'ধর শালাকে ধর' বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। গোবর্দ্ধনবাবু কিয়ৎদূর ছুটিয়া, প্ল্যাটফর্মের তারের বেড়া টপকাইয়া, মাঠ দিয়া, জঙ্গল দিয়া প্রাণপণে ছুটিলেন। গাছের কাঁটায় তাঁহার কাপড় ছিঁড়িল, গা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল, তথাপি তিনি ছুটিলেন। একপাটি জুতা খুলিয়া পথে পড়িয়া রহিল, একপায়ে জুতাশুদ্ধ তিনি ছুটিলেন। ক্রমে দ্বিতীয় পাটিটিও খুলিয়া পড়িল, তথাপি ছুটিলেন, পায়ে কাঁটা ফুটিতে লাগিল, পাথরকুচি বিঁধিতে লাগিল—ক্রমে তাহার গতি মন্দ হইয়া আসিল। অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে একস্থানে বসিয়া পড়িলেন। চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, ঘন জঙ্গল। কান পাতিয়া রহিলেন, ডাকাইতগণ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে কিনা। অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাইলেন না।

মনে মনে তখন গোবর্দ্ধনবাবু ভাবিলেন, ষ্টেশনে উহারা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করিবে না, কারণ নিজেদের প্রাণের ভয় ত আছে। তাই ঘণ্টা দুই সেখানে বসিয়া থাকিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইলেন, পা কাটিয়া ব্যথা হইয়াছে। খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতে লাগিলেন। পথ ভুলিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা ৯টার সময় স্টেশনে উপস্থিত হইলেন।

ডাকাইতগণ বা কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানিলেন, ছোটবাবু বাসায় গিয়াছে। বাসায় গিয়া ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

ছোটবাবু হাসিয়া বলিলেন, "কি, কোথায় ছিলেন এতক্ষণ? ডাকাতরা আপনাকে খুঁজছিল যে।"

গোবর্দ্ধবাবু নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় গেল তারা?"

"তারা এতক্ষণ কলকাতায় পৌছে গেছে।"

ছোটবাবু তখন যুবকগণের নিকট বাস্তবিক যাহা শুনিয়াছিলেন—তাহাদের বরযাত্রী যাওয়া প্রভৃতি—তাহা বর্ণনা করিলেন।

গোবর্দ্ধনবাবু বলিলেন, "আচ্ছা কি করে বেরুল তারা?"

ছোটবাবু এইবার কল্পনার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "সে মশায় আশ্চর্য কৌশল! সাতটার ট্রেনে তারা চলে গেলে, আড্ডাতে গিয়ে দেখলাম কিনা বাইরে তালা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি রয়েছে। খাট ভেঙ্গে, নেওয়ার খুলে তারই মই তৈরী করেছে, করে সেই জানালার ফুটোয় উঠে, একে একে টুপ্‌টুপ্‌ করে লাফিয়ে পড়েছে। উঃ—কি কৌশল, কি সাহস!"

গোবর্দ্ধনবাবু কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, 'দেখুন, তারা ডাকাতই বটে, বিয়ের বরযাত্রী নয়। বরযাত্রী এসেছিল এটা আপনাকে মিথ্যে করে বলে গেছে।—যা হোক্‌, আমার নাম-টাম তাদের কাছে বলেন নি ত?"

'আরে রাম! আমাকে অনেক করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলে বটে, কিন্তু আমি বল্লাম, মশয় কতলোক আসছে, কতলোক যাচ্ছে, কত লোকের খবর রাখব বলুন। তবে হ্যাঁ, মলিদা চাদর গায়ে, মাথায় পাগড়ী জড়ানো একটা লোককে প্ল্যাটফর্মে রাত্রে দেখেছিলাম বটে ঐ যা বলছেন আপনারা. বোধহয় পাগলটাগল হবে।"

গোবর্দ্ধনবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "নামটি আমার বলেন নি যে, এইটি ভারি উপকার করেছেন। পরে যদি তারা, কি তাদের দলের লোক, এসে আমার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে দোহাই আপনার বলবেন না"—বলিয়া গোবর্দ্ধনবাবু ছোটবাবুর হাত দুখানি চাপিয়া ধরিলেন।

ছোটবাবু বলিলেন, "ক্ষেপেছেন, সে কি আমি বলি? জিভ কেটে ফেল্লেও না।"

ছোটবাবুর বাসাতেই স্নানাহার করিয়া, দ্বিপ্রহরের গাড়ীতে গোবর্দ্ধনবাবু কলিকাতা রওনা হইলেন।

পরদিন ডাকেই ছোটবাবু একটি বৃহৎ বুক-প্যাকেট পাইলেন—গোবর্দ্ধবাবু তাঁহাকে নিজ গ্রন্থাবলী সম্পূর্ণ একসেট উপহার পাঠাইয়াছেন। প্রত্যেক পুস্তকে উপহারের কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন, "আপনার চিরকৃতজ্ঞ গোবর্দ্ধন।"

শঠে শাঠ্য

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার চৌরঙ্গী রোডের উপর সন্তরাম জীবনরাম ভাটিয়ার মস্ত বড দোকান; সেই দোকানে অতি পুরাতন দুর্লভ ও নানা দেশ-বিদেশের বিচিত্র শিল্প-সম্ভারের কারবার করে সে। তিব্বতের তৈরী মণিপদ্মে হুং, নেপালের ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি, চীনের প্রাচীন পোর্সিলেন, জাপানের সাৎসুমা পোর্সিলেনের বাসন, বর্মার ছাতা, চীনা মান্দারিনের প্রাচীন ড্রাগন আঁকা জোব্বা, চীনা চিত্রকরের প্রাচীন ছবি, জাপানী কিমোনো, জাপানী ছবি, সামুরাইয়ের তরোয়াল, বলীদ্বীপের ঘণ্টা, যবদ্বীপের দেবমূর্ত্তি, সিংহলের রূপা-বাধানো নারিকেল-মালার বাটি, গান্ধারের মূর্তি, ওয়াজিরিদের চাপ্‌লি জুতা, মেক্সিকোর ডাকাতদের ছোরা, কর্সিকার ডাকাতের কোমরবন্ধ, বেলোয়ারী কাচের স্থতোয় বোনা নেকটাই, র‍্যাফেল মুরিলো জশুয়া রেনলডসের ছবি—এমনি কত কি দামী আর দুর্লভ অদ্ভুত শিল্প-সম্ভারে তার দোকান সৌন্দর্য আর বিস্ময়ের বিলাসভবন হয়ে আছে। দেশ-বিদেশের রাজা, মহারাজারা আর আমেরিকার মালটি-মিলিওনিয়ার বা ক্রোড়পতিরা শীতকালে যখন কলকাতায় আসে, তখন জীবনরাম বেশ মোটা রকম লাভ করে। অন্য সময়েও তার দোকানে লোকের ভিড় কম হয় না; ক্রেতা বেশী না থাকুক, কৌতূহলী দর্শকের আনাগোনায় জীবনরামের দোকান সর্বদাই সরগরম থাকে। তার দোকানে দামী জিনিস যেমন আছে, সস্তা অথচ সুন্দর জিনিসেরও অভাব নেই; সিংহলের তালকাঠের ছড়ি, বর্মার গালার রঙে ছবি আঁকা বাঁশের কৌটা, দার্জিলিঙের রংচঙা পাথরের চেন, হার, দুল, জাপানের খড়ের চটি জুতা, উড়িষ্যার আবলুশ কাঠের উপর হাড়ের কাজ-করা লাঠি আর বাক্স, খুব অল্প দামেই বিক্রী হয়। যারা দোকানের শোভা আর দুর্লভদর্শন দ্রব্য দেখতে দোকানে যায়, তারা চক্ষুলজ্জার খাতিরে অল্পদামী একটা দুটো জিনিস কিনে আনে। এতেও জীবনরামের জীবনযাত্রা বেশ সুখ-সচ্ছন্দেই চলতে থাকে।

কিন্তু পুলিশের সন্দেহ দৃষ্টি লেগে থাকে এমনি প্রাচীন আর দুর্লভ মনিহারী

ও মনোহারী দোকানের উপর। পুরনো জিনিসের বেশীর ভাগ চোরাই মাল হওয়া সম্ভব, নইলে এমন সব দুর্লভ দ্রব্য স্বেচ্ছায় হস্তান্তর করবে, এমন হতভাগা লক্ষীছাড়া জগতে খুব বেশী আছে বলে মনে হয় না। পুলিশ খবর পেয়েছে, জীবনরাম চোরাই মালের কারবার করে; চোরাই মাল কিনে সে এমন নিপুনভাবে সেগুলির গঠনে আর চেহারায় অদল-বদল ঘটায় যে, সেই দ্রব্য যার চোখের সামনে থেকে থেকে অতি পরিচিত হয়ে গেছে, সেই মালিকও আর তার নিজের মাল চিনতে বা সনাক্ত করতে পারে না। পুলিশের গোয়েন্দারা সাধারণ ভদ্রলোক ক্রেতার বেশে প্রত্যহ দোকানে এসে ঘোরা ফেরা করে; অদ্ভুত বা দামী বা দুর্লভ জিনিস চুরি যাওয়ার খবর পেয়েই পুলিশের লোক জীবনরামের দোকানে ছদ্মবেশে এসে ঘুরে যায়: কিন্তু তাকে ঘুনাক্ষরেও কলঙ্কভাগী করতে পারে, এমন চিহ্ন তারা এ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে নি। পুলিশের কাছে খবর এলো, এক সৌখীন ধনীর বৈঠকখানা থেকে একটা তিব্বতী মনিপদ্মে হুং চুরি গেছে। সেই জিনিসটা হচ্ছে একটি রূপার অষ্টদল পদ্ম। পদ্মকোষটা সোনার, তার উপরে অষ্টধাতুর একটি বজ্র আছে। বজ্রটির দুই মুখে আর মধ্যদেশে তিনটি মরকত মনি বাসানো আছে; পদ্মের আটটি পাপড়িতে বিচিত্র কারুকার্য করা, একটী পাপড়ি একটু ভাঙা; পদ্মকেশরগুলি সোনার তারের মুখে মুক্তা লাগিয়ে তৈরি; পদ্মটি একটি বেদীর আকারের যন্ত্রের উপর স্থাপিত; সেই যন্ত্রবেদী ধরে পদ্মটি শূন্যে তুললে পদ্মের অষ্টদল মুদ্রিত হয়ে পদ্মকোষস্থিত বজ্রটিকে আবৃত করে, আর পদ্মটিকে শূন্যে থেকে নামিয়ে যন্ত্রবেদীকে কোনো আধারের উপর স্থাপন করলে পদ্মটির অষ্টদল বিকশিত হয়ে খুলে ছড়িয়ে পড়ে আর পদ্মকোষস্থিত বজ্রটি প্রকাশিত হয়ে যায়। পুলিশের সন্দেহ হোলো, এমন দুর্লভ বিচিত্র দ্রব্য নিশ্চয়ই জীবনরামের দোকানে গোপন অভিসার করেছে বা করচে। পুলিশ বহুদিন তাকে তাকে ফিরলো, কিন্তু চোরাই মালের কোনই সন্ধান মিললো না।

একদিন জীবনরাম তার দোকান থেকে বেরিয়ে মোটর গাড়ীতে চড়তে যাবে, এমন সময় একজন পুলিশ অফিসার এসে তাকে বললে—আপনার নামে একটা ওয়ারেন্ট আছে।

জীবনরাম আশ্চর্য ও ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—আমার নামে ওয়ারেন্ট?

পুলিশ অফিসার বললে, হ্যাঁ, এই দেখুন। পুলিশ অফিসার জীবনরামের সামনে একখানা ওয়ারেন্ট মেলে ধরলে। জীবনরাম সেই কাগজখানার উপর

চোখ ফেলেই প্রফুল্ল হয়ে উঠল; এ ওয়ারেন্ট তো নেকিরাম জীবনরামের নামে; আমার নাম তো মস্তরাম জীবনরাম। এ ওয়ারেন্ট আমার নয়। অফিসার বললে আপনি হয়তো নাম বদলেছেন। জীবনরাম হেসে বললে— বদলাতে হ'লে লোকে নিজের নামটাই বদলায়, বাপের নাম কেউ বদলায় না। আমি মস্তরামের পুত্র জীবনরাম; আর এই ওয়ারেন্ট যার নামে সে নিকিরামের পুত্র জীবনরাম। অফিসার বললে—তা হবে। তাহলে আপনি যদি একবার অনুগ্রহ করে পুলিশ কমিশনারের অফিসে গিয়ে কমিশনার সাহেবকে এই কথাটা বুঝিয়ে বলেন, তবে সকল গোল মিটে যায়। জীবনরাম বললে— চলুন; কমিশনার সাহেবের সঙ্গে তো আমার পরিচয় আছে; তিনি তো আমার দোকানের খরিদ্দার। অফিসার বললে—তাহলে তো কোন ভাবনাই নেই। আমার বেয়াদপি মাপ করবেন, আমরা হুজুরের চাকর, আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম। জীবনরাম এ কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, এ ওয়ারেন্ট কিসের জন্য? অফিসার বললে—এ সি, আই, ডি'র ওয়ারেন্ট, এর কারণ বলবার নয়। তবে আপনি যখন সেই লোকই নন, তখন আপনাকে বলি—রাওয়ালপিণ্ডিতে যে পুলিশ অফিসার খুন হয়েছে সেই সম্পর্কেই। জীবনরাম বললে—ওঃ! আমার কোনো পুরুষের সঙ্গে রাওয়ালপিণ্ডির কোনো লোকের সম্পর্কই নেই। আর আমি তো ছ মাসের মধ্যে কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাই-ই নি তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অফিসার বললে, তাহলে আপনি একবার গিয়ে এই কথাটা বললেই হবে। আপনাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে বাধ্য হচ্ছি। মাপ করবেন। জীবনরাম মনে মনে বিরক্ত ও একটু ভীতও হয়েছিলো, তাই পুলিশ অফিসারের ক্ষমা প্রার্থনার উত্তরে সে বিনয় প্রকাশ করতে পারছিলো না যে, আপনার আর দোষ কি অথবা আমার এতে আর কষ্টই বা কি! সে অফিসারের কোনো কথার উত্তর না দিয়ে নিজের দোকানের কর্মচারীকে ডেকে বল্ল—এ ভাই দৌলতরাম, আমি পুলিশ-কমিশনারের আফিসে যাচ্ছি; এই অফিসার এক নেকিরাম জীবনরামের নামে ওয়ারেন্ট এনে আমাকে গ্রেপ্তার করতে চান। আমি পুলিশ-কমিশনার সাহেবকে বল্লেই তিনি এই অফিসারের ভুল বুঝতে পারবেন, কারণ তিনি তো আমাকে ভালো ভাবেই চেনেন। এই বলে জীবনরাম পুলিশ অফিসারের মোটরে চড়ে চলে গেলো। জীবনরাম পুলিশ-কমিশনারের আফিসে গিয়ে পুলিশ-কমিশনারের সঙ্গে দেখা করতে চাইলে, ডেপুটি

পুলিশ-কমিশনার বললেন—পুলিশ-কমিশনার এখন নেই। কিন্তু আপনি ব্যস্ত হবেন না, আপনার কোনো আশঙ্কাও নেই। আপনি যে একজন নামজাদা ব্যবসাদার তা কলকাতা সহরের কে না জানে? তবে একটা সন্দেহ মীমাংসা করবার জন্যই আপনাকে একটু কষ্ট দিতে বাধ্য হয়েছি। আপনি আমাদের সেই বেয়াদপি মাপ করবেন। আপনি বসুন। হর্ষবাবু, সেই নেকিরাম জীবনরামের ফাইলটা নিয়ে আসুন দেখি। যে পুলিশ-অফিসার জীবনরামকে গ্রেপ্তার করে এনেছিলো সে ঘরের এক পায়রা-খোপ আলমারী থেকে একটা ফাইল এনে ডেপুটি পুলিশ-কমিশনারকে দিলে। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সেই ফাইলের ভিতর থেকে একখানা লেখা কাগজ বের করে জীবনরামকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখুন তো এ লেখা কি আপনার জীবনরাম সেই গুজরাটি লেখা কাগজখানা হাতে নিয়ে পড়েই বললে—না, এ লেখা আমার নয়। ডেপুটি পুলিশ কমিশনার বললেন—আপনি একখানা কাগজে এই কাগজের লেখা কথা কটা অনুগ্রহ করে লিখুন; আমাদের হ্যাণ্ডরাইটিং একস্‌পার্টকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে চাই। সে যদি বলে, এই দুই কাগজের লেখা এক হাতের নয়, তাহলেই আপনাকে আর আমরা কষ্ট দেবো না। জীবনরাম একখানা কাগজের উপর পূর্বপ্রদর্শিত কাগজের লেখা কথাগুলি লিখল—তার মর্ম হচ্ছে—'পুলিশ সব টের পেয়েছে, এই পত্রবাহক যা বলবে, সেই রকম ব্যবস্থা করবে। বেশী লেখবার সময় ও সুবিধা নেই।'

লেখা শেষ করে জীবনরাম কাগজখানা ডেপুটি-কমিশনারকে দিতে উদ্যত হ'ল। ডেপুটি কমিশনার বললেন, ওর নীচে আপনার নামটা সই করুন, তাহলে আমরা বুঝতে পারব, কোনটা আপনার লেখা। জীবনরাম নাম সই করে দিলে। হর্ষবাবুকে সেই কাগজ দুখানা দিয়ে ডেপুটি কমিশনার বললেন—হর্ষবাবু, হ্যাণ্ডরাইটিং এক্সপার্টকে লেখা দুটো দেখিয়ে তাঁর অভিমত লিখিয়ে নিয়ে আসুন। হর্ষবাবু কাগজ নিয়ে চলে গেলো। জীবনরাম বসেই আছে। হর্ষ আর ফেরে না। প্রতীক্ষার প্রত্যেকক্ষণ জীবনরামের কাছে যুগান্ত বলে বলে মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ পরে ডেপুটি কমিশনারের ঘরের টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠল। ডেপুটি কমিশনার টেলিফোন ধরে কথা শুনে বললেন—আচ্ছা। তারপর টেলিফোনের চোঙ্‌ রেখে দিয়ে ডেপুটি কমিশনার জীবনরামকে বললেন—আপনি এখন যেতে পারেন। আমাদের হস্তাক্ষর-

পরীক্ষক বললেন যে, আপনার হস্তাক্ষরের সংগে আমাদের কাগজের লেখা মিলল না। আপনাকে যে আমরা অকারণে একটু কষ্ট দিলাম, তারজন্য আমাদের ক্ষমা করবেন। জীবনরাম খুবই রুষ্ট হয়েছিলো; সে কোনো কথা না বলে ডেপুটি কমিশনারকে অভিবাদন করলে এবং জোরে জোরে পা ফেলে বাইরে বেরিয়ে গেলো। জীবনরাম একটা ট্যাক্সি ডেকে নিজের দোকানে ফিরে গেলো। সে গাড়ী থেকে নেমেই দেখলে একখানা মোটর-লরীতে তার দোকান থেকে বহু সামগ্রী বাহির করে এনে তোলা হচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার দোকানের কর্মচারী দৌলতরাম আর একজন অপরিচিত গুজরাটি পোষাক পরা লোক। জীবনরাম আশ্চর্য হয়ে দৌলতরামকে জিজ্ঞাসা করলে—এ সব জিনিস কোথায় যাচ্ছে? সব কি বিক্রী হয়েছে? জীবনরামের এই প্রশ্নে দৌলতরাম আশ্চর্য হয়ে বললে—বিক্রী তো হয় নি; এই বাবু আপনার চিঠি নিয়ে এসে বললেন যে, পুলিশ চোরাই মালের খবর পেয়েছে; এখনই থানা-তল্লাসী করতে আসবে তার আগে সব মাল সরিয়ে ফেলতে হবে। এই তো আপনার চিঠি—

দৌলতরাম জীবনরামের হাতে চিঠি দিলে। জীনরাম বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু উৎসুদৃষ্টি কাগজের উপর স্থাপন করে দেখে—পুলিশ আপিসে যে কাগজে সে লিখেছিলো—পুলিশ সব টের পেয়েছে; এই পত্রবাহক যা বলবে সেইরকম ব্যবস্থা করবে। বেশী লেখার সময় সুবিধা নেই। জীবনরাম বিহ্বল দৃষ্টি তুলে অপরিচিত গুজরাটি লোকটার দিকে তাকালো। সেই লোকটি মৃদু হেসে বললে—আমি পুলিশের লোক। ঠিক সেই সময় হর্ষবাবু হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে বললে—জীবনরামবাবু, আমি আপনাকে ব-মাল গ্রেপ্তার করছি। আপনাকে আর একবার আমার সংগে যেতে হচ্ছে। তবে এবার একলা নয়, আপনার সঙ্গী হবেন দৌলতরাম। জীবনরাম বজ্রাহতের মতন নীরব নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পুলিশের ধূর্ত কৌশলের কথাই ভাবতে লাগল।

খানিকটা তামার তার

হেমেন্দ্রকুমার রায়

১

মানিক চেঁচিয়ে পড়ছিল খবরের কাগজ। শ্রোতা হচ্ছে জয়ন্ত। সে চোখ বুজে ঈজিচেয়ারে শুয়ে আছে। তার মুখে বিরক্তির লক্ষণ। কোন খবরে নূতনত্ব নেই। খুনীরা খুন করেছে সেই পুরাতন উপায়ে। চোরেরাও চুরি করবার নূতন পথ আবিষ্কার করতে পারছে না। সাধু এবং অসাধু সব মানুষই হচ্ছে একই পথের পথিক।

মানিক একটা নূতন খবর পড়ছে।

অদ্ভুত দৈব দুর্ঘটনা:

'গত সপ্তাহে শালিমার একটা বাড়িতে অজিতকুমার বসু নামক জনৈক যুবক বজ্রাঘাতে মারা পড়িয়াছিল। এই সংবাদ আমরা যথাসময়ে পত্রস্থ করিয়াছি। গত পরশ্বরাত্রে আবার সেই বাড়িতেই অজিতকুমারে দ্বিতীয় ভ্রাতা অসীমকুমারের মৃত্যু হইয়াছে ঐ বজ্রাঘাতের ফলেই। ইংরেজী প্রবাদে বলে, দুর্ভাগ্য কখনো একাকী আসে না। কিন্তু উপর-উপরি দুইবারই একই পরিবারে একই দুর্ভাগ্যের এমন আশ্চর্য আবির্ভাবের কাহিনী আমরা আর কোনদিন শ্রবণ করি নাই।'

জয়ন্ত চোখ মেলে সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, 'থামো মানিক। আপাতত আর কোন খবর পড়ে শোনাতে হবে না।'

মানিক হেসে বললে, 'বুঝেছি।'

'কী বুঝেছ?'

'এই খবরটার ভিতরে তুমি চিন্তার খোরাক পেয়েছ?'

'তা পেয়েছি বৈকি। আমার পাপী মন এরকম অসম্ভব দৈব দুর্ঘটনাকে সহজে স্বীকার করতে রাজী নয়। ভগবানের হাতের আড়ালে আমি দেখছি মানুষের হাত।'

মানিক জবাব না দিয়ে কাগজখানা সামনের টেবিলের ওপর রেখেছিল।

জয়ন্ত খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর বললে, 'টেলিফোনের রিসিভারটা এগিয়ে দাও তো।'

'কাকে ফোন করবে?'

'আমাদের বন্ধু গিরীন্দ্র চৌধুরীকে।'

'ইন্‌স্‌পেকটর গিরীন্দ্র চৌধুরীকে?'

'হ্যাঁ, তার কার্যক্ষেত্র তো ঐ অঞ্চলেই। হয়ত সে আমাদের অন্ধকার মনকে কিঞ্চিৎ আলোকিত করতে পারবে।

যথাসময়ে ফোনের মধ্যে জাগ্রত হল গিরীন চৌধুরীর কণ্ঠস্বর।

'গিরীন। আমি জয়ন্ত।'

'ব্যাপার কী? হঠাৎ আমাকে মনে পড়ল কেন?'

'একই বাড়িতে বজ্রাঘাতে দুই ব্যক্তির মৃত্যু। ঘটনা কি তোমারই এলাকায় ঘটেছে?'

'ও হো হো বুঝেছি। মনসা পেয়েছে ধুনোর গন্ধ। তা, ঠিক আন্দাজ করেছ ভাই। ঘটনাস্থলে আমাকেও হাজির হতে হয়েছে বটে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত।'

'মানে?'

'মনের কোণে উঁকিঝুঁকি মারছে সন্দেহ। কিন্তু সে সন্দেহ প্রকাশ বা পোষণ করবার উপায় নেই।'

'কেন?'

'লোক দুটো সত্য সত্যই বজ্র বা বিদ্যুতের আক্রমণে মারা পড়েছে।'

'তবে আবার সন্দেহ কিসের?'

'না, ঠিক সন্দেহও নয়। তবে মাঝে মাঝে পাচ্ছি যেন বিপরীত ইঙ্গিত। একবার বেড়াতে বেড়াতে আমার এখানে আসবে নাকি?'

'নারাজ নই।'

২

জয়ন্ত ও মানিককে দেখে গিরীন্দ্র বললে, 'প্রথমেই তোমরা কি এক এক পেয়ালা কফি পান করতে চাও? জান তো, আমি চায়ের ভক্ত নই।'

জয়ন্ত বলল, 'কফি বা চা কিছুই চাই না। আমরা আজ গল্প শুনতে এসেছি।'

'তা হলে একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি।'

'হ্যা, গৌরচন্দ্রিকা বাদ দিয়ে।'

'শোন। আজ একবছর হল অমরনাথ বসু মারা গিয়েছেন। তিনি ছিলেন একজন বড় জমিদার। যথেষ্ট স্থাবর আর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক। অজিতকুমার, অসীমকুমার আর অমলকুমার হচ্ছে তিন ছেলে। ছোট অমল নাবালক, সেকেণ্ড ইয়ারের ছাত্র। অমরবাবুর একটি মাত্র মেয়ে সুষমা, তার বিবাহ হয়েছে, স্বামীর নাম সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। সুষমার শ্বশুরবাড়ি বিদেশে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর ভাইয়ের অনুরোধ স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়িতেই বাস করে। এই হচ্ছে গত আর বর্তমান পাত্রপাত্রীদের পরিচয়।'

'প্রথমে অজিত যখন বজ্রাঘাতে মারা পড়ে ঘটনাটা আমার মনে স্থায়ী রেখাপাত করে। ডাক্তার বলেন, মৃত্যুর কারণ বিদ্যুতের আঘাতে। কিন্তু গেল পরশু অসীমও ঐ ভাবে মারা পড়তে আমরা রীতিমত চমকে গিয়েছি। এবারেও ডাক্তারের মুখে মৃত্যুর কারণ শুনলুম বটে, কিন্তু দু সপ্তাহের মধ্যে একই পরিবারের উপর বজ্রের এমন পক্ষপাতিত্ব বিস্ময়কর। অবশ্য দুই ঘটনার রাত্রেই মেঘাচ্ছন্ন সজল আকাশে থেকে বজ্রের হুঙ্কার আমরা সকলেই শুনেছি।

'তবে তুমি সন্দিগ্ধ হয়েছ কেন?'

'দুদিনই ঘটনাস্থলে গিয়ে দুটো মৃতদেহ ছাড়া বজ্রাঘাতের আর কোন চিহ্ন দেখতে পাইনি।'

'এ ছাড়া আর কিছু লক্ষ্য করেছ?'

'করেছি। দুদিনই লাস পাওয়া গিয়েছে পূর্বদিকের জানালার তলদেশে মেঝের ওপরে। এও লক্ষ্য করেছি, মৃত্যুর রাত্রে অজিত আর অসীম যে বিছানায় গিয়ে গিয়ে ঘুমিয়েছিল, খাটের শয্যার উপরে সে প্রমাণের অভাব নেই। কিন্তু দুর্যোগময় গভীর রাত্রে তারা শয্যা ত্যাগ করে জানালার ধারে শুয়েছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তর পাই নি।'

'তাহলে তোমরা কোন মামলা খাড়া করতে পারোনি?'

'উঁহু! মামলা দাঁড়াবে কিসের উপর? প্রমাণ কই? সন্দেহ তো প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হবে না।'

'আমাকে একবার ঘটনাস্থলে নিয়ে যেতে পারো?'

'অনায়াসে। সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পাঁচ ছয় মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। কিন্তু সেখানে গিয়ে তুমি কী দেখবে?

'যা দেখবার তাই।'

গিরীন্দ্র হেসে উঠে বললে, 'কিন্তু আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, সেখানে গিয়ে আমরা যা দেখেছি, তার চেয়ে বেশি কিছুই তুমি দেখতে পাবে না। এটা মামলাই নয়, আশ্চর্যভাবে দৈব দুর্ঘটনায় দুটো লোক মরেছে এইমাত্র।

'আশা করি তোমার কথাই সত্য হবে, এখন চল।'

৩

অমরবাবুর বাড়িখানি মাঝারি। তার পূর্বদিকে ট্রাম লাইনের পাকা রাস্তা। পশ্চিমদিকে খিড়কির পুকুর ও বাগান এবং দক্ষিণ দিকে প্রতিবেশীর বাড়ির সারি।

গিরীন্দ্রের সঙ্গে জয়ন্ত ও মানিক রাস্তার দিকের দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালো।

গিরীন্দ্র সব দেখাতে দেখাতে বলল, বারান্দার কোণে এই যে তিনখানা ঘর দেখছ, এর প্রথমখানা হচ্ছে অজিতের ঘর। দ্বিতীয়খানা অসীমের আর তৃতীয়খানা অমলের। প্রথম ঘরের এই জানালার তলায় পাওয়া গেছে অসীমের মৃতদেহ। এ দুটো ঘর এখন খালি পড়ে আছে।

জয়ন্ত দুখানা ঘরেই ঢুকে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

প্রত্যেক জানালা, এমন কি দেওয়ালের লোহার গরাদ পর্যন্ত ভাল করে পরীক্ষা করল। উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না।

তারপর তারা তৃতীয় ঘরের একটা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বাইর থেকেই দেখা গেল ঘরের ভেতরে বসে রয়েছে দুটি লোক। একজনের বয়স হবে আঠার উনিশ আর একজনের চল্লিশের কাছাকাছি।

জয়ন্তের দিকে ফিরে গিরীন্দ্র চুপিচুপি বললে, 'অমল আর তার ভগ্নিপতি সুরেনবাবু।' তারপর ঘরের দিকে ফিরে চেঁচিয়ে বললে, 'কী হয়েছে সুরেনবাবু, অমলের মুখের ভাব অমনধারা কেন?'

অমলের মাথায় সস্নেহে হাত বুলোতে বুলোতে সুরেন বলল, 'বাড়িতে আবার পুলিশ দেখে অমল বড় ভয় পেয়েছে। তাই আমি একে বোঝাবার চেষ্টা করছি।'

'বেশ করেছেন, আমরা বাঘ নই, তেড়ে গিয়ে অমলকে কামড়ে দেব না। আজ একেবারে শেষ তদন্ত করতে এয়েছি, আর আসব না।'

সুরেন বলল, 'আর তদন্ত ; এ হচ্ছে ভগবানের মার, পুলিশ তদন্তের ধার ধারে না।'

সেদিক থেকে ফিরে আসতে আসতে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, 'অমল কি এখনো এই ঘরে থাকে ?

'হাঁা।'

'একলা ?'

'হাঁা।'

'সুরেনবাবুর ঘর কোথায় ?'

'বাড়ির পশ্চিম দিকে।'

'বারান্দার রেলিঙের ওপর হাত রেখে ট্রামের রাস্তার দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে যে কী ভাবছে, তার মুখ দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই।'

মানিক বললে, 'কী হে, ধ্যানসাগরে তলিয়ে গেল নাকি ?'

'আমি তলাবার চেষ্টা করছি না মানিক, আমি ভাসবার চেষ্টা করছি।'

গিরীন ঠাট্টার সুরে বলল, 'কী আবিষ্কার করলে শুনি ?'

'শুনবে ? এই বাড়িতে চোর আসতে পারে খুব সহজে।'

'তাই নাকি ?'

'নিচের ঐ গ্যাস পোষ্টাটার দিকে তাকিয়ে দেখ। ওর ওপরে উঠলেই এই বারান্দার নাগাল পাওয়া যায়।'

'উঃ, অভাবিত আবিষ্কার।'

'আর একটা আবিষ্কার করেছি। রাস্তার ওধারকার ঐ বাড়িখানার গায়ে ভাড়া-পত্র টাঙানো রয়েছে। ও বাড়িখানা ভাড়া দেওয়া হবে।'

'তাতে তোমারই বা কী ? আমারই বা কী ?'

'মনে করছি বাড়িখানা আমিই ভাড়া নেব। জায়গাটি আমার বেশ লাগছে। কিছুদিন এখানে বাস করব।'

'মানে ?'

'মানে কিছুই নেই। এ হচ্ছে আমার খেয়াল। আর খেয়াল হচ্ছে অর্থহীন। অতঃপর আমরা প্রস্থান করতে পারি।'

জয়ন্ত ঠাট্টা করেনি, আজ কদিন হল সত্যসত্যই শালিখার সেই বাড়িখানায় উঠে এসেছে।

মানিকের কৌতুহলের সীমা নেই। সে বিলক্ষণ জানে, জয়ন্তর খেয়াল হয় না অকারণে। ঐ দুই মৃত্যুর ভেতর থেকে যে কোন সূত্র আবিষ্কার করেছে নিশ্চয়ই। নইলে ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকবার জন্যে তার এতখানি আগ্রহ কেন?

জয়ন্তের মনের ভিতর প্রবেশ করবার জন্যে গিরীন্দ্রও কম ব্যস্ত হয়ে ওঠে নি। সে রোজই আসে আর একই প্রশ্ন করে, 'কেন তুমি এ বাড়িখানা ভাড়া নিলে, এখানে থাকলে তোমার কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?'

জয়ন্ত বোবা। শুধু মুখটিপে হাসে আর নস্য নেয়।

হপ্তা দুই কেটে গেল। দুপুর বেলায় জয়ন্ত বাইরে বেরিয়েছিল। একটা ছোট ব্যাগ হাতে করে ফিরে এল সন্ধ্যার সময়ে।

মানিক বললে, 'ব্যাগটি নূতন দেখছি। ওর ভিতরে কী আছে?'

ব্যাগটা সযত্নে আলমারীর ভিতর পুরে, রহস্যময় হাসি হেসে জয়ন্ত বললে, 'যথাসময়েই বুঝতে পারবে।'

মানিক রাগ করে বললে, 'এত লুকোচুরি কেন?'

'প্রথম পরিচ্ছেদেই পরিশিষ্টের কথা বলে দিলে উপন্যাস পড়তে কারুর ভাল লাগে না। গোয়েন্দা কাহিনীর আর্ট প্রকাশ পায় লুকোচুরির ভেতর দিয়ে।'

রাত এগারোটা বেজে গেল। এই সময়ে নৈশ আহার শেষকরে জয়ন্ত শয্যায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। আজ সে খেয়ে দেয়ে রাস্তার ধারের জানালার সামনে চেয়ার টেবিল নিয়ে গিয়ে বসে পড়ল।

মানিক শুধালো, 'ঘুমোতে যাবে না?'

'না।'

'কেন হে?'

আমি দেখতে চাই আজ গভীর রাত্রে চাঁদের মুখে কালিঢেলে গোটা আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে যায় কি না। তারপর হয়ত জাগবে হু হু বাতাস, হয়ত ঝরবে ঝরো-ঝরো বাদল ধারা, হয়ত বাজবে ডিমি-ডিমি বজ্র ডমরু।'

'হঠাৎ এই উদ্ভট কবিত্বোর কারণ কী?'

'কবি হতে চায় না কে বল?'

'আকাশে তো দেখি প্রতিপদের চাঁদের প্রতাপ। কেমন করে জানলে আজ ঝড়বৃষ্টি নামবে ?'

'গণৎকার জানিয়ে দিলে।'

'সে আবার কে ?'

'আবহ-বিদ্যা নিয়ে যাদের কারবার। মান তো, আবহ-বিদ্যা জাহির করবার জন্যে সরকারি অফিস আছে ? আজ আমি সেখানে গিয়েছিলুম। খবর পেলুম, আজ শেষ রাত্রের দিকে রীতিমত ঝড় বৃষ্টির সম্ভবনা আছে।

'তুমি ক্রমেই অন্যায় রকমের দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ। আর তোমাকে বোঝবার চেষ্টা করব না। আমি এখন ঘুমোতে চাই।'

'তথাস্তু।'

অনেক রাতে কিসের শব্দে মানিকের হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের ভেতর হু হু করে ঢুকছে জোর হাওয়া। ঘরের দরজাটা খোলা। জানলার সামনে চেয়ারের উপর জয়ন্ত নেই। তার বিছানাও শূন্য।

বজ্রের হুঙ্কারে চমকে মানিক বাহিরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, চাঁদের আলোর বদলে সেখানে দেখা যাচ্ছে কেবল অন্ধকারকে। বৃষ্টি নামার শব্দও শোনা গেল।

তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে মানিকের চোখে পড়ল আর একদৃশ্য। অমরবাবুর বাড়ির সামনে গ্যাস-পোষ্টের উপরে একটা মূর্তি। পরমুহূর্তে মূর্তিটা ঝাঁপ খেল মাটির উপরে। গ্যাসের আলোকে চিনতে বিলম্ব হল না। জয়ন্ত।

মানিক হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছে, জয়ন্ত আবার এসে দাঁড়ালো ঘরের ভিতর। তার হাসি হাসি মুখ।

'এ সব কী, জয়ন্ত! জয়ন্ত, তুমি চোরের মত অমরবাবুর বাড়িতে গিয়েছিলে ?'

'গিয়েছিলাম।'

'তোমার পায়ে রবারের জুতো, হাতে রবারের দস্তানা!'

'হ্যাঁ, এ হচ্ছে Vulcanised রবার।'

'আশ্চর্য!'

'এর চেয়ে বেশি আশ্চর্য যদি হতে চাও তাহলে ছুটে যাও টেলিফোনের কাছে।'

'তারপর ?'

'গিরীনকে ফোন কর। বলব, এখুনি সদলবলে ছুটে আসতে।'

'সে কি! এই রাতে, এই ঝড়-জলে ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। বোকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করো না। গিরীনকে বলো, এখুনি সদলবলে অমরবাবুর বাড়িতে না গেলে এ মামলার কিনারা হবে না। ততক্ষণে আমি একটু বিশ্রাম করে নি।'

অল্পক্ষণ পরেই একদল পাহারাওলা নিয়ে গিরীন্দ্র এসে হাজির হন্তদন্তের মত।

সে কোন প্রশ্ন করবার আগেই জয়ন্ত বললে, 'এখন কোন কথা নয়। এখনই আমাদের যেতে হবে অমরবাবুর বাড়ির ভেতরে।'

দ্বারবানরা দরজা খুলে দিয়ে এই অসময়ে পুলিশ দেখে অবাক হয়ে গেল। জয়ন্ত সকলকে নিয়ে উঠে গেল একেবারে উপরে। রাস্তার ধারের বারন্দায় গিয়ে সে টর্চের আলো ফেলল। সেখানে পড়ে আছে একটা নিশ্চল মূর্তি।

গিরীন্দ্র সভয়ে বললে, 'বাবা, আবার সর্পাঘাতে মৃত্যু নাকি ?'

জয়ন্ত বললে, 'আরো এগিয়ে গিয়ে দেখ।'

গিরীন্দ্র কয়েক পদ অগ্রসর হয়ে ভাল করে দেখে মহা বিস্ময়ে বলে উঠল, 'একি সুরেনবাবু! এর হাত পা মুখ বাঁধল কে ?'

জয়ন্ত বললে, 'আমি ?'

'কেন ?'

'সুরেন হচ্ছে খুনী।'

'খুনী ; সুরেনবাবু আবার কাকে খুন করেছেন ?'

'অজিত আর অসীমকে।'

এমন সময় বারান্দার তৃতীয় ঘরের একটা জানলা খুলে গেল। ভিতর থেকে উঁকি ঝুঁকি মারতে লাগল অমলের ভীত মুখ।

জয়ন্ত বললে, 'সুরেন আজ আবার বধ করতে চেয়েছিল ঐ বেচারা অমলকে।'

গিরীন্দ্র বললে, 'কিন্তু অজিত আর অসীমের মৃত্যু হয়েছে বজ্রাঘাতে। বজ্র তো সুরেনবাবুর হাতে ধরা নয়।'

'অজিত আর অসীম বজ্রাঘাতে মারা পড়ে নি। তাদের মৃত্যু হয়েছে মানুষের হাতে বন্দী বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা।

'প্রমাণ?'

'ঐ জানলার দিকে তাকিয়ে দেখ।'

জানালার ছয়টা গরাদের গায়ে জড়ানো রয়েছে খানিকটা তামার তার।

গিরীন্দ্র মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'বিদ্যুৎ প্রবাহ সবচেয়ে বেশি চলে রুপোর ভিতর দিয়ে। তারপর তামার স্থান। তারপর সোনা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি।'

'বুঝলুম। কিন্তু এই তামার তারের ভিতর দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চারিত হবে যেমন করে?'

সামনেই ট্রামের লাইন। মাথার ওপরকার যে মোটা তারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ট্রাম চলে, জানলায় এই তামার তারের অন্তপ্রান্ত এখনো ঝুলছে তার সঙ্গে লগ্ন হয়ে। মাঝখান থেকে তার কেটে দিয়েছি আমি, নইলে এতক্ষণে আমাকেও কেউ জীবিত অবস্থায় দেখতে পেতে না।'

'কী ভয়ানক, কী ভয়ানক। কিন্তু—'

'এখনো তোমার মনে 'কিন্তু' আছে? তাহলে আরো একটু পরিষ্কার করে বলছি শোন।'

৪

জয়ন্ত বলতে লাগল :

'সুরেন হচ্ছে একটি প্রথম শ্রেণীর অতি চালাক শয়তান। মাথা খাটিয়ে নরহত্যার বেশ একটি নূতন উপায় আবিষ্কার করেছিল। কাজ করত এমন এক ঝড়ের রাতে, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্র যেদিন তাকে সাহায্য করবে। কী করে সে মনের মত রাত্রি নির্বাচন করত, এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে। আমি মনে করি, আমার মতন সেও কোন সরকারি আবহ-বিদ্যাবিদের কাছে আনাগোনা করত।

'এরূপ অবস্থায় মানুষের পক্ষে কী করা স্বাভাবিক, এ নিয়ে সে মনে মনে আলোচনা করেছিল। এই বর্ষাকালেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষ আমরা শয়নগৃহের জানলার পাশেই শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করি। রাত্রে যদি হঠাৎ বৃষ্টি আসে, আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। তারপর বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা

করবার জন্যে নিদ্রাজড়িত চক্ষে তাড়াতাড়ি সর্বাগ্রে খোলা জান্‌লাগুলো দুমদাম শব্দে বন্ধ করে দি।

'আমাদের এই অভ্যাসের উপরেই নির্ভর করে সুরেন ওই ফাঁদে চমৎকার ফাঁদ। খানিকটা তামার তার সে এমনভাবে জানলার গরাদগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে রাখত যে জানলা বন্ধ করতে গেলেই সেই তার স্পর্শ করা ছাড়া উপায় নেই। তামার তারের অপর প্রান্ত সে নিক্ষেপ করত বৈদ্যুতিক শক্তিতে—জীবন্ত ট্রামের তারের উপরে। ফলে জানলার তার আরও জ্যান্ত হয়ে উঠত। তখন তাকে ছুঁলেই মৃত্যু অনিবার্য।

'তারপর যথাসময়ে সুরেন আবার এসে নিজের অপকীর্তির গুপ্ত চিহ্নগুলো বিলুপ্ত করে দিত। আমার বিশ্বাস বিপজ্জনক মৃত্যুকে নিয়ে এমনভাবে খেলা করার সময়ে আমার মত সুরেনও ব্যবহার করত Vulcanised রবারের জুতো ও দস্তানা। ফলে বৈদ্যুতিক শক্তি তাকে আক্রমণ করতে পারত না।

'সুরেন এটাও হয়ত অনুমান করেছিল যে, একই বাড়িতে একই ভাবে উপরি-উপরি তিনজন লোকের মৃত্যু হলে পুলিশের সন্দেহের সীমা থাকবে না। কিন্তু এটাও তার অজানা ছিল না যে, আসল রহস্য আবিষ্কার করতে না পারলে যে কোন সন্দেহই পঙ্গু হয়ে থাকবে। কারণ সন্দেহ ও প্রমাণ এক কথা নয়। কিন্তু সুরেন অতি চালাক কিনা, তার চক্রান্ত বুঝবার মতন লোকও যে পৃথিবীতে থাকতে পারে, এটা সে ধারণায় আনতে পারে নি। এ হচ্ছে অতি চালাকির দুর্বলতা।

'একই বাড়িতে দুই ব্যক্তির উপর্যুপরি বজ্রাঘাতে মৃত্যু, অথচ ঘরে বজ্রাঘাতের অন্য কোন চিহ্ন নেই এবং মৃত ব্যক্তিকেও পাওয়া যায় ঠিক জানলার ধারেই। এইসব অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখেই আমি পেয়েছিলুম এর মধ্যে হত্যাকারীর হাতের সন্ধান। তারপর বারান্দায় তাকিয়ে জীবন্ত তারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই আমার মনে ফুটে উঠল সন্দেহের ভীষণ ইঙ্গিত।

'তারপর হত্যার উদ্দেশ্য খুঁজে পেতে বিলম্ব হল না। অমরবাবুর তিনপুত্রের অবর্তমানে সম্পত্তির মালিক হবেন তাঁর কন্যা এবং সুরেন হচ্ছে সেই কন্যার স্বামী।

'ঘটনাস্থলের উপর পাহারা দেবার জন্যেই আমি সামনের বাড়িখানা ভাড়া নিয়েছিলুম। আবহ-বিদ্যাবিদ বললেন, 'আজ গভীর রাত্রে ঝড়-বৃষ্টির

সম্ভাবনা। আমিও অতি জাগ্রত হয়ে উঠলুম। অন্ধকার ঘরে জানলার ধারে বসে যথাসময়ে দেখলুম, বারান্দার ওপর চোরের মতন সুরেনের আবির্ভাব। আমিও চুপিচুপি গ্যাসপোস্টের সাহায্যে বারান্দায় উঠে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলুম। তারপর সুরেনের মৃত্যু-ফাঁদ পাতা যেই শেষ হল, আমিও অমনি বাঘের মতন তার ঘাড়ের ওপরে লাফিয়ে পড়লুম—আমি চেয়েছিলুম তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলতে। সে টু শব্দটি করবার আগেই আমি তাকে বন্দী করে ফেললুম এবং তখনই কেটে দিলুম বৈদ্যুতিক শক্তিতে জীবন্ত মৃত্যু-ফাঁদের তার।

'গিরীন, বোধহয় তোমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই। কিন্তু আমার আরও একটি ছোট বক্তব্য আছে। বন্ধু, পুলিশে চাকরি নিয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়ো না! কল্পনা-শক্তির চর্চা করতে শেখো। কল্পনা-শক্তি কেবল কবিদের একচেটে নয়, তাকে দরকার প্রতি মানুষের প্রতি পদে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে।

দুই ডিটেক্‌টিভ, দুই রহস্য

পরিমল গোস্বামী

প্রস্তাবনা

আমি একটি যুবককে অনুসরণ করছি, তুমি আমাকে অন্বেষণ কর। ঐ যে গান্ধী-টুপি-পরা যুবকটি চলেছে, ওর নাম বেনীমাধব। ওর একটি আশ্চর্য ইতিহাস আছে, আমি সেই ইতিহাসটিই অনুসরণ করছি। ওর সেই আশ্চর্য কাহিনীটি শুনেছি, আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে, এবং সে তারও বন্ধু।

প্রথম অধ্যায়

বেনীমাধব ছিল কলেজের ছাত্র এবং ঘোরবাবু। স্বাস্থ্য তার ভাল, বয়সোচিত উদ্দীপনা আর উৎসাহের অভাব ছিল না, পড়াশুনায় ছিল প্রখর। বৃত্তি পাওয়া ছেলে। কিন্তু উৎকৃষ্ট কুসুমেও যেমন কীট প্রবেশ করে এই যুবকটির মধ্যে তেমন এক ব্যাধির প্রবেশ লক্ষণ ফুটে উঠতে লাগল। লক্ষণ

যেটি সবচেয়ে প্রবল বোধ হল, সে হচ্ছে পারিবারিক আকর্ষণে শৈথিল্য, ঘরের প্রতি ঔদাসীন্য। এ লক্ষণটি তার মায়ের চোখে আগে ধরা পড়ল। তিনি মনে মনে নানা কল্পনা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিন্তু মনে হয় কিছু বুঝতে পারলেন। বুঝে বড়ই ভাবনায় পড়লেন। তিনি ছেলের ঘরে গিয়ে একদিন আবিষ্কার করলেন, তার টেবিলে যে ক'খানা পড়ার বই ছিল, তার সংখ্যা অকারণ অনেক বেড়ে গেছে। তিনি ইংরেজি বই পড়া শেখেন নি কখনো, কিন্তু বইয়ের মলাটে যে চিহ্ন ছিল, তা থেকে তিনি চকিতে বুঝতে পেরেছিলেন, অবস্থা খুব সুবিধের নয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, ছেলের প্রসাধনেও বেশ বদল ঘটেছে। অর্থাৎ এদিকেও তার ঔদাসীন্য দেখা দিয়েছে। একটি চুল বেঁকে দাঁড়ালে যে ছেলে তাকে প্রাণপণে সোজা করে বসাত, সেই ছেলের দু'তিনটি চুল কিছুকাল ধরে খাড়া থাকতে দেখছেন, এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। কেমন যেন উদভ্রান্ত, উদাস এবং স্বপ্ন স্বপ্ন ভাব। সব মিলিয়ে মায়ের প্রাণ থেকে থেকে কেঁপে উঠতে লাগল। একটা অজানা আশঙ্কা, অথচ মুখ ফুটে তা কাউকে বলবার উপায় নেই। অশুভ কথাটা উচ্চারণ করতে তার মুখে আটকায়।

বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকে না। তার ছোট বোনকে সে ডেকে ডেকে পড়াত, এখন আর পড়ায় না। সে জন্য তার মন ভার। তার বাবা লক্ষ্য করেও লক্ষ্য করলেন না, ভাবলেন ও বয়সে তিনিও ওরকম হয়েছেন, কোনো একটা আদর্শবাদ মাথায় ঢুকে থাকবে,কিন্তু সে আর কতদিন।

কিন্তু তার অনুমান ঠিক হল না। ক'দিন নয়, বছরখানেকের মধ্যে ব্যাধির লক্ষণ এমন বেড়ে গেল যে তার পক্ষেও আর চুপ করে থাকা চলল না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কিন্তু রহস্য ভেদ করার কাজ হচ্ছে ডিটেকটিভদের, আপন ছেলের বিষয়ে কোনো রহস্য বাপ ভেদ করতে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করে, এক্ষেত্রেও তাই হল, রাধামাধব সেরকম চেষ্টা করলেন না, শুধু স্ত্রীকে বললেন, কৌশলে মেয়েটার পরিচয় নাও, এবং নিতান্ত অসম্ভব না হলে সব ঠিক করে ফেলো। কিন্তু স্ত্রী তো ভিতরের খবর সবই জানেন, কাজেই তার ভয় আরো বেড়ে

গেল। তিনি আরও জানেন, ছেলের যে ব্যাধি তিনি অনুমান করেছেন, তার বিষয়ে কিছুই না জেনে যদি প্রেসক্রিপসনে কোনো বিয়ের কনের ব্যবস্থা করতে হয়, তাহলে হিতে বিপরীত হবে। তিনি একটা অজানা ভয়ে অত্যন্ত মুষড়ে পড়লেন, অথচ মনের মধ্যে যে কথাটি কাঁটার মত বিঁধে আছে তা কতবার তিনি বলতে গিয়েও মুখে আটকে গেছে, বলতে পারেন নি।

তৃতীয় অধ্যায়

পাঠক, তুমি কি কিছু অনুমান করতে পার? না, কি করে পারবে, তুমি তো আর ডিটেকটিভ নও। আধা ডিটেকটিভ হতে গিয়ে যিনি পিছিয়ে এসেছেন, তার কথাই তো এতক্ষণ বলছিলাম, তিনি বেনীমাধবের মা। তিনি মনের সব কথা সম্পূর্ণ গোপন করে স্বামীকে ভারী গলায় বললেন, দেখ চেষ্টা করে, আমি এর মধ্যে নেই। কিন্তু রাধামাধব প্রিন্সিপল-ওয়ালা লোক, তিনি নিজে এ দায়িত্ব নিতে চান না। এবং আসল কথা না জেনে কনে দেখতেও রাজি নন, মস্ত বড় সঙ্কট। তিনি একটি সম্পূর্ণ রাত শারলক হোমসের অনুকরণে এসে বসে তামাক খেলেন, এবং সামান্য কয়েকটি সূত্র ধরে ইনডাকটিভ এবং ডিডাকটিভ উভয়বিধ পদ্ধতিতে চিন্তা করেও কিছুই কিনারা করতে পারলেন না। সকালবেলা শুধু তার মাথা দপদপ করতে লাগল, চোখ দুটি রক্তবর্ণ ধারণ করল এবং মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি মনে মনে একটি শপথ করে বসলেন। এবং যে বিষয়ে এতদিন প্রায় উদাসীন ছিলেন, সেই বিষয়ে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে উঠলেন। তবে ছেলের ব্যাপারে নিজে ব্যক্তিগত-ভাবে হস্তক্ষেপ করলেন না, এ নীতিটি তিনি তখনও বজায় রাখলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

পাঠক, তুকি কি ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকারের কথা ভুলে গিয়েছ? অবশ্যই ভুলতে পার না। সে সামান্য চার পাঁচটা রহস্য ভেদ করেই ভারত বিখ্যাত হয়েছিল সেকথা কে না জানে? তবে তাকে আমরা বহুদিন দেখি নি। কিন্তু দেখি নি বলেই যে সে লাম্বার রুমে পড়ে পড়ে গায়ে মরচে ধরাচ্ছে, তা মনে করার কোনো হেতু নেই। সে আজ কয়েকবছর ধরে ইউরোপের নানা জায়গায় মেকআপ-বিদ্যা—ছদ্মবেশ ধারণের নূতন নূতন

কৌশল শিখে বেড়িয়েছে। ছদ্মবেশ ধারণে তার তুল্য এখন ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় কেউ নেই। শুধু ছদ্মবেশ নয়, সে এখন অসাধ্য সাধন করতে পারে। খাড়াভাবে পোঁতা গ্রীজ-পোলের মাথায় সে শুধু দু'খানা পায়ের সাহায্যে, দেহটিকে পোলের সমকোণ অবস্থায় রেখে উঠতে পারে। ওঠবার সময় দুহাতে তার প্রিয় যে কোনো একখানা বই পড়ে। অথবা নোট লেখে। বেণীমাধবের বাবা রাধামাধব এই ব্রজবিলাসকেই নিযুক্ত করলেন পুত্রের রহস্য ভেদের কাজে। কিন্তু ফী হাজার টাকার নীচে সে কিছুতেই নিতে রাজি হল না। এই রকমই হয়। আগে সে পাঁচ টাকা বা সাড়ে পাঁচ টাকায় যে কোনো রহস্য ভেদ করত। এখন বিদেশ ঘুরে এসে তার দাম বেড়ে গেছে। রাধামাধব কৃপণ নামে খ্যাত। তার পক্ষে এত টাকা একসঙ্গে দেওয়া প্রাণান্তকর। অথচ ব্রজবিলাস সব টাকা অগ্রিম না নিয়ে কাজ করবে না। শেষে তিন দিনের কচলাকচলির পরে ব্রজবিলাস দুটি কিস্তিতে টাকা নিতে রাজি হল এবং পাঁচশ টাকা অগ্রিম নিয়ে টাকার রসিদ এবং রহস্য ভেদের গ্যারাণ্টিপত্র লিখে দিয়ে বিদায় নিল।

পঞ্চম অধ্যায়

পাঠক, ঐ যে দেখতে পাচ্ছ রাজপথে বেণীমাধবের থেকে দশ বারো হাত দূরত্ব বজায় রেখে একটি শুকনো নোংরা কুকুর তাকে অনুসরণ করে চলেছে। ওটি আসলে কুকুর নয়। ওই হচ্ছে ডিটেকটিভ ব্রজবিলাস সরকার। কিন্তু সে খুব নিশ্চিন্ত মনে চলছে না। ছদ্মবেশ ধরা পড়ার ভয়ে নয়, তার ভয় করপোরেশন থেকে তাকে ধরে নিয়ে না যায়। করপোরেশন থেকে ধরার হিড়িক চলছিল তখন। অবশ্য সে অন্য যে-কোন ছদ্মবেশ ধারণ করতে পারত কিন্তু তাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হত না। এই বিশেষ কেসটিতে কুকুর সাজাই নিতান্ত প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন হলে সে পাখী সাজতেও পারে। এমনি তার বিদ্যা। এই তো একবছর আছে পরীক্ষামূলক-ভাবে সে লণ্ডনে একটি কেস হাতে নিয়ে ভারতীয় ময়না সেজে অপরাধীর বাড়িতে গিয়ে ধরা দিল, এবং সেখানে খাঁচায় অতি আদরে পালিত হয়ে তাদের সমস্ত গোপন তথ্য জেনে নিল এবং খাঁচা থেকে পালিয়ে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে এসে সব জানিয়ে দিল। ব্লেকও এই কেস হাতে নিয়েছিল, কিন্তু

ব্রেক ছুটে আসার আগেই ব্রজবিলাসের সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। ব্রেক পরাজিত হয়ে ফিরে গেল, বলল এসব ভারতীয় ম্যাজিক। কিন্তু ইয়ার্ডের পুলিশ কমিশনার ব্রজবিলাসের অপ্রত্যাশিত সাফল্যে মুগ্ধ এবং গদগদ হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে এমন চুমো খেয়েছিল যে সে দাগ তার মুখ থেকে এখনও মেলায় নি। কমিশনার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ব্রজবিলাসকে প্রশংসাপত্র দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ব্রজবিলাস তা নিতে অস্বীকার করে হেসে বলেছিল, আর ওসব কেন, এই দাগ রইল, এটাই বড় সার্টিফিকেট।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রজবিলাস পুরো একটি সপ্তাহ বেণীমাধবকে অনুসরণ করে তার ডায়ারির খাতা বিচিত্র তথ্যে বোঝাই করে ফেললো এবং অতি সহজেই রহস্যের তলদেশে গিয়ে পৌছলো। কিন্তু তখনই তা রাধামাধবকে জানান না; কারণ মাত্র সাতদিনে কাজ উদ্ধার হয়েছে দেখলে রাধামাধব ভাববে এমন সহজ কাজের জন্য এতগুলো টাকা জলে গেল। তাই সে পনেরো দিন পরে আরও একবার বেণীমাধবকে শেষবারের জন্য (এর প্রয়োজন ছিল না, তবু ডবল নিশ্চিত হওয়ার জন্য) অনুসরণ করে কুকুরের বেশেই রাধামাধবের সঙ্গে দেখা করতে গেলো। রাধামাধব প্রতিদিনই ব্রজবিলাসের অপেক্ষা করছিলেন এবং তাকে না দেখে ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন, এমন সময় ব্রজবিলাসের পরিবর্তে দরজায় এক শুকনো কুকুর দেখে ভীষণ বিরক্ত হয়ে লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করতে গেলেন। কুকুরবেশী ব্রজবিলাস মানুষের ভঙ্গিতে দু'পায়ে খাড়া হয়ে বলল, আপনি চিনতে পারেন নি, তাতে আমি খুশিই হয়েছি; শুনুন, আপনার পুত্র কমিউনিস্ট হয়েছে আর কোনো ভাইস তার নেই। তাকে আমি দুভাবে বিচার করেছি। কুকুর সেজে তাকে অনুসরণ করে দেখেছি কোথায় কোথায় সে যায়, এবং নিজে মার্কসবাদী সেজে তার সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি তার বিশ্বাসকে কারো নাড়া দেবার সাধ্য নেই। আমি অবশ্য প্রায় ছাত্ররূপে দীক্ষিত হতেই গিয়েছিলাম, তর্কও করেছিলাম, কিন্তু পরাজিত হয়েছি। অবশ্য জোর করে তার বিশ্বাসকে নাড়া দিতে গেলে সে অবিশ্বাস করতো, আমায় সন্দেহ করতো। কিন্তু এ বিষয়ে তার জ্ঞান দেখে অবাক হয়েছি, আমাকে সে

অনেক কিছু শেখাতে পারে। যাই হোক, তার সম্পর্কে আমাকে যা জানতে দিয়েছিলেন, তা জানিয়েছি। এবারে বাকি টাকাটা দিয়ে দিন।

রাধামাধব সব শুনে ক্ষেপে গেলেন। বললেন, অমি এর একটা কথা বিশ্বাস করি না, তুমি ভুল লোককে অনুসরণ করেছো।

আসন্ন বিপদ বুঝে তার স্ত্রী ছুটে এলেন সেখানে এবং বললেন, উনি মিথ্যা বলেন নি, আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম সব, কানেও এসেছে অনেক কথা।

রাধামাধব এবারে আরও ক্ষিপ্ত হলেন বললেন, তুমি—তুমি জানতে, অথচ বলো নি? হাজার টাকা খরচ করালে এ জন্য?

স্ত্রী তাকে বললেন,. তুমি একটু থামো তো? কেন বলি নি সেকথা তোমাকে পরে বলব, আপাততঃ তুমি ওর সঙ্গে কথা মিটিয়ে ফেলো। আর ব্রজবিলাসবাবু, আপনি ওই কুকুরের ছদ্মবেশ ছাড়ুন, একটা কুকুরকে আপনি বলতে আটকাচ্ছে।

রাধামাধববাবু এতক্ষণে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছেন এবং অপরিচিত লোকের সামনে দাম্পত্য কলহ শুরু করে কিছু লজ্জিতও হয়ে পড়েছেন। তিনি স্ত্রীর কথার প্রতিধ্বনি করে অনেকটা শান্ত স্বরে ব্রজবিলাসকে বললেন আপনি বলতে আমারও আটকাচ্ছে, আমি আগে তুমি বলে ফেলেছি; কিছু মনে করবেন না।

ব্রজবিলাস বলল, স্নানের ঘরটা দেখিয়ে দিন।

পাঁচমিনিটের মধ্যে ব্রজবিলাস নিজ মূর্তিতে বেরিয়ে এলো কুকুরের ছালটা তার হাতে ব্যাগের মত ঝুলছে।

কিন্তু রাধামাধববাবুর উদ্বেগ কমল না। তিনি উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন এবং হঠাৎ ব্রজবিলাসের দিকে ফিরে বললেন, ওকে ফেরাবার উপায় কি? ব্রজবিলাস বললে, সে কাজ আমার নয়। আমার কাজ আমি করেছি, টাকাটা দিয়ে দিন। রাধামাধববাবু ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে ব্রজবিলাসের প্রাপ্য বাকি টাকাটা দিয়ে দিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

পাঠক, শুনে দুঃখিত হবে, রাধামাধববাবু পুত্রকে ফেরাতে পারলেন না। ফেরানোর উপায় চিন্তা করতে না করতে শোনা গেল ছেলে কোন এক আইন অমান্য দলে ধরা পড়েছে এবং ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ করতে করতে জেলে গিয়েছে। জেল হয়েছে এক বছর। এ সংবাদে বেণীমাধবের বাবা ও মায়ের কি অবস্থা হল তা আমাদের জানবার দরকার কি? কোনো নায়কের বাপমাকে নিয়ে কোনো পাঠকের মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু পাঠক, তোমার পুত্র কখনো জেলে গিয়েছে কি? যদি না গিয়ে থাকে, তবে আর ওদের দুঃখ কল্পনা করতে চেষ্টা করো না, দরকারও নেই। মাত্র একটি বছর। কিন্তু তা কত দীর্ঘ—তা নির্ভর করে বছরটা কার, তার উপর। পাঠকের কাছে এই এক বছর দশ বছর মনে হতে পারে যদি বলতে আরম্ভ করি। কিন্তু না বলব না। বেণীমাধবের বাপমায়ের কাছে এই এক বছর অবশ্যই একটা যুগ মনে হল, কিন্তু সব যুগেরই পার আছে, এবং যে পার শুধু ক্যালেণ্ডারের বছরেই হয় না, মানুষের মনের বছরও পার হয়। কিন্তু পাঠক, তত্ত্বকথা শুনতে চেয়ো না, ঘটনা অনুধাবন করবার চেষ্টা কর। বেণীমাধবের মুক্তির আর সাতদিন মাত্র বাকি। এমনি সময়ে সে তার বাবাকে জানাল তাকে অবিলম্বে খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবী এবং একটি গান্ধীটুপি পাঠিয়ে দেওয়া হোক! ওই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত খবর পেয়ে রাধামাধববাবু প্রায় নাচতে শুরু করলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন পুলিশকে এজন্য তিনি পুরস্কার দেবেন। এতবড় মহৎ কাজ আর কারো দ্বারা সম্ভব হত না। অবশেষে এল মুক্তি দিবস। বেণীমাধব চমৎকার কংগ্রেসী পোষাকে সেজে, গান্ধীটুপি মাথায় বন্দেমাতরম ধ্বনিতে জেলখানা মুখরিত করে বাইরে বেরিয়ে এলো। কংগ্রেসের এক বিরাট দল তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে বসল, এ দলের পুরোভাগে রাধামাধব। তিনি কোনো দলেই ছিলেন না, কিন্তু ছেলে খদ্দর পোষাক চাওয়ার পরই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

কংগ্রেসী পাঠক, তোমার কোনো কমিউনিস্ট ছেলে হঠাৎ কখনও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে কি? না দিলে বুঝতে পারবে না রাধামাধব ও তার স্ত্রীর মনে আজ কি আনন্দ। বিশেষ করে তারা এখন কংগ্রেসী হওয়াতে আনন্দের পরিমাণ শতকরা অন্ততঃ পঁচিশ গুণ বেড়ে গেছে। এই বৃদ্ধিটাও তোমার মনে কোনো আলোড়ন জাগাবে না। কিন্তু না জাগায় যদি বয়েই গেল। অতএব সে কথা থাক। পরবর্তী সমস্যা তাদের নয়, বেণীমাধবের বন্ধুদের। কারণ সে গান্ধীটুপি পরার পর থেকে আর তাদের সঙ্গে মেশে না। পথের ছেলেরা বেণীমাধবের মাথার দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলে বেণীমাধবের ধ্বজা দেখে যা। বেণীমাধব অবশ্য এতে বিচলিত হয় না। বেণীমাধব কাউকে কিছুই বলে না, মনটা তার কিছু বিষণ্ণ, অথচ তার কোনো হেতু খুঁজে পায় না কেউ। অতএব কানাঘুষো চলতে থাকে নানারকম। অনেক জাগতিক ঘটনার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, একথা সত্য, এমন কি অনেক মানসিক ঘটনারও কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না একথাও সত্য, কিন্তু তাই বলে কেউ চুপ করে বসে থাকে কি? থাকে না। বেণীমাধবের বন্ধুরাও চুপ করে বসে রইল না।

নবম অধ্যায়

পাঠক, এইবার বেণীমাধবের এক ভূতপূর্ব বন্ধু ধনঞ্জয় গুপ্তকে (কঃ পাঃ) অনুসরণ করি এসো। ঐ যে সে বসে আছে ডিটেকটিভ ব্রজবিলাসের মুখোমুখি। ব্রজবিলাস বলছে, হাজার টাকার নিচে আমি কোনো কেস নিই না। ধনঞ্জয় প্রাণপণে বোঝাচ্ছে এ কোন লাভের ব্যাপার নয়, একটি বিশুদ্ধ রহস্য, এ রহস্য আদৌ ভেদ করা যায় কিনা তা দেখতে কি আপনার কৌতূহল নেই? থাকা তো উচিত। ব্রজবিলাস নিবিষ্ট মনে পাইপ টানতে টানতে বলল, রহস্যের জন্য রহস্য—আর্টস ফর আর্টস সেক—কথাটা শুনতে মন্দ নয়! কিন্তু আমি সে অবস্থা পার হয়ে এসেছি। আপনি বরং আমার ভূতপূর্ব সাকরেদ শম্ভুর কাছে যান, সেও খুব ওস্তাদ ডিটেকটিভ এবং সস্তাও বটে। তার ফী মাত্র আড়াই টাকা, এখনও দর বাড়ায় নি। কী কষ্টে যে

সংসার চালায়, কিন্তু লোকটা খাঁটি। তাকে আমি আমার সহকারী করে নেব কিছু দিনের মধ্যেই। যাবেন তার কাছে। এই নিন তার কার্ড।

আড়াই টাকার কথা মন্ত্রের কাজ করল। ধনঞ্জয় তৎক্ষণাৎ শম্ভুর কাছে চলে গেল।

দশম অধ্যায়

পাঠক, শেষ অধ্যায়টি বড়ই জটিল, বড়ই করুণ এবং নিরাশায় ভরা। কিন্তু শম্ভুর অসাধারণ কৃতিত্বের কথায় এ সবের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে। শম্ভু কেসটি হাতে নিয়েই বেণীমাধব যে জেলে ছিল সেখানে চলে গেল। তার পরিচয় পুলিশ মহলে জানা, অতএব কোনো অসুবিধে হল না। সে প্রথমে বেণীমাধব যে ঘরটিতে ছিল সেখানে গিয়ে বসল। তারপর গুরুর অনুকরণে এক পাইপ তামাক খেলো বসে বসে। এক ঘণ্টা লাগল। এক ঘণ্টায় ধোঁয়ায় ঘর আচ্ছন্ন হল, কিন্তু তার আচ্ছন্ন বুদ্ধিও অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বেণীমাধবকে একখানা চেয়ার ও টেবিল দেওয়া হয়েছিল, তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বসে, শম্ভু আবার তামাকের ধোঁয়া এবং চিন্তার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল। হঠাৎ তার চোখে পড়ল একটি কাগজ, ছোট্ট এবং দুমড়ানো, টেবিলের নিচে এবং দেয়ালের অন্ধকার কোণে পড়ে আছে। সেখানা খুলে তার লিখন পাঠ করতেই তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। এবং সে অবিলম্বে তার হাত ব্যাগ থেকে ম্যাগনিফায়িং গ্লাস বার করে টেবিলের ওপর অদৃশ্য কোনো বস্তু খুঁজতে লাগল। লিখনটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত অর্থপূর্ণ। বাঞ্ছিত জিনিস তাকে পেতে হবেই টেবিলে। দুই আর দুই চার এই অমোঘ বিধান আজও কেউ বদলাতে পারে নি। ধোঁয়া থাকলে আগুন থাকতেই হবে, একথাও তো সকলের জানা। কিন্তু ডিটেকটিভের কাজ ঠিক এর উল্টো দিক থেকে শুধু করতে হয়। অর্থাৎ আগুন যখন আছে, তখন কোনো কালে ধোঁয়া অবশ্যই ছিল, অতএব তার চিহ্ন তাকে আবিষ্কার করতে হয়।

শম্ভু অল্পক্ষণের সন্ধানেই প্রচুর চিহ্ন পেয়ে গেল, এবং তা খুব যত্ন করে একখানা ছুরির সাহায্যে জড়ো ক'রে প্লাস্টিকের একটি কৌটায় সংগ্রহ ক'রে রাখল। তারপর সে গেল জেল ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে। সেখান

থেকে সে গেল ঔষধ তৈরীর ঘরে। কমপাউণ্ডারের কাছ থেকে সে অনেক কিছু জেনে নিল।

পাঠক, ভাবছ শম্ভু যদি সবটা আগেই বুঝে থাকে, তাহলে এত কাণ্ড করার দরকার কি? কিন্তু এরকম ভাবা ঠিক নয়। সব জানলে, সব মিলিয়ে না দেখলে ডিটেকটিভ কখনো তৃপ্ত হয় না, গল্পেরও সাসপেন্স নষ্ট হয়ে যায়।

কিন্তু পাঠক, ওই দেখ, শম্ভু বাড়িতে এসে তার গবেষণা ঘরে বসে জেল থেকে সংগৃহীত এক শিশি ক্লু মাইক্রোস্কোপের নিচে ফেলে দেখছে আর শিস্ দিচ্ছে। শম্ভু বড় ডিক্টেটিভ হবার জন্য নিজে কয়েকবছর মেডিকেল কলেজে পাঠ নিয়েছিল।

একাদশ অধ্যায়

পাঠক, আর দেরী নয়, এবারে রহস্য ভেদ। ঐ যে ধনঞ্জয় বসে আছে শম্ভুর সামনে। শম্ভু অগ্রিম এক টাকা নিয়েছিল, বাকি দেড় টাকা নিয়ে তার অদ্ভুত রহস্যভেদের কথা বলতে আরম্ভ করল: দেখুন ধনঞ্জয়বাবু, এটি বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক কেস। বেণীমাধব চেহারা বিষয়ে ছিল অত্যন্ত মনোযোগী এবং সেকথা আপনি যেদিন আমাকে কেস দেন, সেইদিন বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন সে তার চুল বিষয়ে আগে অত্যন্ত বিলাসী ছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট হওয়ার পর চেহারা চুল ও পোশাক সব বিষয়েই উদাসীন হয়ে পড়েছিল এবং আমি সেকথা বিশ্বাস করেছি। কিন্তু আপনি হয়তো জানেন, মনের কোনো বাসনা দমিত থাকলে ভবিষ্যতে যে কোনো সময়ে আবার তা জাগতে পারে। বেণীমাধবেরও তাই হয়েছিল। সে কিছুদিন জেল বাসের পরেই চুল সম্পর্কে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু দৈব ছিল প্রতিকূল, হঠাৎ তার মাথায় অতি মারাত্মক রকমের একজিমা দেখা দেয় এবং তার ফলে সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়ে। পাঠক, তুমি কখনো কারো মাথায় একজিমা হতে দেখেছ? না দেখলে বুঝতে পারবে না, তা কি ভয়ঙ্কর হতে পারে। বেণীমাধবেরও অবস্থা তাই হল এবং ক্রমে তার চুল উঠে যেতে লাগল। এই চুল উঠে যাওয়ার মধ্যে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না, এলোমেলোভাবে এক এক জায়গা থেকে এক এক গোছা উঠে

গেল। তাই জেল থেকে তার মুক্তির দিন যত এগিয়ে আসতে লাগল, ততই লজ্জায় ক্ষোভে সে অস্থির হতে লাগল। শেষে একদিন স্থির করল যে আত্মহত্যা করবে। সমস্ত রাত সে চিন্তা করল। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব, তা তার মাথায় এলো না। শেষে হঠাৎ একসময় সে কর্তব্য স্থির করে ফেলল। এখন ওটাই তার একমাত্র পথ। অর্থাৎ সে স্থির করলো, কংগ্রেসে যোগ দেবে।

তারপরের ঘটনা পাঠকের জানা আছে। লজ্জার হাত থেকে বাঁচার জন্য গান্ধী টুপি পরা ভিন্ন সত্যিই তার আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু হাজার টাকা খরচ করলেও যে রহস্য ভেদ করা কঠিন ছিল, শম্ভু আড়াই টাকা ফি নিয়ে গান্ধী টুপির নীচে মাত্র পাঁচ ইঞ্চি জায়গার মধ্যে এক বড় একটা রহস্যের সন্ধান পেল। এজন্য আমি তার সঙ্গে দেখা করে তাকে চুমো খেয়ে এসেছি। আশাকরি পাঠক আমার অনুসরণ করবে না, তুমি নিজ রুচিতে যা বলে, তাই করবে।

হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্য

বনফুল

১

হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে।

এ মৃত্যু সুখের অথবা দুঃখের, তাহার বিচার নীতিবিদেরা করিবেন। আইনত তিনি ললিতার স্বামী ছিলেন। তিনি ছিলেন একটি মনুষ্যরূপী দানব, ইহার কবল হইতে ললিতাকে উদ্ধার করিয়া হরবিলাস সৎসাহসেরই পরিচয় দিয়াছেন। আজীবন তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে একঘরে হইয়া বাস করিতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কর্মটি যে একটি অসাধারণ রকম সৎকর্ম। তাহাতে সন্দেহ নাই। সমাজ সংস্কারের জন্য হরবিলাসের মত সাহসী লোকেরই তো প্রয়োজন। এরূপ লোকের তিরোভাব নিতান্তই দুঃখের।

হরবিলাসের একমাত্র বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কিন্তু এসব লইয়া মাথা ঘামাইতেছিল না। সে কেবল ভাবিতেছিল হরবিলাসের মৃত্যুর কারণ কি? লোকটা কাল রাত্রি দশটা পর্যন্ত সুস্থ ছিল, খোশমেজাজে কতরকম গল্প করিল, সহসা কয়েক ঘণ্টার

মধ্যে কী হইল? মৃত্যুর কোন লক্ষণই তো সে তাহার মধ্যে লক্ষ্য করে নাই। ব্যাপরটা বেশ একটু রহস্যময় বলিয়া মনে হইল। বিশেষত হরবিলাসের একটি কথা মনে হওয়াতে সিদ্ধেশ্বরের ধারণা হইল যে এ মৃত্যু স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। হরবিলাস কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে একদিন বলিয়াছিলেন, 'ললিতাকে নিয়ে যখন এখানে চলে আসি তার কিছুদিন পরে বঙ্কেশ্বরবাবু আমাকে একটা চিঠি লেখেন। কী লিখেছিলেন জান? লিখেছিলেন—এর প্রতিশোধ আমি নেবই। জীবন দিয়ে আপনাকে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। দূরে পালিয়ে গিয়ে নিস্তার পাবেন না। আদালতে নালিশ করে ললিতাকে আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি, কিন্তু ওর মুখদর্শন করবার ইচ্ছে নেই। ওকেও আমি শাস্তি দেব, দেখে নেবেন।

হরবিলাসের ম্লান হাসিটা সিদ্ধেশ্বরের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। ভীত, ম্লান হাসি। সহসা তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যুটাও ঠিক স্বাভাবিকভাবে হয় নাই। কে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া কি একটা প্রসাদ তাহাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া গিয়াছিল। সেইদিনই কলেরা হইয়া তাহার মৃত্যু হয়। সত্যই কি তাহার কলেরা হইয়াছিল? সেই সন্ন্যাসী যে বঙ্কেশ্বরের চর নয়, তাহাও তো নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। হয়ত প্রসাদের সহিত বিষ ছিল।—

বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে সিদ্ধেশ্বর শোকাকুল হইয়াছিল, এইসব কথা চিন্তা করিয়া একটু উত্তেজিত হইল। তাহার মনে হইল, ললিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন তদন্ত করিবার কথা কাহারো মনে হয় নাই, কিন্তু হরবিলাসের এই রহস্যময় মৃত্যুতে যখন তাহার মনে খটকা লাগিয়াছে, তখন তদন্ত না করিয়া সে ছাড়িবে না। হরবিলাসের আত্মীয়স্বজন কেহ নাই, তাহাকেই সব করিতে হইবে। উত্তেজনাভরে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। যে ভৃত্যটি হরবিলাসের মৃত্যুসংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছিল, তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, তুই যা, আমি আসছি এখুনি। বাড়িতে আর কোনও লোক যেন না ঢোকে, বুঝলি?'

ভৃত্য সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। একটু পরে সিদ্ধেশ্বরও বাহির হইয়া পড়িল। প্রথমেই গেল থানায়।

২

শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নাই। হৃদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়া হরবিলাসের মৃত্যু হইয়াছে, ইহাই ডাক্তারের অভিমত। হরবিলাসের

হৃদযন্ত্র দুর্বল ছিল, তাহা আরেকজন ডাক্তারও বলিয়াছিল, ইহা লইয়া হরবিলাসের খুঁতখুঁতানিরও অন্ত ছিল না। সামান্য একটু কিছু হইলেই তাহার বুক ধড়ফড় করিতে। কিন্তু এতদিন তো ওই হৃদযন্ত্র লইয়াই তিনি বেশ বাঁচিয়া ছিলেন। সহসা এমন কী হইল ?... থানার দারোগা হরবিলাসের মৃত্যুতে সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সিদ্ধেশ্বর কিন্তু নিঃসন্দেহ হইতে পারিলে না। সে বাড়ির চাকরটাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল।

'তুই কী করে প্রথমে টের পেলি যে বাবু মারা গেছেন ?'

'বাবু রোজ ভোরে ওঠেন, কিন্তু সেদিন রাত দশটা পর্যন্ত যখন উঠলেন না, ডাকাডাকি করেও সাড়া পেলাম না, তখন জানলার সেই ফোকরটা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম—

'ও!'

ফোকরটার ইতিহাস সিদ্ধেশ্বরের মনে পড়িয়া গেল। হরবিলাসের দেশ হইতে একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আসিয়াছিলেন। হরবিলাস তাহাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি যখন আত্মীয় বলিয়া পরিচয় দিলেন, তখন তাঁহাকে বাড়িতে স্থান দিতে হইল। ভদ্রলোক নাকি ব্যবসা-সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে এ অঞ্চলে আসিয়াছিলেন, হরবিলাসের বাড়িতে দিন সাতেক ছিলেন। সেই সময়ে তিনি নাকি লক্ষ্য করেন যে, ঘুমের ঘোরে হরবিলাস প্রত্যহ গোঁ গোঁ করিয়া শব্দ করেন, মনে হয় যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। হরবিলাস ব্যাপারটা তত গ্রাহ্যের মনে আনেন নাই, ভদ্রলোক কিন্তু ইহাতে খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি একজন ডাক্তারই ডাকিয়া আনিলেন। তিনি আসিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের এখনো মনে আছে। একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'সৌভাগ্যক্রমে ডাক্তার ঘোষের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল এখানে। ইনি পশ্চিমে প্র্যাকটিস করেন, এখানে একজন মারোয়ারী রোগীর কল পেয়ে এসেছেন। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল, তাই একে ডেকে নিয়ে এলাম, তুমি একবার বুকটা দেখাও তো এঁকে। রাতে ঘুমের ঘোরে যেরকম কর, ভয় হয়—

ডাক্তার ঘোষ হরবিলাসের বুকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, 'আপনার হার্ট খারাপ, তাই শ্বাস কষ্ট হয়।'

হরবিলাস বলিল, 'আমি তো তেমন টের পাই না।'

'আর কিছুদিন পরে টের পাবেন।'

'কী করব তাহলে?'

'মাথার কাছের জানলাটা খুলে শোবেন। সাফ হাওয়া দরকার।'

'ও বাবা! আমি ভীতু মানুষ, তা পারব না মশাই।'

'জানলা সবটা খুলতে না পারেন, ছোট একটা ফোকর করিয়ে নিন জানালায়। বাইরের অক্সিজেন ঘরে খানিকটা ঢুকলেই হল।'

হরবিলাস চুপ করিয়াছিল।

আত্মীয়টি বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি করিয়ে দিয়ে তবে যাব।'

হরবিলাসের মাথার শিয়রের গোল ছিদ্রটি তিনিই করাইয়া দিয়াছিলেন। পরদিন নিজে গিয়া মিস্ত্রি ডাকিয়া ছিদ্রটি করাইয়া তবে তিনি অন্য কাজ করেন। তাহার পর তিনি বেশীদিন ছিলেনও না।

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে লাগিল। ওই ছিদ্রপথেই মৃত্যু আসে নাই তো? কিন্তু কিরূপে?

'আচ্ছা, হরবিলাসের সেই আত্মীয়টি চলে যাবার পর কেউ এসেছিল?'

'আজ্ঞে না, তবে সেদিন একটি পাঞ্জাবী জ্যোতিষী এসেছিল।'

'পাঞ্জাবী জ্যোতিষী! কবে?'

'দিন পনেরো আগে।

'কী বললে সে?'

'তা তো জানি নে বাবু। তবে অনেকক্ষণ ছিল।'

সিদ্ধেশ্বর ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাসের মৃত্যু-রহস্যের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া তাহার বোধ হইল না।

৩

মৃত্যুর ছয়মাস পূর্বে হরবিলাস একটি উইল করিয়াছিলেন। উইলে ছিল যে, তাহার মৃত্যুর পর তাহার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইবে। "ললিতা বৃত্তি" নাম দিয়া বিশ্ববিদ্যালয় নারী-শিক্ষা প্রসারের জন্য উক্ত টাকার সুদ হইতে একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার মৃত্যুর পর সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত থাকেন তাহা হইলে সিদ্ধেশ্বরই তাহার বিষয় প্রভৃতির বিক্রয়ের ভার লইবে। সিদ্ধেশ্বর যদি জীবিত না থাকে গভর্মেন্টের উপর এই ভার অর্পিত হইবে।

বিষয় সম্পত্তির বিক্রয়ের জন্ত সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের খাতাপত্র দেখিতেছিল। সহসা কতকগুলি ডায়েরি তাহার হাতে পড়িল। হরবিলাস যে এমন নিয়মিত-ভাবে ডায়ারি লিখিতেন, তাহা সিদ্ধেশ্বরের জানা ছিল না। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত হরবিলাস ডায়েরি লিখিয়া গিয়াছেন।

ডায়েরির পাতা উল্টাইতে এক স্থানে সিদ্ধেশ্বরের দৃষ্টি আটকাইয়া গেল। একস্থানে লেখা ছিল: আজ একজন পাঞ্জাবী জ্যোতিষী আসিয়াছিল। সে আমার হস্তরেখা বিচার করিয়া একটি অদ্ভুত কথা বলিল। খানিকক্ষণ আমার হাতের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল, 'আপনাকে যদি একটা কথা জিজ্ঞেস করি, রাগ করিবেন না তো?'

বলিলাম, 'না' রাগ করিব কেন, কী জানিতে চান বলুন।'

সে বলিল, 'আপনি কি কখনও পরস্ত্রী হরণ করিয়াছিলেন?'

আমি প্রথমটা অবাক হইয়া গেলাম, তাহার পর মনে হইল এ খবর কাহারও নিকট সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। বলিলাম, 'ধরুন যদি করিয়াই থাকি।'

জ্যোতিষী বলিল, 'তাহা হইলে একটি বিষয়ে আপনাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। সর্পাঘাতে আপনার মৃত্যু হইবে। এমন স্থানে কখনও যাইবেন না যেখানে সাপ থাকিতে পারে।' এই কথাগুলি বলিয়া জ্যোতিষী চলিয়া গেল।

জ্যোতিষীর কথাটা বড়ই অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে ললিতার ব্যাপারটা সে আমার হস্তরেখা হইতেই নির্ণয় করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। তাহা যদি হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণীটি তুচ্ছ করিবার মত নয়, সাবধানে থাকা উচিত। সাবধানেই আছি, বাড়ি হইতে পারতপক্ষে কখনও বাহির হই না। নিজের ঘরটিতেই বসিয়া থাকি। কাল কিছু কার্বলিক অ্যাসিড আনাইব। শুনিয়াছি ঘরের চারিদিকে কার্বলিক লোশন ছিটাইলে সাপ আসে না।

সিদ্ধেশ্বর ডায়েরির পাতাটার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হরবিলাস যে কিছুদিন পূর্বে কার্বলিক এ্যাসিড আনাইয়া ঘরের চতুর্দিকে ছিটাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা সিদ্ধেশ্বর জানিত। সহসা তাহার এ খেয়াল হইল কেন। জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল, কিন্তু কোন উত্তর আসে নাই। হরবিলাস একটু হাসিয়াছিল মাত্র, সিদ্ধেশ্বর ভাবিতে লাগিল, জানলার ঐ

ছিদ্রপথে সত্যাই কি সাপ ঢুকিয়াছিল? সর্পাঘাতে যদি তাহার মৃত্যু হইত, তাহা হইলে শব-ব্যবচ্ছেদের সময় কি তাহা ধরা পড়িত না? সিদ্ধেশ্বর ডায়েরি বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। যিনি শব-ব্যবচ্ছেদ করিয়াছিলেন, সোজা তাহার কাছে চলিয়া গেল।

'আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, হরবিলাসের যদি সর্পাঘাতে মৃত্যু হত, আগে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন আপনি, না?'

'তা পারতাম বৈকি? হঠাৎ একথা মনে হচ্ছে কেন এতদিন পরে?

'না, এমনি।'

সিদ্ধেশ্বর ব্যাপারটা ডাক্তারবাবুর কাছে ভাঙিল না।

'হার্টফেল করে মারা গেছেন ভদ্রলোক, এতে কোন সন্দেহ নেই আর ও নিয়ে এখন মাথা ঘামিয়ে লাভই বা কী?'

'তা বটে।'

একটু অপ্রস্তুত হাসি হাসিয়া সিদ্ধেশ্বর চলিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনে একটা খটকা লাগিয়াই রহিল।

৪

মাসখানেক পরে।

হরবিলাসের বসতবাটীটি বিক্রয় করিবার জন্য সিদ্ধেশ্বর তাহার চৌহদ্দিটি মাপিতেছিল। সেই সময় একটি জিনিস তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। জিনিসটি কিছুই নয়, একটি বড় কার্ডবোর্ডের বাক্স। হরবিলাস যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের পাশেই একটি ঝোপের ভিতর বাক্সটি পড়িয়াছিল। খালি বাক্স, ভিতরে কিছুই নাই। তবে, বাক্সের উপর একটা নম্বর এবং একটা দোকানের ঠিকানা লেখা রহিয়াছে। রোদে-জলে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পড়া যায়। কী মনে করিয়া সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি তুলিয়া লইল।

কী ছিল এ বাক্সে নানারূপ আন্দাজ করিতে করিতে অবশেষে তাহার মনে হইল, বাক্সের গায়ে যে ঠিকনাটা লেখা আছে, বাক্সটি সেই ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়া যদি লেখা যায় যে, এই বাক্সে যাহা ছিল ঠিক এমনি একটি জিনিস ভি. পি. করিয়া আমার নামে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে কী হয়? হয়ত কিছুই হইবে না কিংবা হয়ত একটা গেঞ্জি বা কয়েকজোড়া মোজা বা ঐ ধরণের কিছু একটা আসিয়া পড়িতেও পারে। দেখাই যাক না কী হয়।

সিদ্ধেশ্বর বাক্সটি প্যাক করিয়া এবং উপরোক্ত মর্মে একটি পত্রও তাহার ভিতর দিয়া সেটি পাঠাইয়া দিল। কেবল কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই যে সে এ কার্য করিল তাহা নহে, কেমন যেন নিগূঢ়ভাবে মনে হইতেছিল যে, এই বাক্সটির সহিত হয়ত হরবিলাসের মৃত্যুর কোনও সংস্রব আছে।

৫

দিনদশেক পরে সিদ্ধেশ্বর হরবিলাসের বাড়িতে বসিয়া জিনিসপত্রের একটা ফর্দ করিতেছিল। সম্মুখের দেয়াওলে টাঙানো ছিল ললিতার একখানি ছবি। পিওন আসিয়া প্রবেশ করিল।

'আপনার নামে একটা ভি. পি. আছে বাবু।'

'ভি. পি.? ক' টাকার?

'দশ টাকা পনোরো আনা।'

সিদ্ধেশ্বর সবিস্ময়ে দেখিল, সেই দোকান হইতেই ভি. পি. আসিয়াছে। ভি. পি. ছাড়াইয়া লইল। পিওন চলিয়া যাইবার পর সহাস্যে স্বগতোক্তি করিল: দেখা যাক কী এসেছে।

অবিকল সেইরকম কার্ডবোর্ডের বাক্স। বাক্স খুলিয়া কিন্তু সিদ্ধেশ্বর লাফাইয়া উঠিল। বাক্সের ভিতর একটা সাপ রহিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত আতঙ্কিত দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া ঘরের কোনে যে লাঠিটা ছিল সেই লাঠিটা আনিয়া দূর হইতে সাপটাকে স্পর্শ করিল। সাপ নড়িল না। তখন সাহস করিয়া খোঁচা দিল একটা। খোঁচা দিতেই সাপটা আঁকিয়া বাঁকিয়া বাক্স হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সাপটা যে রবারের এবং স্প্রিং-এর একটা কারসাজি তাহা বুঝিতে সিদ্ধেশ্বরের দেরি হয় নাই। তবু সে সাপটার দিকে সভয়ে চাহিয়া রহিল। অবিকল একটা গোক্ষুর।

নিমেষের মধ্যে হরবিলাসের মৃত্যু রহস্যটা তাহার কাছে যেন পরিষ্কার হইয়া গেল। হরবিলাসের সেই আত্মীয়, সেই ডাক্তার, সেই জ্যোতিষী সকলেই বঙ্কেশ্বর বক্সীর লোক।

সহসা একটা শব্দে সিদ্ধেশ্বর চমকাইয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, ললিতার ছবিখানা মেঝেয় পড়িয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।

সীমন্ত-হীরা

শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায়

১

কিছু দিন যাবৎ ব্যোমকেশের হাতে কোনও কাজকর্ম ছিল না।

খুন, জখম ইত্যাদি যে আমাদের দেশে হয় না, এমন নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে বুদ্ধি বা চতুরতার লক্ষণ লেশমাত্র দেখা যায় না; রাগের মাথায় খুন করিয়া হত্যাকারী তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া যায় এবং সরকারের পুলিস তাহাকে হাজৎ-জাত করিয়া অচিরাৎ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়।

সুতরাং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের পক্ষে সত্য অন্বেষণের সুযোগ যে বিরল হইয়া পড়িবে, ইহা বিচিত্র নহে। ব্যোমকেশের অবশ্য সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না, সে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ-পূর্ব কোণ পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়া বাকী সময়টুকু নিজের লাইব্রেরী-ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাটাইয়া দিতেছিল। আমার কিন্তু এই একটানা অবকাশ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যদিচ অপরাধীর অনুসন্ধান করা আমার কার্য নহে, গল্প লিখিয়া বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তবিনোদনরূপ অবৈতনিক কার্যকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি, তবু চোর-ধরার যে একটা অপূর্ব মাদকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নেশার বস্তুর মত উত্তেজনার উপাদান যথাসময় উপস্থিত না হইলে মন একবারে বিকল হইয়া যায় এবং জীবনটাই লবণহীন ব্যঞ্জনের মত বিস্বাদ ঠেকে।

তাই সে দিন সকালবেলা চা-পান করিতে করিতে ব্যোমকেশকে বলিলাম,—"কি হে, বাঙ্গলাদেশের চোর-ছ্যাচড়গুলো কি সব সাধু সন্ন্যাসী হয়ে গেল না কি?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"না। তার প্রমাণ ত খবরের কাগজে রোজ পাচ্ছ।"

"তা' ত পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কাছে আস্‌ছে কৈ?"

"আসবে। চারে যখন মাছ আসবার, তখনি আসে, তাকে জোর ক'রে ধ'রে আনা যায় না। তুমি কিছু অধীর হয়ে পড়েছ দেখছি—ধৈর্য্যং রহু।"

আসল কথা, আমাদের দেশে প্রতিভাবান্ বদমায়েস—প্যারাডক্স হয়ে যাচ্ছে—প্রতিভাবান্ বদমায়েস খুব অল্পই আছে। পুলিস কোর্টের রিপোর্টে যাদের নাম দেখতে পাও, তারা চুনোপুঁটি। যাঁরা গভীর জলের মাছ—তাঁরা কদাচিৎ চারে এসে ঘাই মারেন। আমি তাঁদেরই খেলিয়ে তুলতে চাই।"

আমি বলিলাম,—"তোমার উপমাগুলো থেকে বেজায় আঁসটে গন্ধ বেরুচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিৎ যদি কেউ এখানে থাক্‌তেন, তিনি নির্ভয়ে ব'লে দিতেন যে, তুমি সত্যান্বেষণ ছেড়ে শীঘ্রই মাছের ব্যবসা আরম্ভ করবে।"

ব্যোমকেশ বলিল—"তা হ'লে মনস্তত্ত্ববিৎ মহাশয় নিদারুণ ভুল করতেন। যে লোক মাছের সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করে, সে জলচর জীবের কথনো নাম শোনে নি—এই হচ্ছে আজকালকার নূতন থিয়োরি। তোমরা আধুনিক গল্প-লেখকের দল এই কথাটাই আজকাল প্রমাণ করছ।"

দরজার কড়া নাড়িয়া "চিঠি হ্যায়" বলিয়া ডাকপিওন প্রবেশ করিল। আমাদের জীবনে ডাক-পিওনের সমাগম এতই অপ্রচুর যে মুহূর্তমধ্যে সাহিত্যিক জীবনের দুঃখদীনতা ভুলিয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একখানা ইন্সিওর করা খাম ব্যোমকেশের নামে আসিয়াছে।

খাম ছিঁড়িয়া ব্যোমকেশ যখন চিঠি বাহির করিল, তখন কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। ব্লক্-ব্লু কালিতে ছাপা মনোগ্রাম-যুক্ত পুরু কাগজে লেখা চিঠি এবং সেই সঙ্গে পিন্ দিয়ে আঁটা একটি একশ' টাকার নোট। চিঠিখানি ছোট, ব্যোমকেশ পড়িয়া সহাস্যমুখে আমার হাতে দিয়া বলিল,—"এই নাও। গুরুতর ব্যাপার। উত্তর-বঙ্গের বনিয়াদি জমীদার-গৃহে রোমাঞ্চকর রহস্যের আবির্ভাব। সেই রহস্য উদ্ঘাটিত করবার জন্য জোর তাগাদা এসেছে—পত্রপাঠ যাওয়া চাই। এমন কি, একশ' টাকা অগ্রিম রাহাখরচ পর্যন্ত এসে হাজির।"

চিঠির শিরোনামায় কোনও এক বিখ্যাত জমিদারী ষ্টেটের নাম। জমীদার স্বয়ং চিঠি লেখেন নাই, তাঁহার সেক্রেটারী ইংরাজীতে টাইপ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এই,—

প্রিয় মহাশয়!

কুমার শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি আপনার নাম শুনিয়াছেন। একটি বিশেষ জরুরী কার্যে তিনি আপনার সাহায্য ও পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করেন। অতএব

আপনি অবিলম্বে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। পথ-খরচের জন্য ১০০৲ টাকার নোট এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

আপনি কোন্ ট্রেণে আসিতেছেন, তার-যোগে জানাইলে ষ্টেশনে গাড়ী উপস্থিত থাকিবে।

ইতি—

পত্র হইতে আর কোনও তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম;—"তাই ত হে, ব্যাপার সত্যই গুরুতর ঠেকছে। জরুরী কার্যটি কি, চিঠির কাগজ বা ছাপার হরফ থেকে কিছু অনুমান করতে পারলে? তোমার ত ও সব বিদ্যে আছে।"

"কিছু না। তবে আমাদের দেশের জমীদারী বাবুদের যতদূর জানি, খুব সম্ভব কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন যে, তাঁর পোষা হাতীটি পাশের জমিদার চুরি ক'রে নিয়ে গেছে। তাই শঙ্কিত হয়ে তিনি গোয়েন্দা তলব করেছেন।"

"না না, অতটা নয়। দেখছ না, একেবারে গোড়াতেই এতগুলো টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে। ভেতরে নিশ্চয় কোনো বড় রকমের গোলমাল আছে।"

"ঐটে তোমাদের ভুল, বড়লোক রুগী হ'লে মনে কর, ব্যাধিও বড় রকম হবে। দেখা যায় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বড়লোকের ফুস্কুড়ি হ'লে ডাক্তার আসে, কিন্তু গরীবের একেবারে নাভিশ্বাস না উঠলে ডাক্তার বৈদ্যের কথা মনেই থাকে না।"

"যা হোক, কি ঠিক করলে? যাবে না কি?"

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল,—"হাতে যখন কোনো কাজ নেই, তখন চল দু'দিনের জন্যে ঘুরেই আসা যাক। আর কিছু না হোক, নূতন দেশ দেখা ত হবে। তুমিও বোধ হয় ও-অঞ্চলে কখনো যাও নি।"

যদিচ যাইবার ইচ্ছা ষোল আনা ছিল, তবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম,—"আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তোমাকে ডেকেছে—"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"দোষ কি? এক জনের বদলে দু'জন গেলে কুমারবাহাদুর বরঞ্চ খুসীই হবেন। ধনঞ্জয় যখন অস্তের হচ্ছে, তখন যাওয়াটা ত একটা কর্তব্যবিশেষ। শাস্ত্রে লিখেছে—সর্বদা পরের পয়সায় তীর্থ-দর্শন করবে।"

সেই দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে যাত্রা করিলাম। পথে উল্লেখযোগ্যও কিছু ঘটিল না, শুধু একটি অত্যন্ত মিশুক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় আমরা তিন জন ছাড়া আর কেহ ছিল না, একথা সেকথার পর ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মশায়দের কদ্দূর যাওয়া হচ্ছে ?"

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মশায়ের কদ্দূর যাওয়া হবে ?"

পাল্টা প্রশ্নে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া থাকিয়া ভদ্রলোকটি আমতা আমতা করিয়া বলিলেন,—"আমি—এই পরের ষ্টেশনেই যাব।"

ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মধুর স্বরে বলিল,—আমরাও তার পরের ষ্টেশনে নেমে যাব।"

অহেতুক মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ব্যোমকেশের কোনও মতলব আছে বলিয়া আমি কিছু বলিলাম না। গাড়ী থামিতেই ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। রাত্রি হইয়াছিল, প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে তিনি নিমেষমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন, তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

দুই তিন ষ্টেশন পরে জানালার কাচ নামাইয়া বাহিরে গলা বাড়াইয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম, পাশের একটা ইণ্টার ক্লাশের কামরার জানালায় মাথা বাহির করিয়া ভদ্রলোকটি আমাদের গাড়ীর দিকেই তাকাইয়া আছেন। চোখো-চোখি হইবামাত্র তিনি বিদ্যুদ্‌বেগে মাথা টানিয়া লইলেন। আমি উত্তেজিত-ভাবে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"ওহে !"

ব্যোমকেশ বলিল,—"জানি। ভদ্রলোক পাশের গাড়ীতে উঠেছেন। ব্যাপার যতটা তুচ্ছ মনে করেছিলুম, দেখছি তা নয়। ভালই !"

তারপর প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সে ভদ্রলোকের চুলের টিকি পর্যন্ত আর দেখিতে পাই নাই।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনটি ছোট, সেখান হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল মোটরে যাইতে হইবে। একখানি দামী মোটর লইয়া জমিদারের একজন কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা মোটরে চড়িয়া বসিলাম। অতঃপর নির্জন পথ দিয়া মোটর নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিল।

কর্মচারীটি প্রবীণ এবং বিচক্ষণ ; ব্যোমকেশ কৌশলে তাঁহাকে দু'একটি প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিলেন,—"আমি কিছুই জানি না মশায়। শুধু

আপনাদের ষ্টেশন থেকে নিয়ে যাবার হুকুম পেয়েছিলাম, তাই নিয়ে যাচ্ছি।"

জমিদার-ভবনে পৌঁছিয়া দেখিলাম,—সে এক এলাহি কাণ্ড! মাঠের মাঝখানে যেন ইন্দ্রপুরী বসিয়াছে। প্রকাণ্ড সাবেক পাঁচমহল ইমারৎ, তাহাকে ঘিরিয়া প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমির বাগান, হট্-হাউস্; পুষ্করিণী, টেনিস্-কোর্ট, কাছারি বাড়ী, অতিথিশালা, পোষ্ট-অফিস্—আরও কত কি। চারিদিকে লস্কর পেয়াদা গোমস্তা সরকার খাতক প্রজার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের মোটর বাড়ীর সম্মুখে থামিতেই জমিদারের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বয়ং আসিয়া আমাদের সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। একটা আস্ত মহল আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সেক্রেটারী বলিলেন,—"আপনারা মুখহাত ধুয়ে একটু জলযোগ ক'রে নিন্। ততক্ষণে কুমার বাহাদুরও আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন।"

স্নানাদি সারিয়া বাহির হইতেই প্রচুর প্রাতরাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার যথারীতি ধ্বংস-সাধন করিয়া তৃপ্তমনে ধূমপান করিতেছি, এমন সময় সেক্রেটারী আসিয়া বলিলেন,—"কুমারবাহাদুর লাইব্রেরী-ঘরে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। যদি আপনাদের অবসর হয়ে থাকে—আমার সঙ্গে আসুন।"

আমরা উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। রাজসকাশে যাইতেছি, এমনি একটা ভাব লইয়া লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করিলাম। 'কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ' নাম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ববিষয়ে বিরাট আড়ম্বর দেখিয়া মনের মধ্যে কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে একটা গুরুগম্ভীর ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম, আমাদেরই মত সাধারণ ধুতি-পাঞ্জাবী পরা একটি সহাস্যমুখ যুবাপুরুষ, গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা—ব্যবহারে তিলমাত্র আড়ম্বর নাই। আমরা যাইতেই চেয়ার হইতে উঠিয়া আগেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। পলকের জন্য দ্বিধা করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন,—"আপনিই ব্যোমকেশ বাবু? আসুন!"

ব্যোমকেশ আমাকে পরিচয় করাইয়া দিয়া বলিল,—"ইনি আমার বন্ধু সহকারী এবং ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক। তাই ওঁকে সহজে কাছ-ছাড়া করি নে।"

কুমার ত্রিদিব হাসিয়া কহিলেন,—"আশা করি, আপনার জীবনী লেখার

প্রয়োজন এখনও অনেক দূরে। অজিতবাবু এসেছেন, আমি ভারী খুসী হয়েছি। কারণ, প্রধানতঃ ওঁর লেখার ভিতর দিয়েই আপনার নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অন্যের মুখে নিজের লেখার অযাচিত উল্লেখ যে কত মধুর, তাহা যিনি ছাপার অক্ষরের কারবার করেন, তিনিই জানেন। বুঝিলাম, ধনী জমিদার লোকটি অতিশয় সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান। লাইব্রেরী ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম, দেয়াল-সংসগ্ন আলমারিগুলি দেশী বিলাতী নানা প্রকার পুস্তকে ঠাসা। টেবলের উপরেও অনেকগুলি বই ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। লাইব্রেরী-ঘরটি যে কেবলমাত্র জমিদার-গৃহের শোভাবর্দ্ধনের জন্য নহে রীতিমত ব্যবহারের জন্য—তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

আরও কিছুক্ষণ শিষ্টতা-বিনিময়ের পর কুমারবাহাদুর বলিলেন,—"এবার কার্যের কথা আরম্ভ করা যাক।" সেক্রেটারীকে হুকুম দিলেন,—"তুমি এখন যেতে পার। লক্ষ্য রেখো, এ ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।"

সেক্রেটারী সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে কুমার ত্রিদিব চেয়ারে ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আপনাদের যে কাজের জন্য এত কষ্ট দিয়ে ডেকে আনিয়েছি, সে কাজ যেমন গুরুতর, তেমনি গোপনীয়। তাই সকল কথা প্রকাশ ক'রে বলবার আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না। এত সাবধানতার কারণ, এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বংশের মর্য্যাদা জড়ানো রয়েছে।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রতিশ্রুতি দেবার কোনো দরকার আছে মনে করি নে, একজন মক্কেলের গুপ্তকথা অন্য লোককে বলা আমাদের ব্যবসার রীতি নয়। কিন্তু আপনি যখন প্রতিশ্রুতি চান, তখন দিতে কোনো বাধাও নেই। কি ভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলুন।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন,—"তামা-তুলসীর দরকার নেই। আপনাদের মুখের কথাই যথেষ্ট।"

আমি একটু দ্বিধায় পড়িলাম, বলিলাম,—"গল্পচ্ছলেও কি কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না?"

কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই চলবে না।"

হয়ত একটা ভাল গল্পের মাল-মশ্‌লা হাত-ছাড়া হইয়া গেল, এই ভাবিয়া

মনে মনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনি নির্ভয়ে বলুন। আমরা কোনো কথা প্রকাশ করব না।"

কুমার ত্রিদিব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া যেন কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবেন, তাহাই ভাবিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন,—"আমাদের বংশে যে-সব সাবেক কালের হীরা-জহরৎ আছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয় আপনি কিছু জানেন না—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"কিছু কিছু জানি। আপনাদের বংশে একটি হীরা আছে, যার তুল্য হীরা বাঙ্গালা দেশে আর দ্বিতীয় নেই—তার নাম সীমন্ত-হীরা।"

ত্রিদিব সাগ্রহে বলিলেন,—"আপনি জানেন? তা হ'লে এ কথাও জানেন বোধ হয় যে, গতমাসে কলকাতায় যে রত্ন-প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে ঐ হীরা দেখানো হয়েছিল?"

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে হীরা চোখে দেখবার সুযোগ হয় নি।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কুমার কহিলেন,—"সে সুযোগ আর কখনো হবে কি না, জানি না। হীরাটা চুরি গেছে।"

ব্যোমকেশ প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল,—"চুরি গেছে!"

শান্তকণ্ঠে কুমার বলিলেন,—"হ্যাঁ, সেই সম্পর্কেই আপনাকে আনিয়েছি। ঘটনাটা সুরু থেকে বলি শুনুন। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের এই জমিদার-বংশ অতি প্রাচীনকাল থেকে চ'লে আসছে। বারো ভূঁইয়ারও আগে পাঠান বাদশা'দের আমলে আমাদের আদি পূর্বপুরুষ এই জমিদারী অর্জন করেন। সাদা কথায় তিনি একজন দুর্দান্ত ডাকাতের সর্দার ছিলেন, নিজের বাহুবলে সম্পত্তি লাভ ক'রে পরে বাদশা'র কাছ থেকে সনদ আদায় করেন। সে বাদশাহী সনদ এখনো আমাদের কাছে বর্তমান আছে। এখন আমাদের অনেক অধঃপতন হয়েছে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে আমাদের রাজা উপাধি ছিল।

"ঐ 'সীমন্ত-হীরা' আমাদের আদি পূর্বপুরুষের সময় থেকে পুরুষানুক্রমে এই বংশে চ'লে আসছে। একটা প্রবাদ আছে যে, এই হীরা যত দিন আমাদের কাছে থাকবে, ততদিন বংশের কোনো অনিষ্ট হবে না; কিন্তু হীরা কোনও রকমে হস্তান্তরিত হলেই একপুরুষের মধ্যে বংশ লোপ হয়ে যাবে।"

একটু থামিয়া কুমার আবার বলিতে লাগিলেন,—"জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জমিদারীর উত্তরাধিকারী হয়,—এই হচ্ছে আমাদের বংশের চিরাচরিত লোকাচার। কনিষ্ঠরা কেবল বাবুয়ান্ বা ভরণপোষণ পান। এই সূত্রে দু' বছর আগে আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি জমিদারী পেয়েছি। আমি বাপের একমাত্র সন্তান, উপস্থিত আমার এক কাকা আছেন, তিনি বাবুয়ান্-স্বরূপ তিন হাজার টাকা মাসিক খোরপোষ জমিদারী থেকে পেয়ে থাকেন।

"এই ত গেল গল্পের ভূমিকা। এবার হীরা চুরির ঘটনাটা বলি। রত্ন-প্রদর্শনীতে আমার হীরা একজিবিট্ করবার নিমন্ত্রণ যখন এল, তখন আমি নিজে স্পেশাল ট্রেনে ক'রে সেই হীরা নিয়ে কলকাতা গেলাম; কলকাতায় পৌঁছে হীরাখানা প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষের কাছে জমা ক'রে দেবার পর তবে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনারা জানেন, প্রদর্শনীতে বরোদা, হায়দ্রাবাদ, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজবংশের খানদানি জহরৎ প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রদর্শনের কর্তা ছিলেন স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট, সুতরাং সেখান থেকে হীরা চুরি যাবার কোনও ভয় ছিল না। তা ছাড়া যে গ্লাস-কেসে আমার হীরা রাখা হয়েছিল, তার চাবি কেবল আমারই কাছে ছিল।

"সাত দিন ধরে একজিবিশন্ চল্‌ল। আট দিনের দিন আমার হীরা নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলুম। বাড়ী ফিরে এসে জানতে পারলাম যে, আমার হীরা চুরি গেছে, তার বদলে যা ফিরিয়ে এনেছি, তা দু'শো টাকা দামের মেকি পেষ্ট।"

কুমার চুপ করিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"চুরি ধরা পড়বার পর প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে কিম্বা পুলিসকে খবর দেন নি কেন?"

কুমার বলিলেন,—"খবর দিয়ে কোনও লাভ হ'ত না, কারণ, কে চুরি করেছে, চুরি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা জানতে পেরেছিলাম।"

"ওঃ"—ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—"তার পর ব'লে যান।"

কুমার বলিতে লাগিলেন,—"এ কথা কাউকে বলবার নয়। পাছে জানাজানি হয়ে পারিবারিক কলঙ্ক বার হয়ে পড়ে, খবরের কাগজে এই নিয়ে লেখালিখি সুরু হয়ে যায়, এই ভয়ে বাড়ীর লোককে পর্যন্ত এ কথা জানাতে পারি নি। জানি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়।

"কথাটা আরও খোলসা ক'রে বলা দরকার। পূর্বে বলেছি, আমার এক

কাকা আছেন। তিনি কলকাতায় থাকেন, ষ্টেট থেকে মাসিক তিন হাজার টাকা খরচা পান। তাঁর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন,—তিনিই বিখ্যাত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক স্তর দিগিন্দ্রনারায়ণ রায়। তাঁর মত আশ্চর্য্য মানুষ খুব কম দেখা যায়। বিলেতে জন্মালে তিনি বোধ হয়, অদ্বিতীয় মনীষী ব'লে পরিচিত হ'তে পারতেন। যেমন তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তেমনই অগাধ পাণ্ডিত্য। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্ল্যাষ্টার অফ্ প্যারিস্ সম্বন্ধে কি একটা নূতন তথ্য আবিষ্কার ক'রে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে উপহার দিয়েছিলেন—তার ফলে 'স্তর' উপাধি পান। শিল্পের দিকেও তাঁর কি অসামান্য প্রতিভা, তার পরিচয় সম্ভবতঃ আপনাদের অল্পবিস্তর জানা আছে। প্যারিসের শিল্প-প্রদর্শনীতে মহাদেবের প্রস্তরমূর্তি এক্‌জিবিট ক'রে তিনি যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেন, তা কারুর অবিদিত নেই। মোটের উপর এমন বহুমুখী প্রতিভা সচরাচর চোখে পড়ে না।" বলিয়া কুমারবাহাদুর একটু হাসিলেন।

আমরা নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। কুমার বলিতে লাগিলেন,—"কাকা আমাকে কম স্নেহ করেন না, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছিল। ঐ হীরাটা তিনি আমার কাছে চেয়েছিলেন। হীরাটার উপর তাঁর একটা অহেতুক আসক্তি ছিল। তার দামের জন্য নয়, শুধু হীরাটাকেই নিজের কাছে রাখবার জন্যে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হীরাটার দাম কত হবে?"

কুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"খুব সম্ভব তিন পয়জার। টাকা দিয়ে সে জিনিস কেনবার মত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। তা ছাড়া আমরা কখনও তার দাম যাচাই ক'রে দেখি নি। গৃহদেবতার মতই সে হীরা অমূল্য ছিল।

"সে যাক্। আমার বাবার কাছেও কাকা ঐ হীরাটা চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা দেন নি। তারপর বাবা মারা যাবার পর কাকা আমার কাছে সেটা চাইলেন। বললেন, 'আমার মাসহারা চাই না, তুমি শুধু আমায় হীরাটা দাও।' বাবা মৃত্যুকালে আমাকে এ বিষয়ে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, তাই জোড়হাত ক'রে কাকাকে বললাম,—'কাকা, আপনার আর যা-ইচ্ছা নিন, কিন্তু ও হীরাটা দিতে পারব না। বাবার শেষ আদেশ।'—কাকা আর কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝলাম, তিনি আমার উপর মর্মান্তিক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর থেকে কাকার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

"তবে পত্রব্যবহার হয়েছে। যে দিন হীরা নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, তার পরদিন কাকার কাছ থেকে এক চিঠি এল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু প'ড়ে মাথা ঘুরে গেল। এই দেখুন সে চিঠি।"

চাবি দিয়া সেক্রেটেরিয়েট টেবলের দেরাজ খুলিয়া কুমারবাহাদুর একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন। ছোট ছোট সুছাঁদ অক্ষরে লেখা বাঙ্গালা চিঠি, তাহাতে লেখা আছে,—

"কল্যাণীয়

খোকা, দুঃখিত হয়ো না। তোমরা দিতে চাও নি, তাই আমি নিজের হাতেই নিলাম।

বংশলোপ হবে ব'লে যে কুসংস্কার আছে, তাতে বিশ্বাস করো না। ওটা আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা ফন্দি মাত্র, যাতে জিনিসটা হস্তান্তরিত করতে কেউ সাহস না করে। আশীর্বাদ নিও—ইতি—

তোমার কাকা—

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ রায়।"

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চিঠি ফেরৎ দিল। কুমার বলিতে লাগিলেন, "চিঠি পড়েই ছুটলাম তোষাখানায়। লোহার সিন্দুক খুলে হীরের বাক্স বার ক'রে দেখলাম, হীরা ঠিক আছে। দেওয়ান মশায়কে ডাকলাম, তিনি জহরতের একজন ভাল জহরী, দেখেই বল্লেন, জাল হীরা। কিন্তু চেহারায় কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই, একেবারে অবিকল আসল হীরার জোড়া।"

কুমার দেরাজ খুলিয়া একটি ভেলভেটের বাক্স বাহির করিলেন। ডালা খুলিতেই সুপারির মত গোলাকার একটা পাথর আলোকসম্পাতে ঝকমক করিয়া উঠিল। কুমারবাহাদুর দুই আঙ্গুলে সেটা তুলিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন, "জহরী ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে বোঝে এটা ঝুটো। আসলে দু'শো টাকার বেশী এর দাম নয়।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা সেই মূল্যহীন কাচখণ্ডটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম; তার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ সেটা ফিরাইয়া দিল, বলিল, "তা হ'লে আমার কাজ হচ্ছে সেই আসল হীরাটা উদ্ধার করা?"

স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কুমার বলিলেন, "হাঁ। কেমন ক'রে হীরা চুরি গেল, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকার নেই। আমি শুধু আমার হীরাটা ফেরৎ চাই। যেমন ক'রে হোক, আমার 'সীমন্ত-হীরা'

আমাকে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে। খরচের জন্তে ভাবনা করবেন না যত টাকা লাগে, যদি বিশ হাজার টাকা দরকার হয়, তাও দিতে আমি পশ্চাৎপদ হব না জানবেন। শুধু একটি সর্ত, কোনও রকমে এ কথা যেন খবরের কাগজে না ওঠে।"

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল, "কবে নাগাদ হীরাটা পেলে আপনি খুশী হবেন ?"

উত্তেজনায় কুমারবাহাদুরের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "কবে নাগাদ ? তবে কি, তবে কি আপনি হীরাটা উদ্ধার করতে পারবেন ব'লে মনে হয় ?"

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল, "এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এর চেয়ে ঢের বেশী জটিল রহস্ত প্রত্যাশা করেছিলুম। যা হোক, আজ শনিবার; আগামী শনিবারের মধ্যে আপনার হীরা ফেরৎ পাবেন।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

২

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম দিনটা গোলমালে কাটিয়া গেল।

রাত্রিতে দুই জনে কথা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "প্ল্যান্ অফ ক্যাম্পেন কিছু ঠিক করলে ?"

ব্যোমকেশ বলিল, "না। আগে বাড়ীটা দেখে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যাক, তার পর প্ল্যান স্থির করা যাবে।"

"হীরেটা কি বাড়ীতেই আছে মনে হয় ?"

"নিশ্চয়। যে জিনিসের মোহে খুড়ো মহাশয় শেষ বয়সে ভাইপো'র সম্পত্তি চুরি করেছেন, সে জিনিস তিনি এক দণ্ডের জন্তও কাছ-ছাড়া করবেন না। আমাদের শুধু জানা দরকার, কোথায় তিনি সেটা রেখেছেন। আমার বিশ্বাস—"

"তোমার বিশ্বাস—?"

"থাক্ সেটা অনুমানমাত্র। দিগিন্দ্রনারায়ণ খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক ক'রে বলা যায় না।" আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম, "আচ্ছা ব্যোমকেশ, এ কাযের নৈতিক দিকটা ভেবে দেখেছ ?"

"কোন্ কাজের ?"

"যে উপায় অবলম্বন ক'রে তুমি হীরেটা উদ্ধার করতে যাচ্ছ।"

"ভেবে দেখেছি। তাহা নিছক চুরি, ধরা পড়লে জেলে যেতে হবে। কিন্তু চুরি মাত্রেই নৈতিক অপরাধ নয়। চোরের উপর বাটপাড়ি করা মহা পুণ্যকার্য্য।"

"তা যেন বুঝলুম, কিন্তু দেশের আইন ত সে কথা শুনবে না।"

"সে ভাবনা আমার নয়। আইনের যাঁরা রক্ষক, তাঁরা পারেন, আমাকে শাস্তি দিন।"

পরদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ একাকী বাহির হইয়া গেল; যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কাজ কত দূর হ'ল ?"

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে কচুরিতে কামড় দিয়া বলিল, "বিশেষ সুবিধা হ'ল না। বুড়ো একটি হর্তেল ঘুঘু। আর তার একটি নেপালী চাকর আছে, সে বেটার চোখ দুটো ঠিক শিকারী বেরালের মত। যা হোক, একটা সুরাহা হয়েছে, বুড়ো একজন সেক্রেটারী খুঁজছে—দুটো দরখাস্ত ক'রে দিয়ে এসেছি।"

"সব কথা খুলে বল।"

চায়ের চুমুক দিয়া বাটি নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"কুমার-বাহাদুর যা বলেছিলেন, তা নেহাৎ মিথ্যে নয়, খুড়ো মহাশয় অতি পাকা লোক। বাড়ীটা নানারকম বহুমূল্য জিনিসের একটা মিউজিয়াম বললেই হয়;—কর্তা একলা থাকেন বটে, কিন্তু অনুগত এবং বিশ্বাসী লোকলস্করের অভাব নেই। প্রথমতঃ বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢোকাই এক মুস্কিল,—ফটকে চারটে দরোয়ান অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ব'সে আছে, কেউ ঢুকতে গেলেই হাজার রকম প্রশ্ন। পাঁচালী ডিঙ্গিয়ে যে ঢুকবে, তারও উপায় নেই,—আট হাত উঁচু পাঁচিল, তার উপর ছুঁচোলো লোহার শিক বসানো। যা হোক, কোনও রকমে দরোয়ান বাবুদের খুসী ক'রে ফটকের ভিতর যদি ঢুকলে, বাড়ীর সদর-দরজায় নেপালী ভৃত্য উজরে সিং খ্যাপা বাঘের মত থাবা গেড়ে ব'সে আছেন,—ভালরকম কৈফিয়ৎ যদি না দিতে পার, বাড়ীতে ঢোকবার আশা ঐখানেই ইতি। রাত্রির অবস্থা আরও চমৎকার। দরোয়ান, চৌকীদার ত আছেই, তার উপর চারটে বিলিতী ম্যাষ্টিফ্ কুকুর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছাড়া

থাকে। সুতরাং নিশীথসময়ে নিরিবিলি গিয়ে যে কার্যোদ্ধার করবে, সে পথও বন্ধ।"

"তবে উপায় ?"

"উপায় হয়েছে। বুড়োর এক জন সেক্রেটারী চাই—বিজ্ঞাপন দিয়েছে। দেড় শ' টাকা মাইনে—বাড়ীতেই থাকতে হবে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই এবং শর্টহ্যাণ্ড টাইপিং ইত্যাদি আরও অনেক রকম সদ্‌গুণের আবশ্যক। তাই দুটো দরখাস্ত ক'রে দিয়ে এসেছি,—কাল ইণ্টারভিউ করতে যেতে হবে।"

"দু'টো দরখাস্ত কেন ?

"একটা তোমার, একটা আমার। যদি একটা ফস্কায়, অন্যটা লেগে যাবে।"

পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালবেলা ৮টার সময় আমরা স্যর দিগিন্দ্র-নারায়ণের ভবনে সেক্রেটারী-পদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলাম। সহরের দক্ষিণে অভিজাত-পল্লীতে তাঁহার বাড়ী; দরোয়ানের ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, আমাদের মত আরও কয়েক জন চাকরি অভিলাষী হাজির আছেন। একটা ঘরের মধ্যে সকলে গিয়া বসিলাম এবং বক্রকটাক্ষে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ ও আমি যে পরস্পরকে চিনি, তাহার আভাসমাত্র দিলাম না। পূর্ব হইতে সেইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছিলাম।

বাড়ির কর্তা ভিতরের কোনও একটা ঘরে বসিয়া একে একে উমেদার-দিগকে ডাকিতেছিলেন। মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা জাগিতেছিল, হয় ত আমাদের ডাক পড়িবার পূর্বেই অন্য কেহ বহাল হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখা গেল, একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন এবং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া শুষ্ক-মুখে প্রস্থান করিলেন। শেষ পর্যন্ত বাকি রহিয়া গেলাম আমি আর ব্যোমকেশ।

বলা বাহুল্য, আমরা নাম ভাঁড়াইয়া দরখাস্ত করিয়াছি; আমার নূতন নামকরণ হইয়াছিল জিতেন্দ্রনাথ এবং ব্যোমকেশের নিখিলেশ। পাছে ভুলিয়া যাই, তাই নিজের নামটা মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া লইতেছিলাম, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, কর্তা আমাদের দুই জনকে একসঙ্গে তলব করিয়াছেন। কিছুটা বিস্মিত হইলাম। ব্যাপার কি ? এতক্ষণ ত একে একে ডাক পড়িতেছিল, এখন আবার একসঙ্গে কেন ? যাহা হোক, বিনা বাক্যব্যয়ে ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখীন হইলাম।

প্রায় আসবাবশূন্য প্রকাণ্ড একখানা ঘরের মাঝখানে বৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবিল এবং তাহারই সম্মুখে দরজার দিকে মুখ করিয়া হাতকাটা পিরাণ-পরিহিত বিশালকায় স্যর দিগিন্দ্র বসিয়া আছেন। বুল্‌ডগের মুখে কাঁচা পাকা দাড়িগোঁফ গজাইলে যে রকম দেখিতে হয়, সেই রকম একখানা মুখ—হঠাৎ দেখিলে 'বাপ রে' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। হাঁড়ির মত মাথা, তাহার মধ্যস্থলে টাক পড়িয়া খানিকটা স্থান চক্‌চকে হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড শরীর এবং প্রকাণ্ড মস্তকের মাঝখানে গ্রীবা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। দীর্ঘ রোমশ দুটা বাহু বনমানুষের মত দৃঢ় এবং ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাহার প্রান্তে অঙ্গুলিগুলি 'ভারতীয় ত্রিকলার' মত সরু ও সুদৃশ্য,—একবারে লতাইয়া না গেলেও পশ্চাদ্ভাগে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। চক্ষু দু'টা ক্ষুদ্র এবং সর্বদাই যেন লড়াই করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজিতেছে। মোটের উপর, আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত এই লোকটিকে দেখিবামাত্র একটা অহেতুক সম্ভ্রম ও ভীতির সঞ্চার হয়, মনে হয়, ইহার ঐ কুদর্শন দেহটার মধ্যে ভাল ও মন্দ করিবার অফুরন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে।

আমরা বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া টেবিলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি আমার মুখ হইতে ব্যোমকেশের মুখে দ্রুতবেগে কয়েকবার যাতায়াত করিয়া ব্যোমকেশের মুখের উপর স্থির হইল। তার পর সেই প্রকাণ্ড মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিল। বুল্‌ডগ হাসিতে পারে কি না, জানি না; কিন্তু পারিলে বোধ করি, ঐ রকমই হাসিত। এই হাস্য ক্রমে মিলাইয়া গেলে জলদগম্ভীর শব্দ হইল,—"উজরে, দরজা বন্ধ ক'রে দাও।"

নেপালী ভৃত্য উজরে সিং দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কর্তা তখন টেবিলের উপর হইতে আমাদের দরখাস্ত দুইটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "কার নাম নিখিলেশ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে, আমার।"

কর্তা বলিলেন,—"হুঁ। তুমি নিখিলেশ। আর তুমি জিতেন্দ্রনাথ? তোমরা দুজনে শলা ক'রে দরখাস্ত করেছ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে, আমি ওঁকে চিনি না।"

কর্তা কহিলেন,—"বটে! চেনো না? কিন্তু দরখাস্ত প'ড়ে আমার অন্য রকম মনে হয়েছিল। যা হোক্, তুমি এম্-এস্-সি পাশ করেছ?"

ব্যোমকেশ বললে,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোন্ য়ুনিভার্সিটি থেকে ?"

"ক্যালকাটা য়ুনিভারসিটি থেকে।',

"হুঁ।" টেবিলের উপর হইতে একখানা মোটা বই তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা খুলিয়া কহিলেন,—"কোন সালে পাশ করেছ ?"

সভয়ে দেখিলাম, বইখানা য়ুনিভার্সিটি কর্তৃক মুদ্রিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকা। আমার কপাল ঘামিয়া উঠিল। এই রে! এবার বুঝি সব ফাঁসিয়া যায়!

ব্যোমকেশ কিন্তু নিষ্কম্প স্বরে কহিল,—"আজ্ঞে, এই বছর। মাসখানেক আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে।"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যাক্, একটা ফাঁড়া ত কাটিল, এ বছরের নামের তালিকা এখনও ছাপিয়া বাহির হয় নাই।

কর্তা ব্যর্থ হইয়া বই রাখিয়া দিলেন। তারপর আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের উপর কঠোর জেরা চলিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে টলাইতে পারিলেন না। শর্টহ্যাণ্ড পরীক্ষাতেও যখন সে সহজে উত্তীর্ণ হইয়া গেল তখন কর্তা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—বেশ তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলতে পারে। তুমি বসো।"

ব্যোমকেশ বসিল। কর্তা কিয়ৎক্ষণ ভ্রূকুটি করিয়া টেবিলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ আমার পানে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "অজিত বাবু!"

"আজ্ঞে।"

বোমা ফাটার মত হাসির শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, অদম্য হাসির তোড়ে কর্তার বিশাল দেহ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। অকস্মাৎ এই আনন্দের কি কারণ ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া দেখি, সে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে। তখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অনুশোচনায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। হায়, হায়, মুহূর্তের অনবধানতায় সব নষ্ট করিয়া ফেলিলাম।

কর্তার হাসি সহজে থামিল না, কড়ি-বরগা কাঁপাইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া একাদিক্রমে চলিতে লাগিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া আমার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিলেন,—"লজ্জিত হয়ো না। আমার কাছে

ধরা পড়া তোমাদের পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বালক হয়ে তোমরা আমাকে ঠকাবে মনে করেছিলে, এতেই আমার ভারি আমোদ হচ্ছে।"

আমরা নির্বাক হইয়া রহিলাম। কর্তা ব্যোমকেশের মাথার দিকে কিছুক্ষণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "ব্যোমকেশ বাবু তোমার কাছ থেকে আমি এতটা নির্বুদ্ধিতা প্রত্যাশা করি নি। তুমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তোমার করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি, তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।" ব্যোমকেশের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন,—"খুলির মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন্-ম্যাটার আছে। তবে ব্রেন-ম্যাটার থাকলেই শুধু হয় না, ভ্যালুয়েশনের উপর সব নির্ভর করে।...হনু আর চোয়াল উঁচু, মৃদঙ্গমুখ, বাঁকা নাক, হুঁ। ত্বরিতকর্মা কূটবুদ্ধি একগুঁয়ে; মোটের উপর বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে—বুদ্ধিমান্ বলা চলে।"

আমার মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশের শবব্যবচ্ছেদ হইতেছে, তাহার মস্তিষ্ককে কাটিয়া চিরিয়া ওজন করিয়া তাহার যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা হইতেছে এবং আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছি।

স্বগত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কর্তা বলিলেন,—"আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো? ষাট আউন্স—তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশী। অর্থাৎ বনমানুষে আর সাধারণ মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাৎ, তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাৎ তার চেয়েও বেশী।"

ব্যোমকেশ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না। কর্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিলেন,—"খোকা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা জিনিস চুরি করবার জন্য। কিন্তু তুমি পারবে ব'লে মনে হয়?"

এবারও ব্যোমকেশ কোনও উত্তর করিল না। তাহার নির্বিকার নীরবতা লক্ষ্য করিয়া কর্তা শ্লেষ করিয়া কহিলেন,—"কি হে ব্যোমকেশবাবু, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যে। বলি, এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েছ, পুরুত সেজে ঠাকুর চুরি করতে ঢুকেছ—তা কি রকম মনে হচ্ছে? পারবে চুরি করতে?"

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে কহিল,—"সাত দিনের মধ্যে কুমারবাহাদুরের জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেব, কথা দিয়ে এসেছি।"

কর্তার ভীষণ মুখ ভীষণতর আকার ধারণ করিল, ঘন রোমশ ভ্রূযুগল কপালের উপর যেন তাল পাকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, "বটে বটে! তোমার সাহস ত কম নয় দেখছি। কি ক'রে কাজ হাসিল করবে শুনি? এখনই ত তোমাদের ঘাড় ধরে বার ক'রে দেব। তারপর?"

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আপনার কথা থেকে একটা সংবাদ পাওয়া গেল—হীরেটা বাড়ীতেই আছে।"

আরক্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া কর্তা বলিলেন,—"হাঁ, আছে। কিন্তু তুমি পারবে খুঁজে নিতে? তোমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে কি?"

ব্যোমকেশ কেবল একটু হাসিল।

মনে হইল, এইবার বুঝি ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিবে। কর্তার কপালের শিরাগুলি ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, দুই চক্ষুতে অন্ধ জিঘাংসা জ্বল্‌জ্বল্ করিতে করিতে লাগিল। হাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকিলেও ব্যোমকেশের একটা রিষ্টি উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ভাগ্যক্রমে সেরূপ কিছু ছিল না। তাই, সিংহ যেমন করিয়া কেশর তাড়া দেয়, তেমনই ভাবে মাথা নাড়িয়া কর্তা কহিলেন,—"দেখ ব্যোমকেশবাবু, তুমি মনে কর, তোমার ভারি বুদ্ধি—না? তোমার মত ডিটেকটিব দুনিয়ায় আর নেই? তুমি বাংলাদেশের বার্ন্তিল? বেশ। তোমাকে তাড়াব না। এই বাড়ির মধ্যে যাতায়াত করবার অবাধ অধিকার তোমায় দিলুম। যদি পার, খুঁজে বার কর সে জিনিস। সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে কথা দিয়েছ না? তোমাকে সাত বচ্ছর সময় দিলুম, বার কর খুঁজে।"

কর্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জন ছাড়িলেন,—"উজ্‌রে সিং!"

উজরে সিং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। কর্তা আমাদের নির্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এই বাবু দুটিকে চিনে রাখো। আমি বাড়ীতে থাকি বা না থাকি, এঁরা এ বাড়ীতে যখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, বাধা দিও না। বুঝলে? যাও।"

উজরে সিং তাহার নির্বিকার নেপালী মুখ ও তির্যক চক্ষু আমাদের দিকে একবার ফিরাইয়া 'যো হুকুম' বলিয়া প্রস্থান করিল।

কর্তা এবার রঘুবংশের কুম্ভোদর নামক সিংহের মত হাস্য করিলেন, বলিলেন,—"খুঁজি খুঁজি নারি, যে পায় তারি—বুঝলে হে ব্যোমকেশচন্দ্র—"

'আজ্ঞে শুধু ব্যোমকেশ—চন্দ্র নেই।"

"না থাক। কিন্তু বুড়ো হয়ে ম'রে যাবে, তবু সে জিনিস পাবে না, বুঝলে? দিগিন্ রায় সে-জিনিস লুকিয়ে রাখে, সে জিনিস খুঁজে বার করা ব্যোমকেশ বক্সীর কর্ম নয়।—ভাল কথা, আমার লোহার সিন্দুক ইত্যাদির চাবি যখন দরকার হবে, চেয়ে নিও। তাতে অবশ্য অনেক দামী জিনিস আছে, কিন্তু তোমার উপর আমার অবিশ্বাস নেই। আমি এখন আমার ষ্টুডিওতে চল্লুম—আমাকে আজ আর বিরক্ত করো না।—আর একটা বিষয়ে তোমাদের সাবধান ক'রে দিই,—আমার বাড়ীময় অনেক বহুমূল্য ছবি আর প্ল্যাষ্টারের মূর্তি ছড়ানো আছে, হীরে খোঁজার আগ্রহে সেগুলো যদি কোনও রকমে ভেঙে নষ্ট কর, তা হ'লে সেই দণ্ডেই কান ধ'রে বার ক'রে দেব। যে সুযোগ পেয়েছ, তাও হারাবে।"

এইরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া স্যর দিগিন্দ্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

৩

দু'জনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

বুড়ার সহিত সংঘর্ষে ব্যোমকেশও ভিতরে ভিতরে বেশ কাবু হইয়াছিল, তাই ফ্যাকাশে গোছের একটু হাসিয়া বলিল, "চল, বাসায় ফেরা যাক। আজ আর কিছু হবে না।"

অন্যকে ঠকাইতে গিয়া নিজে ঠকিয়া অপদস্থ হওয়ার মত লজ্জা অল্পই আছে, তাই পরাজয় ও লাঞ্ছনার গ্লানি বহিয়া নীরবে বাসায় পৌঁছিলাম। দু'পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিবার পর মন কতকটা চাঙ্গা হইলে বলিলাম, "ব্যোমকেশ, আমার বোকামিতেই সব মাটি হ'ল।"

ব্যোমকেশ বলিল, "বোকামি অবশ্য তোমার হয়েছে, কিন্তু সে জন্য ক্ষতি কিছু হয় নি। বুড়ো আগে থাকতেই সব জানতো। মনে আছে—ট্রেনের সেই ভদ্রলোকটি? যিনি পরের ষ্টেশনে নেমে যাবেন ব'লে পাশের গাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলেন? তিনি এরই গুপ্তচর। বুড়ো আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানে।"

"খুব বাঁদর বানিয়ে ছেড়ে দিলে যা হোক। এমনটা আর কখনও হয় নি।"

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিল, "বুড়োর ঐ মারাত্মক দুর্বলতাটুকু আছে বলেই রক্ষে, নইলে হয় ত হাল ছেড়ে দিতে হ'ত।"

আমি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলাম, "কি রকম? তোমার কি এখনও আশা আছে না কি?"

"বিলক্ষণ! আশা আছে বৈ কি। তবে বুড়ো যদি সত্যিই ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দিত, তা হ'লে কি হ'ত বলা যায় না। যা হো'ক, বুড়োর একটা দুর্বলতার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ঐ থেকেই কার্যসিদ্ধি করতে হবে।"

"কোন দুর্বলতার সন্ধান পেলে, শুনি। আমি ত বাবা কোথাও এতটুকু ছিদ্র পেলুম না, একেবারে নিরেট নিভাঁজ,—লোহার মত শক্ত।"

"কিন্তু ছিদ্র আছে, বেশ বড় রকম ছিদ্র; এবং সেই ছিদ্র-পথেই আমরা বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি। কি জানি কেন, বড় বড় লোকের মধ্যেই এই দুর্বলতা সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। যার যত বেশী বুদ্ধি, বুদ্ধির অহঙ্কার তার চতুর্গুণ। ফলে বুদ্ধি থেকেও কোন লাভ হয় না।"

"হেঁয়ালিতে কথা কইছ। একটু পরিষ্কার ক'রে বল।"

"বুড়োর প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে—বুদ্ধির অহঙ্কার। সেটা গোড়াতে বুঝে নিয়েছিলুম বলেই সেই অহঙ্কারে ঘা দিয়ে কাজ হাঁসিল ক'রে নিয়েছি। বাড়ীতে যখন ঢুকতে পেরেছি, তখন ত আট-আনা কাজ হয়ে গেছে। এখন বাকী শুধু হীরেটা খুঁজে বার করা।"

"তুমি কি আবার ও-বাড়ীতে মাথা গলাবে না কি?"

"আলবৎ গলাব। বল কি, এত বড় সুযোগ ছেড়ে দেব?"

"এবার গেলেই ঐ বেটা উজ্‌রে সিং পেটের মধ্যে কুকরি পুরে দেবে। যা হয় কর, আমি আর এর মধ্যে নেই।"

হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"তা কি হয়, তোমাকে চাই। এক যাত্রায় পৃথক্ ফল কি ভাল?"

পরদিন একটু সকাল সকাল স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিনা টিকিটে রেলে চড়িতে গেলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই রকম ভয়ে ভয়ে বাড়ীর সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু দরোয়ানরা কোনও বাধা দিল না; উজ্‌রে সিং আজ আমাদের দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইল না। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, গৃহস্বামী ষ্টুডিওতে আছেন।

অতঃপর আমাদের রত্ন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এত বড় বাড়ীর মধ্যে সুপারির মত একখণ্ড জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিবার দুঃসাহস এক ব্যোমকেশেরই থাকিতে পারে, অন্য কেহ হইলে কোন্‌কালে নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিত। খড়ের গাদার মধ্য হইতে ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করাও বোধ করি ইহার তুলনায় সহজ। প্রথমতঃ, মূল্যবান্ জিনিসপত্র লোক যেখানে রাখে অর্থাৎ আলমারী কি সিন্দুকে অনুসন্ধান করা বৃথা। বুড়া অতিশয় ধূর্ত—সে-জিনিস সেখানে রাখিবে না। তবে কোথায় রাখিয়াছে? এড্‌গার অ্যালেন্ পো'র একটা গল্প বহুদিন পূর্বে পড়িয়াছিলাম মনে পড়িল। তাহাতেও এমনই কি একটা দলিল খোঁজাখুঁজির ব্যাপার ছিল। শেষে বুঝি নিতান্ত প্রকাশ্য স্থান হইতে সেটা বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ কিন্তু অলস কল্পনায় সময় কাটাইবার লোক নয়। সে রীতিমত খানাতল্লাস শুরু করিয়া দিল। দেয়ালে টোকা মারিয়া কোথাও ফাঁপা আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। বড় বড় পুস্তকের আলমারী খুলিয়া প্রত্যেকটি বই নামাইয়া পরীক্ষা করিল। স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ীখানা চিত্র ও মূর্তির একটা কলা-ভবন (gallery) বলিলেই হয়, ঘরে ঘরে নানা প্রকার সুন্দর ছবি ও মূর্তির প্ল্যাষ্টার-কাষ্ট্ সাজানো রহিয়াছে, অন্য আসবাব খুব কম। সুতরাং মোটামুটি অনুসন্ধান শেষ করিতে দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগিল না। সর্বত্র বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে আমরা গৃহস্বামীর ষ্টুডিও ঘরে গিয়া হানা দিলাম।

দরজায় টোকা মারিতেই ভিতর হইতে গম্ভীর গর্জন হইল, "এস।"

ঘরটা বেশ বড়, তাহার এক দিকের সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া লম্বা একটা টেবিল চলিয়া গিয়াছে। টেবলের উপর নানা চেহারার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজানো রহিয়াছে। আমরা প্রবেশ করিতেই স্যর দিগিন্দ্র হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন বলিলেন, "কি হে ব্যোমকেশ বাবু, পরশ মাণিক পেলে? তোমাদের কবি লিখেছেন না, 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর'? তোমার দশাও সেই ক্ষ্যাপার মত হবে দেখছি, শেষ পর্যন্ত মাথায় বৃহৎ জটা গজিয়ে যাবে।"

ব্যোমকেশ বলিল, "আপনার লোহার সিন্দুকটা একবার দেখব মনে করছি।"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন, "বেশ বেশ। এই নাও চাবি। আমিও তোমার

সঙ্গে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম। কিন্তু এই প্ল্যাষ্টার-কাষ্টটা ঢালাই করতে একটু সময় লাগবে। যা হোক, অজিতবাবু তোমায় সাহায্য করতে পারবেন। আর যদি দরকার হয়, উজরে সিং—"

তাঁহার শেষোক্তিতে বাধা দিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটা আপনি কি করছেন?"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন,—"আমার তৈরী নটরাজ-মূর্তির নাম শুনেছ ত? এটা তারই একটা ছোট প্ল্যাষ্টার-কাষ্ট তৈরী করছি। আর একটা আমার টেবলের উপর রাখা আছে, দেখে থাকবে। কাগজ-চাপা হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়—কি বল?"

মনে পড়িল, স্যর দিগিন্দ্রের বসিবার ঘরে টেবলের উপর একটি অতি সুন্দর ছোট নটরাজ মহাদেবের মূর্তি দেখিয়াছিলাম। ওটা তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু উহাই যে স্যর দিগিন্দ্রের নির্মিত বিখ্যাত মূর্তির মিনিয়েচার, তাহা তখন কল্পনা করি নাই। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "ঐ মূর্তিটাই আপনি প্যারিসে এক্‌জিবিট করিয়াছিলেন?"

স্যার দিগিন্দ্র তাচ্ছিল্যভরে বলিলেন,—"হ্যাঁ। আসল মূর্তিটা পাথরে গড়া—সেটা এখনও ল্যুভারে আছে।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। লোকটার সর্বতোমুখী অসামান্যতা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই, ব্যোমকেশ যখন সিন্দুক খুলিয়া তন্ন তন্ন করিতে লাগিল, আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত বড় একটা প্রতিভার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা কোথায়?

অনুসন্ধান শেষ করিয়া ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"নাঃ, কিছু নেই। চল, বাইরের ঘরে একটু বসা যাক।"

বসিবার ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম, স্যর দিগিন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন এবং মুখের অনুযায়ী একটি স্থূল চুরুট দাঁতে চাপিয়া ধূম উদ্গিরণ করিতেছেন। আমরা বসিলে তিনি ব্যোমকেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—"পেলে না? আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। একটু জিরিয়ে নাও, তারপর আবার খুঁজো।" ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চাবির গোছা ফেরৎ দিল; সেটা পকেটে ফেলিয়া আমার পানে ফিরিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন, "ওহে অজিতবাবু, তুমি ত গল্প-টল্প নিয়ে থাকো; সুতরাং একজন বড় দরের

আর্টিষ্ট! বল দেখি, এ পুতুলটি কেমন?" বলিয়া সেই নটরাজ-মূর্ত্তিটি আমার হাতে দিলেন।

ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ইঞ্চি তিনেক চওড়া মূর্ত্তিটি। কিন্তু ঐটুকু পরিসরের মধ্যে কি অপূর্ব শিল্প-প্রতিভাই না প্রকাশ পাইয়াছে! নটরাজের প্রলয়ঙ্কর নৃত্যোন্মাদনা যেন ঐ ক্ষুদ্র মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গ হইতে মথিত হইয়া উঠিতেছে। কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিবার পর আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইল,—"চমৎকার! এর তুলনা নেই।"

ব্যোমকেশ নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"এটাও কি আপনি নিজে মোল্ড্ করেছেন?"

একরাশি ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—"হ্যাঁ। আমি ছাড়া আর কে করবে?"

ব্যোমকেশ মূর্ত্তিটা আমার হাত হইতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিল,—"এ জিনিস বাজারে পাওয়া যায় না বোধ হয়?"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—"না। কেন বল দেখি? পাওয়া গেলে কিন্‌তে না কি?"

"বোধ হয় কিন্‌তুম। আপনি এই রকম প্লাষ্টার-কাষ্ট তৈরী করিয়ে বাজারে বিক্রী করেন না কেন? আমার বিশ্বাস, এতে পয়সা আছে।"

"পয়সার যদি কখনও অভাব হয়, তখন দেখা যাবে। আপাততঃ জিনিসটাকে বাজারে বিক্রী ক'রে খেলো করতে চাই না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল,—"এখন তা হ'লে উঠি। আবার ও বেলা আসব।" বলিয়া মূর্ত্তিটা ঠক্ করিয়া টেবলের উপর রাখিল।

স্যর দিগিন্দ্র চমকাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি ত আচ্ছা বেকুব হে! এখনই ওটা ভেঙেছিলে!" তার পর বাঘের মত ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া রুদ্ধ গর্জনে বলিলেন,—"তোমাদের একবার সাবধান ক'রে দিয়েছি, আবার বলছি, আমার কোন ছবি বা মূর্ত্তি যদি ভেঙেছ, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেব, আর ঢুকতে দেব না। বুঝেছ?"

ব্যোমকেশ অনুতপ্তভাবে মার্জনা চাহিলে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন,—"এই সব সুকুমার কলার অযত্ন আমি দেখতে পারি না। যা হোক, ও বেলা তা হ'লে আবার আসছ? বেশ কথা, উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ—। এবার

বাড়ীর কোন্ দিক্‌টা খুঁজবে মনস্থ করেছ ? বাগান কুপিয়ে যদি দেখতে চাও, তারও বন্দোবস্ত ক'রে রাখ্‌তে পারি।"

বিদ্রূপবাণ বেবাক হজম করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। রাস্তায় পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"চল, এতক্ষনে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী খুলেছে, একবার ওদিক্‌টা ঘুরে যাওয়া যাক। একটু দরকার আছে।"

ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া ব্যোমকেশ বিলাতী বিশ্বকোষ হইতে প্ল্যাষ্টার-কাষ্টিং অংশটা খুব মন দিয়া পড়িল। তারপর বই ফিরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ্য করিলাম, কোনও কারণে সে বেশ একটু উত্তেজিত হইয়াছে। বাড়ী পৌঁছিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হে, প্ল্যাষ্টার-কাষ্টিং সম্বন্ধে এত কৌতুহল কেন ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তুমি ত জানো, সকল বিষয়ে কৌতুহল আমার একটা দুর্বলতা।"

"তা ত জানি। কিন্তু কি দেখলে ?"

"দেখলুম, প্ল্যাষ্টার-কাষ্টিং খুব সহজ, যে-কেউ করতে পারে। খানিকটা প্ল্যাষ্টার অফ্‌ প্যারিস জলে গুলে যখন সেটা দইয়ের মত ঘন হয়ে আস্‌বে, তখন মাটির বা মোমের ছাঁচের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা জমে শক্ত হয়ে যাবে, তখন ছাঁচ থেকে বার ক'রে নিলেই হয়ে গেল। ওর মধ্যে শক্ত যা কিছু ঐ ছাঁচটা তৈরী করা।"

"এই! তা এর জন্য এত দুর্ভাবনা কেন ?"

"দুর্ভাবনা নেই। তবে কি জানো, একটা কথা কেবলই মনে হচ্ছে। ছাঁচে প্ল্যাষ্টার অফ্‌ প্যারিস ঢালবার সময় যদি একটা সুপুরি কি ঐ জাতীয় কোনও শক্ত জিনিস সেই সঙ্গে ঢেলে দেওয়া যায়, তা হ'লে সেটা মূর্ত্তির মধ্যে রয়ে যাবে।"

"অর্থাৎ ?"

কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"অর্থাৎ বুঝ লোক যে জান সন্ধান।"

বৈকালে আবার স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ীতে গেলাম। এবারও তন্ন তন্ন করিয়া বাড়িখানা খোঁজা হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। স্যর দিগিন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া আমরা বসিবার ঘরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম, তখন তিনি

আমাদের ভারি পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া চা ও জলখাবার আনাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যোমকেশ একবারে বেহায়া,—সে অম্লান-বদনে সমস্ত ভোজ্যপেয় উদরসাৎ করিতে করিতে অমায়িকভাবে স্যর দিগিন্দ্রের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

স্যর দিগিন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কত দিন চালাবে? এখনও আশ মিটল না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ বুধবার। এখনও দু'দিন সময় আছে।"

স্যর দিগিন্দ্র অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া টেবলের উপর হইতে নটরাজের পুতুলটা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এটা কত দিন হ'ল তৈরী করেছেন?"

ভ্রূকুটি করিয়া স্যর দিগিন্দ্র চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"দিন পনের-কুড়ি হবে। কেন?"

"না—অমনি। আচ্ছা, আজ উঠি। কাল আবার আসব। নমস্কার!" বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ী ফিরিতেই চাকর পুঁটিরাম একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল, "একজন তকমা-পরা চাপরাসী দিয়ে গেছে।"

খামের ভিতর শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড, তাহার এক পিঠে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে—কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়। অন্য পিঠে পেন্সিল দিয়া লেখা, "এইমাত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। গ্র্যাণ্ডহোটেলে আছি। কত দূর?"

ব্যোমকেশ কার্ডখানা টেবলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল; কড়ি-কাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কুমার-বাহাদুর হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে মনে মনে খুসী হয় নাই বুঝিলাম। প্রশ্ন করাতে সে বলিল, "এক পক্ষের উৎকণ্ঠা অনেক সময় অন্য পক্ষে সঞ্চারিত হয়। কুমারবাহাদুরের আসার ফলে বুড়ো যদি ভয় পেয়ে মতলব বদলে ফেলে, তা হ'লেই সব মাটি। আবার নূতন ক'রে কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

সমস্ত সন্ধ্যাটা সে এক ভাবে আরাম-চেয়ারে পড়িয়া রহিল। রাত্রিতে আমরা দু'জনে একই ঘরে দুইটি পাশা-পাশি খাটে শয়ন করিতাম, বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ গল্প চলিত। আজ কিন্তু ব্যোমকেশ একটা কথাও কহিল না। আমি কিছুক্ষণ এক-তরফা কথা কহিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে, আমি, ব্যোমকেশ ও স্যর দিগিন্দ্র হীরার মার্বেল দিয়া গুলি খেলিতেছি. মার্বেলগুলি ব্যোমকেশ সমস্ত জিতিয়া লইয়াছে, স্যর দিগিন্দ্র মাটিতে পা ছড়াইয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় চমকিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

চোখ খুলিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে আমার খাটের পাশে বসিয়া আছে। আমার নিশ্বাসের সঙ্গে বোধ হয় বুঝিতে পারিল, আমি জাগিয়াছি, বলিল, "দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হীরেটা বসবার ঘরে টেবলের উপর কোনখানে আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাত্রি কটা?"

ব্যোমকেশ বলিল, "আড়াইটে। তুমি একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ? বুড়ো বসবার ঘরে ঢুকেই প্রথমে টেবলের দিকে তাকায়।"

আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলাম, "তাকাক্, তুমি এখন চোখ বুজে শুয়ে পড় গে।"

ব্যোমকেশ নিজ মনেই বলিতে লাগিল, "টেবলের দিকে তাকায় কেন? নিশ্চয়—টেবিলের দেরাজের মধ্যে? না। যদি থাকে ত টেবলের উপরেই আছে। কি কি জিনিস আছে টেবলের উপর? হাতীর দাতের দোয়াতদান, টাইমপিস্ ঘড়ি, গঁদের শিশি, কতকগুলো বই, ব্লটিং প্যাড, সিগারের বাক্স, পিণকুশন, নটরাজ—"

শুনিতে শুনিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রিতে যতবার ঘুম ভাঙ্গিল, অনুভব করিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সকালে ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণকে একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল। সংক্ষেপে জানাইল যে, চিন্তার কোনও কারণ নাই, শনিবার কোনও সময় দেখা হইবে।

তারপর আবার দুই জনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সারারাত্রি জাগরণের পর সে মনে মনে কোনও একটা দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে।

স্যর দিগিন্দ্র আজ বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে সম্ভাষণ করিলেন, "এই যে মাণিক-জোড়, এস, এস। আজ যে ভারী সকাল সকাল? ওরে কে আছিস, বাবুদের চা দিয়ে যা। ব্যোমকেশবাবুকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখছি, দুশ্চিন্তায় রাত্রিতে ঘুম হয় নি বুঝি?"

ব্যোমকেশ টেবল হইতে নটরাজের মূর্ত্তিটি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"এই পুতুলটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কাল সমস্ত রাত্রি এর কথা ভেবেই ঘুমোতে পারি নি।"

পূর্ণ এক মিনিটকাল দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নিঃশব্দে মনে মনে কি যুদ্ধ হইল, বলিতে পারি না, এক মিনিট পরে স্যর দিগিন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ব্যোমকেশ, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। অত সহজে এ বুড়োকে ঠকাতে পারবে না। ওটার জন্যে রাত্রিতে তোমার ঘুম হয় নি বলছিলে, বেশ, তোমাকে ওটা আমি দান করলাম।"

ব্যোমকেশের হতবুদ্ধি মুখের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—"কেমন? হ'ল ত? কিন্তু মূর্ত্তিটা দামী জিনিস, ভেঙে নষ্ট করো না।"

মুহূর্তমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"ধন্যবাদ।" বলিয়া মূর্তিটি রুমালে মুড়িয়া পকেটে পূরিল।

তার পর যথারীতি ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া বেলা দশটা নাগাদ বাসায় ফিরিলাম। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ব্যোমকেশ সনিশ্বাসে বলিল,—"নাঃ, ঠকে গেলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ব্যাপার বল ত? আমি ত তোমাদের কথাবার্তা ভাবভঙ্গী কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

পকেট হইতে পুতুলটা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"নানা কারণে আমার স্থিরবিশ্বাস হয়েছিল যে, এই নটরাজের ভিতরে হীরেটা আছে। ভেবে দেখ, এমন সুন্দর লুকোবার যায়গা আর হ'তে পারে কি? হীরেটা চোখের সামনে টেবলের উপর রয়েছে, অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। পুতুলটা স্যর দিগিন্দ্র নিজে ছাঁচে ঢালাই করেছেন, সুতরাং প্লাষ্টারের সঙ্গে সঙ্গে হীরেটা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। তাতে স্যর দিগিন্দ্রের মনস্কামনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে হীরেটার প্রতি তাঁর এত ভালবাসা, সেটা সর্বদা কাছে কাছে থাকে, অথচ কারুর সন্দেহ হয় না। যে দিক্ থেকেই দেখ, সমস্ত যুক্তি অনুমান ঐ পুতুলটার দিকে নির্দেশ করছে। তাই আমার নিঃসংশয় ধারণা হয়েছিল যে, হীরেটা আর কোথাও থাকতে পারে না। আজ ঠিক ক'রে বেরিয়েছিলুম যে, পুতুলটা চুরি করব। কিন্তু বুড়োর কাছে ঠকে গেলুম। শুধু তাই নয়, বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝে বিদ্রূপ ক'রে পুতুলটা

আমায় দান ক'রে দিলে! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে বুড়ো এক নম্বর। মোটের উপর আমার থিয়োরিটাই ভেস্তে গেল।—এখন আবার গোড়া থেকে সুরু করতে হবে।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু সময়ও ত আর নেই। মাঝে মাত্র এক দিন।"

ব্যোমকেশ পুতুলটার নীচে পেন্সিল দিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরে নিজের নামের আদ্যক্ষরটা লিখিতে লিখিতে বলিল,—"মাত্র এক দিন। বোধ হয়, প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হ'ল না। এ দিকে কুমারবাহাদুর এসে হানা দিয়ে ব'সে আছেন। নাঃ, বুড়ো সব দিক্ দিয়েই হাস্যাস্পদ ক'রে দিলে। লাভের মধ্যে দেখছি কেবল এই পুতুলটা!" মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটা টেবলের উপর রাখিয়া দিল, তারপর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বৈকালে নিয়মমত স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ীতে গেলাম। শুনিলাম, কর্তা এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। ব্যোমকেশ তখন নূতন পথ ধরিল, আমাকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া উজ্‌রে সিং থাপার সহিত ভাব জমাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। আমি একাকী বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম; ব্যোমকেশ ও উজরে সিং বারান্দায় দুই টুলে বসিয়া অমায়িকভাবে আলাপ করিতেছে, মাঝে মাঝে চোখে পড়িতে লাগিল। ব্যোমকেশ ইচ্ছা করিলে খুব সহজে মানুষের মন ও বিশ্বাস জয় করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু উজ্‌রে সিং থাপার পাহাড়ী হৃদয় গলাইয়া তাহার পেট হইতে কথা বাহির করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে আবার যখন দুজনে পথে বাহির হইলাম, তখন ব্যোমকেশ বলিল,—"কিছু হ'ল না। উজ্‌রে সিং লোকটি হয় নিরেট বোকা, নয় আমার চেয়ে বুদ্ধিমান্।"

বাসায় ফিরিয়া আসিলে চাকর খবর দিল যে, একটি লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল, আমাদের আশায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে বলিল,—"কুমারবাহাদুরের পেয়াদা।"

এই ব্যর্থ ঘোরাঘুরি ও অন্বেষণে আমিও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম,—"আর কেন ব্যোমকেশ, ছেড়ে দাও। এ যাত্রা কিছু হ'ল না। কুমারসাহেবকেও জবাব দিয়ে দাও, মিছে তাঁকে সংশয়ের মধ্যে রেখে কোনও লাভ নেই।"

টেবলের সম্মুখে বসিয়া নটরাজ-মূর্তিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল,—"দেখি, কালকের দিনটা এখনও হাতে আছে। যদি কাল সমস্ত দিনে কিছু না করতে পারি"—তাহার মুখের কথা শেষ হইল না। চোখ তুলিয়া দেখি, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে নিষ্পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নটরাজ-মূর্তিটার দিকে তাকাইয়া আছে।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হল ?"

ব্যোমকেশ কম্পিতহস্তে মূর্তিটা আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল,—"দেখ, দেখ—নেই! মনে আছে, আজ, সকালে পেন্সিল দিয়ে পুতুলটার নীচে একটা 'ব' অক্ষর লিখেছিলুম ? সে অক্ষরটা নেই!"

দেখিলাম, সত্যই অক্ষরটা নাই। কিন্তু সেজন্য এত বিচলিত হইবার কি আছে ? পেন্সিলের লেখা—মুছিয়া যাইতেও ত পারে!

ব্যোমকেশ বলিল,—"বুঝতে পারছ না ? বুঝতে পারছ না ?" হঠাৎ সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল,—"উঃ, বুড়ো কি ধাপ্পাই দিয়েছে! একেবারে উল্লুক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হে! যা হোক, বাঘেরও ঘোগ আছে। —পুঁটিরাম।"

ভৃত্য পুঁটিরাম আসিলে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"যে লোকটি আজ এসেছিল, তাকে কোথায় বসিয়েছিলে ?"

"আজ্ঞে, এই ঘরে।"

"তুমি বরাবর এ ঘরে ছিলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে মাঝে তিনি এক গেলাস জল চাইলেন, তাই—"

"আচ্ছা—যাও।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তার পর পাশের ঘরে যাইতে যাইতে বলিল,—"তুমি শুনে হয় ত আশ্চর্য হবে,—হীরেটা আজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত এই টেবলের উপর রাখা ছিল।"

আমি অবাক্ হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। বলে কি ? হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি ?

পাশের ঘর হইতে ব্যোমকেশ ফোন্ করিতেছে শুনিতে পাইলাম—"কুমার ত্রিদিবেন্দ্র ? হ্যাঁ, আমি ব্যোমকেশ। কাল বেলা দশটার মধ্যে পাবেন আপনার স্পেশাল ট্রেণ যেন ঠিক থাকে, পাওয়ামাত্র রওনা হবেন। না, এখানে

থাকা বোধ হয় নিরাপদ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ও সব কথা পরে হবে। ভুলবেন না। সাড়ে দশটার মধ্যে কলকাতা ছাড়া চাই। আচ্ছা, আপনার কিছু ক'রে কাজ নেই—স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত আমি ক'রে রাখব। কাউকে কিছু বলবেন না—না, আপনার সেক্রেটারীকেও নয়—আচ্ছা, নমস্কার।"

তার পর হ্যাটকোট পরিয়া বোধ করি স্পেশাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইল। 'ফিরতে রাত হবে—তুমি শুয়ে পোড়ো।' আমাকে শুধু এইটুকু বলিয়া গেল।

রাত্রিতে ব্যোমকেশ কখন্ ফিরিল, জানিতে পারি নাই। সকালে সাড়ে আটটার সময় যথারীতি দু'জনে বাহির হইলাম। বাহির হইবার সময় দেখিলাম, নটরাজ-মূর্তিটা যথাস্থানে নাই। সে দিকে ব্যোমকেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে তাচ্ছিল্যভরে বলিল,—"আছে। সেটাকে সরিয়ে রেখেছি।"

স্যর দিগিন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন,—"তোমাদের দৈনিক আক্রমণ আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। এমন কি যতক্ষণ তোমরা আস নি, একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল।"

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল,—"আপনার উপর অনেক জুলুম করেছি, কিন্তু আর করব না, এই কথাটি আজ জানাতে এলুম। জয়-পরাজয় এক পক্ষের আছেই, সে জন্য দুঃখ করা মূঢ়তা। কাল থেকে আর আমাদের দেখতে পাবেন না। আপনি অবশ্য জানেন যে, আপনার ভাইপো এখানে গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে আছেন,—তাঁকে কাল একরকম জানিয়েই দিয়েছি যে, তাঁর এখানে থেকে আর কোনও লাভ নেই। আজ তাঁকে শেষ জবাব দিয়ে যাব।"

স্যর দিগীন্দ্র কিছুকাল কুঞ্চিত-চক্ষুতে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিলেন, ক্রমে তাঁহার মুখে সেই বুল্‌ডগ-হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন,—"তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুশী হলাম। খোকাকে বোলো, বৃথা চেষ্টা ক'রে যেন সময় নষ্ট না করে।"

"আচ্ছা, বল্‌ব।"—টেবলের উপর আর একটি নটরাজ মূর্তি রাখা হইয়াছে দেখিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"এই যে আর একটা তৈরী করেছেন দেখছি! আপনার উপহারটি আমি যত্ন ক'রে রেখেছি; শুধু

সৌন্দর্যের জন্য নয়, আপনার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেও আমার কাছে তার দাম অনেক।—কিন্তু যদি কখনও ভেঙ্গে যায়,—আর একটা পাব কি?"

স্যর দিগীন্দ্র প্রসন্নভাবে বলিলেন,—"বেশ, যদি ভেঙ্গে যায়, আর একটা পাবে। আমার বাড়ীতে ঢুকে তোমার শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে, এটাও কম লাভ নয়।"

গভীর বিনয় সহকারে ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এতদিন আমার মনের ওদিকটা একেবারে পর্দা-ঢাকা ছিল। কিন্তু এই ক'দিন আপনার সংসর্গে এসে ললিত-কলার রস পেতে আরম্ভ করেছি, বুঝেছি, ওর মধ্যে কি অমূল্য রত্ন লুকোনো আছে।—ঐ ছবিখানাও আমার বড় ভাল লাগে। ওটা কি আপনারই আঁকা?" স্যর দিগীন্দ্রের পশ্চাতে দেয়ালের গায়ে একটা সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যের ছবি টানানো ছিল, ব্যোমকেশ অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়া দেখাইল।

মুহূর্তের জন্য স্যর দিগীন্দ্র ঘাড় ফিরাইলেন। সেই ক্ষণিক অবকাশে ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত হাতের কসরৎ দেখাইল। টিকটিকি যেমন করিয়া শিকার ধরে, তেমনই ভাবে তাহার একটা হাত টেবিলের উপর হইতে নটরাজ মূর্তিটা তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল এবং অন্য হাতটা সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নটরাজ মূর্তি তাহার স্থানে বসাইয়া দিল। স্যর দিগীন্দ্র যখন আবার সম্মুখে ফিরিলেন, তখন ব্যোমকেশ পূর্ববৎ মুগ্ধভাবে দেয়ালের ছবিটার দিকে চাহিয়া আছে।

আমার বুকের ভিতরটা এমন অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, স্যর দিগীন্দ্র যখন সহজ কণ্ঠে বলিলেন—"হ্যাঁ, ওটা আমারই আঁকা," তখন কথাগুলো আমার কানে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দূরাগত বলিয়া মনে হইল। ভাগ্যে সে সময় তিনি আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই, নতুবা ব্যোমকেশের হাতের কস্‌রত্‌ হয় ত আমার মুখের উদ্বেগ হইতেই ধরা পড়িয়া যাইত।

ব্যোমকেশ ধীরে সুস্থে উঠিয়া বলিল,—"এখন তা হ'লে আসি। আপনার সংসর্গে এসে আমার লাভই হয়েছে, এ কথা আমি কখনও ভুলব না। আশা করি, আপনিও আমাদের ভুলতে পারবেন না। যদি কখনও দরকার হয়,—মনে রাখ্‌বেন, আমি একজন সত্যান্বেষী, সত্যের অনুসন্ধান করাই আমার পেশা। চল অজিত। আচ্ছা, চল্লুম তবে,—নমস্কার!"

দরজার নিকট হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলাম, স্যার দিগীন্দ্র ভ্রূকুটি

করিয়া সন্দেহ-প্রখর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছেন, যেন ব্যোমকেশের কথার কোন্ একটা অতি গূঢ় ইঙ্গিত বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

বাড়ীর বাহিরে আসিতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল; তাহাতে চড়িয়া বসিয়া ব্যোমকেশ হুকুম দিল,—"গ্র্যাণ্ড হোটেল।"

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—"ব্যোমকেশ এসব কি কাণ্ড?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"এখনও বুঝতে পারছ না, এই আশ্চর্য। আমি যে অনুমান করেছিলুম, হীরেটা নটরাজের মধ্যে আছে, তা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। বুড়ো বুঝতে পেরে আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে পুতুলটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তার পর আর একটা ঠিক ঐ রকম মূর্তি তৈরী ক'রে কাল সন্ধেবেলা গিয়ে আসলটার সঙ্গে বদল করে এনেছিল। যদি এই অস্পষ্ট 'ব' অক্ষরটির লেখা না থাকত, তা হ'লে আমি জানতেও পারতুম না।" বলিয়া পুতুলটা উল্টাইয়া দেখাইল। দেখিলাম, পেন্সিলে লেখা অক্ষরটি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—'কাল যখনই এই 'ব' অক্ষরটি যথাস্থানে দেখতে পেলুম না, তখন এক নিমেষে সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ প্রথমে গিয়েই বুড়োর টেবল থেকে নটরাজটিকে উল্টে দেখলুম, আমার সেই 'ব' মার্কা নটরাজ। অন্য মূর্তিটা পকেটেই ছিল। ব্যস! তার পর হাত-সাফাই ত দেখতেই পেলে।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম,—"তুমি ঠিক জানো, হীরেটা ওর মধ্যেই আছে?"

"হ্যাঁ। ঠিক জানি—কোনও সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু যদি না থাকে?"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল,—"তা হলে বুঝব, পৃথিবীতে সত্য ব'লে কোনও জিনিস নেই। শাস্ত্রের অনুমান-খণ্ডটা একেবারে মিথ্যা।"

গ্র্যাণ্ড হোটেলে কুমার ত্রিদিবেন্দ্র একটা আস্ত স্যুট ভাড়া করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার বসিবার ঘরে পদার্পণ করিতেই তিনি দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিলেন,—"কি? কি হ'ল, ব্যোমকেশবাবু?"

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে নটরাজ মূর্তিটা টেবলের উপর রাখিয়া তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

হতবুদ্ধিভাবে কুমারবাহাদুর বলিলেন,—"এটা ত দেখছি কাকার নটরাজ। কিন্তু আমার সীমন্ত-হীরা—"

"ওর মধ্যেই আছে।"

"ওর মধ্যে—?"

"হ্যাঁ, ওরি মধ্যে। কিন্তু আপনার যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে ত? সাড়ে দশটার সময় আপনার স্পেশাল ছাড়বে।"

কুমারবাহাদুর অস্থির হইয়া বলিলেন,—"কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ওর মধ্যে আমার সীমন্ত-হীরা আছে কী বলছেন?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ পরীক্ষা ক'রে দেখুন।"

একটা পাথরের কাগজ-চাপা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ মূর্তিটার উপর সজোরে আঘাত করিতেই সেটা বহু খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল।

"এই নিন আপনার সীমন্ত-হীরা।" ব্যোমকেশ হীরাটা তুলিয়া ধরিল,—তাহার গায়ে তখনও প্ল্যাষ্টার জুড়িয়া আছে, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ওটা সত্য সত্যই হীরা বটে।

কুমারবাহাদুর ব্যোমকেশের হাত হইতে হীরাটা প্রায় কাড়িয়া লইলেন; কিছুক্ষণ একাগ্র নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ, এই আমার সীমন্ত-হীরা। এই যে এর ভিতর থেকে নীল আলো ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে। ব্যোমকেশ বাবু, আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব—"

"কিছু বলতে হবে না, আপাততঃ যত শীঘ্র পারেন, বেরিয়ে পড়ুন। খুড়ো মশায় যদি ইতিমধ্যে জানতে পারেন, তা হ'লে হীরে হারাতে কতক্ষণ?"

"না না, আমি এখনই বেরুচ্ছি। কিন্তু আপনার—"

"সে পরে হবে। নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে তার ব্যবস্থা করবেন।"

কুমারবাহাদুরকে ষ্টেশনে রওনা করিয়া দিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম। আরাম-কেদারায় অঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ পরম সার্থকতার হাসি হাসিয়া বলিল,—"আমি শুধু ভাবছি, বুড়ো যখন জানতে পারবে, তখন কি করবে?"

৪

দিন কয়েক পরে কুমারবাহাদুরের নিকট হইতে একখানি ইন্সিওর করা খাম আসিল। চিঠির সঙ্গে একখানি চেক পিন্ দিয়া আঁটা। চেক্-এ অঙ্কের হিসাবটা দেখিয়া আমার চক্ষু ঝলসিয়া গেল। পত্রখানি এইরূপ—

"প্রিয় ব্যোমকেশ বাবু,

আমার চিরন্তন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যাহা পাঠাইলাম, জানি আপনার প্রতিভার তাহা যোগ্য নয়। তবু, আশা করি, আপনার অমনোনীত হইবে না। ভবিষ্যতে আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় রহিলাম। এবার যখন কলিকাতায় যাইব, আপনার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিব।

অজিত বাবুকেও আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি সাহিত্যিক, সুতরাং টাকার কথা তুলিয়া তাঁহার সারস্বত সাধনার অমর্যাদা করিতে চাই না [হায় রে পোড়াকপালে সাহিত্যিক !] কিন্তু যদি তিনি নাম-ধাম পরিচয় বদল করিয়া এই হীরা-হরণের গল্পটা লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই জানিবেন। শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—প্রতিভামুগ্ধ

শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়।"

সংশপ্তকপুরের রহস্য

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

বেলা তখন নটা, রণজিৎ ও হুকা-কাশি দুখানা চেয়ারে মুখোমুখি বসে সেদিনকার দৈনিক খবরের কাগজখানা ভাগাভাগি করে পড়ছিলেন ; দুজনার মাঝখানে ছোট্ট একটি শ্বেত পাথরের টেবিল, তার ওপর নিঃশেষিত চায়ের কাপ এবং খাবারের থালা পড়ে রয়েছে।

স্থানটি কিন্তু আমাদের কলকাতা সহর নয়, কলকাতা থেকে অনেক দূরে সংশপ্তকপুর নামে একটি জায়গা। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঐ নামে যে নেটিভ স্টেটটির কথা শুনেছ তারই কথা বলছি। পুজোর ছুটিতে এক আত্মীয়ের আমন্ত্রণে রণজিৎ এখানে দিন পনেরোর জন্য বেড়াতে এসেছে, আর রণজিতের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াতে না পেরে হুকা-কাশিও তার সঙ্গী হয়েছেন।

দুজনেই নিবিষ্ট মনে খবরের কাগজে ডুবে ছিলেন। হঠাৎ বাইরের একটা প্রচণ্ড কলরবে দুজনকেই চমকে উঠতে হল। রণজিৎ তাড়াতাড়ি জানলার দিকে এগিয়ে এসেই বিস্ময়ে একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল—সদর রাস্তা পুলিশে ছেয়ে গেছে। বড় রকমের কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধলে ব্যাপারটা যে রকম ঘটে, অনেকটা প্রায় সেই ধরণেরই অবস্থা। ব্যাপারটা কি হতে পারে রণজিৎ হুকা-কাশির সঙ্গে তাই নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময়ে সে ঘরে এসে ঢুকলেন স্বয়ং গৃহকর্তা মণিশঙ্করবাবু। মণিশঙ্করবাবু সংশক্তপুর রাজ্যের দেওয়ান। সে আমলে যে-সব বাঙালী শুধু নিজের বুদ্ধি মাত্র সম্বল করে বিদেশে বেরিয়ে এসে কর্মকুশলতার গুণে বিশেষ গণ্যমান্য হয়ে উঠেছিলেন, মণিশঙ্করবাবু তাদের মধ্যে একজন। সংশক্তপুরের বর্তমান মহারাজ যখন নিতান্ত ছেলেমানুষ তখন তারই প্রাইভেট টিউটর হিসেবে নিযুক্ত হয়ে মণিশঙ্করবাবু প্রথম এ মুল্লুকে আসেন। দেখতে দেখতে তিনি বুড়োমহারাজের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন, ক্রমশই তার পদবৃদ্ধি হতে লাগল। বুড়ো রাজা অনেকদিন গত হয়েছেন, বর্তমান মহারাজা মণিশঙ্করবাবুর হাতে গড়া ছাত্র; গুরুকে তিনি প্রচুর ভক্তি-শ্রদ্ধা করে থাকেন। লোকে বলে, মহারাজা দেওয়ানের কথায় ওঠেন বসেন।

যা বলছিলাম, মণিশঙ্করবাবু ঘরে এসে ঢুকলেন। হুকা-কাশি এবং রণজিৎ উভয়েই লক্ষ্য করলেন, বৃদ্ধের স্বাভাবিক মৌন, প্রশান্ত মুখখানার উপর আজ কে যেন একছোপ কালি বুলিয়ে দিয়েছে, তাঁর প্রশান্ত ললাটে গুটিকয়েক চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে। রণজিৎ তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার, জ্যাঠামশাই ?'

'বলছি, বস ; মিস্টার হুকা-কাশি, আপনিও বসুন, হয়ত আপনার কাছেই আমায় একটু উপকারের প্রার্থনা জানাতে হবে।'

তিনজনে শ্বেতপাথরের টেবিলখানা ঘিরে বসে পড়লেন। মণিশঙ্করবাবু বলতে শুরু করলেন, প্রধানত হুকা-কাশিকেই লক্ষ্য করে—'এখানকার রাজ-পরিবারের ইতিহাস মোটামুটি সবই আপনাদের জানা আছে। রাজা একটু রক্ষণশীল স্বভাবের লোক। কৌলিক প্রথা, যেগুলো আবহমানকাল থেকে চলে আসছে, পারতপক্ষে সেগুলোর কোন রদবদল করতে চান না। সংশক্তপুর রাজ-পরিবারের একটা কৌলিক প্রথা হচ্ছে এই যে, রাজা নিজে অথবা যুবরাজ যখন প্রাসাদের বাইরে যাবেন তখন তাদের রাজবেশ পরে বেরুতে

হয়। এই রাজবেশের সবচাইতে প্রধান অঙ্গ হচ্ছে উষ্ণীষ। অর্থাৎ পাগড়ি। পাগড়ি দুটি যে শুধু বহুমূল্য কাপড়েরই তৈরী তা নয়—প্রত্যেকটারই সামনের দিকটাতে—ঠিক মধ্যিখানে এক-একখানা অখণ্ড হীরা বসানো। এ হীরা দুখানির যে সঠিক দাম কত তা আমি আপনাদের বলতে পারবো না। তবে, দাম যে প্রচুরই হবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। হয়ত দু'চার লাখ টাকাই হবে।

'বর্তমান যুবরাজের বয়স মাত্র ন'দশ বছর। যুবরাজ হিসেবে যখনই যেখানে সে যায়, হীরা সমেত উষ্ণীষ তার মাথায় থাকে। অবশ্য এ সব ক্ষেত্রে যুবরাজকে যথেষ্টই সুরক্ষিত রাখবার চেষ্টা হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও হীরাখানার উপর যে একেবারেই আক্রমণ হয় নি, একথা বলা চলে না। ছোট ছেলে কিনা, চোর-বাটপাড়ের নজর পড়া বিচিত্র তো নয়! মাস ছয়েক আগেকার ঘটনা, যুবরাজ গেছেন ঘোড়দৌড় দেখতে মাঠে, সারি সারি ঘোড়া ছুটছে, মাঠময় দারুণ উত্তেজনা, লোকেদের চিৎকারে কানে তালা লাগার গতিক। হঠাৎ যুবরাজের মাথা থেকে পাগড়ি খসে পেছনের মাটিতে পড়ে গেল। যুবরাজ ফিরে তাকাল, আর সঙ্গে সঙ্গে তার একজন দেহরক্ষীও খপ্ করে পেছনের একটা লোকের হাত চেপে ধরল। দেখা গেল, সে লোকটা ঘোড়দৌড় মাঠেরই একজন আর্দালি। সব জায়গাতেই তার অবাধ গতি, কাজেই যুবরাজের কাছে আসতেও তাকে কোন বেগ পেতে হয় নি। গ্রেপ্তারের পর লোকটাকে কতরকম জেরা করা হল, কত লোভ দেখানো হল, কিন্তু কিছুতেই সে স্বীকার করল না যে, কে তাকে এই দুঃসাহসের কাজে নিযুক্ত করেছে, তার মুখে শুধু এক কথা—সবাই উদগ্রীব হয়ে ঘোড়ার দিকেই তাকিয়ে আছে, তার অথবা যুবরাজের পানে কারো লক্ষ্য নেই দেখে হটাৎ সে লোভ সামলাতে পারে নি, তাই যুবরাজের মাথা থেকে পাগড়িটা খুলে নেওয়ার চেষ্টা করেছে।

'এই ঘটনার তিনমাস পরে যুবরাজের জন্য এক ব্যায়াম শিক্ষক নিযুক্ত করবার কথা হয়। কিষণচাঁদ নামে একটা লোক আমায় এসে ধরে পড়ল; বহুদিন ধরে সে ছিল আমারই অফিসের একজন কেরাণী, সম্প্রতি পেনসন নেবার পর তার পরিবার প্রতিপালন করা নাকি দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে; তার বড় ছেলে হরদেওলাল বহুদিন ধরে বিদেশে নানা আখড়ায় দেহচর্চা করেছে। এইবার রাজবাড়ির এই কাজটি তাকে জুটিয়ে দিতে হবে। রাজবাড়ির ওই

কাজটির জন্য অনেক ভাল ভাল উমেদার ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র আমারই সুপারিশের জন্য মহারাজ হরদেওলালকেই সে কাজে বহাল করলেন।

তারপর আজ সকালবেলার ঘটনা। যুবরাজকে সঙ্গে নিয়ে হরদেওলাল বেরিয়েছিল এখানকার চিড়িয়াখানা দেখাতে, সঙ্গে চার পাঁচজন পাইক বরকন্দাজ। চিড়িয়াখানার ভেতর ঘুরতে ঘুরতে ওরা একটু নির্জন জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছে, এমন সময় দূর থেকে প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল,—'শের নিকৃলা, শের নিকৃলা।' অর্থাৎ একটা বাঘ খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়েছে। একেবারে মহা হুলস্থুল ব্যাপার। যে যেখানে ছিল পাগলের মত ফটকের দিকে দৌড়তে লাগল। চিড়িয়াখানার ভেতরে ঢোকবার এবং ভেতর থেকে বার হবার একটি মাত্র ফটক—তা ছাড়া দ্বিতীয় কোন রাস্তা নেই। চারিদিক জেলখানার মত উঁচু পাঁচিলে ঘেরা। যুবরাজের দেহরক্ষীরা এ বিপদের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। কাজেই এ ক্ষেত্রে যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল, অর্থাৎ যুবরাজের কথা একদম ভুলে গিয়ে সবাই ছুটল ফটকের পানে, নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। যুবরাজ নিজেও মরি-বাঁচি জ্ঞানশূন্য হয়ে ফটকের দিকে ছুটে চলল। ঠিক সেই সময়ে হরদেওলাল পেছন থেকে যুবরাজের পাগড়িটি টুক করে টেনে নিল। ব্যাপারটা যুবরাজ টের পেলেও তখন আর সেদিকে দৃষ্টি দেবার সময় ছিল না, অন্যান্য পাঁচজনের মত সেও তখন প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টাতেই ব্যস্ত।

এদিকে হৈ-চৈ শুনে চিড়িয়াখানার কর্তাও বেরিয়ে এসেছিলেন। বাঘ খাঁচা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে এমন অদ্ভুত কথা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেননি, একটু খোঁজ নিতেই বুঝতে পারলেন, গুজবটা একেবারেই বাজে। তাড়াতাড়ি ফটকের কাছে দৌড়ে এসে সত্যি কথাটা তখন তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন। তারপর যুবরাজের দিকে চোখ পড়তেই তিনি অবাক হয়ে গেলেন। কেননা সাধারণত রাজা-মহারাজেরা চিড়িয়াখানা দেখতে এলে সে কথাটা কর্তাকে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়, যাতে তিনি স্বয়ং বরাবর সঙ্গে থেকে চিড়িয়াখানা দেখাতে পারেন। কিন্তু যুবরাজ এসেছেন কোনরকম খবর না দিয়ে। তিনি তার দিকে চাইতেই পাইক-বরকন্দাজরা এবার সেদিকে চোখ ফেরালো। হঠাৎ তাদের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। একসঙ্গে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'যুবরাজ, আপনার পাগড়ি? পাগড়ি কোথা গেল?' যুবরাজ জবাব দিলে 'আমি যখন ছুটে এদিকে

আসছিলাম তখন পেছন থেকে ওস্তাদজী সেটা খুলে নিয়ে গেছে।' ওস্তাদজী মানে হরদেওলাল। সকলে আবার বলে উঠল, 'ওস্তাদজী খুলে নিয়ে গেছে' সে কি কথা? কোথায় তিনি? চারদিকে তাকিয়ে কোথাও হরদেওলালের দেখা পাওয়া গেল না। তৎক্ষণাৎ চিড়িয়াখানার ফটক বন্ধ করে দেওয়া হল। কে কতকগুলো লোক এরই মধ্যে বাইরে বেড়িয়ে পড়েছিল, বরকন্দাজরা তাড়াতাড়ি ঠেলে তাদের ফের ফটকের ভেতর নিয়ে এল। তারপর আরম্ভ হল সমস্ত চিড়িয়াখানা তন্নতন্ন করে খোঁজা, কিন্তু কোথাও হরদেওলালের ছায়াও দেখা গেল না। চিড়িয়াখানার কর্তা এরই মধ্যে পুলিশে ফোন করে দিয়েছিলেন দেখতে দেখতে দু'লরী বোঝাই সেপাই এসে উপস্থিত হল। কারও দেহ-তল্লাসই বাকি রইল না। কিন্তু কোনও ফল হল না। হরদেওলালের সন্ধান পাওয়া গেল না। হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলেছি, বাঘ বেড়িয়েছে বলে গুজব রটবার সময় যুবরাজরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল তারই হাতকয়েক দূরে পাগড়িটা পাওয়া গেছে, কিন্তু তার হীরাখানা নিখোঁজ। নিশ্চয়ই হীরাটা হাত করে হরদেওলাল গোলমালের সময় ফটক দিয়েই ভেগে পড়েছে, কিন্তু এতগুলো লোকের চোখে সে একবারটি ধরা পড়ে নি। পুলিশ সমস্ত শহরময় তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাইরে রাস্তায় তারই গোলমাল শোনা যাচ্ছে।'

মণিশঙ্করবাবু একটু থেমে আবার বললেম, 'রাজবাড়ি থেকে এইমাত্র লোক এসে সমস্ত ঘটনা আমায় বলে গেল; শুনে অবধি লজ্জায় আমার মাথা একেবারে নুয়ে পড়েছে। ভাল ভাল লোক থাকা সত্ত্বেও আমিই যে ও হতভাগ্যটাকে চাকরিতে ঢুকিয়েছি, একথা একবারও ভুলতে পারছি না। মিঃ হুকা-কাশি, খবরের কাগজে অনেকবার আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা পড়েছি; রণজিতের মুখে আপনার সুখ্যাতি অষ্টপ্রহরই শুনতে পাই। দোহাই আপনার, এ যাত্রা আমার মুখরক্ষা করুন, হতচ্ছাড়াটাকে খুঁজে বার করে দিন, আমি মনের সুখে তাকে জুতিয়ে গায়ের ঝাল মেটাই।'

হুকা-কাশি সম্পূর্ণ নিস্তব্ধভাবে এতক্ষণ মণিশঙ্করবাবুর বর্ণনা শুনছিলেন, তাঁর বক্তব্য শেষ হতেই ধীরে ধীরে বললেন, আমার দ্বারা আপনাব অথবা মহারাজের যদি সামান্ত কিছু কাজও সম্ভব হয়, তবে সেটা নিশ্চয়ই সৌভাগ্য বলে মনে করব। তবে, এ ব্যাপারের কিনারা করতে হলে সরকারি মহলেও



হয়ত কিছু কিছু খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার হয়ে উঠবে। সেটার একটা বন্দোবস্ত করে দিলেই আমি কাজে নেমে পড়তে পারি।'

মণিশঙ্করবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'বেশ বেশ, আমি এক্ষুনি মহারাজকে টেলিফোন করছি।'

রণজিত এবং যুবরাজের একজন বরকন্দাজকে সঙ্গে নিয়ে হুকা-কাশি যখন চিড়িয়াখানায় এসে পৌঁছলেন তখন বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেছে। মহারাজের পরোয়ানা পাঠাতেই চিড়িয়াখনার কর্তা স্বরূপলাল এসে তাদের সঙ্গে জুটলেন। সকলে মিলে তখন এসে উপস্থিত হলেন সেই জায়গাটিতে, যেখানে যুবরাজের পাগড়িটিরও সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। বরকন্দাজটিকে হুকাকাশি জিজ্ঞাসা করলেন, বাঘের ডাক শুনে বরাবর এই রাস্তা ধরেই তোমরা বোধহয় ফটকের দিকে ছুটছিলে? তাছাড়া আর যাবেই বা কোন পথে—এটাই তো দেখছি শুধু বরাবর ফটক অবধি চলে গেছে! ডাইনে জলহস্তীর আর গণ্ডারের আস্তানা, আর বাঁয়ে লেক—কাজেই অন্য যে কোন পথ ধরলে সময় লাগত ঠিক তিনগুণ—সত্যিকারের বাঘ বেরুলে ততক্ষণে তোমাদের গিলেই ফেলত। আচ্ছা, মিঃ স্বরূপলাল, এ লেকটা কত গভীর?

'কিছু না বাবুসাহেব, কিছু না। মোটে একহাঁটু জল, এর ভেতরেও লোক নামিয়ে দিয়ে অনেক খোঁজ করেছি, কিন্তু হীরার কোন হদিশ পাই নি।

'অনর্থক মেহনত করেছেন। যে লোকটা নিজের শরীর দিলে হাওয়ায় মিলিয়ে, সে যাবে একটুকরো হীরা লুকোতে ঐ লেকের জলে? রামচন্দ্র, দেখুন, আমার এই চিড়িয়াখানাটার একটা নক্সা এঁকে দিতে পারেন? হ্যাঁ, এখন পেলেই সুবিধে হয়; আমরা মোটামুটি দেখে আপনার অফিসে গিয়ে উপস্থিত হচ্ছি, আপনি বরং ততক্ষণে নক্সাটা এঁকে ফেলুন গে।' তারপর রাজবাড়ির বরকন্দাজটির দিকে ফিরে বললেন, 'তুমিও না হয় বাবুর সঙ্গে তারই অফিস-কামরায় গিয়ে বস। আমরা যাবার সময় গাড়িতে তোমায় তুলে নিয়ে যাব। আসুন রণজিতবাবু, পাঁচিলের চারপাশটা একবার চক্কর দেওয়া যাক। ছোট্ট চিড়িয়াখানা, কতটুকুই বা আর সময় লাগবে?'

দেওয়ালের ধার ধরে দুজনে এগুতে লাগলেন। হুকা-কাশি কথা কইছেন বটে, কিন্তু তার সতর্ক দৃষ্টি বাজপাখির মত অনবরত খুঁটিনাটি সমস্ত লক্ষ্য করতে করতে চলেছে। একেবারে এদিকটাতে ঘাসের কোন বালাই নেই, তার

উপরে কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে, জায়গায় জায়গায় তাই বেজায় পেছল হয়েছে।

হঠাৎ একজায়গায় এসে হুকা-কাশি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন, 'রণজিতকে প্রশ্ন করলেন', ডানদিকের জমিটা একটু ভাল করে নজর করুন দেখি রণজিবাবু, কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি?'

রণজিত ঘাড় ফিরিয়ে একবার জায়গাটা দেখে নিলে, তারপর বললে 'হুঁ', কতগুলি পায়ের দাগ দেখছি বটে।'

একজনের পা নয় কিন্তু, অন্তত: তিনজনের। দাগগুলো অনেকটা মিলিয়ে গেছে বটে, তবুও ভিন্ন ভিন্ন মাপের দাগ, এ বেশ বোঝা যাচ্ছে। ভাল করে দেখুন তো, আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন কিনা?

হঠাৎ রণজিত যেন চমকে উঠল। চমকাবার কথাও বটে, কেন না সে স্পষ্ট দেখতে পেল, শাবল দিয়ে মাটিতে গোটা দুই বড় বড় গর্ত করে কে যেন আল্‌গা মাটিতে ফের সে গর্ত বুজিয়েছে। শুধু তাই নয়, গর্তের পাশেই কার যেন দু-দুটো হাতের পাঞ্জার ছাপ, অস্পষ্ট হলেও আঙুলগুলো বেশ বোঝা যাচ্ছে। সে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, 'বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি; সমস্ত রহস্য এবার পরিষ্কার হয়ে গেছে। যুবরাজের হীরা এখন মাটির তলায়। শাবলে খোঁড়া গর্ত পাওয়া যাচ্ছে, গর্ত বোজাবার চেষ্টা দিব্যি বোঝা যাচ্ছে, গর্তের পাশে হাতের আঙুলের অস্পষ্ট দাগ দেখছি—তবে আর বাকি, বাকি কী রইল? কী দারুণ আঙুল দেখেছেন, লোকটার গায়ে নিশ্চয়ই অসুরের মত জোর।'

হুকা-কাশি এরই মধ্যে চোখের সামনে একটা বাইনোকুলার তুলে ধরেছিলেন, সেটা নামাতে নামাতে জবাব দিলেন, 'শুধু কি আঙুলেরই ছাপ ও তার নিচে কতখানি জায়গা এখনও নিচু হয়ে আছে দেখুন!'

রণজিত সোৎসাহে বলল, 'আর ওই নিচু জায়গাটা লোকগুলো কী ভাবে মাড়িয়েছে তাও লক্ষ্য করবার বিষয়। দেখে তো মনে হয়, ইচ্ছে করেই পা দিয়ে জায়গাটাকে অমনভাবে ঠুকেছে।'

হুকা-কাশি গম্ভীরভাবে বললেন, 'আসল রহস্য হচ্ছে ওই নিচু জায়গার মধ্যিখানটার চারদিকে পায়ের দাগ, কিন্তু মধ্যিখানকার দু-ইঞ্চি জাগয়া দেখে মনে হয়, বুঝি কোন আর্টিস্ট ওখানে বসে তুলির আঁচড় বুলিয়েছে।···কিন্তু আর নয়, সামনের ওই রাজমিস্ত্রিগুলো হাঁ করে আমাদের কাণ্ডকারখানা

দেখতে শুরু করেছে। চলুন, এবার জানোয়ার দেখবার ভাণ করতে করতে আমরা এগোই। এখান থেকেই আরম্ভ করা যাক।'

দুজনে আবার দেওয়ালের পাশ দিয়ে এগোতে লাগলেন। খানিকটা গিয়েই পশ্চিম দিকের এই দেওয়ালটা শেষ হয়ে গেছে, আর একটা দেওয়াল চলে গিয়েছে সোজা দক্ষিণমুখে। পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকের দেওয়াল যেখানে মিশেছে ঠিক সেই জায়গাটিতে পাঁচ সাতজন মিস্ত্রি একটা নূতন ঘরের ভিত গাঁথছিল, হুকা-কাশি তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে ওস্তাগরেরা, আজ নাকি বাঘ বেরিয়েছিল? তোমরা পালাও নি তো?'

মিস্ত্রিদের মধ্যে যে সব চাইতে বয়সে বড়, সে হেসে বলল, 'না, বাবুসাহেব, চিড়িয়াখানার খাঁচা থেকে কখনো বাঘ বেরোতে পারে? সোরগোল উঠলেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম ও কোন দুষ্টু লোকের ধাপ্পাবাজি, কাজেই আমরা লোকজনদের কাউকে নড়তে দিই নি।

মিস্ত্রির সঙ্গে আলাপ স্থগিত রেখে হুকা-কাশি রণজিতকে বললেন, 'স্বরূপলালকে চিড়িয়াখানার নক্সা এঁকে দেখাতে বলেছি, কিন্তু এখন দেখছি তার আর কোন দরকার নেই। আমি ঢুকতেই যা মনে করেছিলাম, বাস্তবিক তাই। আকারে তো এটা একরত্তি, তা দেখতেই পাচ্ছেন। তাছাড়া এটা একেবারে জিওমেট্রির স্কোয়ার। এই কোণে দাঁড়ান, দেখবেন বাঁদিকে পশ্চিম দিকের দেওয়াল আর ডান দিকে দক্ষিণ দিকের দেওয়াল একেবারে শেষ অবধি দেখা যাচ্ছে। ঠিক এই কোণের সামনাসামনি উল্টো দিকে সদর ফটক—সেখানে এ মুখো হয়ে দাঁড়ালেও এমনি ধারা দেখতে পাবেন, বাঁদিকে পুবদিকের দেওয়াল আর ডানদিকে উত্তর দিকের দেওয়াল একেবারে শেষ অবধি দেখা যাবে—কোথাও বাধা লাগবে না।...এই যে, স্বরূপলাল নক্সা এঁকে আমাদেরই খোঁজে এদিকে আসছে দেখছি।'

অল্প একটু পরে স্বরূপলাল তাদের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। হুকা-কাশি একটু সৌজন্য দেখিয়ে মৃদু হেসে বললেন, 'মিথ্যেই আপনাকে কষ্ট দেওয়া হল দেখছি। নক্সার আর কোন দরকার নেই, আমি নিজের মনে-মনেই সেটা এঁকে ফেলেছি। তবে এনেছেন যখন, দিন, ওটা আমার পকেটেই থাক। বেলা হয়ে গেছে, এবার আমরা চলি। দরকার পড়লে ফের আসা যাবে।'

ফটকের বাইরে মণিশঙ্করবাবুর বিরাট মোটরখানা ওদের জন্য অপেক্ষা

করছিল। হুকা-কাশি তাতে উঠে বসে ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আসবার সময় আমরা তো গোটা চিড়িয়াখানাই চক্কর দিয়ে এসেছি—ঠিক ঐ পথেই অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেলের অফিসে যাওয়া যাবে কি ?'

'যাবে। তবে একটু ঘুর হবে।'

'তা হোক। ওই পথেই তুমি আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে নিয়ে চল।'

ড্রাইভার নেমে গাড়িতে স্টার্ট দিতে গেল ; রণজিত জিজ্ঞাসা করলে, 'অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে যাচ্ছি কেন ?'

'ওখানেই সব রকমের হিসাবপত্র থাকে কি না ! চলুন না, অনেক রগড় ক্রমে দেখতে পাবেন।'

মণিশঙ্করবাবু আজ দুপুরবেলা বাড়িতেই ছিলেন, রণজিত ফিরে আসতেই তিনি উৎসুকভাবে হুকা-কাশিকে প্রশ্ন করলেন, 'কদ্দূর এগোলো ? কোনও কিনারা করতে পারলেন কি ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ ; বারোআনা কাজই সমাধা হয়ে গেছে, বাকি মাত্র চার-আনা। আশা করি, কাল সকালবেলাই আপনি হরদেওলালকে মনের সাধে জুতোতে পারবেন।...হ্যাঁ, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, সদর ষ্ট্রীটের পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়—এই নম্বরগুলোর যে কোন একটা বাড়ির কর্তার সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে কি ?'

মণিশঙ্করবাবু একটু আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কেন বলুন তো ? সাত নম্বর সদর ষ্ট্রীটে তো বীর সিং-এর বাড়ি—লেফটেনান্ট বীর সিং। তার বাপ কর্ণেল ক্ষিতিপ সিং আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন।'

'তবে আপনি টেলিফোন করলে সে বোধহয় এখানে এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবে ?'

'নিশ্চয়ই। কেন, তাকে চাই ? আমি তাহলে এক্ষুণি তাকে খবর দিচ্ছি।'

'তবে সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানার কর্তা স্বরূপলালকেও একটা ফোন করে দেবেন—বাড়ি যাবার সময় প্রত্যেক কর্মচারী আজকের ঘটনা সম্বন্ধে কী জানেন তিনি যেন তা নোট করে রাখেন।'

মিনিট দশেক বাদে মণিশঙ্করবাবু নিচে নেমে এলেন, বললেন, বীর সিং ঘন্টাখানেকের মধ্যেই এসে পৌছচ্ছে। স্বরূপলালকেও আপনার কথামত

ফোন করেছি; সে জানিয়েছে প্রত্যেক কর্মচারীর জবানবন্দী সে নিয়ে রাখবে—কিন্তু সুন্দরলাল আজ অসুখের দরুণ অনুপস্থিত—তার জবানবন্দী পাওয়া যাবে না।

মনে হল হুকা-কাশির ঠোঁটের পাশ দিয়ে একটু যেন চাপা হাসি খেলে গেল। কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করলেন না, রণজিতকে লক্ষ্য করে বললেন, 'চলুন তবে, আমরা তবে চানটানগুলো সেরে ফেলি। রোদ্দুরে ঘোরা তো আর কম হয় নি।'

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় একঘণ্টা পরে লেফটেনান্ট বীরসিং এসে হাজির হলেন। খবর পেয়ে মণিশঙ্করবাবুও নেমে এসেছিলেন। সবাই ঘরে একত্র হতেই ভিতর থেকে দরজা এঁটে দেওয়া হল। মিনিট পনেরো বন্ধ দরজায় তাদের ভিতর কি সব কথাবার্তা হল। তারপর বীরসিং বিদায় নেবার সুরে বললেন, 'বেশ, তাই কথা রইল, আমি সন্ধ্যার পরই প্রস্তুত থাকব। আপনারা তবে রাত ন-টার মধ্যেই আমার ওখানে আসছেন?'

'হ্যাঁ'।

বীরসিং গিয়ে নিজের টু-সীটারে স্টার্ট দিলেন।

রাত তখন অন্ততঃ একটার কম নয়, বীরসিং-এর বাড়ির নিচেকার একটা ঘরে হুকাকাশি, রণজিত এবং বীরসিং আলো নিবিয়ে জানলার পাশে বসে বাইরের দিকে উদগ্রীব হয়ে চেয়ে আছেন। কারও মুখে রা নেই। হঠাৎ হুকা-কাশি আস্তে বীরসিং-এর কনুইয়ে একটু ঠেলা দিয়ে বলে উঠলেন, 'ওই এসেছে! শীগগির চলুন যাই।'

তিনজনেই চটপট উঠে পড়লেন। বীরসিং পাশের ঘরটার দরজায় দাঁড়িয়ে গোটা দুই তুড়ি দিতেই সে ঘর থেকেও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল চারজন বলিষ্ঠ সেপাই—তাদের প্রত্যেকের হাতে বন্দুক। নিঃশব্দে সদর রাস্তার মাঝামাঝি সকলে এগিয়ে আসবার পর বীরসিং টর্চটা জেলে সামনে কাদের লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'যে যেখানে আছ, চুপ করে দাঁড়িয়ে হাত তোল; এক পা নড়েছ কি গুলি ছুঁড়ব।' ততক্ষণে হুকা-কাশি আর রণজিতও টর্চ জেলে ফেলেছেন।

মুহূর্ত মধ্যে একটা গুরুভার দ্রব্য পতনের আওয়াজ হল। তারপরই সব চুপ। হুকা-কাশি এবং বীরসিং টর্চ হাতে সদলবলে এগিয়ে চললেন। কয়েক পা গিয়েই বীরসিং সবিস্ময়ে চীৎকার করে উঠলেন, 'একি! স্বরূপলালজী,

আপনি ?' কথা কয়টি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হঠাৎ চমকে দু'পা পিছিয়ে আসছিলেন, হুকা-কাশি মৃদু হেসে বললেন, 'ভড়কাবেন না লেফটেনাণ্ট, মাটিতে পড়ে ওটা ওরাংওটাং বটে, কিন্তু ওষুধের গুণে একেবারে অসাড়ে ঘুমুচ্ছে—একে বাহ্যজ্ঞান শূন্য। এই অবস্থাতেই মইয়ের সাহায্যে চিড়িয়াখানার এই পাঁচিলটা টপকে ওকে ওধারে—চিড়িয়াখানার মধ্যে চালান দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছিল।'

'কিন্তু কেন ?'

'চিড়িয়াখানার ভিতরকার ওরাংওটাং-বেশী একটি মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য। তারই কাছে যুবরাজের হীরাখানা রয়েছে কিনা। বুঝছেন না আমার কথা ? হরদেওলালের কথা বলছি। কালরাত্রে খাঁচা থেকে এই আসল ওরাংওটাংটাকে এই পথে এইভাবেই বার করে এনে খাঁচা শূন্য করে রাখা হয়েছিল। তাতে ছিল কেবল ওরাংওটাং-এর একটা নকল খোলস আর মুখোস। বাঘের ভয়ে সবাই যখন পালাতে ব্যস্ত তখন আমাদের হরদেওলাল যুবরাজের পাগড়ি থেকে হীরা খুলে সেই খাঁচায় ঢুকে পড়ে, তারপর খাঁচার অন্তরালে ঘুমোবার জায়গায় গিয়ে নকল খোলস পরে ওরাংওটাং সেজে বসে থাকে। হরদেওলাল লোকটা বেঁটে, নইলে এটা তার পক্ষে সম্ভব হত না। সারাদিন চিড়িয়াখানায় সকলে সেই নকল জন্তুটাকেই দেখেছে—কারও মনে ঘুণাক্ষরেও কোন সন্দেহ জাগে নি। আজ রাত্রে ফের আসল ওরাংওটাংটাকে তার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে নকলটিকে এই পথেই বাইরে আনবার বন্দোবস্ত করছিলেন আপনাদের চিড়িয়াখানার বর্তমান কর্তা এই স্বরূপলালজী। কিন্তু পারলেন না, ধরা পড়ে যেতে হল...... আমাদের কাজ হয়ে গেছে, লেফটেনাণ্ট বীর সিং। আমি আর আমার বন্ধু এখন বিদায় নেব। আপনাদের কাজ কিছু বাকি রইল—প্রথমত এই নর-বানর বন্দী ক-টিকে পুলিশের হেফাজতে পাঠানো। আর দ্বিতীয়ত চিড়িয়াখানায় ঢুকে ওরাংওটাং-বেশী হরদেওলালকে গ্রেপ্তার করা। যুবরাজের হীরা তার খোলসের ভিতরেই পাবেন, সে নিশ্চয়ই সেটা কাছছাড়া করতে রাজি হয় নি।

বাড়ি ফিরবার পথে রণজিত বিস্ময়ে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছে দেখে হুকা-কাশি একটু হেসে বললেন, 'আপনি বোধহয় এই ভেবে একটু অবাক হয়ে যাচ্ছেন যে, সমস্ত ব্যাপারটা আমি কী করে আঁচ করলাম।

কিন্তু সমস্ত জিনিসটা ভেঙে বললে দেখবেন, বাস্তবিক খুব বেশি আশ্চর্য হবার কিছু নেই এর ভিতর।...প্রথমে চিড়িয়াখানার যে জায়গাতে যুবরাজের মাথার পাগড়িটা টেনে খুলে নেওয়া হয়েছিল, সেইখানটাতে এসে আমরা দাঁড়ালাম। দেখি, একটা বাঁধানো রাস্তা সোজা সদর ফটক অবধি চলে গেছে। তার একদিকে জল, অন্যদিকে হিপ্পো আর গণ্ডারের আস্তানা; কাজেই কোন মানুষের পক্ষে সে রাস্তা ছেড়ে ডাইনে বাঁয়ে চলবার সম্ভাবনা নেই। হরদেওলাল যদি অন্য কোন রাস্তায় ফটকে পৌঁছতে চেষ্টা করত তাহলে কিছুতেই সে যুবরাজ আর বরকন্দাজদের আগে সেখানে গিয়ে উঠতে পারত না। কেননা অন্য যে কোন রাস্তা ধরলেই তাতে সময় লাগে তিন চার গুণ বেশি। কাজেই ফটকের সামনে ওদের সঙ্গে দেখা হতই; কিন্তু আমরা জানি হরদেওলালকে ফটকের সামনে ওরা কেউ দেখতে পায় নি। যদি বাস্তবিকই সে ফটক দিয়ে ভেগে পড়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই তাকে ছুটতে হয়েছে ওই বাঁধানো রাস্তাটি ধরেই—অর্থাৎ যুবরাজের পাশ কাটিয়ে, তার পাইক-বরকন্দাজদের পাশ কাটিয়ে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, অতখানি বুকের পাটা তার পক্ষে কি সম্ভব? পাগড়ি কে খুলে নিয়েছে যুবরাজ তা টের পেয়ে গেছল, কাজেই তার পাশ কাটিয়ে, তাকে পেছনে ফেলে দৌড়বার চেষ্টা করলে যুবরাজ চীৎকার করে উঠবে—এ আশঙ্কা কি তার মনে জাগে নি? তখন যে আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারত না! কাজেই দেখছেন, এটা বুঝতে আমার মোটেই বেগ পেতে হল না যে আর যেখান দিয়েই হরদেওলাল উধাও হোক না কেন, সদর ফটক দিয়ে যে সে যায় নি সেটা নিশ্চিত।

তারপর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন উঠল—সদর ফটক ছাড়া যখন চিড়িয়াখানা থেকে বেরবার আর কোন রাস্তা নেই, আর সদর ফটক দিয়ে সে যখন বার হয় নি, তবে কি পাচিল টপকে পালালো? কিন্তু অত উঁচু পাচিল তো আর মই না লাগিয়ে টপকানো সম্ভব নয়! একটু আগে পুলিশ এসে সমস্ত চিড়িয়াখানা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে গেছে, মই-এর চিহ্নমাত্র তারা পায় নি। চিড়িয়াখানার বাইরে চারপাশেই লোক চলাচলের রাস্তা, মইশুদ্ধ কোন লোক দেওয়াল টপকে পালাবার চেষ্টা করলে বাইরের লোকের নজরে পড়বার সম্ভাবনা ষোলআনা ছিল। আর সব চাইতে বড় কথা যেটা, সেটা হচ্ছে চিড়িয়াখানার আকারটা—দেখেছেন তো, ঠিক যেন জিওমেট্রির স্কোয়ার

তার এক কোণে সদর ফটকে দারোয়ানেরা বসে আছে, পূব আর উত্তরদিকের দেওয়াল দুটো শেষ অবধি তাদের নজরে আসছে। ঠিক তার উল্টো কোণে কাজ করছে রাজমিস্ত্রিরা—পশ্চিম আর দক্ষিণ দিকের দেওয়াল আগাগোড়া তাদের দৃষ্টির মধ্যে। এ অবস্থায় হরদেওলালের পাঁচিল টপকাবার ভরসা কোনমতেই হতে পারে না। তখন, মনে গুরুতর সন্দেহ হল, চিড়িয়াখানার কোন কর্মচারী এ চক্রান্তের মধ্যে নেই তো? একটু দেখতে হচ্ছে। নক্সা তৈরীর কাজ চাপিয়ে স্বরূপলালকে বিদায় দিলাম, কেননা যদিও তার ওপর তখন আমার কোন সন্দেহ হয় নি; তবু তৃতীয় ব্যক্তি কেউ আমাদের তদন্তের পদ্ধতি দেখতে পায় তা আমি চাই নি। সঙ্গে সঙ্গে বরকন্দাজকেও তার ঘরে পাঠিয়ে দিলাম। যাতে সে নক্সা-আঁকা ছেড়ে আমাদের কাজ না দেখতে পারে।

'পাঁচিল ধরে ধরে খানিকটা এগোতেই হঠাৎ আমার চোখ খুলে গেল। দেওয়ালের উপরে একটা জায়গায় মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। কতকগুলো ছাপ গোড়ালি বলে মনে হল। কতকগুলো আবার পায়ের চেটো বলে মনে হল। গোড়ালি চিড়িয়াখানার দিকে অর্থাৎ লোকগুলো পাঁচিলের দিক থেকে চিড়িয়াখানার ভিতর দিকেও এগিয়েছে। আবার চিড়িয়াখানার ভিতর থেকে পাঁচিলের কাছেও এসেছে। শুধু তাই নয়, পাঁচিলে যে মই লাগানো হয়েছিল, তারও প্রমাণ ওখানেই দেখতে পেলাম। শাবলে খোঁড়া গর্ত দেখে আপনি বললেন নিশ্চয়ই ওটা হীরা পুঁতবার কোন বন্দোবস্ত। কিন্তু বেশ করে ভেবে দেখুন তো, তা কি হওয়া সম্ভব? মিস্ত্রিরা সদাসর্বদা ওদিকে চাইছিল না! আর তাছাড়া হরদেওলাল নিজের অতবড় দেহখানাই লুকিয়ে ফেলল, ছোট্ট একখণ্ড হীরা লুকোতে সে আর পারবে না? আরও এক কথা বলি, হীরা যদি লুকোতেই হয়, তো একটা গর্তই কি সে জন্ম যথেষ্ট নয়? দুটো গর্ত খোঁড়বার কী দরকার ছিল? কাজেই আপনার থিয়োরী একদম বাতিল, এবার আমার থিয়োরীটা শুনুন। পাঁচিলের কাছে পাশাপাশি দুটো গর্ত দেখেই মনে হল, এ বাপু মই লাগাবার বন্দোবস্ত, বিশেষত যখন দেখছি দুটো গর্তের মধ্যে ব্যবধান মাত্র হাত দেড়েক, মানে, একটা মই সচরাচর যতটা চওড়া হয় ঠিক ততটা। জায়গাটা পিছল, পাছে মই হড়কে যায় সেই ভয়ে গর্ত খুঁড়তে হয়েছে। গর্তদুটো বেশ বড়, কাছেই বোঝা গেল মই-এর উপরে তারও চাপানো হয়েছিল অনেক খানিই, সন্দেহ ভঞ্জনের জন্ম তাড়াতাড়ি

আইগ্লাসটা চোখে লাগালাম—হুঁ যা ভেবেছি তাই, শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের গায়ে মই বসাবার দাগ বেশ ফুটে উঠেছে। এটাও বেশ বুঝতে পারা গেল, সমস্ত দাগগুলিই হালের, মানে, কাল সন্ধ্যা এবং আজ সকালের মধ্যে কোন একটা সময়ের, কেন না কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় অনবরতই বৃষ্টি হয়েছে, আগেকার দাগ হলে সব বেমালুম মুছে যেত। এক কথায় যা কিছু ঘটেছে সবই কাল রাত্তিরের ঘটনা। আর একটা অদ্ভুত জিনিস দেখা গেল পাঁচিলের নিচেই গোল হয়ে অনেকটা জায়গা বসে গেছে। খুব ভারি জিনিস উঁচু থেকে নরম মাটির ওপর পড়লে যেমনটি হয় ঠিক সেইরম। ওই জায়গাটার উপরই অবার দেখতে পেলাম অনেক লোকের পায়ের ছাপ। তখন আর ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হল না। একটা ভারি জিনিস জনাতিনেক লোক মই-এর সাহায্যে পাঁচিলের উপর তুলছিল, হঠাৎ সেটা মাটিতে পড়ে যায়। তখন সবাই সেই জায়গাটায় নেমে এসে ধরাধরি করে আবার সেটাকে তোলবার চেষ্টা করে, কাজেই সব ক-জনারই পায়ের দাগ সেই নিচু জায়গাটার উপর ফুটে উঠেছে। কিন্তু ঠিক মাঝখানটিতে কারোরই পা পড়ে নি। কাজেই সেইখানে অল্প একটু জায়গায় পদার্থটার আসল ছাপ মাটিতে ধরা পড়েছে। কেমন যেন চিকড়িমিকড়ি দাগ, অনেকটা মাটির ওপর পশম চেপে ধরলে যেমন হয়, সেই রকম। ঠিক তার একটু উপরেই দেখা যাচ্ছে কার যেন হাতের আঙুলের ছাপ। আপনি ঠিক বলেছিলেন, আঙুলগুলো অদ্ভুতই বটে, মানুষের আঙুল অত লম্বা হয় না। সব মিলে ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়ালো এই—মাটিতে এমন একটা হাতের ছাপ পাচ্ছি যা মানুষের মত অথচ মানুষের নয় বলেই ধারণা হচ্ছে; তার পাশে এমন একটা দাগ দেখা যাচ্ছে যাতে কোন লোমশ জীবের কথাই মনে আসে। স্থানটা চিড়িয়াখানা। কী জীব তাহলে সেটা হওয়া সম্ভব? অবশ্যই বনমানুষ। ওরাংওটাং ছাড়া আর কোন বনমানুষ এই ছোট্ট চিড়িয়াখানায় নেই তা আগেই একদিন গল্পচ্ছলে মণিশঙ্করবাবু বলেছিলেন। কাজেই আমার মনে দারুণ সন্দেহ জাগল যে চিড়িয়াখানার ওরাংওটাংকেই কালরাত্রে এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

ব্যাপারটা আর না ঘাঁটিয়ে আমরা এগোতে শুরু করলাম। আপনার মনে আছে কিনা জানি না,আমি বলেছিলাম, চলুন আমরা জানোয়ার দেখতে দেখতে এগোই। দু'পা এগোতেই বাঁদিকে পাওয়া গেল ওরাংওটাং-এর খাঁচাটি। একটা ওরাংওটাং তাতে শুয়ে ছিল বটে, এবং বাইরে থেকে

রাংওটাং ছাড়া তাকে আর কিছু বলে সন্দেহ করবার কোনই হেতু ছিল না
াও সত্যি, কিন্তু তার চোখ দুটি আসল স্বরূপ আমায় জানিয়ে দিলে। খুব
লো করে লক্ষ্য করতেই দেখতে পেলাম, সে চোখের পাতাও পড়ে না,
িও অচল। তখন সমস্ত রহস্যই আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। রাত্রে
ল ওরাংওটাং সরিয়ে খাঁচা ঠিক করা হয়েছিল, সকালে হরদেওলাল হীরা
রি করেই নকল ওরাংওটাং সেজে সকলের চোখে ধুলো দিয়েছিল। আজ
াত্রে নিশ্চয়ই আবার আসল ওরাংওটাংকে স্বস্থানে আনা হবে। হরদেওলাল
পাবে। ঠিক এই সময়েই হাতেনাতে সবকটা ষড়যন্ত্রকারীকে ধরে
কলব এই হল আমার মতলব।

'একটি বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল—ওরাংওটাংকে নাড়াচাড়া
করবার আগে নিশ্চয় ঔষুধ খাইয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলা হয়েছে, নইলে
নের পশু কখন যে কী করে বসে বলা তো যায় না। তাহলে তার যে রক্ষক
ারও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকবার কথা। আর ষড়যন্ত্রের মধ্যে রক্ষক
াস্তবিকই থাকলে নিশ্চয়ই সে আজ কাজে যোগ দিতে পারে নি
রাংওটাং-এর পাহারায় রয়েছে। এ বিষয়ে একটু অনুসন্ধান নেওয়া দরকার,
কন্তু চিড়িয়াখানায় ঘুণাক্ষরেও তা প্রকাশ করা চলবে না—সবাই তাহলে
বধান হয়ে যাবে। রক্ষকের কী নাম তা জানা আমার পক্ষে আর শক্ত কী?
াদ মহারাজের পরওয়ানা রয়েছে, সটান চলে যাব অ্যাকাউন্টান্ট-জেনারেলের
াফিসে। সেখানে ভাঙা ছুঁচটার পর্যন্ত হিসাব থাকে, ওরাংওটাং-এর রক্ষক
ক, তা কি আর লেখা নেই।

'অ্যাকাউন্টান্ট-জেনারেলের অফিসে যাবার পথে ইচ্ছে করেই
িড়িয়াখানার চারপাশটা ঘুরে গেলাম, কেন না ভিতরে যেখানে মই লাগানো
য়েছিল, তার একটা নিশানা আমি মনে করে রেখেছিলাম। পাচিলের
ক ওপাশে ওই জায়গায় হচ্ছে চার নং সদর স্ট্রীট, দরজায় নেমপ্লেট ঝুলছে—
পারিন্টেণ্ডেন্ট, জুওলজিক্যাল গার্ডেন্‌স্।

'অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিসে শুধু সুন্দর সিং-এর হদিশই পাই নি,
ার কতকগুলি জরুরী খবর জানতে পেয়েছি। প্রথম, স্বরূপলাল চিড়িয়াখানার
াকা কর্তা নয়, মাত্র তিন মাস ধরে 'অ্যাকটিনি' করছে; দ্বিতীয় তার
্যাকটিনি' কাজ আরম্ভ হবার সাতদিন পরেই হরদেওলাল রাজবাড়ির কাজে
াল হয়েছে; তৃতীয়, মাত্র দিনদশেক আগে সে তিন দিনের ছুটি নিয়েছিল—

খুব সম্ভবত ওরাংওটাংটির খোলসের বন্দোবস্ত করতে। ওরই বাড়ির সামনে ওরাংওটাং লোপাট করবার বন্দোবস্ত হয়েছে দেখে গোড়াতেই ওর ওপর সন্দেহ হয়েছিল, অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেলের অফিসে সে সন্দেহ আরও হল। আর সে সন্দেহ যে একেবারেই নির্ভুল তার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল একটু আগে।······ওঃ, এই যে, কথায় কথায় আমরা বাড়ি এসে পড়েছি দেখছি। মণিশঙ্করবাবুকে এবার ছেঁড়া চটির খোঁজ করতে বলতে হবে।'

মৃত্যুভয়

মনোজ বসু

আছেন জগবন্ধু সদাসতর্ক। সদর থেকে ফিরছেন। সঙ্গে পরম বিশ্বাসী সিপাহী দুটি। আর একটি বড় সহায় রয়েছে পিস্তল—কাপড়ের নিচে। কেউ সরকারী পোশাকে নয়—সিপাহী দুজনকে মনে হচ্ছে কোন জমিদারী কাছারির পাইক-বরকন্দাজ। জগবন্ধুকেও গলাবন্ধ জিনের কোট, সাদা উড়ানি এবং খাটো মাপের ধুতিতে কাছারির নায়েব ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না। যাতায়াত নৌকোয়। তিনজনে গাঙের ঘাটে এসে নৌকো খুঁজছেন।

ঠিক করেছেন গয়নার নৌকোয় যাবেন তাঁরা। গয়নার নৌকো অর্থাৎ শেয়ারের নৌকো—অনেক যাত্রী এক সঙ্গে যায় এইসব নৌকোয়—ভাড়া দূর হিসাবে এক আনা থেকে চার আনা। যার যেখানে গরজ নেমে চলে যায়, নতুন মানুষও ওঠে পথের মাঝে। কমপক্ষে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জন চড়ন্দার—নিতান্তই সাধারণের একজন হয়ে ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে চলে যাবেন। বেশি মানুষ বলেই নিরাপদ।

খান আষ্টেক গয়নার নৌকো। ভাটা ধরেছে নদীতে, ছাড়বার সময় হল, মাঝিরা তারস্বরে চড়ন্দার ডাকাডাকি করছে। ঘাটের এ-মুড়ো ও-মুড়ো বার কয়েক চক্কোর দিয়ে জগবন্ধু একটা নৌকো ওর ভিতরে পছন্দ করে ফেললেন। সবচেয়ে বেশি লোক সেই নৌকোয়—মেয়েলোক প্রচুর, বাচ্চা ছেলেপুলেও আছে। অন্য সকলে ডেকে ডেকে গলা ফাটাচ্ছে, এ নৌকোর মাঝি ডাডাক

উপর দাঁড়িয়ে। কে-একজন তামাক কিনতে গিয়েছিল—হাঁক দিয়ে বলছে, ছুটে আয়, ছুটে আয়। যাত্রী আর তুলছে না, ঐ মানুষটা এসে পড়লেই ছেড়ে দেয়।

কারণ অবশ্য বোঝা যাচ্ছে—এত ভিড় কেন এই নৌকোটায়, মাঝির এমন দেমাক কেন। গেরুয়া আলখাল্লা-পরা এক ছেলেমানুষ বৈরাগী গোপীযন্ত্র বাজিয়ে হরিনাম গান করছে পাছ-নৌকোয় বসে। গানের সুরে যেন মধু গলে পড়ে। মানুষের গাদাগাদি বৈরাগীকে ঘিরে। গান শুনবার লোভেই যত মানুষ এই নৌকোয় উঠতে চাচ্ছে। সব গয়নার নৌকোর ভাড়া একই রকম, এমন মধুর হরিনাম এবং তজ্জনিত পুণ্য এই নৌকোয় উপরি লাভ। চড়ন্দার সেইজন্য এত ঝুঁকেছে। কিন্তু যেতে চাইলেই অমনি তো নৌকোয় তোলা যায় না। বড় বড় ভয়াল নদী সামনে, পয়সার লোভে অগুন্তি বোঝাই দিয়ে মাঝনদীতে শেষটা ভরাডুবি ঘটাবে নাকি? মানুষ দেখে দেখে কে কোথায় যাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে তবে তুলছে। বেশির ভাগই কাছাকাছি যাবার মানুষ। বড়-নদীতে পড়বার আগে তারা নেমে গিয়ে নৌকো ভারমুক্ত হবে, এই বোধকরি অভিপ্রায়। চাষাভুষো শ্রেণীর প্রায় সমস্ত।

জগবন্ধু সঙ্গী দু-জন নিয়ে মাঝির কাছে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে মাঝি। বুঝেছে জমিদারের লোক। জমিদারের এলাকার নিচে দিয়ে সদাসর্বদা আনাগোনা, মাঝি মাত্রেই সেজন্য খাতির করে। বলে, যাবেন তো তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন নায়েব মশায়। দেরি করবেন না। আর নয়তো পরে ঐসব নৌকোয় যেতে পারবেন।

চলেছে সেই গয়নার নৌকা—চলেছে। নামতে নামতে জন দশ-বারো চড়ন্দার রইল শেষ অবধি। বাচ্চা কোলে বউমানুষও একটি আছে। বৈরাগী খুব জমিয়েছে—কৃষ্ণলীলা চলছে, বিপ্রলব্ধা রাই দুঃখ আর অভিমানের দহনে ছটফট করছেন সেই জায়গা।

বড়-গাঙে এবার। সুতীব্র স্রোত আর পিঠেন বাতাস পেয়ে নৌকো তীরের বেগে ছুটেছে। গান শুনতে শুনতে ধর্মপ্রাণ জগবন্ধু তদ্গত হয়ে পড়েছেন, চোখের কোণে প্রেমাশ্রু—

কী কাণ্ড লহমার মধ্যে! চড়ন্দারেরা হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে জগবন্ধুর উপর।

দাঁড়িরাও দাঁড় ফেলে তাদের সঙ্গে এসে জুটেছে। সকলের আগে দু-সিপাহী দুটোকে লাথি মেরে মাঝনদীতে ফেলল—সাঁতার দিয়ে কূলে পারে তো আপত্তি নেই। কিন্তু জগবন্ধুকে ছেড়ে দেবে না। টুঁটি ধরেছে তাঁর। চোখ আর মুখ বেঁধে ফেলল কাপড় দিয়ে। দেখতে পান আর কিছু। গোড়ায় একটা চেঁচানি দিয়েছিলেন, তারপর থেকে নিঃসাড় এমন শক্ত বাঁধনে বেঁধেছে, খুলে দিলেও বোধকরি বহুক্ষণ ঐ দুটো ইন্দ্রি সাড় হবে না। এবারে হাত দুটো পিছমোড়া দিয়ে বাঁধে, চোখ-মুখের বাঁধ খোলার একটু যে চেষ্টা করবেন সে উপায় রইল না। চোখ বাঁধার মুহূর্তটি বড় সিঁদুর-ফোঁটা পরা বউটাকে এক নজর দেখতে পেয়েছিলেন—কৌতুকে হাসিতে মুখ ভরে গেছে তার। আর সেই যখন চেঁচানি দিলেন, ভক্তপ্র বৈরাগী সঙ্গে সঙ্গে গানের গিটকিরি দিয়ে উঠল। চড়ন্দার ক'জন জগবন্ধু মুখে কাপড় গুঁজে দ্রুত হাতে বাঁধাছাঁদা করছে, আর সুরলয়ে সুল দোয়ারকি করে চলেছে। খোলকত্তালও ছিল নৌকোর পাটার নিচে— করে এনে তুমুল বাজনা শুরু করল সেই সঙ্গে। মাতামাতি ব্যাপার—ত ভিতর জগবন্ধুর আর্তনাদটুকু একেবারে তলিয়ে গেল। প্রতিক্ষণ ভাবছেন, সিপাহী দুটোর মতো তাঁকেও দেবে এইবার এক ধাক্কা। সাঁ জলের উপর ভাসবেন, হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সে সুযোগ হবে না। নদীত ভবের খেলার ইতি।

কিন্তু জগবন্ধু সামান্য নন, একটা থানার বড়বাবু। সিপাহীদের ম অত সহজে তাঁর রেহাই নেই। নৌকো জোরে ছুটিয়ে দিল। গীতব স্তব্ধ। দাঁড় তো আছেই, তার উপরে বোঠে পড়ছে অনেকগুলো। দাঁ বোঠেয় মিলে জলের উপর আলোড়ন তুলে নৌকো এই যেন একব আকাশে উঠে যায় আবার তখনই পাতালে নামে।

জগবন্ধু দারোগাকে নিয়ে নৌকো সরু খালে ঢুকে পড়েছে। পা জঙ্গল গায়ে এসে লাগে। চোখ-বাঁধা অবস্থায় আকাশ-পাতাল ভাবছেন তিনি নৌকো বেঁধে অনেকে এইবার ধরাধরি করে কাঁধের উপর তাঁকে তুলে নে নিয়ে চলল কোথায় না জানি। ধপাস করে এনে ফেলে ইটে-বাঁধা জায়গার উপর। ভারী বস্তু দূর-দূরান্তর থেকে বয়ে এনে কাঁধ থেকে ফে লোকে যেমন সোয়াস্তি পায়। কাঁটাঝোপ জায়গাটায়, জগবন্ধুর সর্বাঙ্গ ছ গেল। জোড়-হাতে ভর দিয়ে কোন গতিকে উঠে তিনি জবুথবু হ

বললেন। অনেকগুলো গলা পাওয়া যাচ্ছে। নৌকোর সবগুলো মরদ এসেছে, বাড়তিও বুঝি ছিল বসে এখানে।

(সকলকে নিয়ে বলাধিকারী এইবার ভাঙা অট্টালিকার সামনে রোয়াকের উপর উঠলেন। বললেন, এমন কসাড় জঙ্গল তখন হয় নি। কয়েকটা কাঁটাঝিটকের গাছ, সেই কাঁটা গায়ে বিঁধছিল। লোক চলাচল কিছু ছিল, বেচা মল্লিকের খাস যে দল, তাদের ওঠা-বসার আড্ডা এখানে। বিচারের জন্ম আমায় এনে ফেলল।)

জগবন্ধুর বিচার বসল। চোখ-মুখ হাত বেঁধেছে, কিন্তু কান দুটো খোলা রেখে দিয়েছে—আসামি স্বকর্ণে বিচার শুনতে পাবে।

কোন ব্যবস্থা উচিত হবে, মতামত নিচ্ছে সকলের।

কেউ বলছে, সড়কি মেরে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় কর। কেউ বলে মেলতুক দিয়ে চামুণ্ডার নামে বলি দাও—মহাভোগে মা প্রসন্ন হোন। আবার কেউ বলছে, মাটির নিচে পুঁতে ফেল—পচে গোবর হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে, বাইরে এতটুকু গন্ধ আসবে না। মানুষটা যে দুনিয়ার উপর ছিল, কোনদিন নিশানা হবে না তার।

প্রতিটি প্রস্তাব জগবন্ধু শুনে রোমাঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁকে শোনাবার জন্যেই বলা।

শেষটা ভারী গলায় একজন বলে—কাপ্তেন বেচারাম সেই মানুষটা—বেচা মল্লিক বলল, এটা কি বলছ—মানুষে টের পাবে না, তবে আর শাস্তিটা কি হল! কত থানাই তো আছে—থানার উপরে দারোগাও এই নতুন আসে নি। মানিয়ে গুছিয়ে চিরদিন কাজকর্ম হয়ে আসছে। শয়তান এই লোকটা। মেয়ের বিয়ের সময় ইজ্জত বাঁচিয়েছিলাম, বিনি খবরে জামাই এসে পড়লে ছুটোছুটি করে তারও সুরাহা করে দিই। উপকার মনে না রেখে উল্টে ফেউ হয়ে আমার পিছনে লেগে আছে। নেমকহারামির পরিণামটা লোকে জানবে না, শিক্ষা তবে হবে কিসে?

বেচারাম চুপ করল। নিস্তব্ধতা থমথম করছে। হুঁকো দিয়ে গেছে ইতিমধ্যে কেউ, গুড়ুক টানার আওয়াজ শুধু। শাস্তিটা কোন পদ্ধতিতে হবে, তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে তারই বোধহয় ভাবনাচিন্তা হচ্ছে।

আবার একজন বলে ওঠে, ফাঁসিতে লটকে দেওয়া যাক তবে। গাছের ডালে ঝুলুক। কোম্পানী বাহাদুর তিতুমীরের মানুষদের যেমন করেছিল।

কাকে ঠুকরে ঠুকরে চক্ষু দুটো খেয়ে ফেলবে আগে। রোদ্দুরে ধড় শুকিয়ে কাঠ হবে। তাবৎ লোক দলে দলে এসে দেখবে।

ফড়ফড় করে অবিরত হুঁকোয় টান। যে যা ইচ্ছা বলতে পারে, কিন্তু শেষ কথা বেচারামের। হুঁকো নামিয়ে এইবার সেটা উচ্চারিত হবে। বলল, নরহত্যা মহাপাপ, ওস্তাদের নিষেধ। সে কাজ ঠগীদের, আমাদের নয়। দেবী চামুণ্ডা তাদের উপর সেই ভার দিয়েছেন, মানুষ মেরে তারা দেবীর কাজ করে দেয়। আমরা আলাদা।

মুহূর্তকাল থেমে আবার বলে, তবে যদি কেউ নিজের ইচ্ছায় মারা পড়ে আমরা তার কি করতে পরি? তাই একটা মতলব ঠিক করলাম। দারোগার মরণ-বাঁচন তারই নিজের এক্তিয়ারে থাকবে, মরে তো আমরা সেজন্যে দায়ি হব না। অথচ মরবেই নির্ঘাৎ, বাঁচবার কোন উপায় নেই।

জগবন্ধু বলাধিকারীর মুখ বেঁধেছে, চোখ বেঁধেছে, তবু যদি হাত দুটো ছাড়া থাকত কানের ছিদ্র আঙুলে আটকে দিতেন। বিচার তাহলে শুনতে হত না। যেটা ওরা করতে চায়, হঠাৎ অজান্তে ঘটে যেত—এমন দগ্ধে দগ্ধে মরতে হত না। কী মতলব করছে, তারাই জানে। চোখ ঠারাঠারি হয়ে থাকবে নিজেদের মধ্যে। নিয়ে চলল এইবারে সিঁড়ি বেয়ে উপরে—

সকলকে নিয়ে বলাধিকারী ভাঙা অট্টালিকার সিঁড়ি বেয়ে উপরে চললেন। ঘরদোর প্রায় সমস্ত ভাঙা, কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে উপরে যেতে তত বেশী অসুবিধা হয় না।

একজন বলে, এ যে রাবণের সিঁড়ি। শেষ নেই—যেন স্বর্গধামে উঠে যাচ্ছি।

বলাধিকারী বলেন, আমার ঠিক উল্টোরকম মনে হচ্ছিল সেদিন। সিঁড়ির শেষ যেন না হয়। এ জায়গায় আসি নি তার আগে, গ্রামটাও জানতাম না। হাত-বাঁধা দড়ি টেনে একজন আগে আগে উঠছে, পিছন থেকে ঠেলা দিচ্ছে কজনা। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। চোখে দেখবার উপায় নেই, প্রতিক্ষণে ভয় হচ্ছে, এই বুঝি সিঁড়ি শেষ হয়ে গেল, ছাতে উঠে পড়লাম। ছাতে তুলে নিয়ে—তারপর কোন মতলব করেছে, ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে না কি করবে, কাপ্তেন কিছু তো বলল না। দেবী চামুণ্ডার কাছে মনে মনে মাথা খুঁড়ছি: এত অঘটন ঘটাও তুমি মা, একটা করে এই ধাপ উঠছি উপর দিকে ধাপ একটা সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়ে যায়। অনন্ত

কাল উঠেও কখনো ছাদে পৌঁছব না। মা চামুণ্ডার উপর পুরো ভরসা না করে নিজেও যতটা পারি টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছি। জীবনের মেয়াদ কোন না বিশ মিনিট আধ ঘন্টা বাড়িয়ে নেওয়া যাচ্ছে এই কৌশলে।

উপরের লোকটা, হাতের দড়ি ধরে যে টানছে, বিরক্ত ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে : বলি সারারাত্তির লাগবে নাকি এই কটা সিঁড়ি উঠতে? আপসে না যাবে তো বলো, কোমরে কাছি বেঁধে তুলে দিই।

মুখ তো জবর রকম বেঁধে দিয়েছে তবু আমায় জবাব দিতে বলছে। জবাব না পেয়ে চটেমটে গেল বোধহয়। ঠিক কাছি না বাঁধলেও প্রায় তার কাছাকাছি বটে—নিচের মানুষে উপরের মানুষে বল লোফালুফি করতে লাগল যেন আমায় নিয়ে। ধাঁ ধাঁ করে উঠে যাচ্ছি। কত উঁচুতে নিয়ে তুলল রে বাবা—হাত বাড়ালে আকাশে ঠেকে যাবে, এমনিতরো মনে হচ্ছে। অবশেষে থামল এক সময়। পা বুলিয়ে বুলিয়ে বোঝা গেল, সমতল জায়গা। ছাদে এসে গেছি। মনের মতলব কাপ্তেন বলবে এইবারে।

জগবন্ধুকে ছাতে তুলে নিয়ে এলো। আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। লোকগুলো জিরিয়ে নিচ্ছে। একটা অতি-কর্কশ কণ্ঠ তারপরে অনুমতি চাইলে : বলো কাপ্তেন এবারে—

কাপ্তেন বেচারাম ভরাট গলায় বলে, হাতের দড়ি খুলে পা দুটো বেঁধে ফেল ঐ দড়িতে। আলসের ওধারে নিয়ে ঝুলিয়ে দাও।

সেই ব্যবস্থা হতে লাগল। জগবন্ধুকে সোজাসুজি ডেকে বেচারাম এবার বলে, ও সাধু দারোগা, শুনে নাও। মানুষ আমরা মারি নে। ওস্তাদের মানা, কাজেরও বদনাম হয়। এত শত্রুতা করেছ, দুটো হাত তবু ছাড়া রইল। ছাতের আলসের মাথা আঁকড়ে ধরে ঝুলতে থাক। বাদুড় ঝুলে থাকে, চামচিকে ঝুলে থাকে, তুমি কেন পারবে না হে? তাদের চেয়ে অক্ষম কিসে? কপালে থাকলে পথ-চলতি মানুষ ঘাড় উঁচু করে দেখে উদ্ধার করবে। শক্ত করে ধরে থাক, হাত সরে না যায়। কতগুলো সিঁড়ি ভেঙে কত উঁচুতে উঠেছ, আন্দাজ আছে তো? পড়ে গেলে ছাতু-ছাতু হয়ে যাবে কিন্তু। সে মরার জন্ম ধর্মের কাছে আমরা দায়ী হব না।

জগবন্ধু হাত ছেড়ে দিয়ে যদি পড়েই যান, সে কারণে বেচারামের দল ধর্মের কাছে দায়ী হবে না। ধর্ম তরিয়ে ধুপধাপ সিঁড়ি বেয়ে সকলে নিচে

চলে গেল। ছাতের আলসে ধরে জগবন্ধু ঝুলতে লাগলেন। খবর রাখে, রীতিমতো জিমনাষ্টিক-করা মানুষ তিনি।

হাতের বদলে পা দুটো শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে, পায়ের সাহায্য নিয়ে কৌশলে ছাতের উপর যাতে উঠে আসতে না পারেন। ঝুলতে লাগলেন বলাধিকারী সেই অদ্ভুত অবস্থায়।

এক হাতে একটুখানি ঝুলে থেকে অন্য হাতে মুখের বাঁধন খোলা যায় কি না চেষ্টা করে দেখছেন। অসম্ভব। সে বাঁধন ছুরি দিয়ে না কাটলে হবে না। তা ছাড়া একখানা হাতের উপর এত বড় দেহের ভার—গেলেন বুঝি এই পড়ে হাত ত্রিশেক নিচে। দুটো হাতে তাড়াতাড়ি আলসে চেপে আপাতত আত্মরক্ষা করলেন। ঝিঁঝির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে অনেক দূরের ভূমিতলে, তক্ষক ডাকছে পরিত্যক্ত বাড়ির অন্ধিসন্ধিতে। নৌকো ভাসিয়ে দস্যুদল এতক্ষণে চলে গেল কাঁহা-কাঁহা মুলুক। উজ্জ্বল সিঁদুর-পরা সেই দুর্বৃত্ত রূপসী হয়তো খলখল করে হাসছে, মধুকণ্ঠ বৈরাগী কর্মসিদ্ধির আনন্দে আরও মধুর ভক্তিরসের গান ধরেছে। কত রাত্রি এখন না জানি—কতক্ষণে রাত পোহাবে! পথের মানুষ দৈবক্রমে উপরমুখো তাকালে আজব কাণ্ড দেখবে —লাউয়ের মাচায় ফলন্ত লাউ যেমন ঝোলে, একটা মানুষ তেমনি ছাতের আলসে ধরে ঝুলছে।

কিন্তু দুটো হাতেও তো দেহভার রাখা যায় না, হাত টনটন করছে। মরিয়া হয়ে জোড়া-পায়ে একটা দোলন দিতে কার্নিশ পায়ে ঠেকল। আলসের খানিকটা নিচে দিব্যি উঁচু কার্নিশ। পা-দুটোর আশ্রয় হল, খানিকক্ষণ তবু যুঝে থাকা যাবে। জগবন্ধু ঝুলছেন না আর এখন—আলসের মাথা দু-হাতে আঁকড়ানো, পা কার্নিশের খাঁজে, ধনুকের মতো দুমড়ে রয়েছেন। জীবনকে যেন প্রাণপণে জড়িয়ে ধরে আছেন কার্নিশ আর আলসের মাঝের জায়গাটুকুতে। কিন্তু কতক্ষণ আর! মা চামুণ্ডা, তাড়াতাড়ি রাত পুইয়ে সকাল করে দাও, মানুষ ঘুম ভেঙে বেরিয়ে চলাচল শুরু করুক।

পোহাল রাত অবশেষে। চামুণ্ডার দয়ায় তাড়াতাড়ি পুইয়েছে, তা নয়। বরঞ্চ উল্টো। মা যেন রাতটাকে টেনে টেনে বেধড়ক লম্বা করে সন্তানের ধৈর্যের পরীক্ষা করলেন। কাকপক্ষী ডাকছে, মানুষের কথাবার্তাও একটু বুঝি

কানে পাওয়া যায়। রোদ চড়ে উঠল, সেঁক লাগছে গায়ে। হে মা কালী, মানুষজনের উঁচুমুখো নজর তুলে দাও, কেউ না কেউ দেখে ফেলুক।

কি নিয়ে তর্ক করতে করতে জনকয়েক একেবারে নিকটে এসে পড়েছে। আবার ক্রমশ দূরবর্তী হয়ে কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। নিরাশ হয়ে পড়লেন জগবন্ধু। জীবন আঁকড়ে ধরা আছে কয়েকটা মাত্র আঙুলের ডগায়। প্রাণ-পণে ধরে আছেন—কিন্তু কতক্ষণ আর! হাত দুটো খসে যাবে যে কোন মুহূর্তে। গলা ফাটিয়ে মানুষের উদ্দেশে বলতে চান: শোন, শুনছ গো তোমরা? পা-ফেলে-চলা মাটিটুকুই সব নয়, মাথার উপরেও আছে। ঘাড় উঁচু করে তাকিয়ে দেখ।

হায় রে, বাঁধা-মুখে আওয়াজ বেরোয় না। মানুষ ঘুরবে ফিরবে সারাদিন, দিন গিয়ে সন্ধ্যা হবে রাত্রি হবে। আকাশমুখো কেউ তাকাবে না।

পিছনের অনেকগুলো দিন দ্রুত মনের উপর দিয়ে ছুটেছে—শিশু থেকে এই জোয়ান-যুবো হয়েছেন তার বহু ঘটনা। হঠাৎ মনে হল, ঝুলছেন না তিনি, নিরালম্ব শূন্যলোকে ভাসছেন রাজা ত্রিশঙ্কু হয়ে—স্বর্গেও নেই, মর্ত্যেও নেই। গভীর কালো তরলিত ছায়া নিম্নদেশে—হু-হু করে পড়ে যাচ্ছেন তিনি সেখানে, আবর্তময় ভয়াল ছায়া-নদীতে। ধারাস্রোতে প্রবল এক পাক দিয়ে উল্কার বেগে নিয়ে চলল তাঁকে, লহমার মধ্যে পৌঁছে দিল। পুরানো দিনের চেনা কণ্ঠধ্বনি অনেক কানে আসে, যে সব মানুষ বেঁচে নেই বলে জানেন। কিন্তু কঠিন ভাবে চোখ বাঁধা বলে দেখা যায় না কোন-কিছু। মুখ বাঁধা বলে ডাকতে পারেন না কারও নাম ধরে। পা বাঁধা বলে সাঁতরে কাছে যাবেন, সে উপায় নেই। হাত দুটোই শুধু খোলা আছে, আচ্ছন্ন অবস্থায় কখন সেই হাত বাড়িয়ে দিলেন, তাদের ধরবার অভিপ্রায়ে···তারপর আর কিছু মনে পড়ে না, খানিকটা সময় এর পরে একেবারে ফাঁকা। চেতনা অসাড় করে দিয়ে ডাক্তার অপারেশন করে, চেতনা ফিরে পেয়ে রোগি কিছুতে আর মাঝের অবস্থা মনে করতে পারে না। জগবন্ধুরও ঠিক তাই—হাত ছেড়ে দেবার পরে অনেকখানি সময় মুছে রয়েছে তাঁর মনে, জীবন থেকে বেরিয়ে চলে গেছে।

নরেন নি বলাধিকারী। ক্ষুদিরামকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে ঘড়ির হিসাব করেছিলেন। সর্বসাকুল্যে ঘণ্টা ছয়েক ছিলেন বোধ করি ঝুলন্ত অবস্থায়। কিন্তু কষ্টটা ছয় কিংবা ছ-শ বছরের।

তেতলার ছাতে এনে তুলেছিল, ছাতের উপর ঐ যে চিলেকোঠা—। জগবন্ধু চিলেকোঠার আলসে দেখালেন সাহেবদের। ক্ষুদিরাম সেই সময়টা মুখে হাত চাপা দিয়ে খিকখিক করে হাসছে। জগবন্ধুকে জানানো হয়েছিল, আলসের বাইরে দিকে তাঁকে ঝুলিয়ে দিয়েছে—ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হাত নিচে মাটি। আসলে ঝুল খাচ্ছিলেন তিনি চিলেকোঠার আলসে ধরে। কার্নিশে পা রেখে ধনুকের মতন দুমড়ে ছিলেন, সরলরেখায় থাকলে পা থেকে ছাত দেড়-হাত দু-হাতের বেশি নয়। একটা বাচ্চা ছেলেও যেটুকু নিরাপদে লাফিয়ে পড়তে পারে। অথচ আতঙ্কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি যমযন্ত্রণা ভোগ করেছেন। মরার কিছুমাত্র সম্ভাবনা না থেকেও হাজার বার মরণ হয়ে গেল। হাত অবশ হয়ে পড়ে গেলেন একসময়—পতন মাত্র দেড় হাত উঁচু ছাদে। গায়ে আচড়টি লাগে নি, তবু কিন্তু অচেতন হয়ে রইলেন দীর্ঘক্ষণ। চোখ-মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে গেছে ইতিমধ্যে। আরও অনেকক্ষণ পরে সম্বিত পেয়ে চোখ মেলে চারিদিক দেখেন। কাপ্তেন বেচারাম কৌতুক করে গেছে—এত বড় বেকুবি কারো কাছে প্রকাশ করে বলার নয়।

সে দিনের এই মনোভাব। এখন লজ্জা ভেঙে গিয়ে বলাধিকারী হাঁকডাক করে সকলকে সেই বিচিত্র উপলব্ধির কথা বলেন: চোখের উপর মৃত্যুর স্পষ্ট চেহারাটা ভাল করে দেখে নিয়ে জীবন্তের মধ্যে ফিরে এসেছি আবার। মৃত্যুভয় তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছি। অভিজ্ঞতা চাক্ষুষ বলেই প্রত্যয় দৃঢ়। জীবন উত্তাল উদ্বেগময়, মৃত্যু শান্ত নিরুত্তাপ নিরুপদ্রব। মৃত্যুতে নয়, মৃত্যুভয়েরই যন্ত্রণা। সে ভয়ের কিছুমাত্র ভিত্তিভূমি নেই।

খুন-খারাপি

শিবরাম চক্রবর্তী

খারাপি যদ্দূর হবার হল, খুনটা হতেই বাকি রইল কেবল। ‘খুন-খারাপি’ সম্পাদকের সঙ্গে বেশ একচোট হয়ে গেল আমার।

ওর গোয়েন্দা-কাহিনীর মাসিকে একটা ডিটেকটিভ গল্প দিয়েছিলাম। পড়ে-টড়ে বললেন, কিস্‌সু হয় নি। ডিটেকটিভ গল্প বলছেন, কিন্তু এর মধ্যে ডিটেকশন কোথায়? ঘটনা কই? একটা ডিটেকটিভও তো নেই। টিকটিকির ল্যাজ দূরে থাক—টিকিও দেখা যায় না।

টিকটিকি না থাক—খুনতো আছে। ওর টিকটিক করার প্রতিবাদে আমি বলতে যাই।

হ্যাঁ, খুন আছে, তাই বলেই যে খুনের গল্প হয়েছে, তা আমি বলতে পারব না, বরং বলতে হয় গল্পটাকেই আপনি খুন করেছেন। খুনের সেই আবহাওয়া কই? খুনীর মনস্তত্ত্ব? সত্যিকারের খুন বলে ত মনেই হয় না। খুনীকে মনে হয় যেন কলের পুতুল, লেখকের হাতের খেলনা মাত্র। তার কোন ব্যক্তিত্বই নেই। গল্পের খুনোখুনি, বস্তুত না ঘটলেও, তার মধ্যে বাস্তবতার স্পর্শ থাকবে তো? তবেই না মশাই, পড়লে মনে হবে, হত্যাকাণ্ডটি সত্যিই বুঝি ঘটেছিল। নাঃ যদ্দিন না আপনি নিজে একটা খুন করতে পারছেন, তদ্দিন কোন খুনের গল্পে আপনার হাত খুলবে না। মহীশবাবু সাফ কথা বলে দিলেন শেষটায়।

আর এই বলে নিহত গল্পটাকে তিনি আমার হাতে ফেরৎ দিলেন। নিমতলায় পাঠাবার জন্যই মনে হয়। কিন্তু কথাটা ওর একদিক দিয়ে খাঁটি, আমি ভেবে দেখলাম। সত্যিই খুনের কোন অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। ভালবাসার অভিজ্ঞতা না থাকলে যেমন প্রেমের গল্প লেখা যায় না, খুন খারাপির বেলায়ও তার অন্যথা হবার কথা নয়। সম্পাদকের কথায় একটা আইডিয়া—বেশ উঁচুদরের আইডিয়া পেলাম, বলতে কি?

মামার তার পেয়ে তার পরদিনই, চলে আসতে হল কালিম্পং। কি এক জরুরী কাজে তাকে নেপালে যেতে হচ্ছিল। তাঁর অবর্তমানে ফাঁকা বাড়ি আগলাবার দায় আমার।

মামা পালাতেই আমার পালা এল। এক দিস্তে কাগজ নিয়ে বসে পড়লাম। 'কালিম্পং-এর ফাঁকা বাড়ি বলে গল্প ফাঁদলাম একটা। ডিটেকটিভ গল্পই। কিন্তু ফাঁদতে গিয়ে মহীশবাবুর কথাগুলো মনে বাধল। ডিটেকটিভ গল্পের কাঠামোটাই আসল। সেইটে ঠিকমত বাঁধতে পারলে খুনটুনগুলো আপনা থেকেই বাধ্য হয়, খুনীরাও অবাধে এসে ফাঁদে পা দেয়। বাধিত হয়েই আসে। অবিশ্যি কাঠামোর পরেও আরো থাকে। খুনের আবহাওয়া খুনীর মনের ভাব আর পুলিশের মনের আড়ি—ইত্যাদি। এসব থাকেই। কিন্তু কাঠামো না থাকলে গোটা গল্পটাই কাঠ হয়ে থাকবে।

কাঠামো ভাবতে গিয়ে এক আকারের কথা মনে পড়ল। গল্পের নাম পাল্টালাম। বদলে করলাম 'সম্পাদক-সাবাড়'। প্লটটা ভাঁজতে লাগলাম মনে মনে। মুগুরের মতই—ভাঁজতে ভাঁজতে যেন ঘাম বেরোয়—তেমনি ঘটনারা বেরুল। ব্যায়ামের ফলে শিরা উপশিরায় তাজা খুনেরা খেলে যায়। তেমনি আমার শীর্ষদেশে খুনের আবহাওয়া খেলতে লাগল। খুনতব্য লোকটাও ক্ষুণ্ণ মনে দেখা দিল আমার মাথায়। খুনটাও যেন মাথা নাড়ল। মগজের মধ্যে গজগজ করতে লাগল—খুন ও খুনী। এক খুনোখুনী কাণ্ড।

ফস্ করে প্যাডের একটা কাগজ নিয়ে চিঠি লিখলাম মহীশবাবুকে—এখন বুনো হাঁসের মরশুম এখানে। কালিম্পং-এর হাঁসের মাংস চেখেছেন নাকি কখনো? এমন খাসা চীজ আর হয় না। খাসী কোথায় লাগে মশাই। এ-হেন জিনিস একা-একা খেয়ে সুখ নেই। আপনি যদি দিন দুয়েকের অবসর করে এখানে আসেন, এসে আমার সঙ্গে যোগ দেন তো খুব খুশি হবো। আসছেন তো? পুনশ্চ, নতুন একটা গল্প ফেঁদেছি, সেটাও আপনাকে শোনাতাম।—

চিঠি ছেড়ে নিশ্চিন্ত রইলুম। জানি তো আমি, আমার যেমন হাসির দিকে, ওর তেমনি হাঁসের দিকে দুর্বলতা। হাঁসের স্বাদ পাবার জন্য চীনে রেস্তোরার আশে পাশে ঘুরঘুর করে বেড়ান—সে খবরও আমার অজানা ছিল না। ডাক-রোস্টের হাঁক ছাড়লে ফেরৎ ডাকেই উনি এসে হাজির হবেন; আমি জানতাম।

গল্পটার নাম পাল্টালাম আবার। বারবার তিনবার। এবারের নামকরণ মহীশমর্দন। ডিটেকটিভ গল্পটা আর একবার এগুলো। তৃতীয় ধাপ। নামতার ধাপ্পা পার হল। বস্তুতঃ তরোয়ালের চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধরলেও,

কলম তার মতই অনেকটা। উভয়েই কাটতে কাটতে এগোয়। আর লেখাও মশাই, যতই কাটা পড়ে, ততই আরো অকাট্য হয়ে ওঠে।

মহীশবাবুর চরম কথাগুলো কানে বাজছিল আমার। গল্পের মধ্যে কোন খাদ থাকবে না মশাই। গল্পও যে সোনার জিনিস যদি খাঁটি না হয়, তাহলেই মাটি। তাহলে আর তার দাম কি বলুন ?······

এবং ওইখানেতেই শেষ নয়। তার পরেও আরো—'আপনার গল্পটায় অপরাধের মধ্যেই শুধু ফাঁকি নেই, অপরাধীর ভেতরও ফাঁক। সত্যি বলতে, সেইখানেই এর গল্তি। আপনার এই গল্পটাই আসলে অপরাধী। এই গিল্‌টি লেখা সোনার বলে আপনি চালাতে এসেছেনে আমার কাছে ? আমার মত জহুরির কাছে ! ছি ! বলে তিনি আমাকে বারবার ধিকার দিয়েছিলেন। সেই থেকে গিল্‌টি কনসেপ্টটা আমার মনে জেগে রয়েছে। ছি-ছি করছে ক্ষণে ক্ষণে। আর খাদের আইডিয়াটাও—বলতে কি—পেলাম আমি তার কাছেই।

আমাদের এ-বাড়ির কাছেই সেই অতলস্পর্শ গহ্বরটা। এমন খাদ যে, তার মধ্যে যদি কেউ পড়ে, তার বাদ দেবার আর কিছু থাকবে না। পড়তে না পড়তেই তুলো হয়ে ধুনে—পিজে—সুতো হয়ে বুনে আনকোরা কয়েক গজ খাদি হয়ে বেরুবে অন্য ধার থেকে।

না, বেরুবার কোন কথাই নেই। সূত্রপাত অবধি আছে তারপরে আর নেই। শেষ কোথায় এই খাদের এবং এর খাদ্যের কেউ তা বলতে পারে না।

খাদটাকে গিয়ে পরীক্ষা করলাম আবার। স্বয়ং খাদক হয়েই নয় বলাই বাহুল্য। কোন জিনিস তলিয়ে দেখার ভাগ্য আমার হয় না। আমার হচ্ছে ওপর ওপর। সোনার বেলায়, সোনালীদের বেলায় যা দেখেছি যেমনটা দেখা গেছে, যেমন ধারা দৃষ্টি হয়েছে, যেমনটা ঘটেছে আমার অদৃষ্টে, খাদের বেলায় কি তার অন্যথা হবে !

আমাদের বাংলো থেকে দু' ফার্লং দূরে খাদটা। গত আসাম-ভূমিকম্পের সময়েই পাহাড়ের এ ধারটা ধ্বসে গেছল। কিনারার কাছটা কাঁচের মত ক্ষণভঙ্গুর হয়ে রয়েছে। তারপর থেকে পাহাড়ের এই পাড়টা প্রায় পড়ো-পড়ো অবস্থায়—দয়া করে পড়লেই হয়।

অদূরের একটা গাছে দড়া বেঁধে কোমরের সঙ্গে জড়ালাম। তারপর আলগা পায়ে গেলাম কিনারার কিনারে। কাছাকাছি একটা ফাটলের

ফাঁকে দশ টাকার নোট গুঁজে রেখে চলে এলাম। তারপর পথেই বই বার করে খুনীর মনস্তত্ত্ব নোট করতে লাগা গেল। শিকারকে বাগাবার আগে খুনীর মনের বিকার কেমন হয়। তার মনে কেমন চোট লাগে। প্রথমেই, মনে হল—খুনটা যেন বেমালুম হয়। কেউ যেন না টের পায়—এমন ভাবে যেন চুকে যায়, যাতে খুনের ব্যাপারটায় চরম হয়ে খতম হয়ে যায়। কোনই খুঁৎ থাকে না। তাই নিয়ে তারপরে কোনো খুঁৎখুঁতি জাগে না কারো। খুন করার পর হাতকড়ায়—হাতকড়ায় থেকে কাঠগড়ায় গিয়ে না দাঁড়ায়। আসামী হয়ে না দাঁড়াতে হয় অবশেষে। সব ফাঁস হয়ে গিয়ে ফাঁসি না হয়ে যায় শেষটায়।

অবশ্যি ফাঁসিকাঠে যে ঝোলে। যাকে ঝুলতে হয়, তারও একটা মনস্তত্ত্ব আছে এবং সেটাও কিছু কম মারাত্মক নয়। সেটাও জানবার বটে। কিন্তু তদ্দূর এগোবার বাসনা আমার হয় না। সেরকম অবস্থায় পড়লে মন যে কেমন করে, তা আমি আভাসে আঁচ করতে পারি, কিন্তু ঠিক কেমন কেমনটি করে তা জানতে সেই ঝুলন-যাত্রার গলা বাড়াবার মত বৈজ্ঞানিক মানসিকতা আমার নেই। ফাঁসিতে গিয়ে লটকানোর চেয়ে আমার মনে, খুন করে সটকানো ঢের ভালো। অনেক উপাদেয়।

দিন দুয়েক পরে মহীশবাবু দেখা দিলেন। দেখলাম তেমনি হৃষ্টপুষ্টই রয়েছেন। শুকিয়ে যান নি একটুও। দেখে খুশিই হলাম। অবশ্যি খাদের ধারটা কাঁচের মতই ভঙ্গুর, তা ঠিক, কিন্তু কাঁচও তো অনেক সময় কাঁচা কাজ করে। ভাঙে না। কিন্তু মহীশবাবুর দিকে তাকালে এমন পাকা গুটি কাঁচাতে পারবে বলে মনে হয় না। এই পাহাড়ে দেহ নিয়ে যখন উনি গুটি গুটি ওই ক্ষণভঙ্গুরতার ওপর গিয়ে পড়বেন, সে-দৃশ্য কল্পনা-নেত্রে দেখবার। মোষের মত মহীশের আড়াইমণি ভার পড়লে আর দেখতে হবে না। কনে দেখার মতই পাকা কাজ হবে। পাহাড়ের কোনো কোণেই আর ওকে দেখা যাবে না।

এসেই ওঁর প্রথম কথা—হাঁস কই ?

শুরুতেই হাঁসফাঁস।

আমি হাসলাম। এই তো আসছেন, খেয়েদেয়ে একটু আরাম করুন—জিরিয়ে নিন। রোদ পড়লে বেরুনো যাবে। বাংলোর ওধারে জংলী ধারটায় পাহাড়ের কিনারে বিকালে কত হাঁস যে এসে পড়ে, তার আর ইয়ত্তা হয় না।

বটে, বটে—উৎসাহে তিনি পাতি হাঁসের মত ককিয়ে ওঠেন।

হাঁস ধরার কাজ—সে কাজ আজ বিকালেই হাসিল করা যাবে, বলে আমি একটুখানি হাসি।

তারপর আমার নোটবই বার করে নিজের মনের খবর টুকতে বসি। সত্যি বলতে, আমার-মানে-আমার অন্তর্গত খুনেটার একটু যেন মন কেমন করে। মহীশের ওপর একটু মায়া হয়। আমার গল্প কাটলেও এমন কি-আমাকে কটু-কাটব্য করলেও ওর আসন্ন বিয়োগ আমাকে একটু বিধুর করে তোলে। খাদের তলায় ও কাত হয়ে পপাত। মনশ্চক্ষে সে দৃশ্য দেখে আমি কাতর হই।

কিন্তু আর্ট ফর আর্টস সেক। আর্টের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে পেছপা হলে চলে না। আর্টের খাতিরেই আমাকে হার্টলেশ হতে হবে, ওকে হার্টফেল করতে হবে। বাধ্য হয়েই মহীশকে ত্যাগ করতে হবে আমার। ওর মায়া কাটাতে হবে নৈর্ব্যক্তিক ভাবে। আমাকে নিদারুণ অমায়িক হতে হবে।

বিকালে আমরা বেরুলাম। ঝকমকে রোদের ধপধপে দিন। খাদের অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। যেতে যেতে বললাম, আর একটু বেলা পড়লেই হাঁসরা আসবে। এসে পড়বে অকুস্থলে। তাহলেও আজ একটু আগেই বেরুনো যাক।

কিনার কাছাকাছি নোটখানাকে দেখা গেল। ফোকরে আটকানো রয়েছে সেইরকম। ভালোয় ভালোয় রয়েছে। জ্বল জ্বল করছে উজ্জ্বল আলোয়।

মহীশবাবুর দৃষ্টি সেইদিকে আকর্ষণ করি। দেখুন তো একখানা দশটাকার নোট না। নোট বলেই যেন বোধ হচ্ছে। ওইখানে, ওই খাদের ধারটায় দেখুন তো?

তিনি বললেন, হ্যাঁ, সেইরকমই তো দেখাচ্ছে বটে। কাছে গিয়ে দেখতে হয়—এই বলে তিনি এগুলেন।

সম্পাদকের দূরদৃষ্টি লেখকের দূরদৃষ্টির মতই সমান প্রখর। স্বভাবতই সম্পাদকের তা একটু বেশি এবং সম্পাদকেরা সে হিসেবে বেশ হিসেবী।

সেদিকে লেখকরা বরং একটু বেহিসেবীই। এই কেন এখনই দেখুন না, চোখের উপরেই তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মহীশকে আগুয়ান হতে দেখেই

আমার মনে হল—আর মনে হয়ে মন খারাপ হয়ে গেল—নোটখানা দশ টাকার না হলেও হত। কোন ক্ষতি ছিল না, পাঁচ টাকার হলেও চলত। এমন কি একখানা একটাকার নোটেও চলে যেতে পারত অনায়াসেই। আমরা লেখকরা আর্টের স্বার্থে এমনই মুক্তহস্ত। অর্থব্যয়ে কোনই পরোয়া করি নে। বাড়তি খরচা করতেও কাতর নই, কিন্তু তাই বলে এমন অপব্যয়েরও তো কোন মানে হয় না।

যাকগে। মহীশ তো গেল। সঙ্গে সঙ্গেই গেল। নোটখানাকে নিয়েই। নোটের ওপরে তার মোট গিয়ে পড়তে না পড়তেই পাহাড়ের ধারটা ধ্বসে পড়ল। বিচ্ছিরি চিৎকারের রেশ বাতাসে মিলিয়ে যেতেও বেশিক্ষণ লাগল না।

ফিরে এসেই লিখতে বসলাম গল্পটা—ঘটনাটা টাটকা থাকতেই। মনস্তত্ত্বমূলক লেখার মূল কথা, মনের তত্ত্ব তাজা থাকতে থাকতেই লিখতে হয়। কাগজের পিঠে তুলতে হয় আমূল। মূল্যের বেলায় যেমনটি। হাতে হাতে নগদ নগদ। কিম্বা মূল্যের বেলায়ও বলতে পারেন। সে রকম লেখা কখনই অমূলক বলে বোধ হয় না। মূলো খেলে যা হয়—যেমনটি হয়—সে লেখা পড়ে পাঠকেরা তাই ঘটে। তার মনে ঢেকুর উঠতে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। সমস্ত মনকে গন্ধমাদন করে তোলে। উটমুখো সম্পাদকেরা সে সব লেখারই মূল্য দেন। স্বর্ণমূল্য।

সে লেখা সোনার মতনই নিতান্তই খাঁটি। তার মধ্যে কোন খাদ নেই, এবং শোনানোর মতও। কিন্তু শোনাই কাকে মশাই। ধারে কাছে কোনই সম্পাদক নেই। একজন যিনি ছিলেন, তিনি নিজেই এখন জানা শোনার বাইরে। ধর্মতত্ত্বের ন্যায় গভীর গুহার গর্ভে নিহিত। শোনায় খারাপ, কিন্তু তাহলেও, তিনি নিজেই এখন খাদের মধ্যে গণ্য—

* * * *

আনকোরা পাণ্ডুলিপির ওপরেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। গভীর রাত্রে হঠাৎ ঘুমটা ভাঙল। ঘুম-ভাঙা চোখ মেলতেই চমকে উঠেছি।

আমার ঘরের আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে আমার ইজি চেয়ারে বসে—ওকে ?

মহীশবাবু না ?

দেখেই আমি শিউরে উঠেছি।

একি? আপনি এখানে? ঘড়ঘড় শব্দে গলার আওয়াজ বেরুলে বলতে পারলাম।

? দেখতে এলাম গল্পটা, জানালেন মহীশবাবু। কেমন ওৎরালো দেখি।

সে কি? আপনি মারা যান নি?

সম্পাদকরা কি সহজে মরে? অত সহজে মরবার? অনেক লেখককে মেরে ঘায়েল করে তবেই একটা সম্পাদক হয়।

আপনি খুন হন নি—আপনি বলতে চান?

খুন হলেই বা কি! সম্পাদকের সাত খুন মাপ! সম্পাদকেরা অমর।

এরপর, খুন তো হয়েই ছিল, খাবাপিটাও হতে বাকি থাকল না। সর্বত্র রোমাঞ্চিত হয়ে······

যা হবার তাই হল। আমি হার্টফেল করলাম।

পরাশর বর্মা ও কবিতার ঘণ্ট

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রাত এগারোটায় প্রথম, দশ মিনিট পরেই আবার, তারপর পাঁচ মিনিট না যেতে যেতেই একেবারে নাছোড়বান্দা।

অগত্যা পরাশরকে গিয়ে জানাতে হল দরজায় ধাক্কা দিয়ে।

ধাক্কা পড়তে না পড়তেই ওধার থেকে বিরক্ত আওয়াজ; আবার কেন ধাক্কাধাক্কি! বলেছি তো আজ খাব না।

খেতে ডাকি নি! তুমি দরজাটা খোল দেখি!

পরাশর আমারই পড়বার ঘরের দরজাটা খুলে প্রায় মারমুখো হয়ে বললে, কি সর্বনাশটা করলে বলো দেখি! ঠিক এই মোক্ষম সময়টায় এসে সব মাটি না করলে হত না?

কি মাটি করলাম? হেসে বললাম, আরাম কেদারায় বসে শুধু তো কড়িকাঠ গুণছো দেখছি। সাদা কাগজে একটা কালির আঁচড় তো পড়ে নি।

পড়বে কি করে? পরাশর ক্ষুব্ধ স্বরে জানালে, সবে কবিতাটা তৈরি করে একটু ঘাঁটছি—

শিগগির একটা ট্যাক্সি!

পরাশরের কথার ধরনে মনে হল ট্যাক্সির বদলে একটা রকেট-প্লেনই তার প্রয়োজন।

রকেট-প্লেন দূরে থাক, একটা ট্যাক্সি পেতেই ওই গভীর রাত্রে একটু বেগ পেতে হল। সে-ট্যাক্সিতে পরাশরের পাশে বসে গন্তব্যস্থানে পৌঁছোতেও প্রায় ঘন্টাখানেক লেগে গেল।

গন্তব্যস্থান যে অতদূর তা অনুমান করতে পারি নি। কলকাতা ছাড়িয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বহুদূর যাবার পর বাঁদিকের একটি রাস্তায় পরাশরের নির্দেশমত গাড়ি ঘুরল। তারপরও বেশ খানিকটা গিয়ে ট্যাক্সি যেখানে থামল, সেটা উদোম মাঠ না কোন বাড়ি-টাড়ি—কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না।

শীতের গাঢ় কুয়াশায় ঢাকা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার রাত। কলকাতা থেকে এতদূর পথ যেন সার্চলাইটের আলোয় কোন রকমে ফুঁড়ে ফুঁড়ে এসেছি। সারাক্ষণই চারিদিকে কালো পর্দার একটা ঘেরাটোপ। মাঝে মাঝে উল্টো দিক থেকে ট্রাক কি লরিগুলো ঘোলাটে দানবীয় রক্তচক্ষু নিয়ে শাসিয়ে চলে গেছে।

পরাশর এই অন্ধকার কুয়াশায় ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছেছে কিনা সন্দেহ করছি, এমন সময় ডান দিকে কিছু দূরে একটা আলো দেখা গেল। সে আলো এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু অন্তত বুঝলাম যে বাড়িটি যেমনই হোক রাস্তা থেকে তা বেশ দূরে এবং সামনে বেশ প্রশস্ত খানিকটা জায়গা আছে।

আলোটা কাছে আসবার পর যে লোকটির হাতে লণ্ঠনটা ঝুলছে, তাকে আর সামনের গেটটাকেও দেখা গেল। লোকটি প্রৌঢ়। মুখের দাড়ি-গোঁফ শাদা-কালোয় মেশানো। কিন্তু চলাফেরায় এখনো শক্ত-সমর্থ জোয়ান বলেই বোঝা যায়। সবচেয়ে যা অদ্ভুত লাগল, তা লোকটির আধা মিলিটারী পোশাক শুধু নয়, পিঠে বাঁধা বন্দুক। যে বাড়িতে হ্যারিকেনের বেশি আলোর ব্যবস্থা নেই, সেখানে এমন সশস্ত্র পাহারাদার কি কারণে!

দূরে আলো দেখেই আমরা নেমে দাঁড়িয়েছিলাম। ট্যাক্সির সঙ্গে চুক্তিই ছিল আমাদের জন্যে যতক্ষণ দরকার অপেক্ষা করবে এবং আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

দরোয়ান এসে তালা খুলে গেটটা খুলে ধরতেই ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে পরাশর বললে, শিউপ্রসাদজী জেগে আছেন তো অর্জুন সিং ?

অর্জুন সিংএর চেহারা যেমন, মেজাজ আর কথার ধরনও তেমনি আধা মিলিটারি। রুক্ষ ভারি গলায় সে বললে, অগর নিদমে হোতা তো আপকো বোলায়া কাহে! খুদ যাকে দেখিয়ে!

অভদ্র জবাবের ধরন পরাশর কিন্তু যেন গায়েই মাখল না। আমাকে নিয়ে কাঁকর-ফেলা রাস্তায় এগোতে এগোতে হেসে বলল, অর্জুন সিং আমার ওপর খুশি নয়।

যে কথাটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম তা আর হল না।

আমাদের ট্যাক্সিটা তখন ড্রাইভার ঘুরিয়ে রাখছে। ঘোরাবার মুখে গাড়ির হেড লাইটের আলোটা কয়েক মুহূর্তের জন্যে এদিকে পড়ায় গাঢ় কুয়াশার মধ্যেও যা দেখতে পেলাম, তাতে বেশ একটু অবাকই হতে হল। বাড়ি শুধু নয়, এটা ছোটখাটো একটা কারখানাও বটে। টিনের শেড, চিমনি, উঁচু জলের ট্যাঙ্ক আবছা ভাবে ক্ষণিকের জন্যে দেখতে পেলাম।

এরকম কারখানাবাড়ি এমন নির্জন অন্ধকার কেন! ওই বন্দুক-বাঁধা দরোয়ান অর্জুন সিং ছাড়া আর কেউ কোথাও আছে বলে তো মনে হয় না।

ভুতুড়ে কারখানা-বাড়ির চেয়ে বড় বিস্ময় তখনো আমাদের অন্য অপেক্ষা করছে।

লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখিয়ে অর্জুন সিং যেখানে পৌঁছে দিলে, সেটা কারখানার ভেতরেই একটি থাকবার বাড়ি! ছোটখাটো নয়, বেশ বিরাটই বলা যায়। একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন মাত্র সম্বল না হলে তার সাজসজ্জা, আসবাবপত্র দেখেও খুশি হওয়া যেত মনে হল।

অর্জুন সিং আমাদের হাতে হ্যারিকেনটা দিয়ে নিচে সিঁড়ির কাছ থেকেই বিদায় নিয়েছিল। পরাশরের এ-বাড়ি ভালো করেই চেনা বুঝলাম! হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক বারান্দা থেকে আর এক করিডর ঘুরে সে যে ঘরটির সামনে গিয়ে থামল, তার ভেতর থেকে মৃদু একটু আলো আসছে।

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই মাঝখানের টেবিলে রাখা একটি জলন্ত মোমবাতি

চোখে পড়ল। তারপর তা থেকে দূরে কয়েকটি সোফাসেটি যেখানে সাজানো —সেখানে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁকে। বোঝা গেল ইনিই শিউপ্রসাদ।

প্রথম দেখে যেন পাথরের মূর্তির মতই নিশ্চল মনে হয়েছিল। আমরা কাছে যেতে একটু নড়েচড়ে বললেন, বসুন মিস্টার ভার্মা। সঙ্গে কাকে নিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে।

হ্যাঁ, আমার একজন বন্ধু। ওঁর বাড়ি থেকেই আপনার টেলিফোন পাই। ওঁর পরামর্শ আমার অনেক কাজে লাগে বলেই সঙ্গে আনলাম।

বলাবাহুল্য পরাশরের এ কৃতজ্ঞতায় একটু খুশিই হলাম।

পরাশর ও আমি একধারের একটি সেটিতে বসবার পর শিউপ্রসাদ আরেকটি সোফায় বসলেন। তাঁর নড়াচড়া ও বসার ভঙ্গি থেকে কিছু বোঝবার জো নেই। কিন্তু 'সঙ্গে কাকে নিয়ে এসেছেন মনে হচ্ছে' শুনে যা অনুমান করেছিলাম, এই প্রায়ান্ধকার ঘরেও চোখে কালো চশমা পরে থাকতে দেখে তার সমর্থন পেলাম। শিউপ্রসাদজী অন্ধ।

ভদ্রলোকের যাকে বলে বিশাল দশাসই চেহারা। বয়স পঞ্চাশের কাছকাছি হলেও পেরিয়ে এখনো বোধ হয় যায় নি। সামান্য একটা মোমবাতির আলোতেও তাঁর চেহারায় যতটুকু দেখা গেল, তাতে একটা অভিজাত গাম্ভীর্যের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্ধতার জন্যেই কিনা জানি না; মানুষটি অভ্রভেদী পাহাড়ের মত সুদূর একটি অটল প্রশান্তিতে পৌঁছে গেছেন মনে হয়।

সেই মানুষের পরের কথাবার্তায় তাই বুঝি অত বেশি চমকে উঠলাম। একটু উত্তেজনা কি চাঞ্চল্য নেই। ধীর-স্থির গলায় শিউপ্রসাদজী বললেন, আপনাকে কেন এত রাত্রে এমন ব্যস্ত হয়ে ডেকেছি, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না মিস্টার ভার্মা।

মনে হচ্ছে আপনার ভাগ্নী, মানে লছমী দেবী আর তাঁর স্বামী রতনলালজী নতুন কোন চাল চেলে আপনাকে শাসাচ্ছেন। অবশ্য তার জন্যে দুপুর রাত্রে আমায় ডাকবার কারণটা বুঝতে সত্যিই পারছি না।

এখুনি পারবেন। শুনুন, লছমীকে আমি খুন করেছি।

সেই শান্ত-গম্ভীর স্বরে আমি চমকে উঠলেও পরাশরের কোন ভাবান্তর অন্তত বাইরে প্রকাশ পেল না। প্রায় শিউপ্রসাদজীর মতই শান্ত স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলে, কখন? কিভাবে?

আজ ভোরবেলায় পিস্তলের গুলিতে— যেন নিত্যনৈমিত্তিক সকালে প্রাতঃভ্রমণের খবরের সুরে বললেন।

আজ ভোরে যদি খুন করে থাকেন, তাহলে এখন আমায় ডাকবার মানে ?

পরাশরের প্রশ্নে শিউপ্রসাদজী যা বলতে যাচ্ছিলেন তাতে গায়ে পড়ে এবার বাধা না দিয়ে পারলাম না, মাপ করবেন শিউপ্রসাদজী। আপনি··· আপনি পিস্তল দিয়ে গুলি করলেন বলছেন, অথচ···

আমার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই শিউপ্রসাদজী একটু যেন তিক্ত স্বরে বললেন, আমি অন্ধ মানুষ, তবু কি করে গুলি করলাম ভাবছেন ? ওটা আমি পারি। আপনাদের যেমন চোখের আমার তেমনি শুধু কানে শোনার জগৎ। মানুষের চোখে দেখা ছবি আপনারা মনে করে রাখেন, আমি রাখি কানে-শোনা চেহারা। শব্দভেদী বাণ যেমন ছিল, তেমনি শুধু কানে শুনেই আমি লক্ষ্যে প্রায় নির্ভুল ভাবে টিপ করতে পারি। কিন্তু এই ক্ষমতায় যে এমন সর্বনাশ হবে তা জানলে চোখের মত ডান হাতটাকে নিজে পঙ্গু অচল করে দিতাম···

শিউপ্রসাদজী থামলেন। মনে হল এই প্রথম তাঁর গলা যেন দুর্বার আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ তাঁকে চুপ করে থাকতে দিয়ে পরাশর দৃঢ় স্বরে বললে, ঘটনার এত পরে কেন আমায় ডেকেছেন জানি না ; তবু এক এক করে আমার ক'টা প্রশ্নের এবার জবাব দেবার চেষ্টা করুন শিউপ্রসাদজী।

দিচ্ছি—সবই দিচ্ছি। শিউপ্রসাদজী আবার ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটা বললেই আশা করি আপনার সমস্ত প্রশ্নের জবাব পাবেন। আপনাকে এত পরে কেন ডাকিয়েছি তাও বুঝতে পারবেন। আপনার বন্ধুর খাতিরে সমস্ত ইতিহাসটাও একটু সংক্ষেপে বলছি। জাল ওষুধ তৈরির অভিযোগে আমার এ ফ্যাক্টরী যে মামলায় পড়েছিল, তা আপনার বন্ধু জানেন হয়তো। সে মামলায় ফ্যাক্টরীর জিৎ হয়েছে। কিন্তু তবু আমি তা বন্ধ করে রেখেছি। বন্ধ করে রাখার কারণ এই যে মামলায় ওকালতির প্যাঁচে জিতলেও আমি ভেতরে ভেতরে খবর নিয়ে জেনেছি যে এখানে সত্যিই জাল ওষুধ গোপনে তৈরী হত আর লছমীর স্বামী রতনলালই তার পাণ্ডা। মামলায় জেতবার পর আমি এ কোম্পানী থেকে রতনকে তাই

সরিয়ে দেবার জন্তে লছমীর শেয়ারের দুগুণ দাম তাকে দিয়ে সব কিনে নেবার প্রস্তাব করেছি। এ ফ্যাক্টরী বন্ধ হয়ে যায় তাও ভালো, তবু রতনলালকে তা চালাতে আমি দেব না। স্বামী রতনলালের পরামর্শে লছমী কিন্তু সে প্রস্তাবে রাজী নয়। আমাকেই এ কোম্পানী থেকে অযোগ্য বলে সরাবার জন্তে তারা মামলা করেছে, আর দরকার হলে শুধু কোম্পানী নয় পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবে বলে শাসিয়েছে। সেই শাসানির পরই আমি আপনাকে প্রথম ডাকিয়ে পাঠাই মিস্টার ভার্মা। আপনি যেখানেই থাকুন, দরকার হলে যাতে খবর দিতে পারি সে ব্যবস্থাও করতে বলি। আজ কিন্তু কোন বিপদ থেকে বাঁচবার জন্তে আপনাকে ডাকি নি। মৃত্যুভয় আমার কোনদিনই ছিল না, শুধু রতনলালের মত মানুষের উদ্দেশ্য যাতে সিদ্ধ না হয় সেজন্তই আপনার সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন যা ঘটে গেছে তারপর আর আমি বাঁচতেও চাই না। পুলিশের কাছে আমি আত্মসমর্পণই করব। শুধু এই কোম্পানী যাতে রতনলালের হাতে না যায় সেজন্তে কয়েকটা দরকারী দলিলপত্র আর প্রমাণ আপনার হাতে দিয়ে তার বিরুদ্ধে লড়বার ভার নিতে আপনাকে অনুরোধ করছি। বলুন, এ ভার নেবেন ?

নেব !—পরাশর গম্ভীরভাবে বললে, কিন্তু ব্যাপারটা কিভাবে কোথায় ঘটল তাই এখনও জানতে পারি নি।

তাও জানাচ্ছি, যদিও শুধু শুনে রাখা ছাড়া আর কিছু আপনার সে বিষয়ে করবার নেই। আমি তা চাইও না। আমার অপরাধের চরম দণ্ডই আমার কাম্য। লছমী স্বামীর পরামর্শে আমার শত্রু হয়েছে, কিন্তু আপনি তো জানেন, সে আমার বুকের হাড় ছিল। যৌবনে কঠিন রোগে অন্ধ হবার পর আমি বিবাহ করি নি। আমার একমাত্র বোনও ওই লছমীকে দু-বছরের রেখে মারা যায়। তাকে চোখের মণির চেয়ে স্নেহে আদরে মানুষ করেছি, তারপর যতদূর সম্ভব সুপাত্র খুঁজে বিয়ে দিয়েছি। আমাদের সমাজে ধনী আছে অনেক মিস্টার ভার্মা, কিন্তু সত্যিকার বিদ্বান কম। রতনলাল বিলেত থেকে বিজ্ঞানের বড় ডিগ্রী নিয়ে এসেছে। বিয়ের যৌতুক হিসাবে ধনদৌলত তো বটেই আমার এই কোম্পানীর অর্ধেক শেয়ার লছমীর নামে লেখাপড়া করে দিয়েছিলাম। রতনলালকে করেছিলাম ম্যানেজার। ভেবেছিলাম, ওরা দুজনে দু-চোখের মণি হয়ে আমার অন্ধতার দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। কিন্তু বিদ্যার বুদ্ধিতে কিছু হয় না, চরিত্র যদি না থাকে। রতনলালের সব

কাজকর্মের ভেতর কি যেন একটা গোলমাল টের পাচ্ছিলাম, তবু সন্দেহকে আমল দিই নি। জাল-ওষুধের ব্যাপার নিয়ে মামলা ওঠার পর আর মনকে চোখঠারা গেল না। আগেই বলেছি, মামলায় জিতলেও আমি সন্তুষ্ট হই নি। রতনলালের শয়তানির সব প্রমাণ সংগ্রহ করে তাকে ম্যানেজারি থেকে সরালাম। কিন্তু লছমী তার কথায় বেঁকে দাঁড়াল। লছমীর চেয়ে আমার ইমান বড় মিস্টার ভার্মা। ফ্যাক্টরির গেটে তালা লাগালাম। নিজেদের জেনারেটর বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সত্যিই সমস্ত বাড়িঘর কারখানা অন্ধকার হয়ে গেল। ওই বহুকালের বিশ্বাসী অর্জুন সিংকে ছাড়া কাউকে এখানে রাখলাম না। আমার উইল বদলাবার ব্যবস্থা করে রতনলালের গুপ্তঘাতকের ভয়ে সারাক্ষণ রিভলবার নিয়ে থাকার অভ্যাস করলাম। আমার অনিদ্রা রোগ আছে। সাধারণত অনেক রাত্রে আমার ঘুম আসে বলে সকালে বেশ বেলা করে আমি উঠি। কাল ভোরের একটু আগে কিন্তু হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। আমার পাখি-ঘর আপনাকে সেবার বোধ হয় দেখিয়েছি। দৃষ্টির অভাব আমি শ্রুতির আনন্দ দিয়ে মেটাবার চেষ্টা করি। আমার চিড়িয়া-মহলে হরেক জাতের সুকণ্ঠ পাখি আমি দেশ-বিদেশ থেকে আনিয়ে খাঁচায় বন্দী করেছি। ঘুম ভেঙে যাবার পর শোবার ঘরের পাশেই চিড়িয়ামহলে কি যেন একটা শব্দ শুনলাম। অর্জুন সিং নিচে আছে পাহারায়, তাকে ডাকবার সময় নেই। রিভলবারটা নিয়ে আমি চিড়িয়ামহলে গেলাম? এ-বাড়ির সব ঘর দোর দরজা আমার বহুদিনের অভ্যাসে মুখস্থ। সহজ মানুষের মতই আমি চলাফেরা যে করতে পারি তা বোধ হয় লক্ষ করেছেন। চিড়িয়ামহলে ঢোকা মাত্র ঘরের শেষ প্রান্তে আবার কিরকম যেন একটা আওয়াজ পেলাম। অস্পষ্ট একটা চাপা আক্রোশের গর্জন বললে তা যেন বোঝানো যায়। তারপরই সেদিক থেকে কারুর বেগে ছুটে আসতে গিয়ে পাখিদের খাঁচা পাড়বার টুলের সঙ্গেই একটা ধাক্কা। তখন নিশ্চিত ধারণা হয়েছে যে রতন-লালের কোন ভাড়াটে খুনে যেমন করে হোক পেছনের জমাদারদের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে চিড়িয়ামহলে ঢুকেছে। আমায় আক্রমণ করাই তার লক্ষ্য। আমার দিকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসতেই গুলিটা ছুঁড়েছিলাম। আমার গুলি ছোড়া আর ধাক্কা লাগবার শব্দ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায়। কোনটা আগে কোনটা পরে বলতে পারব না। আর তারপরেই সেই কাতর আর্তনাদ —মামাজি!

সেই তীব্র আর্তনাদ যেন আবার তাঁর বুক বিদীর্ণ করে দিলে এমন ভাবে শিউপ্রসাদজী থামলেন। অত্যন্ত সংযত মানুষ, কিন্তু বেদনায় রুদ্ধকণ্ঠে আর ভাষা বার করতে পারলেন না কিছুক্ষণ।

তাঁকে সামলাবার সময় দেবার জন্যে কিনা জানি না, পরাশর একটা অবান্তর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বলল: আপনার রিভলবারের শব্দে পাখিগুলোর ভয়ে প্রায় মারা যাবার অবস্থা নিশ্চয়?

না—শিউপ্রসাদজী আবার শান্ত স্বরে বললেন, রিভলবার আমার সাইলেন্সার দেওয়া। লছমীর আর্তনাদ শুনে সেটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেদিকে আমি এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সেই বিচলিত অবস্থায় আমার মুখস্থ গতিবিধি আমি তখন ভুলে গেছি। কিসে যেন একটা বাধা পেয়ে জায়গাটায় যখন পৌছলাম, তখন হাতড়ে কাউকে সেখানে পেলাম না। শুধু কাতর অস্ফুট গোঙানির সঙ্গে মেঝের ওপর পা ঘষে ঘষে চলার একটা শব্দ পেলাম। বুঝলাম লছমী আহত হয়ে কোনরকমে পালিয়ে যাচ্ছে। চিৎকার করে উঠলাম, লছমী, লছমী, যাস নি! কিন্তু কোন শব্দ তারপর আর নেই। কোথায় গেল লছমী! ওই ঘরেই কোথাও তার অজ্ঞান কিংবা প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে নিশ্চয়। আমার পক্ষে খুঁজে বার করা তখন সম্ভব নয়। নিজের ঘরে এসে ব্যাকুলভাবে ঘণ্টা বাজিয়ে অর্জুন সিংকে ডাকলাম। রিভলবার ছোড়ার কথা না জানিয়ে তাকে চিড়িয়া-মহলটায় কেউ লুকিয়ে আছে কিনা খুঁজে দেখতে বললাম। সে কাউকে সেখানে পেলো না। জিজ্ঞাসা করলাম, কম্পাউণ্ডে কাউকে আসতে বা বেরিয়ে যেতে দেখেছে কিনা। সে বললে, না। সত্যিই তখন আমি দিশাহারা। সমস্ত ব্যাপারটা স্বপ্ন না সত্য তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে।

স্বপ্ন যে নয় তা জানতে দেরি হল না। মনের উদ্বেগে অস্থিরতায় তখন আমি ক'টা ঘুমের বড়ি বাধ্য হয়ে খেয়ে সবে বোধ হয় একটু তন্দ্রার আচ্ছন্নতায় ডুবে গেছি। ফোনের আওয়াজে ঘুম ভেঙে যাবার পর শুনলাম ঘড়িতে সকাল ছ'টা বাজছে।

ফোন করছে স্বয়ং রতনলাল। রতনলালের গলা তখন শয়তানের নয় যেন দেবদূতের বলে মনে হল।

ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, লছমী—লছমী এখন বাড়িতে?

লছমী বাড়িতে কিনা জিজ্ঞাসা করছেন আপনি?—রতনলালের গলা যেন ধারালো বাঁকা ছুরি মনে হল। লছমীর খোঁজ করছেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কাতর ভাবে জানতে চাইলাম, সে এখন কোথায়? কেমন আছে?

কোথায়, কেমন আছে কিছুই জানেন না?

রতনলালের গলায় নিষ্ঠুর বিদ্রূপ কত তীক্ষ্ণ তা ভাববার মত আমার তখন অবস্থা নয়। আকুল ভাবে বললাম, হ্যাঁ, জানি জানি। ভোরের একটু আগে সে আমার এখানে কেন লুকিয়ে এসেছিল জানি না···

আমার কথায় বাধা দিয়ে একটু যেন সবিস্ময়ে রতনলাল বললে, ভোরের একটু আগে এসেছিল বলছেন?

হ্যাঁ, বলছি তো আমি ভাবতেও পারি নি সে অমন ভাবে ওসময়ে আসতে পারে! আমি না জেনে···

তাকে গুলি করেছেন। তীক্ষ্ণ ছুরির ঘায়ে যেন আমার কথাটা মাঝখানে কেটে দিয়ে রতনলাল বললে, না জেনে নয়, সব জেনে-শুনে—মতলব করে।

না, না!—আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, কিন্তু বলো সে কোথায়? কেমন আছে? গুলির কথা যখন জানো, তখন সে যেভাবে হোক বাড়িতে ফিরতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে···

হ্যাঁ, ফিরেছে!—আবার কঠিন স্বরে রতনলাল বাধা দিলে, শুধু প্রাণটুকু নিয়ে ফিরেছে। তাও কতক্ষণ আর থাকবে জানি না।

না, না, যেমন করে হোক তাকে বাঁচাতেই হবে। যত টাকা লাগে আমি দেবো। তাকে এখনো কেন হাসপাতালে নিয়ে যাও নি? কোন ডাক্তারও কি ডাকো নি?

না, ডাকি নি, হাসপাতালেও নিয়ে যাই নি। কেন যাই নি তা বুঝতে পারছেন? রতনলাল জ্বলন্ত স্বরে বললে,—ডাক্তার ডাকলে কি হাসপাতালে নিয়ে গেলে প্রথমেই কি প্রশ্ন হবে, তা আশা করি বুঝতে পারছেন? সে প্রশ্নের সঠিক জবাব দেব কিনা জানবার জন্যেই এ ফোন করছি।

নিশ্চই, নিশ্চয় দেবে! যা বলবার সবই বলবে!—আমি অস্থির হয়ে জানালাম, আমি নিজেই সব স্বীকার করব। আমার মান সম্মান ঐশ্বর্য জীবনের চেয়ে লছমীর জীবনের দাম অনেক—অনেক বেশি! তুমি এখুনি হাসপাতালে নিয়ে যাও।

না, যাব না।—রতনলাল কঠিন স্বরে বললে, আপনার মান সম্মান ঐশ্বর্য জীবন সবকিছুর চেয়ে লছমী বড় বলছেন! কি তার জন্যে ত্যাগ করতে পারেন তাহলে?

বুঝলাম শয়তান রতনলাল আমার হৃদ্‌পিণ্ডে মোচড় দিয়ে তার যা আদায় করবার করে নিতে চাইছে। কিন্তু তখন আমার ন্যায় অন্যায় উচিত অনুচিত ভাববার ক্ষমতা নেই। বললাম, পারি, পারি, সব পারি। কিন্তু আর দেরি কোরো না।

না, করব না। কিন্তু আপনারও দেরি করা চলবে না। আমি এখুনি যাচ্ছি। কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদ ছেড়ে দেবার চিঠি তৈরি করে রাখুন। সেই সঙ্গে আপনার নিজের সমস্ত শেয়ার লছমীর নামে ট্রান্সফার করবার জন্যে যা প্রয়োজন।

রতনলালের কথায় স্তম্ভিত হয়ে বললাম, তা না হলে লছমীকে বাঁচাবার ব্যবস্থা তুমি করবে না?

সোজা স্পষ্ট উত্তর এল, না।

এক মুহূর্ত হয়তো দ্বিধা করেছিলাম, তার পরেই বললাম, তুমি এসো। যা বলছ সবই আমি করে রাখব। কিন্তু তুমি আগে ওকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করে এসো। অন্তত এখুনি একজন ডাক্তার ডাকাও।

তাই ডাকিয়েছি। আপনি তৈরি থাকুন।—বলে রতনলাল ফোন ছেড়ে দিলে।

তারপর আধঘণ্টার মধ্যেই রতনলাল এলো। যা সে চেয়েছিল সব ব্যবস্থাই যতদূর সম্ভব তখন করে রেখেছি। সেগুলো তার হাতে দেবার আগে ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, লছমীর কি ব্যবস্থা সে করে এসেছে।

সে নির্বিকার ভাবে বললে, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দিয়েছে। তারা আসছে। আমার কাছে যা পাবার না পেলে অ্যাম্বুলেন্সের দরকার নেই বলে সে জানিয়ে দেবে।

ভেতরটা আগুন হয়ে উঠলেও, তৎক্ষণাৎ সব কিছু তাকে দিলুম। সে আরো যা কিছু সই করাতে চাইল তাও করে দিলাম বিনা প্রতিবাদে। তার মধ্যে লছমীকে গুলি করার স্বীকারোক্তিও। কাগজপত্রগুলো নিয়ে চলে যাবার আগে কোথায় গুলিটা করেছি সে দেখিয়ে দিতে বললে। চিড়িয়া-মহলের কথা জানিয়ে বললাম, ইচ্ছে করলে নিজে গিয়ে দেখতে পারে।

রতনলাল চলে যাবার পর কি উদ্বেগে যন্ত্রণায় যে কাটিয়েছি তা বোঝাবার

নয়। আধঘণ্টা অন্তর ফোন করেছি রতনলালকে। ফোনে কখনো পেয়েছি, কখনো পাই নি। সে জানিয়েছে, ভাবনার কিছু নেই। লছমীর উপযুক্ত ব্যবস্থাই হয়েছে। কোন হাসপাতালে তাকে পাঠিয়েছে তা কিছুতেই কিন্তু বলতে চায় নি। বললে আমি তখনি সেখানে ছুটে যেতাম। সেটুকু সান্ত্বনাও সে আমায় পেতে দেয় নি! তারপর ঘণ্টা তিন আগে রাত দশটা নাগাদ সে ফোন করে জানায় যে লছমীর সব শেষ। সেই সঙ্গে পিশাচের মত নির্বিকার ভাবে জানায় যে আমাকে গোড়া থেকে অনেক কিছুই সে মিথ্যে বলেছে। আহত হয়ে লছমী সেই অবস্থাতেই নিজে গাড়ি চালিয়ে কোন রকমে গিয়ে বাড়িতে পৌঁছোয়। ওখানে রতনলালকে ব্যাপারটা জানাতে না জানাতেই সে অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ের দরুন জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রতনলাল তাকে সেই অবস্থায় হাসপাতালে দিয়ে এসে, তারপর মিথ্যে করে আমার কাছে ভুল খবর দিয়ে, ওই সব কাগজপত্র আদায়ের ব্যবস্থা করে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার কিছুক্ষণ বাদেই লছমীর মৃত্যু হয়। পুলিশের কাছে সমস্ত জানিয়ে লছমীর মৃতদেহ পোস্টমর্টেমে পাঠাবার ব্যবস্থা করিয়ে তারপর সে আমাকে অত রাত্রে ফোন করছে। এ ফোনের অন্য উদ্দেশ্যও আছে। পুলিশকে এই খুনের বিষয়ে তার জবানবন্দী দিলেও আমার স্বীকার-পত্র সে তখনো দেয় নি। আমার কাছে তেমন কিছু দাম পেলে এ স্বীকার-পত্র সে আমায় ফেরৎ দিতে পারে এই তার বক্তব্য! সে আমার বিরুদ্ধে মুখে যাই বলে থাকুক, স্বীকার-পত্র না পেলে প্রমাণের অভাবে আর ওকালতির জোরে মামলা ফেঁসে যেতে পারে, এই কথাই সে আমায় বোঝাতে চায়।

তাকে জাহান্নমে যেতে বলে আমি ফোন নামিয়ে রেখেছি মিস্টার ভার্মা। পুলিশ আমায় ধরতে কখন আসবে জানি না, কিন্তু তারা আসুক না আসুক আমি নিজে থেকেই সব কথা জানাবো। শয়তানী প্যাঁচে রতনলাল যা কিছুতেই তার লোভ সব আদায় করেছে। লছমীর মৃত্যুর পর স্বামী হিসেবে তার যা কিছু সব সেই পাবে। আমি ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের পদ তো ছেড়েই দিয়েছি, না দিলেও এই অপরাধের শাস্তির পর কোম্পানীতে আমার জায়গা থাকবে না। সে নির্বিবাদে এই ফ্যাক্টরীতে তখন তার নকল ওষুধের ব্যবসা চালাতে পারবে বলে আশা করছে। কিন্তু তার সেই আশায় আমি ছাই দিতে চাই! গোপনে সন্ধান নিয়ে জাল ওষুধের ব্যাপারে তার কাজকর্মের যেসব প্রমাণ আমি সংগ্রহ করেছি, তা আমি আপনার হাতে দিচ্ছি। এসব

প্রমাণ-পত্র কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, আপনার চেয়ে ভালো কেউ জানে না। ওর মত শয়তান যাতে ওষুধের নামে মানুষকে বিষ দেবার এ সুযোগ না পায়, আপনি শুধু তাই দেখবেন।

শিউপ্রসাদজী থামলেন। মুখ দেখে মনে হয় অপরাধের শাস্তি যেন নিজেই তিনি নিজেকে এখন থেকেই দিয়েছেন।

পরাশর একটু চুপ করে থেকে বললে, আমায় যে ভাবে দিচ্ছেন, আমি তা নিতে আপত্তি করব না। কিন্তু এ অপরাধে আপনার শাস্তি যে হবেই তাই বা ভাবছেন কেন? আপনি সত্যিই তো ভুল বুঝে গুলি ছুড়েছিলেন। আপনি স্বীকারোক্তি যাই দিয়ে থাকুন, নিছক দুর্ঘটনা বলে ধরে বিচারক আপনাকে কোন শাস্তি না-ও দিতে পারেন।

কিন্তু শাস্তি যে আমি চাই মিস্টার ভার্মা!—ধৈর্য হারিয়ে এই প্রথম শিউপ্রসাদজীর গলা অস্বাভাবিক রকম তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, আদালতের বিচারে মুক্তি পেলেও বেঁচে থাকবার কোন আগ্রহ আমার থাকবে মনে করেন? না, কেউ না দিক, চরম দণ্ড আমি নিজের হাতেই নেবো।

প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্যে পরাশর বোধ হয় এবার বললে, আপনার রিভলবারটা কোথায়?

বললাম তো সেটা লছমীর ডাক শুনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম।

সেখানেই তাহলে সেটা পড়ে আছে।—পরাশর উঠে পড়ে বললে, চলুন, সেটা একবার দেখি।

ক্লান্ত ঔদাসীন্যের সঙ্গে শিউপ্রসাদজীও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, দেখতে চান, চলুন। কিন্তু আমি কিছু ভুল বলেছি মনে করবেন না। আমারই রিভলবার দিয়ে গুলি আমি সত্যি করেছি। রিভলবার তারপর ছুঁড়ে যে ফেলে দিয়েছিলাম। তাও ঠিক।

শিউপ্রসাদের কথাই যে ঠিক কয়েক মুহূর্ত বাদেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। রিভলবারটাকে পাওয়া গেল চিড়িয়া-মহলের মেঝেতেই। পুলিশের কথা মনে করে পরাশর সেটা যেমন আছে তেমনই রেখে দেবার কথা শিউপ্রসাদকে জানালে। তারপর একটু যেন দ্বিধা করে জিজ্ঞাসা করলে, এ বিষয়ে আমার করণীয় কিছুই নেই শিউপ্রসাদজী, আপনিও তা চান না, কিন্তু নিজের একটু কৌতূহল মেটাতে আপনার অর্জুন সিংকে দু-একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি?

বেশ, অতই যখন আগ্রহ, তখন জিজ্ঞাসা করুন, কিন্তু সত্যিই ও সমস্ত ব্যাপারের কিছুই জানে না। ওর নিশ্চয় ধারণা কোন বদমায়েস গুণ্ডা লুকিয়ে আছে কিনা দেখবার জন্যে ওকে ডেকেছিলাম। লছমী যে এখানে এসেছিল, আমার গুলিতেই যে সে মারা গেছে, এসব ওর কল্পনার বাইরে। —বলে শিউপ্রসাদজী আমাদের বিদায় দিলেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সামান্য মোমবাতির আলোয় তাঁর আবছা যে মূর্তি দেখলাম, তা কোনদিন বুঝি ভোলবার নয়। অসীম বেদনা, হতাশা আর জীবন সম্বন্ধে বিতৃষ্ণার সঙ্গে একটা সৌম্য আভিজাত্য যেন সেই অস্পষ্ট চেহারায় মিশে আছে।

অর্জুন সিংকে জেরা করে সত্যিই কোন লাভ হল না। একে তার মিলিটারি মেজাজ, তার ওপর পরাশরের ওপর কি কারণে কে জানে সে যেন বেশ বিরূপ। পরাশরের প্রশ্নগুলো যেন সে গ্রাহ্যই করলে না।

কাল রাত্রে তুমি কি কোন সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলে অর্জুন সিং?

পরাশরের প্রশ্ন শুনে ভ্রূকুটিকুটিল দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে অর্জুন সিং শুধু রূঢ় স্বরে বললে, না।

যেন একটু লজ্জিত হয়ে পরাশর আবার বললে, মানে তোমার তো বয়স হয়েছে, তাই ভাবছিলাম ভোরের দিকে যদি একটু ঘুমিয়ে পড়ে থাকো।

যেদিন ওরকম ঘুমিয়ে পড়ব, সেদিনই চাকরি ছেড়ে দেব। অর্জুন সিং তার নিজের কর্কশ ভাষায় জানালে।

তাহলে জেগে থেকেও তুমি ভোরের দিকে কাউকে এ কম্পাউণ্ডে ঢুকতে কি বেরুতে ছাখো নি?—পরাশর তবু নাছোড়বান্দা।

না, দেখি নি। ভোরবেলা কেউ এখানে আসে নি—অর্জুন সিংএর স্পষ্ট জবাব, ভোরে নয়, সকাল সাতটা নাগাদ রতনলালজী এসে চলে গেছেন।

আর প্রশ্ন করা নিরর্থক বুঝে পরাশরও এবার ক্ষান্ত হল।

ট্যাক্সিতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে কিন্তু মনে হল কি একটা প্রশ্ন যেন তার মনকে খোঁচা দিচ্ছে।

কি ভাবছো বলো তো পরাশর? জিজ্ঞেস করলাম,—কোথাও কি কিছু গোলমাল আছে মনে হচ্ছে।

ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে আর যে যাই বলুক, অর্জুনসিংহ যে ঠিক কথা বলছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হেসে বললাম, অর্জুন সিং কি-ই বা এমন বলেছে যে তার সত্যিমিথ্যের তারিফ করা যায়?

কিছুই বলে নি ঠিক। কিন্তু যা বলেছে তারই দাম হয়তো যথেষ্ট। ছোট একটু সত্য কথা বলে বড় মিথ্যাকে ঢাকাও তো যায়।

পরাশরের এ হেঁয়ালি বুঝলাম না। নির্বোধ প্রতিপন্ন হবার ভয়ে প্রশ্নও করলাম না কিছু।

তারপর যথাসময়ে শিউপ্রসাদজীর খুনের মামলা আদালতে উঠল। যিনি নিহত তিনি স্ত্রীলোক ও সুন্দরী যুবতী হলেও ব্যাপারটায় প্রণয়ঘটিত কিছু নেই বলে খবরের কাগজে মামলাটা সম্বন্ধে তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। শুধু মোটা মোটা খবরগুলোই সংক্ষেপে সেখানে পাওয়া গেল।

মামলাটাও অত্যন্ত সহজ সরল। তার মধ্যে জটিলতা কিছু নেই। শিউপ্রসাদজী নিজেই অপরাধ স্বীকার করেছেন, ডাক্তারি রিপোর্টে লছমী দেবীর গুলি খেয়ে মৃত্যুর আনুমানিক যে সময় দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গেও শিউপ্রসাদজীর জবানবন্দীর সময় মিলে গেছে, মৃতার দেহে যে গুলি পাওয়া গেছে, ব্যালিস্টিক রিপোর্টে তা শিউপ্রসাদেরই রিভলবারের বলে প্রমাণ হয়েছে, রিভলবারের ওপর শিউপ্রসাদের হাতের ছাপও স্পষ্ট। এরপর মামলার রায় যে কি হবে সে বিষয়ে কারুর কোন সন্দেহের অবকাশও থাকবার কথা নয়।

সেরকম সন্দেহ পরাশরেরও ছিল না, তবু খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়তে পড়তে একদিন সে উত্তেজিত হয়ে নিজের মনেই বলে উঠল, মিথ্যে—সব মিথ্যে!

আমার ঘরে বসেই সকালবেলা সে কাগজ পড়ছিল। চা খেতে খেতে তার অপ্রত্যাশিত উত্তেজনায় বিস্মিত হয়ে বললাম, খবরের কাগজের অর্ধেক খবর যে মিথ্যে, তা কি এই প্রথম আবিষ্কার করলে!

আমার পরিহাসের কোন জবাব না দিয়ে সে গম্ভীর মুখে বললে, চলো, আজই হাজতে শিউপ্রসাদজীর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

আমাকেও সঙ্গে নিতে চাও? একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ, তোমারও থাকা দরকার।—বলে সে বোধ হয় হাজতে দেখা করবার ব্যবস্থা করতেই বেরিয়ে গেল।

হাজতে গিয়ে শিউপ্রসাদজীর সামনে পরাশরের উগ্র মূর্তি দেখে আমি প্রায় হতভম্ব।

দেখা হবার পর তার প্রথম রুক্ষ অভিযোগ হল, আমায় মিথ্যা কথা কেন বলেছিলেন শিউপ্রসাদজী ?

শিউপ্রসাদজীর সৌম্য প্রশান্ত মুখেও যেন একটা অস্বস্তির ছায়া পড়ল। বললেন, কি মিথ্যে বলেছি মনে করতে তো পারছি না।

মনে করতে পারছেন না!—পরাশরের গলায় তীব্র ভর্ৎসনা, আপনার চিড়িয়ামহলের একটা দেয়ালে রিভলবারের একটা গুলি পাওয়া গেছে জানেন ? জানেন, একটা নয়, রিভলবার থেকে দুটো গুলি ছোড়া হয়েছে ? অথচ আপনি বলেছেন একটি মাত্র গুলি করে, 'মামাজি' ডাক শুনে রিভলবার আপনি ফেলে দেন।

সে সময় এত বিচলিত ছিলাম যে ঠিক কি করেছি মনে নেই। কে জানে হয়তো দুটো গুলিই ছুড়ে থাকব।

ছুড়ে থাকব নয় সত্যিই ছুড়েছেন! আমার কাছে আর উদাস মহত্ত্বের ভান করবেন না। দুবার গুলি আপনি বেশ হিসেব করে জেনে শুনেই ছুড়েছেন। কেন ছুড়েছেন আমি ধরতে পারি নি মনে করেছেন ? আমায় ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। যতই বাহাদুরি-ই করুন, আপনার অন্ধ হাতের টিপ এমন কিছু নির্ভুল নয়। স্পষ্ট একটা আওয়াজ না পেলে আপনি লক্ষ্য ঠিক করতে পারেন না। প্রথম গুলিটা সেই স্পষ্ট একটা শব্দের প্রতিক্রিয়ার আশাতেই আন্দাজে ছুড়েছিলেন। 'মামাজি' বলে লছমী দেবী আর্তনাদ করার পর বেশ তাক করে দ্বিতীয় গুলি ছোড়েন। লছমী দেবীকে মারাই আপনার উদ্দেশ্য ছিল। মুখে যাই বলুন, আপনার একমাত্র ভয় ওই ফ্যাক্টরির কর্তৃত্ব হারানো। অর্ধেক শেয়ার লছমী দেবীর হবার দরুন সেই আপনার সবচেয়ে বড় পায়ের কাঁটা। লছমী দেবী ও রতনলালজী আপনাকে সরাবার জন্যে মামলা করেছেন। লছমী দেবীকে সরাতে পারলেই রতনলালও ঠুঁটো। এই সব হিসেব করেই লছমী দেবীকে সব আট-ঘাট বেঁধে মেরেছেন।

তাই যদি হয়,—শিউপ্রসাজী ক্লান্ত স্বরে বললেন, তাহলেও তো আমার সেই অপরাধেরই বিচার হচ্ছে। আমার কৃতকর্মের শাস্তিই তো আমি পেতে যাচ্ছি।

না, যাচ্ছেন না। সেইখানেই আপনার চালাকি। সমস্ত দোষ অকপটে স্বীকার করার ছলেই আপনি আসল সত্য আড়াল করে দিয়েছেন। ব্যাপারটায় অভাবিত দুর্ঘটনার রঙই লাগিয়েছেন কৌশলে। আর আপনি মনে মনে সেই কথাই জানেন যে অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনার নামেই আপনি রেহাই পেয়ে যাবেন আদালতের সহানুভূতিতে। কিন্তু আমি যদি পরাশর বর্মা হই তাহলে ন্যায় বিচারের কোন স্খলন আমি হতে দেব না। লছমী দেবীকে কি কৌশলে সেদিন ভোরে আনিয়েছিলেন সেইটেকেই শুধু বার করতে চাই।

কথাগুলো বলে একটু বিদায় সম্ভাষণের জন্যেও পরাশর সেখানে দাঁড়াল না। গলা নামিয়ে সে কথা বলে নি। আশপাশের আরো দু-চারজনের কানে কথাটা গেছে। তাদের বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে দিয়ে গটগট করে সে আমায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

জেল থেকে ফেরবার পথে পরাশরের মেজাজ বুঝে অনেকক্ষণ কিছু বলতে সাহস করি নি। বেশ কিছুটা সময় বাদে একটু দ্বিধা ভরে বললাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ?

না, পারো না।—পরাশরের সোজা উত্তর,—তার বদলে একটা রহস্যের মানে খুঁজে পাও কিনা চেষ্টা করে দেখো।

কি রহস্য ?—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

যুক্তির অমন ফাঁক রাখা সত্ত্বেও কেন শিউপ্রসাদজী তা ধরিয়ে দিলেন না? সেই জন্যেই রতনলালজীর কাছে মাপ চাইতে একবার যাওয়া দরকার। লালবাজারে অবশ্য তার আগে একটু গালাগাল দিয়ে আসতে হবে।

পরাশরের কথা শুনে আমি তো হতভম্ব।

এসব আবোল-তাবোলের মানে কি ? শিউপ্রসাদজীর এই সোজা মামলার ভাবনায় পরাশরের কি মাথার গোলমাল হয়ে গেল !

সেই রকম কিছু হওয়া যে অসম্ভব নয়, ঘণ্টা কয়েক বাদে তার যেন আরো জোরালো প্রমাণ পেলাম। লালবাজারের কোন বিভাগের ছোট না বড় কোন কর্তা না চুনোপুঁটির সঙ্গে সে তখন দেখা করে এসেছে জানি না। কিন্তু বাড়িতে এসে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে সেই যে ভোম মেরে বসেছে, আর কোন সাড়াশব্দই নেই। এই মামলারই কোন্ জম্পেশ জট ছাড়াতে সে তন্ময় যখন ভাবছি, তখন হঠাৎ সে যা প্রশ্ন করে বসল, তাতে সত্যিই আমার চক্ষুস্থির।

ধ্যান ভেঙে পরাশর আমার দিকে ফিরে ব্যস্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করলে, সই কবিতার লাইনটা কি বলেছিলাম মনে আছে? সেই যে তোমার জন্যে সদিন বানালাম।

তুমি এখন কবিতা ভাবছো?—আমি হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

হ্যাঁ ভাবছি। পরাশর একটু বুঝি বিরক্তিই দেখালো, কবিতা ছাড়া ভাববার কি আছে? এখন কবিতাটা বলবে?···দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমারই মনে পড়ছে। অন্ধ চোখে···না, না, বোজা চোখে···হ্যাঁ, বোজা চোখে হাট াসে, উদিত বলাকা! ছি, ছি, ছি, ছি!

ছি-ছি যে কবিতার লাইনটাকে নয়, পরাশরের পরের কথায় তা বোঝা গল। কিংবা বলা যায় মাথামুণ্ডু কিছুই বোঝা গেল না তার প্রলাপের।

আত্মগ্লানিতে যেন জ্বলে মরছে এই ভাবে পরাশর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ই কবিতার লাইনটা ভুলে গেছলাম, এমন আমি অপদার্থ! ওই নন্দী সাহেব াসে গেছেন, চলো রতনলালজীর বাড়ি।

বাইরে দরজা দিয়ে সত্যিই তখন স্যুট-পরা এক ভদ্রলোক ঢুকছেন। তনিই নন্দী সাহেব বলে পরিচয় পেলাম। পরাশরের এলোমেলো কথার ানে কিছু থাক বা না থাক, রতনলালজীর দর্শন পাবার এ সুযোগ আমি্যাগ করতে পারলাম না।

বাড়ি নয়, ফ্ল্যাট। আগেকার সাহেব পাড়ায় দস্তুরমত হালফ্যাশানের ড়মাচুষি আস্তানা। অটোমেটিক লিফ্‌ট দিয়ে উঠে কলিংবেল টিপতেই যভাবে উর্দিপরা বেয়ারা এসে রতনলালজীর কাছে নিয়ে গেল, তাতে মনে ল পরাশর আগে থাকতেই ফোনে যোগাযোগ করে রেখেছে।

রতনলালজী উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করে আমাদের বসতে ললেন। নিজে তিনি বসলেন বিরাট একটি অর্ধচন্দ্রাকার সেক্রেটারিয়েট াতীয় টেবিলের ওপাশে।

আর সকলে বসলেও, পরাশর তখনো দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে রতনলালজীর কে চেয়ে আছে।

রতনলালজী অস্বস্তি বোধ করলেন কিনা জানি না, কিন্তু মুখে কৌতুকের য়েই বললেন, আমার চেহারায় এত কিছু বিশেষত্ব আছে বলে তো ানতাম না।

বিশেষত্ব নয়, দেখছি সাধারণত্ব। পরাশরও বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে

হেসে বললে, আপনার চেহারা আর পাঁচজন ধনী ব্যবসাদার কি শিল্পপতির মতই। একটু ধূর্ত, একটু ভোঁতা, একটু দাম্ভিক, একটু সুবিধাবাদী, একটু বেপরোয়া, একটু ভীতু, একেবারে সহজ সাধারণ। এই চেহারা দেখেই আশ্বস্ত হলাম, রতনলালজি। পটের ছবির মত শান্ত সৌম্য অভিজাত ধার্মিক চেহারায় ঘেন্না ধরে গেছে।

রতনলালজীর মত আমিও অন্তত পরাশরের এ ধরনের বক্তৃতা শুনে বেশ একটু বিমূঢ়। আধুনিক সাহেবি পোষাকে রতনলালজীকে ভালোই দেখাচ্ছে। তাঁর চেহারা আহা মরি না হলেও কুশ্রী বলা যায় না। কিন্তু তা নিয়ে এত উচ্ছ্বাসের মানেই বুঝতে পারলাম না। আমাদের অবস্থা অনুমান করেই বোধ হয় পরাশর আবার বলতে শুরু করলে, ভাবছেন এসব কথা বলার মানে কি? মানে একটা আছে মশাই। আপনার সম্বন্ধে অত্যন্ত ভুল ধারণা একটা হয়েছিল স্বীকার করছি। চরিত্রের বেলা যেমন, চেহারার বেলাতেও তেমনি ভুল ধারণাটা যে কেটে গেল, তা আপনাকে খুশি হয়ে না জানিয়ে পারছি না।

কি ভুল ধারণা আমার সম্বন্ধে ছিল? জিজ্ঞেস করলেন রতনলালজী।

আপনি জাল ওষুধ তৈরি করেন।

তার ফয়সালা তো হাইকোর্টেই হয়ে গেছে।—রতনলালজী হাসলেন।

তবু দুর্জনের মুখ কি বন্ধ থাকে। আপনি যে এ কারবারের পাণ্ডা—এরকম কয়েকটা প্রমাণ একজন আমাকে দিয়েছেন আপনাকে জব্দ করবার জন্যে।

রতনলালজীর মুখের হাসি তেমনিই রইল। কৌতুক ভরে বললেন, কে দিয়েছে? স্বয়ং স্বনামধন্য শিউপ্রসাদজী তো?

তা ছাড়া আর কে?

হ্যাঁ, রতনলালজীর হাসিতে একটু যেন ঘৃণার ঝাঁঝ টের পাওয়া গেল, কর্তৃত্বের লোভে নিজের ভাগ্নীকেই যিনি মারতে পেরেছেন, আমার এটুকু উপকার করতে তিনি পেছপাও হবেন কেন?

ঠিকই বলেছেন রতনলালজী। আমরা শিউপ্রসাদজীর প্রমাণগুলো আপনার হাতেই দিতে এসেছি, সেই সঙ্গে এ কথাটাও বলতে যে আপনি সত্যি ভাগ্যবান।

দুদিন আগে যার স্ত্রী নির্মমভাবে খুন হয়েছেন, তাকে আপনি ভাগ্যবান

বলেন?—হাসি মিলিয়ে গিয়ে রতনলালজীর স্বরে এবার তিক্ত জ্বালা ফুটে উঠল।

পরাশর কিন্তু অবিচলিত ভাবে বললে, হ্যাঁ, তবু ভাগ্যবান বলি, কারণ কপাল ভালো না হলে ওই খুনের দায়ে আপনিই পড়তে পারতেন।

আমি!—রতনলালজীর মুখে বিমূঢ়তার সঙ্গে বিরক্তির ছায়া,—কি করে?

ধরুন, ভোরের আগে না হয়ে মাঝরাত্রে লছমী দেবী যদি তাঁর মামার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে আসতেন। ধরুন, অর্জুন সিং ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছে বলে লছমী দেবীর প্রতি তার একটা অসীম স্নেহ থাকায়, সে জেনেশুনেও চিড়িয়ামহলের পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে তাঁর উঠে যাওয়ায় বাধা দিত না। ধরুন, লছমী দেবীকে বাড়ি থেকে গোপনে বেরুতে দেখে সন্দেহক্রমে আপনি তার অনুসরণ করতেন আর চিড়িয়ামহলে ঢোকবার পর তাকে ধরে ফেলতেন। ধরুন, সে মামাজীর কাছে সব অন্যায়ের জন্যে মাপ চেয়ে আশ্রয় নেবার জন্যে এসেছে বুঝে আপনি জোর করে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেন। ধরুন, আপনাদের ধস্তাধস্তির শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে শিউপ্রসাদজী খুনে গুণ্ডা ভেবে গুলি করতেন। ধরুন, সেই-মুহূর্তে ছুটে আসতে গিয়ে টুলে ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বার জন্যে গুলিটা ফসকে যেতো আর লছমী দেবীর মুখ দিয়ে 'মামাজী' বলে আর্তনাদ বেরিয়ে আসত। ধরুন, বিচলিত শিউপ্রসাদজী সেদিকে গিয়ে পৌঁছোবার আগেই আপনি এসে লছমী দেবীর নাকে-মুখে ক্লোরোফর্ম গোছের কিছু চাপা দিয়ে তার কণ্ঠ তো বটেই, শ্বাসও প্রায় রুদ্ধ করে অজ্ঞান করে দিতেন। ধরুন, শিউপ্রসাদজী অর্জুন সিংকে ডাকতে যাবার সময় তাঁর ফেলে দেওয়া রিভলবারটা সাবধানে রুমাল জড়িয়ে কুড়িয়ে নিয়ে অচেতন লছমী দেবীকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে আপনি নামিয়ে নিয়ে যেতেন। ধরুন, অর্জুন সিং সে-সময়ে ওপরে উঠে আসার দরুন নির্বিবাদে লছমী দেবীকে বাইরে নিয়ে গিয়ে মোটরে আপনি বাড়ি নিয়ে আসতে পারতেন। ধরুন, বাকি রাতটা ভেবে ভেবে শিউপ্রসাদজীর ভুলে রিভলবার চালনাটা কাজে লাগাবার ফন্দি আপনি বার করতেন। ধরুন, সকাল ছটা নাগাদ শিউপ্রসাদজীকে ফোন করার পর তাঁর মুখে গুলি করার সময় সম্বন্ধে ভুল ধারণা জেনে নিয়ে আপনি ফন্দিটা একটু পাল্টাতেন। ধরুন, সাইলেন্সার দেওয়া শিউপ্রসাদজীর রিভলবার

দিয়েই অসন্দিগ্ধ লছমী দেবীকে মেরে, আপনি তাঁকে কোন হাসপাতালে নিয়ে তুলতেন। ধরুন, তারপর সেখানে যা জবানবন্দী দেবার দিয়ে শিউপ্রসাদজীর কাছে গিয়ে যা যা আদায় করবার আপনি করতেন। তারপর ধরুন, গুলি ছোঁড়ার জায়গা দেখবার ছুতোয় চিড়িয়ামহলে গিয়ে রুমাল জড়ানো রিভলবারটা এক জায়গায় ফেলে আসতেন। ধরুন, সারাদিন তারপর মিথ্যে স্তোক দিয়ে, রাত্রে শিউপ্রসাদজীকে নিংড়ে আরো কিছু আদায় করবার আশায়, সঠিক খবর দিয়ে আপনি তাঁর স্বীকারোক্তিটা উপযুক্ত দামে বিক্রী করবার প্রস্তাব করতেন···

নিজেকে ভাগ্যবান প্রমাণ করতে এত কিছু ধরতে যাব কেন? রতনলালজীর মুখে সেই এক ঈষৎ ধূর্ত কৌতুকের হাসি।

তাহলে ভাগ্য খারাপ মেনে নিয়ে কথাগুলো সত্য বলেই ধরুন।

তার মানে?—এক মুহূর্তে রতনলালজীর মুখের চেহারা আর গলার স্বর সত্যিই হিংস্র হয়ে উঠল। তীব্র কণ্ঠে বললেন, আমার সঙ্গে তামাশা করতে এসেছেন আপনারা? শিউপ্রসাদজী নিজ মুখে স্বীকার করেছেন যে ভোরের কাছাকাছি লছমী সেখানে যায় আর তিনি গুলি করেন।

গুলি তিনি করেন ঠিকই। সেই গুলি চিড়িয়ামহলের দেয়ালে বিঁধে আছে। ভোর সম্বন্ধে তাঁর ধারণাটা ভুল। আর সে ভুল একটি মামুলি পুরোন কবিতার আধুনিক রূপ দেওয়ার কথা মনে না পড়লে হয়তো আমি ধরতেই পারতাম না। কবিতাটি হল, পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল। লছমী দেবী ও আপনার ধস্তাধস্তির শব্দে চিড়িয়ামহলের পাখিরা জেগে উঠে ডাকতে শুরু করে। অন্ধ মানুষ। অনিদ্রায় অর্ধেক রাত জেগে সবে একটু তখন তন্দ্রা এসেছে। তন্দ্রা ভেঙে যাবার পর পাখির আওয়াজ শুনে ভোর বলে মনে হয়েছে! এ ঘটনার পর ঘুমোবার বড়ি খেয়ে সত্যিই ঘুমিয়ে না পড়লে সময়ের হিসাবে অতটা ভুল নিশ্চয় তাঁর হত না। কিন্তু আর বাক্যব্যয় নয় ইন্সপেক্টর সাহেব, ওয়ারেন্টটা বার করে হাতকড়া লাগান।

রতনলালজীকে লালবাজারে নিয়ে যাবার পর বাড়ি ফেরার পথে পরাশরকে জিজ্ঞাসা করলাম, সবই বুঝলাম এখন, কিন্তু সকালে শিউপ্রসাদজীকে গিয়ে অমন মিথ্যে ধমকাবার মানেটা কি বলবে।

মানে?—পরাশর হাসল, ওটা খানিকটা বাহাদুরি, খানিকটা রতনলালের

চর যদি কেউ থাকে, তাকে ধোঁকা দিয়ে রতনলালকে আশ্বস্ত করতে পাঠাবার ফিকির।

আর যুক্তির মধ্যে কি ফাঁক রেখেছিলে যা শিউপ্রসাদজী ধরিয়ে দেন নি?

সে-ফাঁক ধরতে চাইলে সেই কথাগুলো আর একবার মনে করে আওড়াও কিংবা কোথাও লিখে নিয়ে বার কয়েক তন্ন তন্ন করে খোঁজো। ফাঁক ধরতে পারলে আমায় চিঠি দিও। আমি কবিতা লিখতে কলকাতার বাইরে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছ? ঠিকানা কি?

কোন জবাব মিলল না। প্রশ্ন করতে না করতেই পরাশর ভিড়ের মধ্যে এঁকে-বেঁকে ছুটে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়েছে।

ঝুমকি

ভবানী মুখোপাধ্যায়

সাধারণ ধরণের মানুষের জীবনে অনেক সময় বিচিত্র ঘটনা ঘটে যায়। এই কাহিনীটিও সেই জাতীয়। সারা কলকাতা খুঁজে বেড়ালেও তপনমোহন বসু চৌধুরীর মত অতি সাধারণ প্রাণী মেলা শক্ত। তপনমোহনও আপনাকে একটা অসাধারণ কিছু মনে করতো না, তবে আমাদের আর সকলের মত তারও ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারা রক্ষার প্রয়োজনে তাঁরও বাঁচার প্রয়োজন এবং সে বাঁচার অর্থ বাঁচার মত বাঁচা, ভালো খেয়ে পরে সুখে ও স্বচ্ছন্দে থাকা।

কলকাতা থেকে সে বম্বে এসেছিল হয়ত ভালো আবহাওয়ার জন্য, আর হয়ত ভেবেছিল সিনেমার কাহিনী-টাহিনী লিখে নিজের খরচাটা চালিয়ে নেবে। আর ছিল একটু ক্ষীণ আশা। তপনমোহনের জানাশোনা এক অপরূপ সুন্দরী ভাগ্য পরিবর্তনের বাসনায় কিছুদিন আগেই বোম্বাইয়ের পথে পাড়ি দিয়েছিল। তপন ভেবেছিল প্রবাসে উভয়ের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। তা হয় নি।

তারপর পাঁচ বছর কাটলো—এই ক'বছরে সাফল্য লাভ না হলেও তপনমোহন সুখে ছিল। তপনের প্রকৃতি ছিল আনন্দময়, সাদাসিধে হিসাবে

তার আকৃতি মনোরম, বর্ণ শ্যাম হলেও উজ্জ্বল এবং লাবণ্যমণ্ডিত, পোষাক পরিচ্ছদও নিখুঁত এবং মনোহর। যে-সব মেয়েদের হাতে অনেক সময় এবং সেই সময় উপযুক্ত ভাবে কাটাবার উপায় যারা খুঁজে পায়না, তপনমোহন তাদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয় প্রাণী। তপন ভালো মানুষ, অকারণ তর্ক করেনা। বিনা প্রতিবাদে সব মিথ্যা কথা হজম করার ক্ষমতা তার অসীম এবং তাঁর নিজস্ব কোনো মৌলিক মত নেই। সমাজে প্রতিষ্ঠা এবং লোকপ্রিয়তা অর্জনে এইগুলি অতিশয় সদ্‌গুণ।

সবিস্ময়ে তপনমোহন একদা আবিষ্কার করল সিনেমা জগতে ফিল্মের স্ক্রীপ্ট লেখার কাজে কারো কাছে তার প্রয়োজন নেই সুতরাং সিনেমা জগতের আর সকলের মত তারও ব্যক্তিগত জীবন-কাহিনী অনেক তথ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। কিভাবে সে অমুকটা মিস্ করেছে এবং তমুকটা তার মুখ থেকে খসে পড়েছে তারই অসংখ্য হতাশাময় বিবরণ সে বলতে পারতো।

বিখ্যাত ডাইরেক্টর বসন্ত রায় তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদানের স্টোরীটা ওকে দিয়েই করাবেন ঠিক করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে উভয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হল না। অনেকে এসে ভিড় করে দাঁড়ালো, তপনমোহনকে সরে আসতে হল।

কিন্তু তাই বলে তপনমোহনের একবারও মনে হয় নি যে সে বেকার, কারণ সিনেমা জগতের এত খুঁটিনাটি ব্যাপার দিনরাত লেগেই আছে যে তপনমোহনের নাওয়া-খাওয়ার সময়ই ঠিকমত মিলতো না।

স্টুডিওতে সর্বদাই পৃথিবীখ্যাত মানুষের সঙ্গে কনুই ঠেকাঠেকি হওয়া সম্ভব। পাশের চেয়ারের মানুষটি হয়ত সবেমাত্র রাশিয়া থেকে ফিরলেন, ও পাশের ব্যক্তিটি চললেন চীনে। তাই তপনমোহনের পাঁচবছর রীতিমত আনন্দময়, উত্তেজনাপূর্ণ এবং মনোরম কেটেছে। প্রতিটি দিন সে সূক্ষ্মভাবে উপভোগ করেছে। শুধু এই পাঁচবছর পরে যে জিনিসটির অভাব ঘটেছে সে হল অর্থ। বিস্ময় এবং হতাশায় সে আবিষ্কার করল তার মূলধন শেষ হয়ে এসেছে। বোম্বাইয়ের সিনেমা জগতে কোটি কোটি টাকা উড়ে বেড়ালেও একটিও তার পকেটে এসে পড়ছে না।

এই অবস্থায় তার লক্ষ্য পড়লো ইন্দিরার ওপর। ইন্দিরার খ্যাতি সিনেমা-তারকা হিসাবে একদিন যথেষ্ট ছিল, আজ স্তিমিত হয়ে এসেছে তাঁর স্বামী

এবং প্রযোজক বংশীধর মজুমদারের আকস্মিক মৃত্যুর পর। মেরিন ড্রাইভে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আর একটি আছে লোনাভালায়। এখন কদাচিৎ অভিনয়ে নামেন, অতিশয় মর্যাদামণ্ডিত মহিলা, সকলের শ্রদ্ধা এবং বিস্ময়ের পাত্রী। প্রায় সব অনুষ্ঠানেই তাঁর উপস্থিতি ঘটে, বোম্বাই তাঁর ভালো লেগেছে, তাই এখানেই স্থায়ীভাবে থাকবেন স্থির করেছেন। বংশীধরের অনেক টাকা ছিল, একটু বেশী বয়সেই তিনি ইন্দিরাকে বিয়ে করেছিলেন, বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর পর সে সব টাকা ইন্দিরাই পেয়েছেন। মেরিন ড্রাইভের বাড়িতে দাসী-চাকর ভিন্ন ইন্দিরার নিকট আত্মীয় বোধহয় আর কেউ নেই—বেশীর ভাগ সময় এখন ঝুম্‌কির পরিচর্যায় কাটে। বংশীধরই ঐ বিরাট শাদা বেড়ালটা পারস্য থেকে নাকি কিনে এনেছিল।

আত্মীয়স্বজন না থাকলেও ইন্দিরার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কম নয়। সকলের প্রতি তার ব্যবহার সমান।

এক এক সময় শ্রীমতী ইন্দিরার এই একাকীত্ব অতিশয় নিদারুণ মনে হত, তখন তিনি ভাবতেন এই অসংখ্য পরিচিতের মধ্যে কে তাঁর প্রকৃত বন্ধু? সেই নৈরাশ্যময় মুহূর্তে তিনি চলে যেতেন লোনাভালার বাংলোয়। কয়েকদিন অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে আবার বোম্বাইয়ের জনারণ্যে ঝাঁপ দিতেন। সেই সময় বাংলাদেশের পুরাতন পরিচিত মহলে দু'একখানি চিঠিও লিখতেন, খুব শীগগিরই দেশে ফিরবেন এমন সম্ভাবনার কথাও সে-সব চিঠিতে উল্লেখ করতেন। কিন্তু এই ভাবাবেশ দীর্ঘস্থায়ী হত না, সামাজিক আবর্তের উত্তেজক আবহাওয়ায় আবার সব চাপা পড়ে যেত। নতুন ছবির মহরৎ উৎসব, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা সামাজিক পার্টিতে আবার পুরাতন ইন্দিরা দেবীর আবির্ভাব ঘটতো। বন্ধু-বান্ধব এবং অনুরক্তদের ভিড়ে মনটা খুশিতে ভরে উঠত।

তপনমোহন ইন্দিরার এই জাতীয় পরিচিত বন্ধু। ভারী চমৎকার মানুষ, সদানন্দময়, সদাহাস্যময়, বশংবদ, সরস কথার যাদুকর। কিঞ্চিৎ চাটুকারিত্ব থাকলেও তার মধ্যে সন্ত্রাসকর কিছু ছিলনা। সরল এবং স্বার্থহীন প্রকৃতির তপনমোহনকে ইন্দিরাও পছন্দ করতেন। সব দলেই তার সমান সমাদর। সবাই তাকে চায়।

ইন্দিরার কথা বিবেচনা করতে শুরু করে তপনমোহনের মনে হল আরো আগে এই কথাটি তার মনে জাগে নি কেন! ইন্দিরার এত টাকা যে সে

কিভাবে খরচ করতে হবে তাই জানেনা, বর্তমানকালে এমন একটা অবস্থা অচিন্তনীয়। অথচ আর সবায়ের মতো ইন্দিরা স্থূল রুচির কদর্য রমণী নয়। সংস্কৃতিসম্পন্ন মহিলা হিসাবেই তার প্রতিষ্ঠা। ক্লাসিকাল গান থেকে পোস্ট-ইম্প্রেসনিস্ট ছবি—সবই সে বোঝে। তার মতামতের মূল্য আছে, অথচ তার বক্তব্য বিরক্তিকর নয়। শুধু যেন কিঞ্চিৎ উত্তাপের অভাব।

কিন্তু বিচার করতে বসে তপনমোহন দেখলো এই উত্তাপের অভাব ঘটবে না। ইন্দিরা সর্ব বিষয়েই সচেতন। বয়স্ক স্বামীর বিড়ম্বনাও ইন্দিরা অকপটে ব্যক্ত করেছে। কিন্তু ইন্দিরার নামে সিনেমা পাড়ায় কোনো স্ক্যাণ্ডাল ছড়িয়ে নেই। পুরুষ মানুষের ভিড়ে সে হাজির থাকলেও ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলে। বাক্যে এবং ভঙ্গীতে তার অপূর্ব সংযম। তপনমোহনকে এই পাষাণে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সকল সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার এই একমাত্র পথ একথা তপনমোহন বুঝেছে, তাই সে অখণ্ড মনোযোগে ইন্দিরার পরিচর্যা শুরু করল। ইন্দিরার ঘর-বাড়ি, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সবকিছুর মধ্যে নিবিড়ভাবে মিশে গেল।

আধুনিক ধরণের চমৎকার বাড়ি ইন্দিরার। প্রশস্ত এবং সুসজ্জিত কয়েকটি ঘর, পিছনে ছোট বাগান আর কোমল কচি ঘাসের লন, তাতে টেনিস খেলা চলেনা, তবে ইন্দিরা ব্যাডমিণ্টন খেলে থাকেন। ড্রইংরুম এবং ডাইনিং রুমের প্রাচীর গাত্রে কয়েকজন আধুনিক শিল্পীর চমৎকার এচিং। সব কিছুর মধ্যেই গৃহস্বামিনীর নিখুঁত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

একদিন ঘন নীলরঙের সোফার একপ্রান্তে বসে আছে তপনমোহন। ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ স্পর্শের পরিবেশে সে বিহ্বল হয়ে উঠেছে। কফির সরঞ্জাম টেব্‌লে সাজিয়ে গেছে পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিহিত বেআরা। সবই বেশ শান্ত, অন্তরঙ্গ এবং প্রীতির পরিচায়ক।

ইন্দিরার আরো কাছে এগিয়ে এসে ভাবগাঢ় কণ্ঠে তপনমোহন বলল :

—কি ভাবছিলাম জানো ?

—না, কি ভাবছিলে আবার ?

—চলোনা, দু'চারদিনের জন্য পুণা ঘুরে আসা যাক। এই সময়টা ওখানকার 'ভবানী মন্দিরে' কি একটা মেলা বসে। মন্দ লাগবেনা। না হয় সুলতা রায়, বলদেব কাপুর, ঠাকুরদাস এদেরও সঙ্গে নেওয়া যাবে।

শান্ত গলায় ইন্দিরা জবাব দেয়—বেশ ত', মেলা নিশ্চয়ই বেশ জমবে। ছোটবেলায় দিল্লীতে আমরা রামলীলার মেলা দেখেছি, চমৎকার লাগত!

এমনই ভঙ্গীতে তপনমোহন ইন্দিরার মুখের দিকে তাকিয়েছিল যে ইন্দিরা সহসা মুখ তুলে তার দিকে সবিস্ময়ে তাকালো। যেন এখনই প্রশ্ন করবে—তোমার আজ হ'ল কি তপন? একটু যেন কেমন মনে হচ্ছে! সত্যই আজ তপনের মনের পরিবর্তন ঘটেছে। এতদিনের ঘনিষ্ঠতার পর আজই সর্বপ্রথম তপনের মনে হল যে ইন্দিরাকে নিবিড় বাহুর বাঁধনে বেঁধে চুম্বনে আকুল করে তোলে। কেন যে আগে একথা মনে হয় নি তাই ভাবে তপন! মাথায় একটা আইডিয়া যদি জাগে তাহলে তার পরিকল্পনাও জাগে, বহুবিধ কথা মনে উদয় হয়।

তপনমোহন ভনিতা না করেই বলে—আমরা অনেকদিনের বন্ধু, লোকে বলে বন্ধুতা জিনিসটা কৃত্রিম, আমার কিন্তু এ যুক্তি হাস্যকর মনে হয়, তোমারও কি তাই মনে হয়?

এই বলে ইন্দিরার বাহুমূলে লঘু আঘাত করে একটু সরে বসল তপন।

ইন্দিরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তার মৃদুনীল চোখের তারায় স্নেহের আভাষ। ইন্দিরাও মনে মনে ভাবছে—ছেলেটা ভালোই, ক্রমেই যেন আরো ভালো হয়ে উঠছে। প্রকাশ্যে ইন্দিরা বলল—পুরুষ মানুষের বন্ধুত্বতার সবটাই কৃত্রিম মনে হয়, কিন্তু মেয়েদের পক্ষে তা নয়। মেয়েরা যাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করে তাকে আপনার করে নেয়, তার মধ্যে আর এতটুকু ভেজাল থাকে না। তাই তাদের যে বন্ধু হয় সে আজীবন বন্ধু।

চিন্তাকুল ভঙ্গীতে তপন বলে—ঠিক তাই, মেয়েরা এই রকমই হয়, সব বিষয়েই সিরিঅস। কিছুই সহজে ভুলে যাওয়া মেয়েদের পক্ষে শক্ত।—তারপর অতি গভীর মনোযোগ দিয়ে ইন্দিরার মুখের পানে তাকিয়ে তপনমোহন সহসা প্রশ্ন করে—কিন্তু তুমি কি আমাকে বন্ধু বলে নিয়েছ? একটা কথা তোমাকে বলি ইন্দিরা, আমার জীবনে আজ তুমি অনেকখানি ছেয়ে আছে। তোমার ঐ শান্ত, সংযত ভঙ্গীটুকু আমার ভারী ভালো লাগে।

অতি ধীরে ধীরে জবাব দেয় ইন্দিরা—আমাদের বন্ধুতা তোমার কাছে মর্যাদা পেয়েছে তা জেনে সত্যি আমার আনন্দ হল। এত সব আমি বুঝি না অন্ততঃ এর আগে বুঝি নি।

তপনমোহন এই শুভ মুহূর্তের অপচয় করতে চায় না। সে বলল—এখন ত' বুঝেছ। আজ তোমাকে স্পষ্ট করে বলি, এই জগতে তুমি আমার একমাত্র বন্ধু। চিন্তিত ভঙ্গীতে কফির বাকি অংশটুকু শেষ করলো তপনমোহন। মনে মনে ভাবছে যদি সহসা চুমো খেয়ে বসে তাহলে কি তার প্রতিক্রিয়া হবে। নারী চরিত্র চিরদিনই রহস্যময়। তারা অনেকদূর অবধি এগিয়ে নিয়ে গিয়ে এমন ভাব দেখায় যেন কিছুই সে জানেনা, বোঝে নি। অনেক সময় যেন প্রকৃতই অবাক হয়ে পড়ে। চমৎকার বন্ধুত্বের অবসান ঘটলো বলে অভিযোগ করে, আর অনেক সময় এই ফিকে বন্ধুত্বটাকেই সবচেয়ে বড়ো বলে মনে করে।

আত্মসমর্পণ করলে কি আকৃতি হবে ইন্দিরার? ইন্দিরার সম্পদ আছে, কিন্তু সে যদি নিঃস্ব হত তাহলেও কি এই মনোভাব থাকতো তপনের? আজ যে মানসিক ক্ষেত্রে তপনমোহন এসে পৌঁচেছে সেখান থেকে সে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে—বিষয় সম্পত্তিবিহীন ইন্দিরাকেও সে এমনই ভালবাসে। ইন্দিরাকেই সে ভালবাসে।

পেয়ালায় আর একটু কফি ঢেলে নিল তপনমোহন। ইন্দিরা যে নিঃস্ব নয়, সে অতুল সম্পদের অধিকারিণী একথা ভাবতেও ভালো লাগে। এমন সময় ইন্দিরার সেই বেড়ালটা ধীরে ধীরে তার সামনে এসে গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ালো। কোনদিন বেড়াল সম্পর্কে কিছু ভাবেনি তপনমোহন, মাঝে মাঝে এইটুকু শুধু মনে হয়েছে স্বামীহীনা রমণীরা নিঃসন্তান হ'লে অনেকখানি সময় জীবজন্তুর পিছনেই কাটায়। কেউ পাখি পোষে, কেউ বেড়াল পোষে কেউ বা আবার গোপাল ঠাকুর বুকে করে কাঁদে। ইন্দিরার বেড়ালটার কথা সে কখনো ভাবে নি, আজ বেড়ালটা দেখে মনে হল এই ঝুম্‌কিকে নিয়ে অতখানি বাড়াবাড়ি ভালো নয়, কারণ বেড়ালের প্রভুভক্তির কোনো কাহিনীই জানা যায় না। ওরা নির্বিকার, কিন্তু নিস্পৃহ নয়। নিজস্ব জীবনযাত্রায় ওরা অভ্যস্ত এবং মানুষকে অবজ্ঞা করে।

এই বেড়ালটা কিন্তু বিরাট। পারস্যদেশের কার্পেটের মত তার বেড়ালও বিচিত্র—(সত্যই কি বেড়ালটা পারস্য থেকে আনা? সে প্রশ্ন পরে করা যাবে।) উপস্থিত কিন্তু দেখা গেল বেড়ালটা ইন্দিরার ভক্ত বটে—ঝুম্‌কি বলে মিহি গলায় ডাকতেই সে সোজা উঠে এসে কোলে বসল। ইন্দিরা কি একটা কাজে যখন উঠে গেল তখন বেড়ালটা অতিশয় উপেক্ষার ভঙ্গিতে

তপনমোহনের মুখের দিকে তাকিয়ে আরেকটা সোফায় গিয়ে চোখ বুজিয়ে বসে রইল।

তপনমোহনের সাধ হয় বিড়ালের চিত্ত জয় করায়। বিড়াল সে দেখতেই পারে না, কিন্তু একথা সে জানে শিশুরা এবং জীব জন্তুরা মহৎ লোকই পছন্দ করে। বিড়ালটা তপনকে যে অশ্রদ্ধা করে তা নয়, গ্রাহ্যই করত না। দু'একবার ইন্দিরার জন্য একা অপেক্ষা করার সময় তপনমোহন লক্ষ্য করেছে ঝুম্‌কি হিমশীতল নেত্রে ওর মুখের পানে তাকিয়ে আছে। যেন ও একটি অকিঞ্চিৎকর প্রাণী।

আজ সর্বপ্রথম যেন ঝুম্‌কিকে ভালো করে দেখল তপনমোহন। বিড়ালটি আর যাই হোক তপন সম্পর্কে উদাসীন নয়। কিছুক্ষণ আগে যখন ইন্দিরার হাতটা ধরেছিল তপন, তখন মনে হল ঝুম্‌কি ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

তপনমোহন উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে—ভারী চমৎকার বেড়াল, এমন বেড়াল আর দেখি নি, কত বয়স হবে? কতদিন আছে তোমার কাছে?

মৃদু হেসে ইন্দিরা বলে—তা আছে একেবারে বাচ্ছা থেকেই, পাঁচ-ছ বছর হবে। ঝুম্‌কি সত্যি দেখতে ভালো, সবাই তাই বলে।

—তোমাকে ভারী ভালোবাসে, না?

—তা বোধহয় বাসে! ঝুম্‌কী আমার ভারী লক্ষ্মী।

—খুব আশ্চর্য! শুনেছি বেড়ালরা নাকি ভারী স্বার্থপর, কাউকেই ভালোবাসেনা।

ইন্দিরা মধুর হেসে বলে ওঠে—যতো সব বাজে কথা! ঝুম্‌কি এদিকে আয়!

বিড়ালটা তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আড়ামোড়া ভেঙে নেয়. তারপর অতবড় প্রাণীর পক্ষে যা অসম্ভব বলে মনে হয়, নিঃশব্দে এপারে এসে দাঁড়িয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে সহসা থেমে তপনমোহনের মুখের পানে তাকালো। তপন সহসা বলে ওঠে—জানো আমার মনে হয় তোমার ঝুম্‌কি বোধহয় আমাকে পছন্দ করে না, ভাবে এ আবার কে এল!

ইন্দিরা তার স্বাভাবিক মৃদু গলায় বলে—হয়ত তাই, ঝুম্‌কি রীতিমত 'জেলাস্' হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে—

—জেলাস্? বলো কি? আমি ত' জানতাম বেড়ালেরা আত্মচিন্তাতেই

বিড়োর থাকে—ওদের মনে ঈর্ষা, সন্দেহ, ঘৃণা প্রভৃতি থাকে নাকি? কি জানি, আমি ত' আর বেড়াল পুষি নি কখনও!

ইন্দিরা বলে এ ত' অতি সহজ কথা! যাকে আমরা ভালোবাসা বা টান বলি তার মধ্যেও ত' আত্মসুখ, আত্মতৃপ্তিই সর্বপ্রধান। বিড়ালরা হয়ত স্বার্থপর, কিন্তু ঝুম্‌কি আমার সাধারণ বেড়াল নয়।

এই আলোচনার পর তপনমোহনের জীবনে অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল। সবই কেমন এলোমেলো। আমরা সকলেই জানি মাঝে মাঝে জীবনের আবহাওয়া এমনই বিচিত্র হয়ে ওঠে, পৃথিবীটা সহসা যেন বিরূপ হয়ে ওঠে। যে চিঠির প্রতীক্ষায় থাকি সে চিঠি এসে পৌঁছায় না, কত নির্ধারিত ব্যবস্থা শেষ মুহূর্তে ভেঙে যায়। আরব সমুদ্রে ঝড় ওঠে, বোম্বাইয়ের আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসে, পায়ের তলার মাটি সরে যায়। পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়।

তপনেরও এই অবস্থা। প্রথমতঃ তার সহসা কেমন মনে হচ্ছে শুভস্য শীঘ্রং। কানে কানে কে যেন দিনরাত বলছে, সময় আর নেই, পরে যেন বেশী দেরী না হয়ে যায়।

ছায়াছবির জগৎ বড় অনিশ্চিত, সাগর লহরীর মতো। সাগরের বুকেই ঢেউ জেগে আবার সাগরে মিলিয়ে যায়। আজ যা ঠিক কাল তা কেঁচে যায়, সকলের ক্ষেত্রেই তাই, নিশ্চিন্ত নির্ভরতা এই জগতে নেই। এমন কি যে সব তারকা খ্যাতির সপ্তম স্বর্গে বিরাজিত তিনিও জানেন না পরবর্তী ছবি রিলিজ হওয়ার পর তাঁর কি মূল্য থাকবে। এই অনিশ্চয়তা স্টুডিওর অভ্যন্তর থেকে তার আশেপাশেও ছড়িয়ে পড়ে। তপনমোহনের যখন ব্যাঙ্কে টাকা ছিল তখন সে আকস্মিক দাবী মেটাতে কুণ্ঠিত হয় নি, বিব্রত বোধ করে নি। তখন একটা অসতর্ক উচ্ছৃঙ্খলতার জোয়ারে সে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক সংকটে এ জগতের সকলেই বিব্রত, তাই আবেগাপ্লুত বিস্ফোরণ এখানে সাধারণ ঘটনা। এখানকার বাতাস অতি সূক্ষ্ম এবং স্নায়ুশিরা অবসন্ন।

তপনমোহন মালাডে যে অঞ্চলটায় থাকতো সেটা প্রায় জনহীন। বাড়িটাও অতি প্রাচীন। কাঠের বাড়ির দোতলায় সাজিয়ে গুছিয়ে সে থাকতো, নীচের

তলায় বাড়ীর পারসী মালিক মিসেস বাটলিওয়ালা থাকতেন। মিসেস বাটলিওয়ালা এ্যানি বেসান্টের থিওসফীক্যাল সোসাইটির উৎসাহী সদস্য। বৃদ্ধার ঘরে উজ্জ্বল আলোয় সন্ধ্যার পর প্রতিদিন বৈঠক বসতো।

প্রথমটায় যখন এই বাড়িতে তপনমোহন এসেছিল তখন তার মন্দ লাগে নি। নিরালা আমেজ তার ভালোই লেগেছিল—কিন্তু অতি উজ্জ্বল সূর্যালোকে এ অঞ্চলের সবই কেমন শেষটায় ম্লান হয়ে যায়। অতিরিক্ত যত্নে সর্বদাই ঘরবাড়ির প্রসাধন করতে হয়। তপন তার ঘর বেশ ভালোভাবে সাজিয়েছিল—একটা সুন্দর ডেস্ক, (লেখার বাতিক ছিল তার)—আধুনিক আরাম কেদারা, বাদামী পালিশের সেটি—সে যেন নিবিড় করে টেনে রাখে। দেয়ালে কয়েকটি পরিচিত তারকা এবং সহকর্মীদের (ডাইরেক্টর এবং চিত্রজগতের অন্যান্য ভি. আই. পি-দের সে সহকর্মী মনে করতো) ফটো টাঙানো। কয়েকটি হাতে আঁকা ছবিও ছিল।

সহসা এ সবই তার কাছে বিস্বাদ লাগছে। এই আতংকিত মুহূর্তেই সে ইন্দিরার বাহুর বাঁধনে ধরা দিতে চায়। যত শীঘ্র তার স্বপনপুরীতে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই তার লক্ষ্য।

তপনমোহনের মনে কেমন একটা ভার এসে জমেছে। সে ভার ঠিক ইন্দিরার জন্য যত নয়, তার ঐশ্বর্যের মোহটাই তাকে যেন বেশী করে আকৃষ্ট করেছে। এদিকে আবার তাকে ভালোবাসে কথাটাও ভুলতে পারেনা। ইন্দিরা সম্বন্ধে তার এতখানি দুর্বলতা তার সম্পদের লোভে, হয়ত তাই। এখন ইন্দিরাকে দেখলেই তাকে বুকে রাখার কল্পনা তার মনে জাগে। ইন্দিরা তাকে বুকে তুলে নিয়েছে,—তার ব্যবহারে একটা স্নেহ ও সান্ত্বনার ভঙ্গী। জীবনে এই সর্বপ্রথম হিসাব নিকাশে বসে তপন ভাবে, এতদিন এই সুযোগ কেন সে গ্রহণ করে নি। কারো কারো চরিত্রে কেমন দ্বিধা আর সংশয় থাকে, কিন্তু এইবার আর ভুল করবেনা সে। ইন্দিরা যদি তার পাশে থাকে তাহলে পৃথিবীরও পরিবর্তন ঘটবে, তার উৎসাহ ও প্রেরণায় এইবার সে জগৎটাকে দেখে নেবে। এইবার তার সাহিত্য-সৃষ্টির সার্থক প্রয়াসে সকলে বিস্মিত হবে।

শীতের অপরাহ্ন। হঠাৎ সমুদ্রে কোথায় বিক্ষোভ ঘটেছে। তার ফলে

আকাশে মেঘ জমেছে, কনকনে হাওয়া বইছে, মাঝে মাঝে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ইন্দিরার ড্রইং রুমের উষ্ণ পরিবেশে তপনমোহন যেন সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। ইন্দিরার সব কিছুই কেমন পরিপাটি। দেওয়ালের ছবি থেকে জানালার পর্দা সবই নিখুঁত পারিপাট্যে পরিপূর্ণ। ঘরে ঢুকেই তপনমোহন লক্ষ্য করল পূবদিকের সোফাটায় সেই সাদা বেড়ালটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। ইন্দিরার নেপালী চাকর বাহাদুর এসে জানিয়ে গেল মেমসাহেব আসছেন। ঝুম্‌কি আর তপনমোহন নিঃশব্দে বসে আছে।

হাতের কাছে একখণ্ড সেদিনের সংবাদপত্র। তপনমোহন মনে মনে সাংবাদিকদের সাধুবাদ জানায়। কত বুদ্ধিমান ওরা, প্রতিদিন কেমন নতুন কথা লেখে,—বড় বড় লোকের মনের কথা টেনে বার করে, কঠিন প্রশ্নবানে আইসেনহাওয়ার থেকে আসাদুল্লা সবাইকে কাবু করে। বিশ্ব রাজনীতির ঘোরালো দাবাখেলার কথা ভাবে তপন, বোঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ওর হৃদয়-সমুদ্র এমনই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে যে নিজের কথা ভিন্ন আর কিছুই সে ভাবছেনা।

আজই আর কিছুক্ষণ পরে ইন্দিরার সঙ্গে কথাটা পাকা করে নেবে, এবং আজ এই ঘর ছাড়ার আগে ওরা বিবাহিত নর-নারী হিসাবেই পরস্পরকে গ্রহণ করবে। ইন্দিরা যে তাকে গ্রহণ করবে এ বিষয়ে তপনের মনে এতটুকু সংশয় নেই।···কিন্তু শুধু কি তাই!

চারিদিকে তাকিয়ে কেমন অস্বস্তি বোধ করে তপন, সবিস্ময়ে আবিষ্কার করে এই ঘরটিতে সে আর ঝুম্‌কি।

ঝুম্‌কি এতক্ষণ পরমানন্দে শুয়ে ছিল, এইবার নিচে নেমে সামনের থাবা দিয়ে কার্পেটটা টানছে। আওয়াজটা কেমন মধুর লাগছেনা।

ধরা গলায় তপন বলে ওঠে—এই, ওরকম করতে নেই। যেন কোনও সচেতন প্রাণীকেই সে বলছে।

ঝুম্‌কি অতি তাচ্ছিল্যভরে মুখ তুলে তপনমোহনের দিকে তাকায়। এই সর্বপ্রথম তপন লক্ষ্য করল ঝুম্‌কির চোখ দুটো কি জলজ্বলে। চোখে যেন দুটি টর্চলাইট জ্বলছে। তপনমোহন সেদিকে লক্ষ্য করতেই ঝুম্‌কি আবার চোখ বুজিয়ে ফেলে, যেন অন্ধকারেই সে আরো ভালো করে দেখছে। প্রকাণ্ড ঘরটির সব কিছু ছাপিয়ে এই পারসিক বেড়ালটি যেন সহসা বিরাটত্ব লাভ করেছে। সারা ঘরটায় ঝুম্‌কির গায়ের বিশ্রী গন্ধ।

অবশেষে ইন্দিরা এল। আগমন নয় আবির্ভাব। এতক্ষণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তপনমোহন।

কিছু পরেই তপনের জন্য কফি আর ইন্দিরার চা এল। তারপর কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব সংযত করে তপনমোহন কাঁপা গলায় বলল—ইন্দিরা, আজ একটা কথা বলবো। এই কথাটিই অনেকদিন ধরে বলবো মনে করেও বলে উঠতে পারি নি। আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ইন্দিরা মুখ তুলে এমন মহিমামণ্ডিত ভঙ্গীতে তপনের মুখের পানে তাকাল যে, তপনের মনে হল যেন শিশু তপন তার মার কাছে সার্কাস দেখতে যাওয়ার বায়না ধরেছে।

কিছুক্ষণ পরে ইন্দিরা মধুর গলায় বলল—ভালো কথা তপন, কিন্তু আমি ত' বুড়ি হয়ে গেলাম, আমাকে কি তুমি ভালোবাসতে পারবে?

—কি বলছ তুমি? বুড়ি? আশ্চর্য। তোমার কি কোনো বয়স আছে ইন্দিরা? তুমি সর্বকালের, অনেক বিচার করে তোমাকে ভালোবেসেছি এবং বিয়ে করতেও চাই।...এই কথা বলেই তপন নাটকীয় ভঙ্গীতে ইন্দিরার হাত দুটি চেপে ধরল। ইন্দিরা নীরব, বাধা দিল না।

তপন কিন্তু রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছে। সে বলে চলে—আমরা কেউ ছেলেমানুষ নই একথা ঠিক, আমার দেবার মত কিছুই নেই। আছে একমাত্র আমার ভালবাসা, নিষ্ঠা আর অকপট আগ্রহ। আমাকে তুমি নাও ইন্দিরা, আমি তোমার অযোগ্য হবনা হয়ত—(কথাগুলি বলার সময় তপনের মনে হল এ তার নিজের কথা নয়, কোনো মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা থেকে ধার করা)। ইন্দিরা তখনো হাত সরিয়ে নেয় নি বরং একটু বেশী করেই ধরেছে মনে হল।

ইন্দিরা হেসে বলল—জানো ত' আমার একবার বিয়ে হয়েছিল। পৃথিবীতে দু'রকমের বিধবা আছে, একদল বিবাহে বিশ্বাসী আর একদল মুক্তিকামী। সবই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে।

আরো কাছে এগিয়ে আসে তপনমোহন, বলে—বলো তোমার অভিজ্ঞতা।

—কি আর অভিজ্ঞতা! তুমি ত' ওঁকে জানতে। একমাত্র ওঁর বংশীধর নামটুকু ছাড়া আর কিছুই আমার অপছন্দ ছিলনা। তোমাকেও আমি পছন্দ করি তপন। হয়ত আমাদের বাকী জীবনটা ভালোই কাটতে পারে।

মাঝে মাঝে বড়ই একা লাগে, কেমন একটা নিদারুণ শূন্যতা,—ভালো বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের কথা—কিন্তু—

—কিন্তু কিসের? আগ্রহভরে প্রশ্ন করে তপন।

—এই জীবনেই আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। এ হয়ত ঠিক নয়, সম্পূর্ণ নয় কারো জীবনই ত' সম্পূর্ণ নয়। আমার এ জীবন আর যাই হোক নিরাপদ। আর তা ছাড়া ঠিক যে একা তা নই, আমার ঝুম্‌কি আছে—

—ঝুম্‌কি! তপনের কণ্ঠস্বরে ব্যঙ্গের আভাষ।

—তুমি জানোনা তপন, জানলে আশ্চর্য হবে, ঝুম্‌কি সাধারণ বেড়াল নয়।

তপনমোহনের সাহস অনেক বেড়ে গেছে, ইন্দিরাকে আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে সে বলে—কিন্তু একথা বলোনা তোমার ঝুম্‌কির জন্য আমাদের বিয়ে হবেনা। আর যাই হোক বেড়ালের চাইতে আমার সাহচর্য তোমার ভালই লাগবে। আমি তোমাকে ভালোবাসি, সে ভালোবাসা তুমি সারাজীবনেও পাও নি!

—জানি—মৃদু গলায় ইন্দিরা বলল। তপন লক্ষ্য করলো যেন আরো কাছে এগিয়ে এসেছে ইন্দিরা। ইন্দিরা আবেগ ভরে বলে ওঠে—তোমাকে জানি তপন, ভালো লাগে তোমাকে—

তপন বুঝলো এই সেই স্বর্ণ মুহূর্ত। বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুম্বনে অভিষিক্ত করলো ইন্দিরাকে। তবু নিস্পন্দ ইন্দিরা, নিজেকে মুক্ত করার এতটুকু চেষ্টা নেই। ইন্দিরা তপনের লম্বা চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, যেন দুরন্ত শিশুকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। যেন তপন এসে তাকে এই মাত্র সংবাদ দিয়েছে যে, স্কুলের পরীক্ষায় সে প্রথম হয়েছে।

তপন কি চায়! স্নেহ আর ভালোবাসা দুই। কি প্রয়োজন প্রচণ্ড কামনাবেগের। ইন্দিরা হয়ত একটু শীতলা, তবু সেই পাষাণেই ত' প্রাণ সঞ্চার করতে হবে। পাগলের মত চোখে মুখে চুমার চিহ্ন এঁকে দিয়ে তপন বলে—কথা দাও ইন্দিরা, আমাকে বিয়ে করবে কথা দাও। আমি তোমাকে সুখী করবো, আমি তোমাকে ছেড়ে আর থাকতে পারিনা।

শেষের কথাগুলি কিন্তু আটকে গেল, প্রচণ্ড একটা কাশির আবেগ এল। গলায় যেন অনেক কি আটকে আছে। পেয়ালা থেকে ঠাণ্ডা কফির তলানিটুকু চুমুক দিয়ে খেয়ে তপন বলে—কি বিশ্রী কাশি এবং কি বেরসিক!

গলায় কি যেন আটকেছে।……আবার আবেদন জানায় তপন—ইন্দিরা আমাকে তুমি কথা দাও। তুমি আমাকে বাঁচাও।

ইন্দিরার কোলের ওপর মুখ রেখে প্রায় কান্নার ভঙ্গীতে কথাগুলি উচ্চারণ করল তপন। থিয়েটারে যেমন সবাই করে থাকে। আশা করেছিল ইন্দিরা এইবার সাড়া দেবে। একবার মনে হলো ইন্দিরা যেন আত্মসমর্পণ করবে, কিন্তু তখনই সচেতন হয়ে সরে বসলো ইন্দিরা। বলল—একটু সময় দাও তপন, আমি একটু ভাবি। দু একটা দিন সময় চাই। তপনের মুখের দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে এতক্ষণে তাকালো ইন্দিরা। আবার প্রশ্ন করে—বিধবা-বিবাহে কি তুমি বিশ্বাসী তপন? এদেশে কি বিধবা বিবাহ সফল হয়েছে? তা ছাড়া আমার বয়স হয়েছে, আমি অতি সাধারণ রমণী, এই পৃথিবীর অসংখ্য মধ্যবয়সী রমণীর অন্যতমা। ভয় হয় দুদিনেই তোমার মোহ কেটে যাবে, তখন অতি ভাল্ মনে হবে।

তখন প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো—তুমি 'ভাল্'! বলো কি! এই ক'দিনে একটি মুহূর্তও আমাদের ভাল্ মনে হয় নি। তুমিও তা জানো। আমাদের দুজনের মনের ভাবধারা এক রকম, রুচিও বিভিন্ন নয়, দুজনের একই বস্তুতে আকর্ষণ আছে। আমি তোমার মনের গহনে পাহারা দেব। তুমি বড়ো অসহায়, বড়ো একা—কথাগুলিতে আন্তরিকতার সুর স্পষ্ট।

এই সময় ইন্দিরার ঝুম্‌কি একবার আড়ামোড়া ভেঙে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিচিত্র দৃশ্য। উভয়েই তার এই নিঃশব্দ প্রস্থান লক্ষ্য করল। যেন ওদের কাউকেই সে দেখে নি এমনই রাজসিক ভঙ্গী। তবু তপনমোহনের মনে হয় ঝুম্‌কি তার দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে। তার গলা মুখ সব চেপে ধরেছে। তপনমোহন বুঝলো আর যাই হোক উপস্থিত যবনিকা পতন। এই দৃশ্য শেষ হল। সে উঠে দাঁড়ায়।

তপন বলে—আচ্ছা, ঐ কথাই রইল, দুদিন পরে কিন্তু পাকা কথা দিতে হবে। তখন যেন না বোলো না।…এই বলে তপন দীপ্ত ভঙ্গীতে বেরিয়ে গেল।

তিনদিন পরে অবশেষে ইন্দিরার সম্মতি পাওয়া গেল। তপনমোহনের জয় হল। ইন্দিরা হেসে বলল—শুধু আমার ঝুম্‌কির যা আপত্তি।

একটু সরে দাঁড়িয়ে তপন বলল—আবার সেই ঝুম্‌কি! তুমি সময়ে অসময়ে খালি ওর কথা তোলো।

—দেখ, আমার জীবনে ওর একটা স্থান হয়ে গেছে। ছোট থেকে আছে, তাছাড়া ঝুম্‌কি আমার সাধারণ বেড়াল নয়। অনেক আশ্চর্য কাণ্ড ও করেছে। মনোহরদাসের কি হয়েছিল শোনো নি?—ইন্দিরার কণ্ঠে কুণ্ঠিত ভঙ্গী।

তপনমোহন বড় অস্বস্তি বোধ করছে। সারা অঙ্গ যেন তার ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সে শুধু বলল—কোন মনোহরদাস? হিন্দুস্থান সিনেটোনের?

—না, মনোহরদাস সানরাইজ প্রোডাক্টসের। এমন কিছু নয়। ভদ্রলোকের পেটে দু'এক পাত্র পড়লে আর জ্ঞান থাকেনা। একদিন একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিল। পরের দিন চিঠি পেলাম, প্লেনে উঠে সোজা কলকাতায় পাড়ি দিয়েছে। আগের রাতে নাকি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছে। আমি ওকে আর কখনো দেখি নি। কিন্তু বেশ বুঝেছি এর ভেতর ঝুম্‌কির কিছু হাত আছে।

ইন্দিরার মুখটি দুটি হাতের মধ্যে ধরে তপন বলে—শোনো ইন্দিরা, বেড়ালটাকে মাথায় তোলার প্রয়োজন নেই। তুমি ওর কথা অত ভেবনা। আমাদের বিয়ের পর সব ঠিক হয়ে যাবে।

ইন্দিরা কথা না বলে মাথা নাড়ে। তারপর বলে—সে ত' বটেই, কিন্তু মুশকিল হয়েছে বেড়ালটা আমাকে ভারি ভালবাসে। একবার রণজিৎ কাপুরের মুখে নখের দাগ বসিয়ে দিয়েছিল।

তপনমোহনের সারা অঙ্গে শীতল হিমবাহ প্রবাহিত। সে বলে ওঠে—ননসেন্স। বিয়ের পর আমাদের জীবনে ঝুম্‌কির প্রবেশ নিষেধ। নাহয় ক্লোরোফর্ম করবো।

তপনের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকালো ইন্দিরা। তারপর অতি ধীর গলায় বলল—পারবে কি? ও বড় শক্ত প্রাণী। ইচ্ছে করলে ও সব পারে।

সেদিন ইন্দিরার বাড়ি থেকে তেমনি খুশী মনে উঠতে পারলো না তপনমোহন। কি যেন একটা বোঝা বুকের ওপর। কোথায় আনন্দে তার প্রাণ আজ নৃত্য করবে তা নয়, যেন মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে। ইন্দিরার টাকা উপলক্ষ্য হলেও ইন্দিরাকে তপনের ভালো লাগে। ভালো না বাসলেও ভালোলাগার দাম কি কম! সহচরী হিসাবে আদর্শ, আর আর্থিক নিরাপত্তার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক।

কয়েকদিন পরে বাড়ি ঢুকতেই তপনের মনে হল যেন তার দোর গোড়ায় ঝুমকি শুয়ে আছে। ভালো করে আবার দেখলো তপন, না কিছু নেই, কোথাও কিছু নেই। মনে মনে ভাবে—আশ্চর্য। যতো সব অসম্ভব আজগুবি কাণ্ড! বেড়ালটা আমাকে নার্ভাস করে তুলেছে। কোথাও কেউ নেই, আমি কিনা বেড়াল দেখছি। সর্বনেশে বেড়াল বটে।

স্নানটান সেরে আপন মনে সন্ত শেখা গানের দু'এক লাইন গুন্ গুন্ করে গাইছে আর তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছছে, স্পষ্ট দেখলো ঝুম্‌কিটা শোয়ার ঘরে ঢুকছে। কোথায় মেরিন ড্রাইভ আর কোথায় মালাদ,—আশ্চর্য বেড়াল ত'!

শোবার ঘরের চারদিক দেখলো, কোথাও বেড়াল নেই। সেই রাতে দুঃস্বপ্ন দেখলো তপন। কে যেন তাকে সাবধান করছে, (সকালবেলা লোকটার নাম বা চেহারা কিছুতেই আর মনে এলোনা) পৃথিবী এবং স্বর্গের মধ্যে ত্রিশঙ্কুর মতো বিরলম্ব অবস্থায় ঝুলছে তপন। সে প্রশ্ন করল, সাবধান হব কেন? সেই স্বর্গীয় দূত বা দানব তাকে বলল—বৎস! এ বিবাহে তোমার নিরাপত্তা নেই।

এর কয়েকদিন পরে ইন্দিরার মোটরে তারই পাশে বসে তপন ধরা গলায় বলল—জানো ক'দিন কি যেন হয়েছে আমার, ভালো করে খেতে পারিনা, ভালো ঘুম হয় না।

ওর হাতের ওপর হাত রেখে মধুর কণ্ঠে ইন্দিরা বলে—কেন বলো ত'?

—কি জানি, সর্বদাই তোমার ঝুম্‌কি আমার চোখের সামনে ভাসছে। সত্যি দেখি কিনা জানিনা, মনে হয় যেন আমার ঘরেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ওর হাতটা চেপে ধরে ইন্দিরা বলে—ঝুম্‌কিটা ক'দিন যেন কেমন হয়ে আছে। আমারই ভয় করে যেন আমি কিছু একটা অন্যায় করছি। তপন তুমি মন খারাপ কোরোনা। আচ্ছা সত্যি আমাকে ভালোবাসো তুমি?

—ভালোবাসি? তার মানে? এ কথা বলছ কেন?

—আমাকে যদি ভালোবাসো তাহলে কোনো ভয় নেই, অন্য কোন কারণে যদি বিয়ে করো তাহলেই ঝুম্‌কিকে ভয়। বেড়ালটা সাধারণ বেড়াল নয়। ওর একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। তুমি বলছো ওকে দেখেছ, আমিও একবার ওকে দেখেছি। ক'বছর আগে লোনাভালায় সপ্তাহখানেক ছিলাম, ওকে এখানেই রেখেছিলাম, বাহাদুর দেখাশোনা করতো। কিন্তু প্রতিদিন

সন্ধ্যায় ওকে আমি সোনাঝালায় দেখতাম। তুমি হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু—এই সর্বপ্রথম তপন একটু বিরক্ত হল! সে অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠে —ছিঃ ইন্দিরা! এ একেবারে গাঁজাখুরি কথা! রিডিকুলাস্।

গাড়িটা একজায়গায় থামিয়ে ওরা নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চৌপাটিতে বেড়াল। কেউ আর কোনও কথা বললো না।

এরই দুদিন পরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তপনের! শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে, কম্বলের তলায় সে ঘামছে, বুক টিপ টিপ করছে—সেই অবস্থায় সে স্পষ্ট শুনলো—এই বিয়ে হয় না তপন! এখনও সময় আছে। বিপদে পড়বে।

পরদিন থেকে শয্যাশায়ী হল তপন। ডাক্তার এলেন, ভালো করে পরীক্ষা করে বললেন—কিছুই হয় নি। তবে হার্টটা একটু দুর্বল। সাবধানে থাকবেন। বন্ধুরা লক্ষ্য করলে, তপন কেমন ম্লান হয়ে গেছে, যেন অনেকদিন রোগভোগ করে উঠেছে। রক্তহীন পাংশু মুখ। সন্ধ্যার পর ইন্দিরার কাছে ছুটলো তপন। ইন্দিরা তার অবস্থা দেখে ব্যথা পায়। তার প্রকৃতিটা বাৎসল্য রসে ভরা, তপনের এই শারীরিক ক্লেশে ওদের ভালোবাসা যেন আরো গভীর হয়ে ওঠে। ওপাশের সোফায় ঝুমকি শান্ত হয়ে শুয়ে আছে, কারো দিকে তার লক্ষ্য নেই।

সেই রাতেও শরীরটা আরো খারাপ মনে হল। বোধহয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হবে, মাথার যন্ত্রণাও আছে। গোটা কয় এ্যাসপিরিনের বড়ি খেয়ে চুপ করে শুয়ে পড়লো তপন। ভালো ঘুম হলে শরীরটা সুস্থ হবে।

সহসা ঘুম ভেঙে গেল তপনের। দুঃস্বপ্ন নয়, কেমন একটা নিদারুণ অস্বস্তি। বুকের ওপর কিসের চাপ পড়ছে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। বেড্‌সুইচ টিপে ঘড়ি দেখলো প্রায় তিনটে বাজে। সহসা নজরে পড়লো দেয়ালের ধারে ঝুমকিটা ওর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এইবার কিন্তু ওর দিকে চোখ পড়তেই পালালো না,—সোজা চেয়ে আছে। ভয় পেল তপন। সামনে বোধহয় সুন্দরবনের বাঘ দেখলেও এত ভয় হত না তার। ঝুম্‌কি ক্রমশঃই বড় হচ্ছে, ফুলে ফুলে উঠছে, নিজের নির্বোধ নিষ্ক্রিয়তায় লজ্জা পায় তপন। এখনই উঠে অন্য ঘরে চলে যাওয়া উচিত।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল তপন। কম্বলটা হাতেই ধরা রইল, মেঝেতে

একটি পা দিয়ে নামছে, ওদিকে চোখ রেখেছে ঝুম্‌কির ওপর। ঝুম্‌কি সোজা ওর দিকে এগিয়ে এল, বাঘের ভঙ্গীতেই থাবা তুলে এগিয়ে আসছে।

চীৎকার করলো তপন—বেরো! দূর! দূর হ—

কিন্তু ঝুম্‌কি অনেক এগিয়ে এসেছে, বিছানার ওপর পড়ে গেল তপন। ঘর থেকে পালাবার পথও যেন বন্ধ। চতুর্দিকে কেমন একটা দুর্গন্ধ, নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।…এক লাফে ঝুম্‌কি উঠে এসে ওর বুকে উঠে এসেছে। তপনের গালে তার ধারালো থাবা বসেছে, তার আর কথা বলার শক্তি নেই, চতুর্দিক যেন অন্ধকার হয়ে গেছে—

খবরটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। যথাসময়ে ইন্দিরার কানেও খবর পৌছল। তপনের ওপর গভীর মমতা ছিল ইন্দিরার। ছেলেটিকে তার ভালোই লেগেছিল। তবু কেমন একটা স্বস্তিও অনুভব করলো সেই সঙ্গে, এতদিন সে মুক্ত ছিল, সেই অবাধ মুক্তি দিয়ে গেল তপন। আবার সে স্বাধীন। বেচারী তপন! গত ক'দিনের উত্তেজনাময় দিনগুলি অবিস্মরণীয় হয়ে রইল। খবরের কাগজে সংবাদটা পড়ার সময় কান্নায় ভেঙে পড়ল ইন্দিরা। সন্ধ্যার টেলিগ্রামে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তপনের বন্ধুরা রিপোর্টারকে জানিয়েছেন, তপনের গালে কিসের যেন আঁচড়ের চিহ্ন ছিল।

আঁচলে চোখ মুছলো ইন্দিরা

বাহাদুর দুধ হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে। এই সময়টা ঝুম্‌কিকে স্বহস্তে দুধ খাওয়ানো ইন্দিরার নিত্যকর্ম! ইন্দিরা ধরা গলায় ডাকলো—আয় ঝুম্‌কি! দুধটা খেয়ে নে—

মন্দাক্রান্তা চালে উঠে এসে দুধের পাত্রে জিভটা রাখলো ঝুম্‌কি।

রক্তমুখী নীলা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

১

নিশীথ রাতের আগন্তুক

না—ঘুম আজ আর আসবে না।

হাত বাড়িয়ে বেড সুইচটা টিপে, শিয়রের কাছে ত্রিপায়ে রক্ষিত টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দিলাম।

মৃদু নীলাভ আলোয় ঘরটা স্বপ্নাতুর হয়ে উঠল মুহূর্তে যেন।

নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ রাত্রি।

কার্তিকের শেষ, কিন্তু ইতিমধ্যেই কলকাতা সহরে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে। পায়ের দিকের খোলা জানালাটা দিয়ে ঝিরঝির করে রাতের হাওয়া এসে ঢুকছে। রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে হিম ঝরছে তারই আভাস মধ্যরাতের ঠাণ্ডা হাওয়ায়।

অন্ধকারে আকাশের কোলে শূন্যে স্থির হয়ে আসে ইতস্তত কয়েকটি আকাশ-প্রদীপের আলো। দূরে আরও দূরে বিক্ষিপ্ত তারকার দল নৈশরাত্রির শিয়রে জাগে।

ভিতরে আসতে পারি?

হঠাৎ একটা মোটা গলার স্বর শোনা গেল।

চমকে উঠলাম, এত রাত্রে আবার কে ঘরের মধ্যে আসতে চায়। রক্তলোভী কোন নিশাচর নয় তো? রক্তের লোভে এসে হাজির হয়েছে।

বললাম, কে?

দরজাটা বন্ধই ছিল, এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে একটু।

দরজাটা একটিবার খুলুন না?…

কে?—আবার প্রশ্ন করলাম।

চিনতে পারবেন না। আমি আপনার পরিচিত তো নই। দয়া করে একবার দরজাটা যদি খোলেন।

দরজাটা খুলতেই যেন এক ঝলক ঝড়ো হাওয়ার সবই, আমাকে এক-

প্রকার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে আগন্তুক আমার শয়নঘরে এসে প্রবেশ করলেন।

চমকে সরে দাঁড়িয়ে আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম। আগন্তুক ততক্ষণে অনাহুতই ঘরের একটি সোফা অধিকার করে বসে পড়েছেন। তাঁর মাথায় একটা ফেল্টের ক্যাপ, পরিধানে মভ্ কালারের দামী স্যুট।

মুখখানি নিখুঁত ভাবে কামানো।

চোখে কালো কাঁচের সেলুলয়েডের ফ্রেমে আঁটা চশমা।

কে আপনি ?

ভয় পবেন না—বসুন। আমি চোর, ডাকাত বা খুনী নই।

আগন্তুকের সামনে বসে আমি আর একখানা সোফা অধিকার করে বসলাম।

আগন্তুকের দিকে তাকালাম। মুখখানা হাড় বের করা, রুক্ষ কঠিন। চোয়ালের দু' পাশের হাড়-দুটো 'ব' এর আকারে বিশ্রীভাবে, সামনের দিকে উঁচু—সজাগ হয়ে উঠেছে। কপালের দুপাশে শিরাগুলো দড়ির মত জেগে আছে। চোখের দৃষ্টি যেন ধারাল ইস্পাতের ফলার মত ঝক্‌ঝক্ করছে।

বলুন তো কে আপনি ? কি চান ? আবার প্রশ্ন করি।

আপনিই তো সুব্রত রায়—কিরীটি রায়ের সহকারী ও বন্ধু ?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি ?

ব্যস্ত হবেন না, বলছি। আমারও পরিচয় একটা আছে বৈকি !···এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারেন ? অনেকটা পথ তাড়াতাড়ি এসে বড্ড পিপাসা পেয়েছে।

ভোলা ! ভোলা !—চীৎকার করে ভৃত্যকে ডাকলাম।

ভোলা আপনার চাকর বুঝি ? বোধহয় সে বাড়িতে নেই। বাড়িতে ঢুকবার সময় দেখলাম সদর-দরজাটা শুধু ভেজানো রয়েছে। প্রথমে কড়া নাড়লাম, কিন্তু কোন সাড়া পেলাম না। সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। সামনেই সিঁড়ি দেখে সোজা উপরে ওঠে এসেছি। ওদিককার জানালা দিয়ে আলো জ্বলতে দেখে বুঝেছিলাম এ ঘরে কেউ নিশ্চয়ই আছেন। তবে জেগে আছেন ভাবি নি ! বড্ড পিপাসা পেয়েছে যদি আমাকে এক গ্লাস জল···

ভদ্রলোক কথাগুলো একটানা বলতে বলতে থেমে গেলেন।

আমি সোফা হতে উঠে গিয়ে সোরাই থেকে কাঁচের গ্লাসে করে জল এনে ভদ্রলোকের সামনে ধরে বললাম, এই নিন।

জলের গ্লাসটা আমার হাত থেকে নিয়ে এক চুমুকে গ্লাসটা শূন্য করে পাশের ত্রিপয়ের ওপর রাখতে রাখতে আগন্তুক বললে, ধন্যবাদ।

তারপর একটু থেমে বললেন, এত রাত্রে হঠাৎ এমনি করে বলা নেই, কওয়া নেই আমাকে ঘরে ঢুকতে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেছেন নিশ্চয়ই সুব্রতবাবু? অবশ্য তা হবারই কথা! বলতে বলতে ভদ্রলোক যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে চোখের পাতাদুটি বোজালেন।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম।

চোখ দুটি তখন আর দেখবার উপায় নেই, কেননা নিমীলিত আঁখিপল্লবের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। টেবিল ল্যাম্পের আলোর খানিকটা রশ্মি তির্যক ভঙ্গীতে আগন্তুকের ডানদিকের কপালে ও গালের খানিকটা আলোকিত করে তুলেছে। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপচাপ আবার বসে রইলেন, তারপর আবার একসময় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রাত্রির স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললেন, সুব্রতবাবু! আপনি হয়ত আমার পরিচয় পাবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছেন। আমার নাম শৈলেশ্বর সেন।... কোন একটা বিশেষ কারণে নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন বোধ করে এত রাত্রে আমাকে আপনার কাছে গোপনে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আসতে একপ্রকার বাধ্য হতে হয়েছে। দাঁড়ান একমিনিট,—বলতে বলতে শৈলেশ্বরবাবু সোফা থেকে উঠে পড়লেন এবং আমার শয়নঘরে ভেজানো দরজাটা বন্ধ করে এলেন। শৈলেশ্বর বললেন, আসবার সময়ই নিচের সদর দরজাটা খিল তুলে বন্ধ করে দিয়ে এসেছি। বলতে বলতে ভদ্রলোক আবার চোখ তুলে চশমার কাঁচের ভিতর দিয়েই আমার দিকে যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

বাড়িতে আর কেউ নেই বুঝি?

সনৎ ও রাজু ওরা দুজনে মাকে নিয়ে কিরীটির সঙ্গে শিলং গেছে বেড়াতে। এখানে আমি একাই। ভোলা চাকর আর রামঠাকুর সম্বল। দারোয়ানটি পর্যন্ত ভাগলবা......

তা হলে বাড়ি দেখছি খালি।—আগন্তুক ভদ্রলোক বললেন।

তা যা বলেন!—হাসতে হাসতে জবাব দিলাম।

শুনুন সুব্রতবাবু, আমি কেন এত রাতে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।

তা হলে খুলেই বলি। এই যে দেখছেন আমার ডানহাতের অনামিকায় একটি সোনার আংটি—এই বলে ভদ্রলোক ডান হাতখানি আমার সম্মুখে প্রসারিত করে ধরলেন।

আমি চেয়ে দেখলাম ভদ্রলোকের ডান হাতের অনামিকায় একটি সাপ আংটি; আংটির সাপের মাথায় মটরের আকৃতির একখানি নীলা পাথর বসানো। আংটির পাথরটা বুঝি নীলা? আমিই শৈলেশ্বরবাবুকে প্রশ্ন করলাম।

হ্যাঁ রক্তমুখী নীলা ছিল! ভদ্রলোক মৃদুস্বরে জবাব দিলেন।

ছিল মানে; এখনও তো মনে হচ্ছে নীলাই।

না, এটা নীলা নয়—সামান্য একটা নীল রংয়ের কাচ মাত্র।

নীল রংয়ের কাচ! তবে কি সত্যি ওটা নীলা নয়? এই বলে আমি বিস্মিতভাবে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম।

শৈলেশ্বরবাবু ঘাড় দোলালেন: না।

তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মৃদুস্বরে বললেন, সুব্রতবাবু। আপনাকে এত রাতে অন্যায় ভাবে বিরক্ত করতে আসবার কারণ আমার আংটির রক্তমুখী নীলাটি হারিয়ে গিয়েছে তাই। যেমন করে যে উপায়েই হোক আপনাকে নীলাটি আমার উদ্ধার করে দিতেই হবে।

বলতে বলতে সহসা ভদ্রলোক ঝুঁকে পড়ে তাঁর দু'হাত দিয়ে আমার ডান হাতটা চেপে ধরে বললেন, সুব্রতবাবু, লক্ষ লক্ষ টাকার লোহার কারবার আমার। ব্যাঙ্কেও আমার বহু টাকা সঞ্চিত আছে। নীলাটির বিনিময়ে আমি সব দিতে রাজি আছি। আপনি আমার নীলাটি শুধু যে করেই হোক উদ্ধার করে দিন। আমি আপনার ক্রীতদাস হয়ে থাকব।

উত্তেজনায় শৈলেশ্বরবাবুর কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

আমি আমার হাতের উপর রক্ষিত শৈলেশ্বরবাবুর হাতটির উপর মৃদু চাপ দিয়ে বললাম, ব্যস্ত হবেন না, শৈলেশ্বরবাবু। আমার কথা বিশ্বাস করুন। নীলা যদি সত্যি কেউ চুরি করে থাকে আমার যথাযোগ্য চেষ্টা করব সেটা উদ্ধার করে দিতে।...আর আমার বন্ধু কিরীটিকে তো জানেন। আমি যদি না পারি, তাকে আমি ভার করে দেব। সে এলে আপনার নীলা ফিরে পাবেনই।

আঃ। আমাকে বাঁচালেন সুব্রতবাবু।

ভদ্রলোক একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু ব্যাপারটা আমাকে সব এবারে খুলে বলুন তো শৈলেশ্বরবাবু। কোন কথা গোপন করবেন না। জানবেন কোন কথা গোপন করলে আমার অনুসন্ধানের ব্যাঘাত ঘটবে। আর তাছাড়া আমার ও আপনার মধ্যে যদি একটা ভাল রকম বোঝাপড়া না থাকে তবে আমার পক্ষে কারো হয়ে কাজ করাও সম্ভব হবে না; একথা আপনাকে আগে থেকেই কিন্তু জানিয়ে রাখছি।

নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই। সে কথা একশবার।

॥ ২ ॥

রক্তমুখী নীলার ইতিহাস

শৈলেশ্বরবাবু বলতে লাগলেন,—

সুব্রতবাবু। নীলাটার একটা ছোট্ট ইতিহাস আছে। আমার বয়স বর্তমানে ছাপান্ন বছর। বছর পনের আগে আমার বয়স যখন একচল্লিশ বছর, তখন আগ্রায় একটা নিলামে এক বিখ্যাত পার্শী মার্চেন্টের অন্যান্য জিনিস-পত্রের সঙ্গে হৃত সেই রক্তমুখী নীলাটা আমি কিনেছিলাম। নীলাটা এই সাপ আংটির মাথাতেই বসানো ছিল।

সেই পার্শী মার্চেন্টের ছিল প্রকাণ্ড পাবলিশিং বিজনেস। সেই রক্তমুখী নীলার আংটিটা পরবার পর থেকেই তাঁর ব্যবসায়ে হু-হু করে লাভ হতে লাগল। এমন সময় হঠাৎ একদিন সকালে সেই পার্শী মার্চেন্টকে তাঁর ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল। ভদ্রলোক নিজের রিভলবার দিয়ে গুলী করে আত্মহত্যা করেছেন। ভদ্রলোকের সংসারে আপনার বলতে আর কেউ ছিল না। থাকবার মধ্যে ছিল এক দূর সম্পর্কীয় ভাগ্নে। ঐ আকস্মিক দুর্ঘটনার সংবাদ নিয়ে এদিকে ভাগ্নের কাছে 'তার' গেল। ওই দুর্ঘটনার দিন তিনেক পরে শোনা গেল, সেই পার্শী মার্চেন্টের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এক লক্ষপতি সুদখোরের কাছে বাঁধা আছে। উনি নাকি নূতন কি একটা ইনভেস্টমেন্টে টাকা ঢালতে গিয়ে মৃত্যুর আগে সাতদিনের মধ্যেই যথাসর্বস্ব খুইয়েছিলেন।

মার্চেন্টের সব সম্পত্তি নিলামে উঠল। আমি তখন আগ্রায় আমার এক বন্ধুর বাসায় পুজোর ছুটি কাটাচ্ছি। বন্ধুর মুখে নিলামের কথা শুনে সেখানে

গেলাম। কেননা খুব ছোটবেলা থেকেই নিলামে জিনিসপত্র কেনা আমার একটা নেশা ছিল। সেখানে গিয়ে অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে নীলার আংটিটিও দেখলাম। চমৎকার আংটিটি।

শুনলাম নীলার আংটিটার একটা ইতিহাস আছে। আংটিটি ছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব মীরকাশেম আলীর। একদিন রাত্রে নবাব যখন ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন, তখন কোন গুপ্তচর তার আঙ্গুল হতে আংটিটি চুরি করে নিয়ে যায়। এবং তারই কিছুকাল পরে উদয় নালা দুর্গের পতন হল ও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শেষ আশার প্রদীপটুকুও নিভে গেল। তারপর বহু হাত ও বহু উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘুরে আংটিটা এক পাঠান দস্যুর হাতে পড়ে। দস্যুটি ধরা পড়ার পর গভর্নমেণ্টের হাতে আংটিটা যায় এবং সেখান হতে পার্শী মার্চেণ্টটি একুশ শ' টাকায় আংটিটি কিনে নেন। একটা সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত রূপার ডিসে আংটিটি রক্ষিত ছিল। সোনার একটা সাপ-আংটি। একটি সাপ একটি সরু সোনার তারের মত, তারই মাথায় সুবৃহৎ মটর দানার মত একটি রক্তমুখী নীলা বসানো। নীল স্ফটিকের মধ্যে যেন একটি রক্তদ্যুতি। নীলাভ এক ফোঁটা জমাট রক্ত যেন। আশ্চর্য সুন্দর।

অন্ধকারে আংটির পাথরটা সাপের চোখের মত জ্বলে ; সমস্ত দিন রাত্রে আলোর তারতম্যের জন্য পাথরের মধ্যেও রঙের রূপান্তর ঘটে।

বলা বাহুল্য আংটিটি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং তক্ষুনি মনে মনে স্থির করলাম, যত দামেই হোক আংটিটি আমি কিনব।

আমি ও আর একজন আমার চাইতে বয়সে কিছু বড় পার্শী ভদ্রলোকের মধ্যে দর কষাকষি চলতে লাগল নীলাটা নিয়ে। শেষটায় সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে আংটিটি আমি কিনে নিলাম এবং তখুনিই আঙুলে পরলাম আংটিটা।

আপনাকে বলব কি সুব্রতবাবু। আংটিটি আঙুলে পরবার সঙ্গে সঙ্গে সর্বশরীর আমার যেন সহসা রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ যেন আমার শরীরের সমগ্র স্নায়ুকোষকে তরঙ্গায়িত করে গেল—মাথাটার মধ্যে কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল।

বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা।

তাজের দিকে বেড়াতে গেছি; সঙ্গে আছে কলকাতা থেকে আগত জীবনকুমার সেন নামে আমাদের আর এক বন্ধু।

তাজের পাষাণচত্বরে আমরা তিনবন্ধু বসে আছি। এমন সময়ে অদূরবর্তী ধূসর সীমান্তের শীর্ষ ছুঁয়ে চাঁদ দেখা দিল। তাজের শ্বেতশুভ্র কঠিন পাষাণগাত্রে চাঁদের আলো যেন গলে পড়ছে।

তিনজনেই তন্ময় হয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করছি, সহসা আমার ডানহাতের ওপর কার যেন মৃদু স্পর্শ পেয়ে চমকে ফিরে তাকালাম।

এক অশীতিপর বৃদ্ধ পার্শী ভদ্রলোক। তাঁর পরিধানে সিল্কের চোগা চাপকান। মাথায় শুভ্র চুল; আবক্ষ-বিলম্বিত শুভ্র দাড়ি।

তিনিই হঠাৎ বেকায়দাভাবে চলতে গিয়ে আমার হাতের পরে পা দিয়ে ফেলেছেন অজান্তে।

ভদ্রলোক অনুতাপ মিশ্রিত ভাঙ্গা গলায় বললেন, মাফ কিজিয়ে। মুঝে আপকো নেহি···

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, না-না-না!···এতে আর কী?···তাছাড়া আমারও তো তেমন বিশেষ কিছু লাগে নি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সবিনয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে কুণ্ঠিতভাবে চলে গেলেন। আমরা আরও কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইলাম; তারপর আমরাও উঠে পড়লাম। বন্ধুর নিজের মটোরে করে তাজ দেখতে গিয়েছিলাম। তাজের গেটের বাইরে ড্রাইভার আমাদের জন্য গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। আমার অন্য দুই বন্ধু উঠে পড়েছেন। আমি গাড়ির ফুটবোর্ডে পা দিয়ে উঠতে যাব, এমন সময় রাত্রির জমাট স্তব্ধতা ভঙ্গ করে পিস্তলের গর্জন শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির সামনের কাঁচের খানিকটা ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় আমরা সকলেই ভটস্থ হয়ে উঠলাম।

আমার বন্ধু জীবনবাবু যেমন সাহসী তেমন গুণ্ডাধরণের। সে গাড়ির দরজা খুলে এক লাফ দিয়ে নেমে পড়ল এবং ডান দিককার সিঁড়ি ভেঙ্গে তাজ বাজারের যেখানে পাথর ও নানাবিধ সৌখিন জিনিসপত্র বিক্রী হয় সেদিক পানে ছুটল।

আমরা হতভম্ব হয়ে গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে রইলাম।

অল্পক্ষণ পরে জীবনকুমার ফিরে এল। এসে বলল, না কাউকেই দেখা গেল না। বেটা পালিয়েছে।

আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা ভাবতে ভাবতেই আমরা গাড়িতে চেপে রওনা হলাম বাড়ির দিকে।

তাজ গেট হতে বার হয়ে কংক্রিটের সরু রাস্তা বরাবর আগ্রা ফোর্ট স্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছে। রাস্তার দুপাশে নানারকমের গাছপালা মৃদু চন্দ্রালোকে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে যেন স্বপ্নের মত। মাঝে মাঝে হাওয়ার মৃদু মৃদু দোলায় পাতাগুলো সিপ্‌ সিপ্‌ শব্দ করে।

আমাদের গাড়ি ছুটে চলেছে। গাড়ির মধ্যে আমরা সকলেই চুপচাপ বসে আছি। কারও মুখে কোন কথা নেই। ঘটনাটা যেন আগাগোড়া রহস্যময়......

সেদিন গভীররাত্রে দোতলার ঘরে আমি আর জীবনকুমার পাশাপাশি শয়ন করেছি। সহসা একসময় একটা খসখস্‌ শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

ঘর অন্ধকার।

খোলা জানালা-পথে আকাশের দিকে তাকালাম। তারায় ভরা একটুকরো আকাশ, যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্নের একটুখানি ছোঁয়া।

চাঁদ বোধ হয় তখন আকাশের একপ্রান্তে হেলে পড়েছে।

আবার খস্‌ খস্‌ শব্দ। মনে হল কে বুঝি নিঃশব্দে পদসঞ্চারে ঘরের মধ্যে চলে বেড়াচ্ছে।

কে?—বলে উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।

নিশ্চয় কেউ ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে। কিন্তু কে? চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে শুয়ে শুয়েই মৃদু আলো-ছায়া-ভরা ঘরের চারপাশে তাকাতে লাগলাম।

একসময়ে চোখে পড়ল একটা লম্বা অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি নিঃশব্দ অন্ধকারে। দুলতে দুলতে যেন আমার শয্যার দিকে অতি সাবধানে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। আমি বুঝতে পারছি—অস্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে।

ছায়ামূর্তি নিঃশব্দে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

এতক্ষণে ভাল করে শিয়রের কাছে দণ্ডায়মান মূর্তির দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। একমুখ ভর্তি কালো কালো দাড়ি নিয়ে সেই মূর্তি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় তার চোখের মণি দুটো যেন ধক্‌ ধক্‌ করে জলছে। দু'খণ্ড অঙ্গারের মতই। কী ক্রুর, বীভৎস সেই দৃষ্টি। যেন

কুৎসিত ভয়ঙ্কর একটা বন্য লালসা সে দৃষ্টির মধ্যে লেলিহান হয়ে উঠেছে।

মূর্তির গায়ে একটা কালো রঙের চাদর। চাদরটা মাথার ওপরে ঘোমটার আকারে তুলে দেওয়া। ঘোমটা কপাল পর্যন্ত নেমে এসেছে, হাত দুটি বুকের ওপর ভাঁজ করে মূর্তি আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

ইচ্ছা হচ্ছিল চীৎকার করে বাড়ির সকলকে জাগিয়ে তুলি। কিন্তু কী সম্মোহন দৃষ্টি সে ক্ষুধিত চোখের তারায়—কণ্ঠের সমস্ত শক্তি আমার অবশ হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে এক সময় লোকটা তার চাদরের ভিতর হতে একটা দীর্ঘ হাত বের করে বিছানার একপাশে রক্ষিত আমার ডান হাতটা চেপে ধরতেই আমি ধড়মড় করে উঠে বসে চীৎকার করে উঠলাম, চোর চোর !···

বিদ্যুৎ গতিতে আমার ডানহাতের আঙুলে একটা যেন মোচড় দিয়েই মূর্তিটা খোলা জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার চীৎকার শুনে জীবন ততক্ষণে ধড়মড় করে শয্যার উপরে উঠে বসেছে। বাড়ির আর সকলেও জেগে উঠল।

আমার মুখে সব কথা শুনে সকলে মিলে খোঁজাখুঁজি করা হল, কিন্তু কাউকে দেখা গেল না।

মাটি থেকে দোতলার জানালা প্রায় আট-ন হাত উঁচু হবে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেখান দিয়ে লাফিয়ে পালানো একপ্রকার অসম্ভব।

বন্ধুরা বললে, ওই রক্তমুখী নীলাটা হাত থেকে খুলে ফেল। ওটাই হয়তো যত নষ্টের গোড়া।···ওটা আঙুলে পরা অবধি যত ব্যাপার ঘটছে।

আমি বললাম, তা হোক, ওটা আমি খুলব না আঙুল থেকে, যত বিপদই আমার আসুক,—শেষ পর্যন্ত মরতে হয় তাও স্বীকার !···

এই পর্যন্ত বলে ভদ্রলোক একটু থামলেন।

(৩)

॥ কিরীটি ॥

তারপর ?—আমি ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম।

তার পরের দিনই আগ্রা থেকে ফিরে এলাম। দীর্ঘ একবছর আমার কোন বিপদ-আপদ ছিল না। এদিকে ব্যবসায়েও আমার দিনের পর দিন

খুব বেশি উন্নতি হতে লাগল। এমন সময়ে বোম্বাইয়ে এক পার্শী মার্চেন্টের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। অমন চমৎকার ভদ্রলোক ব্যবসায়ীদের মধ্যে আমি ইতিপূর্বে দেখি নি। তিনি আমার নূতন হার্ডওয়্যার ব্যবসায়ের অংশীদার হলেন। বলা বাহুল্য, নূতন ব্যবসায়েও আমার প্রচুর লাভ হতে লাগল।

এমনি করে আরো বারোটি বছর কেটে গেল। কিন্তু হঠাৎ গত বছর থেকে দেখছি ব্যবসায়ে আমার অত্যন্ত ক্ষতি হচ্ছে। পর-পর হাজার হাজার টাকার তিন-চারটে ট্র্যানজাকশন একেবারে নষ্ট হয়ে গেল। একদিন দুপুর বেলা নিজের প্রাইভেট রুমে বসে বসে এইসব কথা ভাবছি, সহসা আমার আংটির কথাটা মনে পড়ে গেল। আংটিটার দিকে তাকালাম। কিন্তু আংটির পাথরটা যেন কেমন কেমন মনে হল। নীলাভ পাথরটার ভিতর থেকে যে একটা রক্তদ্যুতি ফুটে বের হয় সেটা তো কই দেখা যাচ্ছে না। চমকে উঠলাম এবং তক্ষুনি গাড়িতে চেপে বৌবাজারের এক জুয়েলারের দোকানে গেলাম।

জুয়েলার আমার যথেষ্ট পরিচিত। আংটির পাথরটা পরীক্ষা করে বললেন, ওটা আসলে নীলা পাথরই নয়, সামান্য একটা নীল রঙের কাঁচ মাত্র। আমার মাথা ঘুরে গেল। চারিদিক অন্ধকার দেখলাম।

বাড়িতে ফিরেই পুলিশে সংবাদ দিলাম। বাড়ির সব চাকর-বাকরদের নানাভাবে জেরা শুরু করে দিলাম। কিন্তু কোন সুবিধাই হল না।

আমার কিন্তু মন ভেঙে গেল। পাগলের মত দিবারাত্র পাথরটার কথাই চিন্তা করতে লাগলাম। এমন সময় সহসা একটা বেনামী চিঠি রেজিস্টারী ডাকে পেলাম। এই দেখুন সেই চিঠি!···

ভদ্রলোক জামার বুক পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা মলিন খাম বের করে দিলেন। চিঠিটা টেবিল ল্যাম্পের সামনে উঁচু করে ধরলাম। পরিষ্কার ইংরাজী টাইপে লেখা। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়—

প্রিয় শৈলেশ্বর,

তোমার আংটির নীলা হারায় নি। আটমাস আগে আমি সেটা চুরি করেছি তোমার আংটি সমেত।···তোমার হাতের আঙুলে যে আংটিটা আছে সেটা একটা মেকি পাথর বসানো অন্য আংটি। শুনলাম তুমি পুলিশের সাহায্য নিয়েছ। কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না। মিথ্যা সময়

ও অর্থের অপব্যয় হবে মাত্র। কারণ এ জীবনে আর তোমার সেটা ফিরে পাওয়ার কোন আশাই নেই জেনো। অতএব বুদ্ধিমানের মত কোন গোলযোগ না করে চুপচাপ থাকাই ভাল । চুপ করে যাও এবং কেস তুলে নাও।

ইতি,—

B. Y. X. IV. IV. I. তোমার 'R'.

আমি তিন চারবার আগাগোড়া চিঠিটা পড়ে শৈলেশ্বরবাবুর মুখের দিকে তাকালাম।

এখন বুঝতে পারছেন বোধ হয় কেন এত গোপনে এত রাত্রে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি।—শৈলেশ্বরবাবু বললেন।

আচ্ছা আট মাস আগে এমন কোন ঘটনা বা উপলক্ষ ঘটেছিল যে আপনি কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেছলেন ?

না, তেমন কিছু মনে পড়ছে না। তাছাড়া অনেক দিন আগের কথা।...

আটমাস আগে আপনি কোথায় ছিলেন ?

মীরাটে, ব্যবসা সংক্রান্ত একটা ট্রানজ্যাকশনের কাজে আমি ও আমার বন্ধুটি সেখানে মাসখানেক ছিলাম।

আপনার এই পার্শী বন্ধু লোক কেমন ?

আগেই তো আপনাকে বলেছি অমন অমায়িক, ভদ্র ও রুচিসম্পন্ন লোক বড় একটা আমার চোখেই পড়ে নি।

বয়স কত হবে বলে মনে হয় ?

তা পঞ্চাশ কি ষাট হবে বোধ করি।

পুলিস কি এখন আপনার কেস ইনভেসটিগেট করছে মিঃ সেন ?

না, এই চিঠি পাবার পরই কেসটা আমি উইথড্র করে নিয়েছি।

বেশ করেছেন। কিন্তু আজকের মত এই চিঠিটা আপনাকে আমার কাছে রেখে যেতে হবে। কাল সকালে হোক কিংবা রাত্রেই হোক সুবিধামত আমিই আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখা করব। আপনি বাসা থেকে কোথাও বেরোবেন না। তাছাড়া আপনার বাড়িতে তো ফোন আছে ?

আজ্ঞে আছে।

এবারে আপনি তাহলে বাড়ি যান। রাত্রি প্রায় শেষ হতে চলল।

· শৈলেশ্বরবাবুকে সদর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। ভোলার সন্ধান নিয়ে দেখি, বেটা বাড়ি ফিরে সদর দরজা বন্ধ দেখে রোয়াকে শুয়ে পড়েই দিব্যি নাক ডাকাচ্ছে।

ভোলাকে জাগিয়ে ঘরে ডেকে নিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে দিলাম এবং তারপর উপরে এসে শুয়ে পড়লাম।

* * * *

পরদিন দুপুরে অপ্রত্যাশিতভাবে কিরীটি শিলং থেকে ফিরে এল। আমি ঐ সময়ে বসে মিঃ শৈলেশ্বর সেনের রেজিস্টারী ডাকে পাওয়া চিঠির তলাকার সাঙ্কেতিক অক্ষরগুলো বুঝবার চেষ্টা করছিলাম।

ও হে মিলিয়নিয়ার!

চমকে মুখ তুললাম। দেখি খোলা দরজার সামনে দণ্ডায়মান কিরীটি।

কিরীটি!···আনন্দে আমার গলার স্বর বুজে এল।

হ্যাঁ, কিরীটিই! কিন্তু এত মনোযোগ দিয়ে কী পড়া হচ্ছিল শুনি?

একটা চিঠি।

কার চিঠি? কিরীটি হাসতে হাসতে এগিয়ে এল।

দেখ না!

চিঠিটা আমি কিরীটির দিকে এগিয়ে ধরলাম।

কিরীটি হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে গুনগুন করে পড়তে লাগল। তারপর সহসা চিঠির শেষে ঐ সাঙ্কেতিক লেখাগুলোর কাছে এসে থেমে গিয়ে পরক্ষণেই আবার বললে, হুঁ, তারিখ দেখছি 10. 4. 41. আজ হচ্ছে 20. 4. 41. দিন দশেক আগেকার চিঠি; কিন্তু B. Y. কথাটি কি। আর নীচের এই নামের বদলে 'R' অক্ষরটাই বা কী মীন করছে? নামের অক্ষর নয় তো? কি নাম রজত, রমেন, রমেশ?

আমি কিন্তু কিরীটিকে এবার বাধা দিয়ে বললাম, তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কিরীটি?

না। ট্রেন থেকে নেমে সোজা এখানে চলে এসেছি, বলতে বলতে কিরীটি আমার পাশেই একটা খালি সোফায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়ল।

রাজু ওরা আসে নি?

না, তাদের শৈলাবাসের আকাঙ্ক্ষা এখনো মেটে নি। কী আর করি।

হাত-পা গুটিয়ে অমন দিন-রাত্রি চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে কেমন যেন জমাট বেঁধে যাবার যোগাড় হয়ে উঠেছিল। কাজেকাজেই আমি আর থাকতে পারলাম না। জংলীকে নিয়ে সোজা চলে এলাম। জংলীকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বরাবর তোমার এখানেই চলে আসছি এখান থেকে স্নানপর্ব সেরে তবে গৃহে গমন। ইতিমধ্যে হীরা সিং গাড়ি নিয়ে আসবে।...

আর দেরী করো না তবে, স্নানের ঘরে যাও। আমি ততক্ষণ ভোলাকে দিয়ে কাপড় আর টাওয়েল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কিরীটি স্নান ঘরের দিকে চলে গেল।

(৪)

মুখোমুখি

বিকালের দিকে কিরীটি আমাদের বাড়িতে এল।

ভোলা গরম গরম চা ও টোস্ট দিয়ে গেছে। চা খেতে খেতে কিরীটিকে গত রাত্রির ঘটনা আনুপূর্বিক সব খুলে বললাম।

সমস্ত ঘটনা শোনবার পর কিরীটি একটা সিগারে অগ্নিসংযোগ করতে করতে বলল, মাস্টার, তোমার সকালের সেই চিঠির রহস্য আমার কাছে এতক্ষণে খোলসা হয়ে গেল—কথা কয়টি বলে কিরীটি একগাল পীতাভ ধোঁয়া মুখ থেকে উদ্গীরণ করলে।

কী, অর্থ কী? আমি উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলাম।

জলের মত সোজা। কিন্তু কথা হচ্ছে সত্যি কি তুমি নীলাটা উদ্ধার করতে চাও নাকি?

নিশ্চয়ই।

তবে বোম্বে যেতে হবে।

বোম্বে যেতে হবে? তার মানে?

মানে! মানে আবার কী? বলছি তো বম্বে যেতে হবে: But I am too tired!

এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে পাশের টেবিলে রক্ষিত টেলিফোন বেজে উঠল এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললাম; হ্যালো...Yes, Subrata Roy

Speaking, অ্যাঁ, কী বললেন? বেরিয়ে যাচ্ছেন?…জরুরী কাজ?… আপনার সেই পার্শী পার্টনারের সঙ্গে?…আজ তা হলে যাব না?

সহসা কিরীটি আমাকে বাধা দিল: সুব্রত, ওকে যেতে বারণ কর এবং বল ওর পার্শী পার্টনারের সঙ্গে আজকে যেন কোথাও না যান…আমরা আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ওর সঙ্গে দেখা করব।…আর জিজ্ঞাসা করতো…পার্শী মার্চেন্টটি এখানে কোথায় থাকেন?

কিরীটির কণ্ঠে ভয়ঙ্কর একটা আদেশের সুর।

আমি কিরীটির কথামত তক্ষুনি মিঃ সেনকে সবই খুলে বললাম। মিঃ সেন আপত্তি জানালেন, বললেন, তার পার্শী বন্ধুটি গত সপ্তাহে কলকাতায় এসেছেন। গ্র্যাণ্ড হোটেলে একটা স্যুট নিয়ে আছেন। আজ রাত্রেই, দিল্লী এক্সপ্রেসে মিঃ সেনকে নিয়ে কী একটা বিজনেসের ব্যাপারে তাঁদের পাটনা যাবার কথা।

আমি তখন মিঃ সেনকে কিরীটির আসবার সংবাদ দিয়ে বললাম; আমি কিরীটিকে তার নীলা সম্পর্কে সমস্ত ঘটনা বলেছি এবং কিরীটিরই ইচ্ছা অনুযায়ী তাকে আমি থাকতে বলছি।

মিঃ সেন বললেন, বিজনেসের ব্যাপারে পাটনায় তাদের যেতেই হবে, না গেলে সমূহ ক্ষতি হবে। তবে ট্রেন সেই রাত্রি সাড়ে দশটায়। বাড়ি থেকে রাত্রি নয়টার পর রওনা হলেও কোন ক্ষতি নেই। এর মধ্যে যদি আমরা তার সঙ্গে একবার দেখা করি তো ভাল হয়। তার পার্শী বন্ধুটিও এখুনি সেখানে আসছেন। তাঁর সঙ্গেও আলাপ করিয়ে দেবেন। তিনিও সব জানেন নীলা চুরির কথা এবং তাকে সবকথা আজই উনি নাকি দুপুরে বলেছেনও।

আমি কিরীটিকে মিঃ সেনের বক্তব্য সব বললাম।

কিরীটি বললে, তবে মিঃ সেনকে বলো যে, আমরা না যাওয়া পর্যন্ত উনি যেন বাড়ি থেকে কোথাও না বের হন। আমরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই যাচ্ছি।…

আমি কিরীটির নির্দেশ মত মিঃ সেনকে ফোনে তাই বলে দিলাম।

* * * * *

মিঃ শৈলেশ্বর সেনের বাড়ি হাজরা রোডে।

টালীগঞ্জে কিরীটীর বাসা হতে আমরা যখন মিঃ সেনের বাসার সামনে হাজির হলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

হাজরা রোডের উপরেই প্রকাণ্ড ত্রিতল সাদা রংয়ের বাড়ি। বাড়ির সামনে লোহার গেট। গেটে নেপালী দারোয়ান। গেট থেকে লাল কাঁকর বিছান পথ বরাবর গাড়ি বারান্দার নীচ পর্যন্ত গেছে। ছু'পাশে টেনিস লন ও নানা জাতীয় ফুল ও পাতাবাহারের গাছের সৌন্দর্য-সমাবেশ।

হীরা সিং গাড়ি-বারান্দার নীচে গাড়ি থামাতেই আমাদের নজর পড়ল অন্য দিকে, আর একখানা সিডানবডি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বেয়ারা আমাদের পথ দেখিয়ে উপরে নিয়ে গেল।

দোতলার কোণের দিককার একটি ঘরে মিঃ সেন ছিলেন।

আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে কলস্বরে অভিনন্দন করে ঘরের মধ্যে ডেকে নিলেন: আসুন আসুন।

আমরা তিন জনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলাম। সর্বাগ্রে আমি, মাঝখানে কিরীটি ও পশ্চাতে মিঃ সেন।

মাঝারি গোছের একখানি ঘর। ঘরের মেঝেতে সবুজ রংয়ের মূল্যবান কার্পেট বিছান কালো পাথরের তৈরী ঘরের মধ্যখানে একটা ব্রোঞ্জের তৈরী মারকারির প্রতিমূর্তি শ্বেত পাথরের টেবিলের 'পরে রক্ষিত।

ঘরের ছু'পাশে সোফা পাতা। তারই একটা অধিকার করে একজন শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ পার্শী ভদ্রলোক উপবিষ্ট। ভদ্রলোকের চোখে কালো কাঁচের চশমা।

আমরা সকলে এক একটি সোফা অধিকার করে বসলাম। তারপর কিরীটিকে দেখিয়ে মিঃ সেনকে বললাম, মিঃ সেন, ইনিই আমার পরম বন্ধু কিরীটি রায়।...আর কিরীটি, ইনি মিলিয়নিয়ার, আয়রণ মার্চেন্ট মিঃ শৈলেশ্বর সেন।

ছু'জনে ছু'জন অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদন জানালেন। এবারে মিঃ সেন অদূরে উপবিষ্ট কালো চশমা চোখে পার্শী ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, ইনি আমার অংশীদার ও বিশিষ্ট বন্ধু মিঃ রুস্তমজী মেটা!...আর ইনি মিঃ সুব্রত রায়, আমার নবলব্ধ বন্ধু।

মিঃ মেটা হাত তুলে নমস্কার করতে করতে বললেন, Glad to meet you Mr. Roy.

কিছুক্ষণ এটা ওটা আলাপ আলোচনার পর সহসা একসময় কিরীটি মিঃ মেটার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার চোখ কী খারাপ নাকি মিঃ মেটা?

মেটা মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, 'হাঁ, মানে, কয়েকমাস যাবৎ আমার একটি মাত্র চোখ উইক্ হয়ে পড়েছে।

: তার মানে ?—কিরীটী প্রশ্ন করল।

: মানে আমার একটি চোখ ছোট বেলায় নষ্ট হয়ে যায়—বাঁ চোখটা। একটি মাত্র চোখই আমার অবশিষ্ট।…অত্যধিক পরিশ্রমে এটাও পাছে উইক হয়ে পড়ে, তাই ডাক্তারের পরামর্শে কালো ফিল্মের চশমা ব্যবহার করছি কিছুদিন হলো।

: কতদিন হোল কালো চশমা ব্যবহার করছেন ?

: বেশিদিন নয়—তা সাত আট মাস হবে বোধ হয়, তাই না মিঃ সেন ?

রুস্তমজী শৈলেশ্বরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন।

: হাঁ, ঐরকমই হবে।

আরো দু'চারটে কথাবার্তার পর রুস্তমজী বললেন, শুনলাম আপনারা আমার বন্ধু সেনের হারানো নীলাটি উদ্ধারের চেষ্টা করছেন, সত্যি নীলাটি হারানো অবধি বন্ধু আমার অত্যন্ত মুষড়ে পড়েছেন। ব্যবসাক্ষেত্রে পর্যন্ত মন দেন না আগের মত। নীলাটি যদি উদ্ধার করে দিতে পারেন আমরা দু'জনেই আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। কিরীটি বলল, চেষ্টা করতে পারি, ফলাফলের কথা বলি কেমন করে ?

: আপনার ক্ষমতার কথা মিঃ সেনের মুখেই আমি শুনেছি মিঃ রায়। কথাটা বললেন রুস্তমজী।

ভৃত্য ট্রেতে করে চা ও জলখাবার নিয়ে এল।

চা পানের পর হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে এক সময় রুস্তমজী বললেন, কিন্তু মিঃ সেন, এদিকে আবার বেশি দেরী হলে ট্রেন আমরা ধরতে পারব না।

তারপর রুস্তমজী তাঁর পার্টনার ও বন্ধু শৈলেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবারে উঠুন মিঃ সেন। তারপর আবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আজ আমাদের ছেড়ে দিতে হবে মিঃ রায়। একটা বড্ড জরুরী কাজ হাতে আমাদের। আপনাদের সঙ্গে আর একদিন ভাল করে আলাপ করব।

সহসা এমন সময় কিরীটির কণ্ঠস্বরে আমরা সকলেই চমকে উঠলাম। সে গম্ভীর স্বরে বলল, মিঃ রুস্তমজী মেটা…আপনাকে আমি মিঃ সেনের রক্তমুখী নীলাটা চুরির অপরাধে অভিযুক্ত করছি।

ঘরের মধ্যে সহসা বজ্রপাত হলেও বোধহয় এতটা কেউ চমকে উঠত না।

মিঃ মেটা যেন কিরীটীর কথায় পাষাণের মত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন· এবং কালো কাঁচের চশমা পরা চোখ নিয়ে স্থির অচঞ্চলভাবে কিরীটির মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

অনেকক্ষণ পরে মিঃ মেটা মিঃ সেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ সবের মানে কি মিঃ সেন ?···

মিঃ সেনও যেন ভয়ানক বিব্রত হয়ে পড়েছেন।

কিরীটি তখন মিঃ মেটার দিকে তাকিয়ে অচঞ্চল কঠিন আদেশের ভঙ্গিতে বলল, লক্ষী ছেলের মত আসন গ্রহণ করুন মিঃ রুস্তমজী মেটা। শুনুন মিঃ সেন, শোন সুব্রত। কয়েকমাস আগে রুস্তমজীর সঙ্গে যখন মিঃ সেন মীরাটে ছিলেন, সেই সময়ে নিশ্চয়ই খাবারের সঙ্গে কোন ঘুমের ঔষধ দিয়ে কোন এক রাত্রে রুস্তমজী মিঃ সেনের আঙুল থেকে রক্তমুখী নীলা বসান সাপ আংটিটা খুলে নিয়ে অন্য একটি নকল পাথর বসান আংটি পরিয়ে দেন। রুস্তমজীকে হয়ত চিনতে পারছ না : বোম্বের বিখ্যাত পার্শী পাবলিকেশন বিজনেস্ম্যান—একদা যাঁকে তার নিজ শয়নকক্ষে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়—ইনি তাঁরই ভাগ্নে। কেমন রুস্তমজী! আমার কথা ঠিক কিনা? রুস্তমজী নিশ্চয়ই তাঁর মামার কাছে কোন এক সময় হয়ত ঐ নীলাটার সম্পর্কে শুনেছিলেন এবং তাতেই হয়তো নীলটার পরে ওঁর লোভ জন্মায়। মামার মৃত্যুর পর যখন শুনলেন সমস্ত সম্পত্তি নীলামে উঠেছে, তখন তাড়াতাড়ি এলেন নিলামে আংটিটা কিনতে, কিন্তু মিঃ সেন বেশি অফার দিয়ে কিনে নিলেন ওঁকে বঞ্চিত করে সেবারে। ফলে রুস্তমজীর আক্রোশ পড়ল মিঃ সেনের উপর এবং একবার তাদের সামনে ও একবার রাত্রে আগ্রাতেই ওর বন্ধুর বাসায় আংটিটা নেবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তখন ভাবলেন, এভাবে আংটিটা হাতানো যাবে না। তখন বন্ধুবেশে ব্যবসার ভাগিদার সেজে এসে মিঃ সেনের সামনে দাঁড়ালেন। কোন পার্শী কোন একজন বাঙালীকে অংশীদার নিয়ে ব্যবসা করবে—এ স্বপ্নেরও অগোচরে। মূল উদ্দেশ্য ছিল রুস্তমজীর এ নীলাটি কোনমতে হাতিয়ে নিজের অধিকারে আনা। মিঃ সেনের ব্যবসার গতি দেখে নীলাটার জন্য আরো লালায়িত হয়ে উঠলেন। দিনের পর দিন কলকাতায় থেকে নীলাটা চুরি করা সম্ভব হবে না জেনেই ব্যবসার ছল করে মিঃ সেনকে মীরাটে নিয়ে গেলেন এবং অনায়াসেই কাজ

হাসিল করলেন। বলতে বলতে এবারে কিরীটী হঠাৎ রুস্তমজীর দিকে ফিরে তাকিয়ে কঠোর নির্দেশের ভঙ্গিতে বললে, রুস্তমজী! এবারে বের করে দিন মিঃ সেনের রক্তমুখী নীলাটা।

এতক্ষণে রুস্তমজী কথা বললেন, মিঃ রায়। একজন ভদ্রলোককে এভাবে আপনার মত একজন ভদ্রলোকের পক্ষে অপমান করবার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাচ্ছি না।

: মিঃ মেটা, আর রহস্য কেন? আমি জানি, নীলাটা আপনার সঙ্গেই আছে।

: কি বলছেন আপনি পাগলের মত মিঃ রায়?

: ঠিকই বলছি।

: বেশ খুঁজে দেখুন···কিন্তু জানবেন, এ অপমান আমিও সহজে হজম করব না।

নিজেই রুস্তমজী তন্ন-তন্ন করে জামাকাপড়, মনিব্যাগ, জুতো, মোজা, টুপি চুল সবকিছু খুঁজে দেখালেন, কিন্তু নীলাটা পাওয়া গেল না। কিরীটি তখন যেন ক্ষেপে উঠেছে এবং ব'লে ওঠে: ওসব খুঁজলে কি হবে, ওখানে তো নেই—বলতে বলতে সহসা এগিয়ে এসে এক টান দিয়ে রুস্তমজীর চোখ থেকে গগল্‌সটা ছিনিয়ে নিল এবং তীক্ষ্ণ আদেশের সুরে বলল, রুস্তমজী রক্তমুখী নীলা অতি ভয়ঙ্কর জিনিস। ভেবে দেখুন আপনার মামার কথা। কিভাবে যথাসর্বস্ব খুইয়ে তাঁকে শেষপর্যন্ত একদিন আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। কে জানে কোন ভয়ঙ্কর পৈশাচিক মৃত্যু আপনার জন্যও অপেক্ষা করছে কিনা ···সর্বনাশ যদি না চান যাঁর জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দিন। ও নীলা—বিশেষ করে রক্তমুখী নীলা সকলের সহ্য হয় না। এই যে দীর্ঘকাল নীলাটার লোভে হন্তদন্ত হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছেন, চুরি করেও কী সেটা লুকোন রইল? ধরা পড়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত। ওর সাহচর্যেও বিষ আছে মিঃ মেটা। রক্তমুখী নীলা বড় সাংঘাতিক বস্তু। এখনও ভাল চান তো যাঁর নীলা ফেরত দিন তাঁকেই। রুস্তমজী কঠিন নির্বিকার কণ্ঠে বললেন, 'বললাম ত' আমি জানি না।'

কিরীটির দু'চোখের তারায় যেন আগুনের ঝলক। ক্রমে সে একপা একপা করে রুস্তমজীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বজ্রকঠোর কণ্ঠে বলে, আপনি। হাঁ। আপনি জানেন। আপনি জানেন। আপনার চোখ, ঐ পাথরের চোখ। ঐ, ঐখানেই সেই নীলা! রক্তমুখী নীলা!···

কিরীটির ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে তখন। রুস্তমজীও সহসা যেন কেমন চঞ্চল হয়ে থপ্ করে চোখের 'পরে হাত চাপা দিলেন এবং চীৎকার করে বললেন, না—না—আমি জানি না।—আমি জানি না। কিরীটি তখন মিঃ সেনের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, মিঃ সেন, আপনার এই বন্ধুর চোখের মধ্যেই লুকানো আছে নীলাটা। নিয়ে নিন্।

বাঘের মতই মিঃ সেন রুস্তমজীর 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন : খুন করব তোকে···চোর···আমার রক্তমুখী নীলা! দে—দে—

অনায়াসেই মিঃ সেন বৃদ্ধ রুস্তমজীকে চিৎ করে মাটিতে ফেলে আঙুল দিয়ে খাবলিয়ে রুস্তমজীর পাথরের চোখটা ছিনিয়ে নিলেন।

ঝরঝর করে রক্ত ছুটে এসে রুস্তমজীর সমস্ত জামা নিমেষে রাঙা করে তুলল এবং সেই রক্তের সঙ্গে চোখের কোটর হতে নীলাটা ছিটকে মাটিতে পড়ে গেল। পাগলের মতই মিঃ সেন নীলাটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নিলেন।

*   *   *   *

বাড়িতে ফিরে একটা সিগারেট ধরিয়ে তাতে মৃদু টান দিতে দিতে কিরীটি বলল, প্রথমে চিঠির সাঙ্কেতিক অর্থ আমি বুঝতে পারি নি, পরে তোমার মুখে মিঃ সেন বর্ণিত সমস্ত ঘটনা শুনে বুঝলাম B. Y. Bombay. R মানে রুস্তমজীর নামের প্রথম অক্ষর তখনই আমার কাছে ব্যাপারটা সহজ হয়ে এল। তাই বলেছিলাম, বম্বে যাব। কেন না শুনেছিলাম তোমার মুখে রুস্তমজী বোম্বেতেই নাকি থাকেন। তারপর ফোনে যেই শুনলাম মিঃ সেনের পার্শী বন্ধু এখানেই এখন আছেন, তখন বোম্বে যাওয়ার প্রয়োজন আর থাকল না।

: একটা কথা : নীলাটা যে রুস্তমজীর সঙ্গেই আছে কেমন করে বুঝলে?

: এ তো খুবই সহজ। তুমি হয়ত জানো না সুব্রত, কোন পাথর ইত্যাদি মানুষ যখন ব্যবহার করে, সেটা দেহের চামড়ার সঙ্গে স্পর্শ করে থাকা চাই, নচেৎ সকলের ধারণা পাথরের কোন উপকার না কি পাওয়া যায় না। রক্তমুখী নীলাটা যখন রুস্তমজী চুরিই করেছেন, তখন যাতে সেটা থেকে উপকার পান সেই চেষ্টাই করবেন এবং তা করতে হলেই গায়ের চামড়ার সঙ্গে লাগিয়ে রাখতে হবে। সে ভাবে রাখতে হলে এক আংটি অথবা 'তাগা'র সঙ্গে পাথরটা যুক্ত করে রাখতে হয়। কিন্তু তাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে ওর পক্ষে সব চাইতে ভাল ও সহজ উপায় ছিল নীলাটা

তাঁর পাথরের চোখের তলায় রাখা এবং তা করতে পারলে কারও চোখে পড়বারও সম্ভাবনা নেই···কাজও হবে এবং করলেনও তাই। দোষীর মন কিনা, তাই সর্বদা একটা কালো সান-গগলস্ ব্যবহার করতে শুরু করেন রুস্তমজী। রুস্তমজীর হাতে আংটি নেই দেখে তাই প্রথমেই তার চোখের গগলস্ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার চোখের অসুখের সময় ও নীলাটা চুরি যাবার সময় মিলিয়ে দেখো একটা সুন্দর মিল আছে।

আমার সমস্ত সন্দেহ মিটে গেল। এবং সম্পূর্ণ অনুমানের 'পর ভিত্তি করেই সোজাসুজি তাকে আক্রমণ করলাম।

: চমৎকার তোমার যুক্তি কিরীটি!

এমন সময় পাশের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল, ক্রিং···ক্রিং···ক্রিং

: সুব্রতবাবু ?—ওপাশ থেকে প্রশ্ন এল।

: হাঁ, বলুন।

: আপনার ও মিঃ রায়ের নামে পাঁচ পাঁচ হাজার করে দশহাজার টাকার চেক পাঠালাম আমার সেক্রেটারীর হাত দিয়ে। অনুগ্রহ করে ওই সামান্য টাকাটা নিয়ে আমায় বাধিত করবেন। আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলতে পারব না।

আমি ফোনটা রেখে এঘরে এসে দেখি সোফার 'পরে হেলান দিয়ে ইতিমধ্যেই কিরীটি কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়েছে।

মর্মর

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এইবার দিল্লি থেকে ফেরার পথে ট্রেনে উঠে মনে মনে বললুম, আর না, এই শেষ! একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার তিনবার। চাকরির ইন্টারভিউ দিতে আর যেখানে যাই—করাচি কি লামডিং, কানপুর কি কোহিমা, দিল্লিতে আর নয়! আগের দু'বার ইন্টারভিউ দিয়ে আসতে হয়েছিলো দারুন গ্রীষ্মে। লাভের মধ্যে হয়ে ছিলো শরীর আধখানা আর পকেট খালি। কিন্তু চাকরি হয় নি। এবারেও তাই। তবে একমাত্র ভালো যা দেখছি এবার

আসতে হয়েছে শীতে। তাই অন্যান্যবারের মত এবার শুধু দিল্লিতে ওঠা আর হাওড়ায় নামা নয়। ঠিক করেছি অন্ততঃ আগ্রা হয়ে তাজমহল দেখে ফিরবো।

কিন্তু কে তখন জানতো এবার আমার কপালে তাজমহল দেখা নেই। যখন ট্রেনে উঠলুম কামরা বেশ খালি ছিলো। কিন্তু আজকাল তো খালি থাকার উপায় নেই। দেখতে দেখতে ভরে উঠলো: বেঁটে, লম্বা রোগা, মোটা, ইহুদি, বার্মিজ, মুসলমান, হিন্দু, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া ছেলে-মেয়ে—একেবারে মানুষের খিচুড়ি।

এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে আছি এমন সময় একটি পাঞ্জাবি মুসলমান আমারি কামরাতে উঠলো। পরনে গরম ট্রাউজার আর কালো শেরোয়ানি, মাথায় লাল ফেজ। টকটকে রঙ, উন্নত কপাল, টিকলো নাক, আর জোড়া গভীর কালো বাঁকানো ভুরুর নীচে নীল চোখ। তার সমস্ত চেহারায় বুদ্ধির উজ্জ্বল্য, প্রতিভার স্বাক্ষর। অথচ সমস্ত ভঙ্গীতে একটি বিষণ্ণ মাধুর্য, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলুম তার কারণ সেই আশ্চর্য দুটি চোখ। সে চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল, অথচ তীক্ষ্ণ নয়। বিষণ্ণ অথচ মধুর। সে যেন এই কামরার অদ্ভুত জনতার মধ্যে দাঁড়িয়েও নিজের চারিদিকে একটা নির্জনতার পাঁচিল তুলে দিয়েছে। আমার পাশে দাঁড়িয়েও সে যেন রয়েছে অনেক-অনেক দূরে। ভিড় দেখে সমস্ত মেজাজ যে রকম বিগড়ে গিয়েছিলো তাকে দেখেই কিন্তু আবার হালকা হয়ে এলো। নিজেকে আরো অনেকটা সঙ্কুচিত করে আমার পাশ থেকে দুটো বই সরিয়ে কোনো রকমে আর একটি মানুষের মতো জায়গা করে হেসে তাকে ইংরেজিতে বললুম বসতে। সে-ও হাসলো তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে দুটি বেঞ্চের মাঝখানে-রাখা আমার হোল্ড্-অলের উপর বসে ইংরিজিতে বললো, 'এইখানে বসলে আমরা দুজনেই আরামে যেতে পারবো কিন্তু আপনি কি বাঙালী?'

বললুম, 'হ্যাঁ, কিন্তু কী করে জানলেন?'

ছেলেটি পরিষ্কার বাংলায় বললো, 'বাঙালীকে বাঙালী বলে চিনে ফেলা খুব এমন কঠিন নয়। বিশেষ করে আমার পক্ষে, যে ছ'বছর কলকাতায় ছিলো!'

দেখতে দেখতে আলাপ হয়ে গেলো। ছেলেটির নাম মির্জা। কলকাতায় আর্ট-স্কুলের ছাত্র ছিলো। সেখান থেকে পাশ করে গিয়েছিলো ফরাসি দেশে মূর্তি গড়া শিখতে। আমাদের গল্প জমে উঠলো। পাঁচমিশেলি লোকের

ভিড়ে আমরা যে ট্রেনের কামরায় বসে আছি সে কথা আমি তো স্রেফ ভুলেই গেলুম। তার মধ্যে কী যেন একটা শক্তি আছে, কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই অপরিচিতকে আত্মীয় করে নেবার দুর্লভ মন্ত্র।

'আপনাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে এর আগেও দিল্লি এসেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, এই নিয়ে তিনবার। আশাকরি এইবারই শেষবার।'

মিষ্টি হেসে সে বললো, 'ইন্টারভিউ দিতে বুঝি ?'

বিস্মিত হয়ে বললুম, 'কী করে জানলেন ?'

আবার হেসে সে উত্তর দিল, 'এ আর এমন শক্ত কথা কী ; দিল্লিতে আজকাল কি কেউ সখ করে বেড়াতে আসে ? হয় ব্যবসা নয় চাকরি। আর যেহেতু আপনি বাঙালী, সেহেতু অনুমান করা শক্ত নয় এসেছিলেন চাকরিরই খোঁজে। আপনার কথা শুনে বুঝলুম চাকরি হলো না। কেমন—নয় ?'

খুব সহজ করেই কথাগুলো সে বললো। আমারো মনে হোলো, বাস্তবিকই কত সহজ আমার কথা জানা। তবুও কেমন যেন অস্বস্তি লাগলো। মির্জার সেই গভীর নীল চোখের দৃষ্টি যেন আমার মনকেও স্পর্শ করেছে। আমার ভাবান্তর লক্ষ্য না করে সে বলে চললো, 'কিন্তু বন্ধু কখনো হতাশ হোয়ো না—তুমি বলে কথা বললে অসন্তুষ্ট হবে না তো ; তুমি বলতেই ভালো লাগে। 'আপ' কিম্বা 'আপনিটা' যেন বড্ড দূ'রে রাখে মানুষকে। হ্যাঁ, যা বলছিলুম আমার তো মনে হয় মানুষের ভাগ্য হচ্ছে পাগলা ঘোড়ার মতো। কেবলি লাফায়, পিঠে বসতে দেয় না। তাই বলে তুমি যদি হাল ছেড়ে বসে থাকো তাহলে তো হার হোলো তোমারই। কখনো হতাশ হয়ো না। সেই পাগলা ঘোড়ার পিঠে জোর করে চেপে বস ; প্রমাণ করো তুমি তার প্রভু, সে তোমার নিয়ে। হয়তো প্রথমে দু'চারবার সে লাফাবে, পিঠ থেকে ছুঁড়ে ফেলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু যদি তুমি ঠিকমত লাগাম কষতে পারো, চপটি লাগাতে পারো তার বেয়াদপির পিঠে—দেখবে সে তোমার বশ হয়ে এসেছে। দেখবে সেই ঘোড়াই নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে দেশ থেকে দেশান্তরে। একটির পর একটি রাজ্য জয় করে তোমাকে সে দিগ্বিজয়ী করে তুলবে—চাকরি হোলো না তো কী হয়েছে ? অন্য পথ দেখো! ব্যবসা করো। প্রত্যেক মানুষের উপযুক্ত পথ তো সংসারে আছেই। শুধু খুঁজে নিতে হয়। এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে সে বুঝি একটু লজ্জিত হোলো। তারপর হেসে বললো, 'উপদেশ দিলুম বলে রাগ করলে না তো ? তোমাকে ভালো লাগলো বলেই

বললুম। এ আমার মনের কথা। তাছাড়া,' এবারে একটু রহস্যজনক হেসে বললো, 'তাছাড়া তোমার কপালেও লেখা রয়েছে ব্যবসাতেই হবে তোমার উন্নতি।'

আমি বললুম 'সত্যি নাকি? আর কী লেখা রয়েছে বলতে পারো?'

'বলবো?' আবার সে হাসলো, 'তুমি টুণ্ডলায় নামবে, আর যাবে আগ্রায় তাজমহল দেখতে। কিন্তু এ-যাত্রায় দেখা হবে না।'

'কেন?'

খুব একটা গম্ভীর গণক-গণক মুখ করে সে বললো, 'তুমি যে-রাতে জন্মেছিলে সে-রাতে চাঁদ উঠেছিলো বারোটায়। আজকেও তাই উঠবে। শাস্ত্রমতে সে কারণেই তোমার কপালে আজ রাতে তাজমহল দেখা নেই। যে রকম হাওয়া বইছে আর আকাশটা যেরকম মেঘে ছেয়ে রয়েছে তাতে বৃষ্টি হবে বলে মনে হয়। এই ডিসেম্বরের শীতে বৃষ্টি মাথায় করে তুমি কি রাত বারোটায় চাঁদের আলোয় তাজমহল দেখতে পাবে বলে আশা কর?'

হো-হো করে হেসে বললুম, 'গণক-ঠাকুর' এবার কিন্তু ভুল হোলো। আমি যখন জন্মেছিলুম তখন খটখটে রোদ রাত নয়—কিন্তু সে-কথা যাক্। আমি যে আগ্রায় যাচ্ছি সে-কথা কে বললে?

কে আবার? কেউ না। সোজা কলকাতায় যাবার মতলব থাকলে তুমি তো বিছানাটা খুলে অন্তত পিঠে একটা বালিশ লাগিয়ে বসতে!

'কিন্তু আগ্রাতেই যে যাবো সেকথা বললে কে?'

'অন্য কোথাও গেলে অন্য ট্রেনে উঠতে, দিনের গাড়িতে। তাছাড়া বাঙালিবাবুরা তাজমহল দেখতে বড় ভালোবাসে। কিন্তু তুমি এর আগে যে আগ্রায় আসো নি সে-কথাও আমি বলতে পারি।'

যদিও নিতান্ত রহস্যচ্ছলে কথাবার্তা চলছিলো তবুও এমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলুম যা ঠিক বর্ণনা করতে পারবো না। তাই শুধু প্রশ্ন করলুম, 'বল, কী করে জানলে?'

আবার সে হো হো করে হেসে বললো, 'যারা আগে একবারও আগ্রা গেছে তারা জানে সকালের ট্রেনে যাওয়াই সবদিক দিয়ে সুবিধের। কোনো বদল নেই।' তারপর একটু থেমে বললো, 'আমার বাড়িও আগ্রায়। সকালের ট্রেন মিস্ করেছি বলেই এ গাড়িতে উঠতে হোলো। দেখছি লোকসান হয় নি। তোমার মতো একটি বন্ধু আজ পেলুম এবং সে-বন্ধুটিকে

আমার গরিবখানায় নিয়ে গিয়ে ধন্য হবো।—আমার বাড়িতেই তোমাকে ভাই থাকতে হবে কিন্তু, কোনো আপত্তি শুনবো না।'

'এতো বড় মজার ব্যাপার হোলো।' ঠিক কি বলবো ভেবে না পেয়ে বললুম।

মির্জা আবার হাসতে লাগলো। বললো, 'পৃথিবীটাই মজার। কত মজার ঘটনা ঘটে—দেখবে! ভালো কথা, তোমাকে এমন একটি জিনিস দেখাবো আগ্রার তাজমহলের চেয়ে যা কম আশ্চর্য নয়।'

'মানে।'

'এখন বলবো না। তবে এটুকু বলতে পারি তাজমহলকে হয়তো কোনো-দিন ভুলবে কিন্তু তাকে ভুলবে না কোনোদিন।'

মির্জা চুপ করলো। ট্রেনে দারুণ শব্দ হচ্ছিল। কথাবার্তা ভীষণ চেঁচিয়ে বলতে হচ্ছিলো বলে ক্লান্ত হয়ে আমিও চুপ করলুম।

টুণ্ডলায় গাড়ি বদল করে যখন অন্য ট্রেনে উঠলুম তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যের দিকে চলেছে। সমস্ত আকাশ ধূসর কম্বলে ঢাকা। মাঝে মাঝে টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছে। ইষ্টিশানের ওপাশে বড় বড় নিমগাছগুলো ঝড়ো হাওয়ায় ঝাকড়া চুলো পাগলের মতো মাথা নাড়ছে। হাতের তালু আসছে ঠাণ্ডা হয়ে। সমস্ত শরীর শির-শির করছে। সেই শিরশিরিনি যে শুধু ঠাণ্ডার জন্য নয় তখন সে-কথা বুঝি নি।

ট্রেন বদল করে কপালজোরে বসতে পেয়েও দেখলুম এ-গাড়িতেও রীতিমতো ভিড়। মির্জা আমার পাশে বসে বললো, 'যাক্। তবু বসতে পাওয়া গেলো। গাড়ি লেট যাচ্ছে। আগ্রায় পৌছতে পৌছতে রাত ন'টা। হয়তো তখন বৃষ্টি জোরেই পড়বে। আমার টেলিগ্রামটা সময়মতো পেলে হয়। বাড়ির গাড়ি না এলে বিপদে পড়বো—অনেকটা পথ।'

'বাড়িতে কে-কে আছেন?'

একটু চমকে মির্জা বললো, 'কে-কে? কেন, আমার দাদামশাই আর স্ত্রী। আর কে থাকবে?'

বললুম, 'না। সে-কথাই জিজ্ঞেস করছিলুম।'

'আমার দাদামশাইকে দেখলেই বুঝবে কত সুন্দর তিনি। ফরাসি দেশ ক ফিরে ভেবেছিলুম তাঁর একটি পাথরের মূর্তি খোদাই করবো। কিন্তু, পর আমার বিয়ে হোলো আর তারপর সব যেন গোলমাল হয়ে গেলো।

মূর্তিটি আর তৈরী করা হয় নি অনেকদিন। এক রাতে স্বপ্ন দেখেছি বুঝি শেষ হয়েছে সেই মূর্তি গড়া। জানতুম ঠিক আমার মনের মতন একটি মূর্তি গড়তে পারলে চারিদিকে হৈ হৈ পড়বে।...অনেকদিন কেবল সেই মূর্তির কথাই ভেবেছি। সাদা পাথরে খোদাই একটি শুভ্র শান্ত মূর্তি। আমার সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে। তোমাকে আজ দেখাবো ?

আমি শুধু বললুম 'ও'। কারণ এ সব ব্যাপারে আমার উৎসাহ বিশেষ নেই। সত্যি কথা বলতে কি এসব মূর্তি-টূর্তি আমি ভালো বুঝি না। বরাবরই দেখেছি এগজিবিশনে আমার সে সব ছবি ভালো লাগে সমঝদার লোকেরা সেগুলোকে যাচ্ছেতাই বলে। আর সমঝদারের কাছে যে সব ছবি উচ্চ প্রশংসা পায় সেগুলো আমার লাগে যাচ্ছেতাই। তাছাড়া, ট্রেনে উঠে পর্যন্ত আমার শরীরটা বিশেষ ভালো লাগছিলো না। মাথার ভিতরে কেমন একটা টিপটিপে যন্ত্রণা বোধ করছিলুম। আর এমন একটা শীত-শীত লাগছিলো যেটা ঠিক ঠাণ্ডার জন্যে নয়। আমার দিকে তার নীল চোখ তুলে কী যেন দেখে মির্জাও চুপচাপ জানালার বাইরে চেয়ে রইলো। ট্রেন যতো জোরে চললো আকাশ ততোই হয়ে আসতে লাগলো কালো। টিপিটিপি থেকে বৃষ্টি নামলো জোরে। শীতের ছোট্ট বেলা যেন এক চুমুকে শেষ করে দিলো দীর্ঘ কালো রাত। অত্যন্ত ক্লান্ত লাগলো। ঘাড়ের কাছে ওভার কোটটা পুঁটলি পাকিয়ে হেলান দিয়ে ঢুলতে লাগলুম।

কতক্ষণ ঢুলেছিলুম কিংবা ঘুমিয়েছিলুম জানা নেই। চোখ মেলে দেখি মির্জা আমার কপালে হাত দিয়ে ঠেলছে। মির্জার হাতটা যেন বড্ড বেশি ঠাণ্ডা। সে বললো, 'এ কী প্রতুল! তোমার গা যেন গরম-গরম ঠেকছে।'

আমি বললুম, 'না-না। ঠিক আছে। কিন্তু কামরার আর লোকেরা কোথায় ? গাড়ি থেমে রয়েছে কেন ?'

হেসে সে বললো, 'আরে সবাই তো নেমে গেছে। আমরা আগ্রায় পৌঁছেছি। চলো, নামা যাক।'

ওভারকোটে ভালো করে বোতাম এঁটে মাথায় টুপি দিয়ে মির্জার সঙ্গে নেমে এলুম। বৃষ্টি কিছু কমেছে। কিন্তু বাতাসে যেন শান দেওয়া। আর আকাশেও মেঘের কমতি নেই। ঘুমিয়ে উপকারই হয়েছিলো। মাথার

ন্ত্রণা প্রায় নেই বললেই হয়। শরীরটাও যেন হাল্‌কা হাল্‌কা বোধ হোলো। একটু যেন বেশি রকম হাল্‌কা।

ইস্টিশান ছেড়ে আমরা বাইরে এলুম। বেশ রাত হয়েছে। একটিও টাঙা কিংবা ট্যাক্সি নেই। শুধু একটি বন্ধ ঘোড়ার গাড়ি রয়েছে দাঁড়িয়ে। অদ্ভুত তার গড়ন। পুরনো আমলের জুড়িগাড়ির মতো। এ-দেশে এ-ধরণের গাড়ি এই প্রথম দেখলুম। কাছে পৌছে দেখি গাড়ির ঘোড়া দুটি চমৎকার। আবছা-আলো-অন্ধকারে তাদের দুধে ধোওয়া সাদা রঙ স্পষ্ট চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে তারা পাথরে পা ঠুকছে আর ছোটো ছোটো স্ফুলিঙ্গ—সোনালি আর নীল আর সবুজ—কয়েক মুহূর্তের জন্য উঠছে চমকে। একজন সহিস আমাদের সেলাম করে দরজা খুলে দাঁড়ালো। তার গায়ে দামী জরির পোশাক। গাড়ির ভিতরটিও চমৎকার। অনেকটা জায়গা। তুলতুলে নরম গদি। এক ফোঁটা ধুলো নেই। নানাধরণের নানা রঙের রেশমের তাকিয়া। ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বড় জোর ফুলদানি দেখা যায়। কিন্তু আতরদানি দেখে সত্যিই আশ্চর্য হলুম খুব। বুঝলুম আমার এই নতুন বন্ধুটি নিশ্চয়ই কোনো নবাব বংশের ছেলে।

অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গাড়ি ছুটলো। নিস্তব্ধ রাত্রিতে শুধু ঘোড়ার খুরের খুট খুট ছাড়া কোনো শব্দ নেই। ইতিপূর্বে এখানে কখনো আসি নি। নিস্তব্ধ এক শীতের ঝোড়ো রাতে দুধের মত ঘোড়ায় টানা চমৎকার এক জুড়ি গাড়ির মধ্যে বসে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অবাস্তব, কেমন যেন স্বপ্ন স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগলো। ভাবলুম মির্জার সঙ্গে একটু গল্প করি। কিন্তু এবার ঢোলবার পালা তার। জানালার পাশে মাথা রেখে সে ঢুলছে। গাড়ির মধ্যেকার একটি ছোট্ট ঝাড় লণ্ঠনের আলো তার মোমের মত নরম মুখের একপাশে পড়েছে। তাকে আরো সুন্দর, আরো ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে। আমিও তার উদাহরণ অনুসরণ করলুম। ঢুলতে লাগলুম।

এবারেও কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম মনে নেই। জেগে উঠে দেখি জুড়িগাড়ি থেমেছে আর মির্জা ডাকছে। শরীরটা আরো হালকা, মাথার ভিতরটা আরো যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো। সহিস দরজা খুলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নামলুম। কিন্তু এ কোথায় এলুম। তখন মাঝ রাত। একটি নিস্তব্ধ প্রাসাদের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে দূরের গাছগুলো দুলছে

আর বাতাসের তীক্ষ্ণ শিস্‌ রাতকে যেন করাত দিয়ে চিরছে। হু-হু করে উড়ে যাচ্ছে মেঘের পর মেঘ। আর সাদা ঘোড়া দুটো উত্তেজিত হয়ে মাঝে-মাঝে পাথরে পা ঠুকছে আর ঠিকরে পড়ছে আগুনের স্ফুলিঙ্গ—সোনালি আর নীল আর সবুজ। শ্বেত পাথরের প্রাসাদে মির্জার পিছন পিছন চললুম। সে যেন আরো গম্ভীর আরো অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। কোনো কথা বলতে ইচ্ছা হোলো না! সমস্ত শরীর অস্বাভাবিক হালকা লাগছে। মহলের পর মহল পেরিয়ে চললুম। সামনে মশালের আলো দেখিয়ে চলেছে উর্দিপরা চাকর। আমাদের চলন্ত ছায়া মাঝে মাঝে পাথরের উপর বড়-বড় হয়ে কাঁপছে। চুপচাপ শুধু এগিয়ে চললুম, জানি না কতক্ষণ। শেষে মহলের পর মহল পার হয়ে নানা ঘোরানো-পাকানো সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করে একটি ঘরের সামনে এসে দাড়ালুম। দরজার পাশে মশাল হাতে মাথা নীচু করে চাকরটা দাঁড়িয়ে রইলো। মির্জা দরজা খুলে আমাকে ইঙ্গিতে বললো আসতে।

ঘরের মধ্যে এসে একেবারে অবাক হয়ে গেলুম। বিরাট সেই হলঘর। মেঝেতে পুরু দামি গালচে, ছাত থেকে ঝোলানো অসংখ্য ঝাড়-লণ্ঠন আর তাদের সাদা আলো জ্যোৎস্নার মতো সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। কোণে তাকিয়া হেলান দিয়ে শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ, সামনে স্ফটিক পাত্রে রঙীন পানীয়। পরণে সাদা মসলিনের চুড়িদার পাজামা ও পাঞ্জাবি। মাথার সাদা চুল পিঠে নেমেছে। শাদা দাড়ি নেমেছে বুকে। টকটকে তার রঙ। ফরসা-নয়—ঈষৎ লালচে। দুটি চোখ নীলার মতো। পাশেই আতরদানি। একটি সোনার থালায় স্তূপ করা মোহর ঝাড়-লণ্ঠনের আলোয় ঝকঝক করছে। সেই বৃদ্ধের কিছু দূরে আর এক বৃদ্ধ বাজাচ্ছে সেতার—আর কিছু দূরে নৃত্যরত এক নর্তকী। তার রেশমের ওড়না উঠছে ফুলে ফুলে। তাঁর ঠোঁট ডালিমের মতো রাঙা, তার রঙ পুরনো হাতির দাঁতের মতো। তার মাথার চুলে কালো সাপের মতো বিনুনি। সেই বিনুনি-বাঁধা-চুল এ-কাঁধ থেকে ও-কাঁধে, বুকে আর পিঠে পড়ছে ঝাঁপিয়ে-ঝাঁপিয়ে। নীল-সমুদ্রের মতো মাঝে মাঝে ফুলে ফুলে উঠছে, তার নীল ঘাঘরা। তার ঘুঙুরের শব্দে এই রাত্রির, এই সভাঘরের, এই প্রাসাদের বুকে নেশা ধরেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলুম। মনে হোলো হঠাৎ যেন ইতিহাসের হাজার হাজার পাতা গেছে উল্টে আর মুখোমুখি আমরা দাঁড়িয়ে আছি এক মোগল-বাদশার রাজসভায়।

আমাদের কেউ যেন দেখেও দেখলো না। সেই বৃদ্ধ সোনার থালা থেকে এক মুঠো মোহর নর্তকীর পায়ে দিলো ছড়িয়ে। তারপর আতরদানি থেকে আতরের পাত্র তুলে নিজের দাড়িতে মাখালো। সমস্ত বাতাস সুগন্ধে ভারি হয়ে গেলো আর আমি স্পষ্ট দেখলুম মেয়েটির ঢেউ-এর ভঙ্গীতে একটি ফুলের স্তূপের মত ভেঙে পড়ে বৃদ্ধকে অভিবাদন করলো। কিন্তু তার আগে মির্জার দিকে তার ভ্রমরের মতো দুটি চোখ তুলে মুহূর্তের জন্য হাসলো। অপূর্ব সেই হাসি। সেই মৃদুচকিত হাসির কোনো বর্ণনা নেই।

মির্জা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে কুর্নিশ করে একপাশে সরে দাঁড়ালো। তারপর ইঙ্গিতে ডাকলো আমাকে। বৃদ্ধ আমার দিকে তার নীলার মত উজ্জ্বল চোখ তুলে ধরলো। আমার বুকের ভিতরটা সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সামনে উঠলো ধ্বক্-ধ্বক্ করে। ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলুম। কুর্নিশ করতে জানি না। কিন্তু কিছু একটা করা উচিত। নীচু হয়ে বৃদ্ধের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলুম। আর সেই মুহূর্তে চারিদিক যেন তোলপাড় হয়ে গেলো। ঝন্ ঝন্ করে যেন ভেঙে গেল হাজার-হাজার কাঁচের আয়না। একটার পর একটা ঝাড় লণ্ঠন গেলো নিভে। আর আশ্চর্য, হাত আমি সরাতে পারলুম না। দেখলুম যার পায়ে হাত দিয়েছি সেই বৃদ্ধ মানুষ নয়, শ্বেত পাথরে খোদাই করা একমূর্তি। সজীব ছিলো এতক্ষণ। কিন্তু আমার স্পর্শে পলকের মধ্যে যেন তার সর্বাঙ্গ জমে পাথর হয়ে গেছে। তার নীলার মতো চোখের দৃষ্টি থেকে তার সূর্যের মতো হাসিটি পর্যন্ত এই মর্মর-মূর্তির উপর পড়েছে ধরা।

ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হোলো সেই সভা, সেই প্রাসাদ, সেই প্রহরীরা। দেখলুম দিগন্ত-বিস্তৃত এক ধূ-ধূ মাঠের মধ্যে মধ্য রাত্রে আমি আর মির্জা আর একটি শ্বেতপাথরের মূর্তি! আর একটি অদৃশ্য মেয়ের ঘুরে বেড়ানো। কখনো কখনো তার রেশমী ঘাঘরার সামান্য আভাস, কখনো তার ঘুঙুরের মৃদু ধ্বনি, কখনো সেই আশ্চর্য আমি অন্ধকার রাত্রির বুকে।···আকাশে হু হু করে মেঘের পর মেঘ উড়ে যাচ্ছে আর অন্ধকার গাছে গাছে বাজছে বাতাসের শিস। আর আমি নতজানু হয়ে সেই মর্মরমূর্তির পায়ের আঙুল স্পর্শ করে বিস্ময়ে মুগ্ধ হয়ে বসে আছি। সমস্ত শরীর শিউরে শিউরে উঠছে। কিন্তু ভয় নেই।

মির্জা বললো, ওঠ বন্ধু, এই আমার দাদামশাই। আর যে মেয়েটি নাচ-

ছিল, যাকে এখন ভালো করে দেখা যাচ্ছে না—সে-ই আমার স্ত্রী। ও একদিন আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলো। তাই আমি সমস্ত পৃথিবীকে উপেক্ষা করে লুকিয়ে এক রাত্রে ওকে বিয়ে করেছিলুম। সেই রাতটাও ছিলো এই রকমই এক ঝড়ের রাত। সেই রাতেও বারোটার চাঁদ ওঠবার কথা ছিলো। কিন্তু সে-চাঁদ ওঠে নি। না আমাদের জীবনে, না নীল আকাশকে আরো নীল করে। আমার দাদামশাই ছিলেন অত্যন্ত চতুর। তাঁর ওই নীলার মতো নীল চোখে ধুলো দেবো এমন ক্ষমতা কোথায়? আমরা আর সূর্যের আলো দেখতে পেলুম না। কিন্তু বড় শখ ছিলো তার একটা মূর্তি গড়বো। সাদা পাথর কেটে অমর করবো আমার দাদামশাইকে। আর সেই সঙ্গে অমর হবে আমার নাম। আমার আজ পৃথিবীতে কেউ নেই। কিন্তু আমার সেই কামনার, আমার সেই আন্তরিক ইচ্ছের মৃত্যু এখনো হয় নি। তারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, বারবার ফিরে ফিরে আসে। তাই বন্ধু, তোমাকে আজ দেখাতে এনেছিলুম আমার সেই মর্মর স্বপ্ন।···তোমার জন্যে গাড়ি ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই। ঠিক জায়গায় তোমাকে নামিয়ে দেবে।

যন্ত্রচালিতের মতো আমি সেই সাদা ঘোড়ার জুড়িগাড়িতে উঠলুম। ঘোড়ার খুরে-খুরে জ্বলে উঠলো স্ফুলিঙ্গ। সোনালি আর নীল আর সবুজ। আর সেই শীতের রাতের ঝোড়ো অন্ধকারের বুকে আমি স্পষ্ট দেখলুম দুটি ভ্রমর কালো চোখ আর বর্ণনাহীন হাসি। খুটখুট করে শুধু ঘোড়ার খুরের শব্দ। অন্ধকার ঝড় বৃষ্টির রাত। গাড়িতে একা। সমস্ত শরীর ভারি হয়ে আসছে। মাথার মধ্যে আবার শুরু হয়েছে সেই যন্ত্রণা আর ঘুমে ভেঙে পড়ছে সমস্ত শরীর। কপালে একবার হাত দিয়ে দেখলুম যেন পুড়ে যাচ্ছে।

সকালে যখন ঘুম ভাঙলো দেখি আগ্রা ইস্টিশানের ওয়েটিংরুমে শুয়ে আছি। জ্বর নেই। সমস্ত শরীর দুর্বল আর হালকা। মুখের ভিতরটা বিস্বাদ। আকাশে ঝড় বৃষ্টির চিহ্নও নেই। কনকনে ঠাণ্ডা আর উজ্জ্বল উষ্ণ সোনালি সূর্য। তাজমহল দেখবার কোনো উৎসাহ বোধ করলুম না। পরের ট্রেন ধরে সোজা চলে এলুম কলকাতায়।

আমার আশ্চর্য কাহিনী কেউ বিশ্বাস করলো না, বলাই বাহুল্য। আমার এক ডাক্তার বন্ধু বললেন, 'একটা ছোট্ট মশা তোমাকে নিশ্চই কামড়ে ছিলো। ফলে ম্যালেরিয়া জ্বরের ঘোরে একটা মস্ত আজগুবি কাণ্ড স্বপ্ন দেখেছো।

তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। জোর করে রক্ত পরীক্ষা করলেন। কী পেলেন তিনি আর ভগবানই জানেন কিন্তু মাসখানেক ধরে সপ্তাহে দুটো করে কুইনাইনের বড় বড় ইঞ্জেকসন আমাকে দেবেন বলেছেন।

একখানা হীরে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল হাজারীবাগ অঞ্চলের এক ডাক-বাংলায়। আমি যখন পৌঁছলাম, তখন প্রায় সন্ধ্যা। কীপারটা ঘর খুলে দিলে জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে আমি বাইরে বেরিয়ে এলাম। সামনে তখন পাহাড়ের মাথায় সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঘন-জঙ্গলের ওপর থেকে রক্তদীপ্তি মিলিয়ে গিয়ে ঘনাচ্ছে রাত্রির কালো ছায়া। পাকা-মহুয়ার মাতাল-গন্ধ নিয়ে পাহাড়ের দিক থেকে ঝিরিঝিরি করে বাতাস আসছিল।

পাশের ঘরে যিনি আশ্রিত, সেই লোকটি তখন ডাক-বাংলার বাইরে একখানা ডেক-চেয়ারে বসেছিলেন। আমাকে দেখেই উঠে বসে নমস্কার করলেন। বললেন, আপনি বাঙালী, আসুন, বসুন।

আলাপ হয়ে গেল। ভদ্রলোকের নাম মন্মথবাবু। ফরেষ্ট অফিসে কাজ করেন প্রায় পনেরো বছর। হাজারীবাগে একখানি ছোট বাড়ি করেছেন, স্ত্রী-পুত্র তার সেখানেই থাকে।

বেশ লাগল লোকটিকে। বয়স পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে। রগের দুপাশে চুলগুলোতে সাদার আস্তর পড়েছে। ব্রহ্মতালুর ওপরে ছোট একটুকরো টাক। সদানন্দ, সদালাপী লোক,—চমৎকার গল্প জমিয়ে নিলেন।

বাইরে অন্ধকার হয়ে আসছে। পাহাড় আর জঙ্গল মিলিয়ে যাচ্ছে দৃষ্টির বাইরে। ডাক-বাংলোর খানসামা আমাদের জন্য ট্রেতে করে চা আর একটা লণ্ঠন নিয়ে এল।

চায়ের কাপটা টেনে নিতে যাবেন, ঠিক এমনি সময়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন মন্মথবাবু। আমি চমকে তাকিয়ে দেখলুম, সদানন্দ মন্মথবাবুর মুখের ভাবটা বদলে গিয়েছে মুহূর্তের মধ্যে। তিনি আকস্মিকভাবে যেমন বিবর্ণ তেমনি পাণ্ডুর হয়ে উঠেছেন।

আমি সবিস্ময়ে বললুম, কি হল আপনার ?

তিনি নিরুত্তরে আমার আঙুলের দিকে দেখিয়ে দিলেন।

আমি বুঝতে পারলুম না।—কি হয়েছে ?

—আপনার ওই আংটিটা—

—হ্যাঁ, হীরার আংটি, কিন্তু—

মন্মথবাবু কথাটা শেষ করতে দিলেন না। বললেন, দয়া করে আংটিটা একটু সরিয়ে নিন। দোহাই আপনার ওর দিকে তাকিয়ে আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছে, দম আটকে আসছে।

আমি থতমত খেয়ে হাতটা টেবিলের তলায় সরিয়ে নিলুম। লোকটার মাথা খারাপ নাকি ! কিন্তু তাই বা কেমন করে হবে। এই তো এতক্ষণ দিব্যি সহজ মানুষের মত খাসা গল্প জমিয়ে নিয়েছিলেন। তা হলে এ কি ব্যাপার !

—কিন্তু আমি তো কিছুই—

একচুমুকে মন্মথবাবু আধ পেয়ালা চা গিলে ফেললেন। মুখের রংটা তার এতক্ষণে একটু একটু করে সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বাতাসে ঘন হয়ে আসা মহুয়ার গন্ধটা নিঃশ্বাসের মধ্যে টেনে নিয়ে তিনি হৃদপিণ্ডটাকে পরিপূর্ণ করে নেবার চেষ্টা করলেন। তারপর বললেন, সব বলছি শুনুন।

মন্মথবাবু যা বলেছিলেন, তা তার ভাষাতেই লিখছি :

আমাদের বাড়ি রংপুর জেলার একটা ছোট পাড়াগাঁয়ে। বাবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ছিলেন। যজন-যাজন করেই তার দিন চলত। কিন্তু দিন চলত কথাটা বলা বোধহয় বেশী বলা হবে—দিন তাকে চালাতে হত। কি অসহ্য দুঃখে-কষ্টে ছেলেবেলায় মানুষ হয়েছি, সে কথা মনে পড়লে আজও সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

আমাদের গ্রামটা বহু পুরোনো। একসময় খুব সমৃদ্ধ ছিল—বড় বড় লোকের বাস ছিল। আর ছিলেন একজন রাজা। শোনা যায় মুসলমানের আক্রমণে তার রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়, তিনি সপরিবারে নিহত হন। তারপরে মহামারী আসে, লোকজন পালিয়ে বাঁচে, এতবড় গ্রাম একেবারে শ্মশানের মতো শূন্য হয়ে গিয়ে খাঁ খাঁ করতে থাকে।

আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরেই ঘন জঙ্গলে ঘেরা একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপ পড়েছিল। রাশি রাশি পুরোনো ইট, ভাঙা পাথরের টুকরো—তার ওপরে এলোমেলো জঙ্গল গজিয়েছে। মাঝখানে একটা মস্ত দীঘি, তাতে মানুষ প্রমাণ ঘাস আর নলঘাস জন্মে জলের চিহ্নমাত্র রাখে নি। লোকে বলত, রাজার গড়। সাপের ভয়ে সহজে সেদিকে বড় একটা কেউ পা বাড়াত না।

আমার ছেলেবেলা থেকেই ওর দিকে কেমন একটা ঝোঁক ছিল। আমি ফাঁক পেলেই ওদিকে ছুটে যেতুম। রাজার গড় থেকে কুড়িয়ে আনতুম রংবেরঙের পাথর। ইট আর টিনের টুকরো। আমাদের ছোট ভাঙা ঘরের একপাশে আরো ছোট্ট একটা খেলাঘর ছিল। সেখানে আমার ওইসব মূল্যবান জিনিসপত্র সঞ্চিত থাকত।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় বাবা ঘরে বসে তামাক টানছিলেন। ঘরে আলো ছিল না। রাত্রে সব সময় আলো জ্বালবার মত পয়সা আমাদের ছিল না। হঠাৎ বাবা উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, ওখানে ওটা কি?

তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে আমরা দেখলুম, আমার ছোট খেলাঘরটির ভেতর থেকে একটি উজ্জ্বল আলোর রশ্মি মেঝের ওপরে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

বাবা লাফিয়ে উঠে সেদিকে চলে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই মাকে ডেকে কেমন অস্বাভাবিক গলায় বললেন, সকলকে ঘর থেকে বার করে দাও—দরকারী কথা আছে।

মা ও বাবা দরজা বন্ধ করে কি দরকারী কথা আলোচনা করলেন জানি না। তারপর থেকেই তাদের একটা আশ্চর্য ভাবান্তর লক্ষ্য করলুম। কেউ ভালো করে কথা বলছেন না। একটা অদ্ভুত ভয়, একটা আশ্চর্য আনন্দ, কেমন একটা নেশা যেন তাদের পেয়ে উঠেছে। সারাক্ষণ তাঁরা ফিসফাস করে কথা বলছেন, ছেলেপিলেরা কাছে গেলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছেন, যা, যা, পালা এখান থেকে।

সেদিন ঘুমের মধ্যেও আমরা টের পেলুম, সারাটা চৌপর রাত বাবা পাগলের মতো ঘরের ভেতর পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। আর বিড় বিড় করে বকছেন, হীরে, হীরে—একখানা হীরে। সাত রাজার ধন এক মানিক।

সেই যে বাবার কি হল—আর এক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকতে পারেন না।

এদিকে যান, ওদিকে যান, মাতালের মত বাড়িময় ছুটোছুটি করে বেড়ান। কেউ ডাকতে এলে বেরুতে চান না, কথা বলতে চান না, কেমন বিহ্বলভাবে তাকান।

কেউ হয়তো এসে বলল, ঠাকুরমশাই, সত্যনারায়ণের পুজো আছে, যেতে হবে। বাবা সোজা জবাব দিলেন, না।

—কেন, যাবেন না কেন?

—কেন যাব? বাবা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন: মতলব আছে মনে মনে, কেমন? সন্ধ্যার আঁধারে রায়বাড়ির আমবাগান খুব ভালো জায়গা বুঝি?

লোকে প্রথম প্রথম ভাবত, বাবার মাথায় বুঝি ছিট দেখা দিয়েছে কিন্তু আস্তে আস্তে সত্যি কথাটাই রাষ্ট্র হয়ে পড়ল। খবরটা কে রটালে জানি না, কিন্তু কয়েকদিন পরেই সারা গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ল, ন্যায়রত্ন মশাই হীরে কুড়িয়ে পেয়েছেন।

আর সেই হীরেই হল আমাদের কাল।

গাঁয়ের লোকের আনাগোনা শুরু হল। সকলেই পাকে-প্রকারে হীরে সম্বন্ধে জানতে চায়, খোঁজ নিতে চায়, দেখতে চায়। আমাদের জীবন একেবারে অস্থির করে তুলল।

বাবা মা প্রাণপণে হীরার কথা অস্বীকার করতেন। কিন্তু তারা বিশ্বাস করত না। মুচকি হেসে চলে যেত। কিন্তু পরের দিন অন্য ছুতো নিয়ে আবার আসত, উদ্দেশ্য ওই হীরের খবর নেওয়া। বাবা-মাকে যেন সবাই মিলে পাগল করে দেওয়ার যো করলে! গরীবের একখানা হীরে পাওয়া যে এতবড় অপরাধ সেটা কে জানত।

তারপর একদিন সন্ধ্যার সময় এল পাশের গাঁয়ের অনন্ত স্যাকরা। বললে, ঠাকুর মশাই, আমাকে ভয় কি? হীরেখানা আমাকে বিক্রী করুন, যা ন্যায্য দাম হয়—দেব।

কিন্তু অনন্ত স্যাকরাকেও তো বিশ্বেস করতে পারেন না বাবা। গাঁয়ের সাধারণ স্যাকরা কত টাকা আর তার দেবার ক্ষমতা আছে যে, ওই হীরে সে কিনে নিতে পারে! এ যে সাত রাজার ধন এক মানিক—না জানি কত লাখ টাকাই এর দাম হবে।

অনন্ত অনেক বোঝালে, অনেক লোভ দেখালে, কিন্তু বাবা কিছুতেই কবুল করলেন না। শেষে অনন্ত হতাশ হয়ে উঠে পড়ল। যাওয়ার আগে

বলে গেল, গরীব মানুষ আপনি, অত দামী জিনিস রাখছেন, শেষে ওর জন্মেই আপনার প্রাণটা যাবে। পৃথিবীতে জোচ্চোর, বদমাসের অভাব নেই এটা মনে রাখবেন ঠাকুরমশাই।

বাবা মনে রাখলেন বৈকি! এমন করে মনে রাখলেন যে, আমাদের দুর্ভাগা জীবন একেবারে অভিশপ্ত হয়ে উঠল। নাওয়া নেই—খাওয়া নেই—দিন রাত তিনি হীরেটাকে বুকের মধ্যে চেপে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যজমান বাড়ি যান না, পুজো-আচ্চা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন, বিড়বিড় করে সারাক্ষণ বকছেন, হীরে—হীরে—হীরে—

সংসার অচল হয়ে উঠল, পেটের ভাত আর জোটে না। মা একদিন রাগ করে বললেন, রাজার জিনিস আমাদের সইবে কেন? ওই মুখপোড়া হীরে নদীতে গিয়ে ফেলে দাও।

—কি? কি বললে?

বাবা এমন করে গর্জে উঠলেন যে, মনে হল, মাকে তিনি খুন করে ফেলবেন। মা সামনে থেকে পালিয়ে যেতে পথ পেলেন না।

একখানা হীরে আমাদের জীবনে যে কি অভিশাপ নিয়ে এল, তা বলবার নয়। মা বললেন, শহরে গিয়ে বিক্রী করে এসো, কিন্তু বাবা ভরসা পান না। পাছে কেউ পথে তার কাছ থেকে ডাকাতি করে নিয়ে যায়। সারাক্ষণ তিনি ওটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে বাড়িময় চলে বেড়াচ্ছেন। একখানা হীরে পাওয়ার সৌভাগ্য আমাদের জীবনে নিয়ে এল অভাব, চূড়ান্ত অভাব, আর সেই সঙ্গে মায়ের চোখের জল। ঠাকুরের দরজায় মাথা ঠুকে মা প্রার্থনা করতে লাগলেন: ঠাকুর এ কি সর্বনাশা হীরে আমাদের দিলে! তুমিই এর উপায় করে দাও—আমি পাঁচসিকে সিন্নী দেব।

পাঁচসিকে সিন্নীর লোভে কিনা জানি না, ঠাকুর উপায় করে দিলেন।

দু'দিন পরে মার আর্ত চিৎকারে আমরা ঘর থেকে বাইরে ছুটে এলাম। ভোরের আলো ভালো করে ফোটে নি, তবু তাতে আমরা যা দেখলাম, তা আজও মনে করতে পারি না।

বাবা উঠানের ওপর পড়ে আছেন। মুখের ভেতর কাপড় ঠাসা, যাতে চিৎকার করতে তিনি না পারেন। আর গলার আধখানা ফাঁক হয়ে আছে। তা থেকে তাজা রক্তের স্রোত উঠোনকে ভাসিয়ে দিয়েছে। গরীবের বরাতে হীরে সইলো না। যে ভাগ্যবান, সেই নিয়ে গেছে।

মন্মথবাবু থামলেন। সেই থেকে হীরে দেখলেই আমার মনে জেগে ওঠে ভোরের অন্ধকারের ভেতর সেই ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন। বাবা মাটিতে পড়ে আছেন—সমস্ত উঠোনময় রক্ত। দু'হাতের রক্তাক্ত মুঠি দুটো তখনো কি যেন প্রাণপণে আঁকড়ে আছে—যেন সেই সাত রাজার ধনকে ধরে রাখবার অন্তিম চেষ্টা।

মন্মথবাবু একটা সিগারেট ধরালেন। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ে রাত ঝাঁ-ঝাঁ করছে।

আমার প্রিয়সখী

সন্তোষকুমার ঘোষ

আমার প্রিয়সখীর কথা লিখছি।

সকালে খবরের কাগজটা খুলেই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। আমার হাত কাঁপছিল। আমার মুখও বিবর্ণ হয়ে গিয়ে থাকবে। আমিতো দেখতে পাই নি, রিফ্রেসমেণ্ট-রুমে আর যারা ছিল তারা বলতে পারবে। চায়ের পেয়ালা ফস্‌কে পড়েছিল, কোনক্রমে সামলে নিলাম। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম চেয়ার ধরে। দাম দিয়েছিলাম কি দিই নি, এখন আর মনে নেই। অস্ফুট গলায় একবার বলেছিলাম, বনরেখা, বনরেখা।

আমার এখনই রেল-পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত—এখনই, এখনই, এখনই।

আমি যে অতটা ভেঙ্গে পড়েছিলাম, তার অনেকটাই ভয়ে আর ক্লান্তিতে। সারারাত ঘুমোতে পারি নি। ওয়েটিং-রুমে সমস্তক্ষণ আলো জ্বলছিল, কোথা থেকে ফিরে ফিরে আসছিল দু-তিনটে মশা, আমার কানে গোপন কোন কথা বলতে চাইল; কী সে-কথা, আমি জানি না। ওদের ভাষা আমি বুঝতে পারি নি। হেলানো চেয়ারটাও আরামপ্রদ ছিল না। পিঠ আর কাঁধের কাছটা টনটন্ করে উঠেছিল। ছারপোকার চোরা ছুরি তো ছিলই।

আরও একটা জিনিস দেখলাম, প্ল্যাটফর্মটা কখনও ঘুমোয় নি। মাঝে মাঝে দূর-পাল্লার গাড়ি এসে দাঁড়ায়, হাঁপায়; মনে হয় রেগে আছে। ওরা রেগেই থাকে, নিশান পেয়ে চলে, সেও যেন রাগত ভাবে।

আমি চোখের পাতা খুলেছি আর দেখেছি। একবার প্ল্যাটফর্মটায় পায়চারি করেও এলাম। তখন সব ঠাণ্ডা, নিথর। কয়েকজন কুলী কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিল, দপ্‌ দপ্‌ করে সিগন্যালের আলো। তার বাবু সোজা হয়ে বসে টরেটক্কা করছিলেন।

আবার এসে শুয়েছি হেলানো চেয়ারে। অস্বস্তি যায় নি। অস্থিরতা বোধ করছি। এ কী অনিদ্রা রোগ আমাকে পেয়ে বসল। কেন ঘুমোতে পারছিনা, কেন এই ভয়? ওয়েটিং-রুমে মাঝে মাঝে কারা আসছিল, খানিক বসে হাত-পা ছড়িয়ে, ঘুমিয়ে কিংবা না ঘুমিয়ে ওরা চলে যাচ্ছিল। খুব মৃদু স্বরে কথা বলছিল কেউ কেউ, কী বলছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না। প্রতিটি পায়ের শব্দে পিট্‌পিট্‌ করে করে তাকিয়েছি, আচ্ছন্ন চেতনা, আবিল দৃষ্টি, সব ছায়া-ছায়া দেখছি। ভয়ে আড়ষ্ট, আমি ভেবেছি, ওরা সরে যায় না কেন। আবার সরে গেলেও চমকে উঠেছি। একাকিত্ব নামে ভয়ঙ্কর একটা রাক্ষস এই ঘরের কোথাও লুকিয়ে আছে, হয় তো ওই হ্যাট-ব্যাকটার পিছনে, কিংবা মানুষ-প্রমাণ টেবিলটার তলায়, সে আমাকে এবার গ্রাস করবে। ভাগ্যিস, কারা ভারি-ভারি মেলব্যাগ এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি ঠেলে নিয়ে গেল, সেই ঘর্ঘর শব্দে আমি ভরসা পেলাম, নইলে বুঝি বা মূর্চ্ছাই যেতাম।

সকালে উঠেই চোখে-মুখে ভাল করে জল ছিটিয়ে দিয়েছি। চেহারা দেখেছি আয়নায়। ছি, ছি, চোখের কোলে এত কালি।

তারপর চায়ের ঘরে কী ঘটল আগেই বলেছি। আমার হাত থেকে খবরের কাগজটা পড়ে গেল, চেয়ার থেকে আমি পড়ে যাচ্ছিলাম! চোখে সূচ্যগ্র বিরক্তি আর বিস্ময় নিয়ে ওরা আমার দিকে চেয়েছিল। আমার মনের ভিতরে কী ঘটছিল বলতে পারব না, আমি এ ব্যাপারটা জানতুম। কাল সারা রাত জুড়ে আমার মনে কালো পিঁপড়ের মত ভয় ঝাঁকে ঝাঁকে এসে বসেছে, ছেয়ে ফেলেছে, দংশন করেছে। সেই ভয়ের উৎসে আমি নিমেষে পৌছে গেলাম।

আচ্ছন্ন অভিভূতের মত আমি চায়ের ঘর থেকে উঠে এসেছি। খেয়াল হতে দেখি, বসে আছি রেল-পুলিশের ঘরে। আমার স্যুটকেসটা আমারই সামনে রাখা, টেবিলের ওপরে।

মনে আছে, পুলিশ অফিসারটি মাথা নীচু করে কী লিখছিলেন, আমাকে দেখে মাথা তুললেন। একটু অবাক হয়ে থাকবেন, কিন্তু আমাকে বুঝতে দিলেন না, ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে আবার লিখে চললেন।

আমি বসে আছি। মাথার ওপর পাখা ঘুরছে, দেখছি ঘড়ির কাঁটা সরছে, ওঁর লেখা আর শেষ হয়না। একজন সেপাই এসে দাঁড়াল, সেলাম করল, ক্লিক করল গোড়ালিতে গোড়ালি মিলিয়ে, শুনতে পেলাম। লেখা কাগজটা তার হাতে তুলে দিয়ে অফিসার আমার দিকে চেয়ার ঘুরিয়ে নিয়ে ভারি-ভারি গলায় বললেন, বনরেখা রায়ের মৃত্যু সম্পর্কে কী বলবেন, এবার বলুন।

এবার অবাক হবার পালা ছিল আমার। অফিসারটিও সে কথা বুঝে থাকবেন। হেসে বললেন, ভাবছেন, এ বিষয়েই আপনি কথা বলতে এসেছেন কী করে বুঝলাম? ওয়েল, আমরা সবাই শার্লক হোমস নই, কিন্তু হতে সাধ সবারই অল্প-বিস্তর আছে। ছোট খাটো চমক দেওয়া আমার অভ্যাস। অথচ আমরা সামান্য পুলিশ, আপনাদের ডিটেকটিভ বইয়ে যারা মূঢ়, হাসি-ঠাট্টার পাত্র। গোয়ান্দা-গল্প পড়ে নিশ্চয় আপনাদের ধারণা হয়েছে আমরা ইট-কাঠের মতই নিরেট, খুন-টুনের কিনারা এ দুনিয়ায় শুধু সখের গোয়ান্দরাই করে। তা নয়, শ্রীলা দেবী, আমরাও করি। বেশি বড়াই করেছি বলে যদি মনে না করেন, তবে বলি, আমরাই করি। সামান্য যা বুদ্ধি-বিবেচনা আছে, তাই খাটাই। আর মনে মনে মানবেতর জীব বলে গালাগাল দিতে চান দিন, কিন্তু আমাদের, অর্থাৎ পুলিশের, পশুর মত ইনটুইশন,—মানে সহজাত বোধও আছে। তা দিয়েই অনেক সময় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ি, দু-চারটে লেগেও যায়।

অফিসারটি সিগারেট ধরিয়ে আবার বললেন, আপনার নাম জানতে অবিশ্যি বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হয় নি, আর ও বস্তুটি ইনটুইশন দিয়েও জানা যায় না। সামুদ্রিক বিদ্যা দিয়েও হয়তো যায়, তবে আমি চোখ দিয়ে জেনেছি। নেহাত নিরক্ষর তো নই, আপনার স্যুটকেসের ওপরেই যে লেবেল লাগিয়েছেন তাতে আপনার নাম লেখা আছে। এবার বলবেন, বনরেখা রায়ের সম্পর্কে আপনি কিছু বলতে চান, ধরলুম কী করে? ফ্রাঙ্কলি বলব, ওটা আন্দাজ। খানিকটা, পুরোপুরি নয়। আপনার নামের নীচে লেখা আছে পাটনা। বনরেখাও ওখানে থাকতেন। দিলাম ঢিল ছুঁড়ে। লাগল। না লাগলে আপনি প্রতিবাদ করতেন। এখনও করেন নি।

আমার কপালে ঘাম ফুটছিল। অফিসারটি বললেন, আর দেখুন, রেল-পুলিশের ঘরে মেয়েরা সচরাচর আসে না। আপনি এলেন। এই অংশনে আজ গোলমেলে কিছু ঘটে নি, ঘটলে হৈ-চৈ হত, আমরা এমনিতেই জানতাম। অতএব আপনি এমন কোন বিষয়ে কিছু বলতে চান, সেটা এখানে নয়, অন্য কোথাও ঘটেছে। যে ঘটনার কথা আপনি এইমাত্র জানতে পেরেছেন। সেটা কি হতে পারে? আপনাদের যাত্রীদের জানবার একটা উপায়, প্রায় একমাত্র উপায়, খবরের কাগজ। সেই কাগজেই শ্রীলা দেবী, আজ বনরেখা রায়ের মৃতদেহ আবিষ্কার ছাড়া চাঞ্চল্যকর খবর আর কিছু নেই।

সিগারেট নিভিয়ে অফিসারটি পাখাটাকে আরও জোরে চালিয়ে দিলেন। বললেন, অবশ্য, আন্দাজ আমার ঠিক নাও হতে পারত। কিন্তু ঠিক যখন হয়েছে, তখন আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এবার আপনার কথা বলুন।

তখনকার মত আমি শুধু বলতে পারলাম, এক গ্লাস জল।

সমস্ত গ্লাসটা চক্‌চক্ করে নিঃশেষ করে আমি অফিসারটির হাতেই তুলে দিলাম। আমার হাত তখনও থরথর করে কাঁপছিল।

শ্রীলা দেবী, আপনি অত্যন্ত বিচলিত হয়েছেন। তবু আপনাকে স্থির হতে হবে। অফিসারটির গম্ভীর কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি, একটু সাহসও যেন পেয়েছি।

বনরেখা রায়কে আপনি কতদিন থেকে জানতেন?

তিনি আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন।

আর?

মনে আছে, গুছিয়ে বলতে পারি নি, আমার গলা বারে বারেই কেঁপে গিয়েছে, কখনও অকারণে উঠেছে উচ্চগ্রামে, কখনও একেবারে নিচের পর্দায় নেমেছে। তবু জানতাম, আমাকে বলতে হবে। বলতে হবেই। যখনই খেই হারিয়ে গিয়েছে, মাথা তুলে চেয়েছি অফিসারটির দিকে। ওঁর পেন্সিলটা অক্লান্ত চলছিল। মাথার ওপর পাখাটাও অক্লান্ত চলছিল, আর গম্‌গমে স্টেশন-ইয়ার্ডে মালগাড়ির শান্টিংএর বিরাম ছিল না।

বনরেখা আমার বাল্যসখী। কলকাতায় একই পাড়ায় আমাদের বাসা ছিল, এক্‌ই স্কুলে পড়েছি একই ক্লাশে। সে ফার্স্ট হত, আমি হতাম সেকেণ্ড।

আপনি কোনবার ফার্স্ট হন নি ?

না, একটু লজ্জা পেয়েছি যেন। আবার বলেছি, একবারও না। আমি সেকেণ্ড হতাম বটে, কিন্তু বনরেখা আমার চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে ছিল। একটু থেমে আমি আবার যোগ করলাম, শুধু লেখা পড়ায় নয়, সব বিষয়ে।

অফিসারকে বলতে শুনলাম, অর্থাৎ ?

আমি এসেছি প্রাণের তাগিদে, অদৃশ্য কোন দৈবশক্তির প্রেরণায়। বলতেই তো এসেছি, তবু লোকটা জেরা করছে কেন ? বিরক্ত গলায় বলেছি, অর্থ আপনিই করে নিন। আভাসে বললে আপনি তো বোঝেন না। বেশ, সোজাসুজি বলছি, লিখে নিন। বনরেখা রূপে শুধু আমাকে কেন, বাংলা দেশের অনেক মেয়েকেই হার মানাতে পারত। ওদের বাড়ির অবস্থা খুবই ভাল। যে-মামার বাড়িতে আমি খেয়ে-পরে মানুষ, তিনি ওদেরই ভাড়াটে ছিলেন। ওই পাড়াতেই ওদের আরও দু-তিনটে বাড়ি ছিল বলে শুনেছি। আমার নিজের পড়ার বই প্রায়ই কেনা হত না, বনরেখার কাছ থেকে ধার করে এনে পড়তাম। বরাবরই ওর খুব উদার মন, কখনও কিছু মনে করত না। এমন কি আমাকে অনেকবার বলেছে, তোর নিজের বই নেই বলেই তুই ফার্স্ট হতে পারিস না। থাকলে আমাকে নিশ্চয় হারিয়ে দিতিস। টিফিনের সময় ওর জল খাবার আমরা দু'জনে ভাগ করে খেতাম। এ ছাড়া মাঝে মাঝে কত ছোটোখাটো প্রেজেণ্ট ও আমাকে দিয়েছে তার হিসেব নেই। বড় হয়েও আমাদের বন্ধুত্ব যায় নি। আমরা কলেজেও একই সঙ্গে পড়ি। সেখানেও আমাকে ও অনেক সাহায্য করেছে। তবে আমাদের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে পড়েছিল তো, আমি সকালে-বিকালে দুটো টুইশানি নিয়েছিলাম। তাই কোনক্রমে পাসকোর্সে বি-এ পাশ করলাম, ও উঁচু অনার্স পেল। পরে ও এম-এ আর বি-টিও পাশ করেছিল।

আর আপনি ?—বিয়ে করলেন ?

অফিসারটির অশোভন প্রশ্নে বিব্রত, একটু বিরক্তও হয়ে উঠেছিলাম। আমি এসেছি বনরেখার শোচনীয় মৃত্যু সম্পর্কে কিছু বলব বলে, অপ্রয়োজনীয় নানা প্রসঙ্গ তুলে ওর লাভ কী ? সময় নষ্ট করতে পুলিশের জুড়ি নেই।

তবু মনের ভাব গোপন করতে হল। বিরক্তিটা যথাসাধ্য চেপে বললাম, না। বরং বনরেখাই বিয়ে করেছিল।

কবে শ্রীলা দেবী, কতদিন আগে ?

পড়তে পড়তেই।

কাকে বিয়ে করলেন বনরেখা দেবী? কোনও সহপাঠীকে?

লোকটার কিছু সহজাত বুদ্ধি আছে স্বীকার করতেই হবে। বললাম, হ্যাঁ। তার নাম প্রসাদ রায়।

আপনি তাকে চিনতেন?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললাম, চিনতাম। ঠিক ঠিক বলতে গেলে, প্রসাদের সঙ্গে আমিই বন-র আলাপ করিয়ে দিয়েছিলাম।

ঘটকালি?

এ-কথাটার উত্তর দিলাম না! নির্লজ্জ, না-ছোড় লোকটা আবার বলল, এইবার বলুন তো শ্রীলা দেবী, এই বিয়ে কি সুখের হয়েছিল?

এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারি নি। ঝোঁকের সঙ্গে বলে উঠেছি, মাপ করবেন, অন্যের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে খবর রাখা আমার বৃত্তি নয়।

লেখা থামিয়ে অফিসারটি টেবিলের উপর পেন্সিলটা বাজালেন। মনে হল, হয়ত একটু অপ্রতিভ হয়েছেন। একটু পরে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন, সত্যিই আমার অপরাধ হয়েছে শ্রীলা দেবী। আপনি ক্লান্ত, শোকাতুর, সে কথাটা মনে ছিল না।

ভাবলাম, এবারে উনি বলবেন, আচ্ছা যেতে পারেন। ছুটি পেয়ে আমি নির্জন কোন একটি কোণ খুঁজে নিয়ে একটু কাঁদব, একটু ঘুমিয়ে নেব।

অতটা আশা করা ভুল হয়েছিল। অফিসারটি আমাকে ছুটি দিলেন বটে, কিন্তু সাময়িকভাবে। বললেন, আপনি ওয়েটিং-রুমেই ফিরে যান শ্রীলা দেবী। শুধু একটি অনুরোধ আছে। পরের গাড়িতেই যেন পাটনায় চলে যাবেন না। আমাদের চীফ্ পূর্ণেন্দু মৌলিকের নাম শুনেছেন? তিনি খবর পেয়ে গিয়েছেন ধানবাদে। ওই সেকটরেই খুনটা হয়েছিল কিনা। অকুস্থলের তদন্ত সেরে বোধ হয় শিগগিরই ফিরে আসবেন, এখানেই। তিনি হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা হলে হাতে স্বর্গ পাবেন।

চীফ মৌলিক সাহেব সত্যিই ভদ্র লোক। অসাধারণ চেহারা। অনেকদিন বাড়িতে রাখা পাকা আমের মত রঙ। বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ

শ্রীলাদেবী। আপনি নিজে থেকে আমাদের সাহায্য করতে এসেছেন, কী ভাবে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাব বুঝতে পারছি না। আমাদের পক্ষে আপনিই হবেন মেটিরিয়াল উইটনেস।

বলতে বলতে পকেট থেকে কাগজপত্র বার করলেন মৌলিক সাহেব। খাপ থেকে চশমা বার করে নাকের যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করে বললেন। বাড়ি সার্চ করে, মৃতের জিনিসপত্র ঘেঁটে, কলকাতায় আর পাটনায় তার করে আমরা সামান্য কিছু কিছু খবর সংগ্রহ করেছি, আপনাকে পেয়ে ভালই হল। আমরা মোটামুটি যে তথ্য দাঁড় করিয়েছি, আপনাকে বলছি। আপনি কনফার্ম করবেন। যেখানে মনে হবে আমাদের ভুল হচ্ছে, শুধরে দেবেন। শুনুন।

মৃত বনরেখা রায়ের বয়স আঠাশ কি উনত্রিশ, এম-এ, বি-টি। পাটনার 'গার্লস ওন স্কুলের' প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। পাটনাতেই স্বামীর সঙ্গে বাস করতেন। স্বামী বিশেষ কিছু করে বলে মনে হয় না। শ্রীলা দেবী, ঠিক বলছি ?

আমি বললাম, ঠিক।

প্রসাদ আর বনরেখার বিয়ের পরের ঘটনা আমার মনে ছবির মত ভাসছিল। ওরা গোপনে বিয়ে করবার পরেও অনেকদিন ঘটনাটা জানাজানি হতে দেয় নি। যখন হল, তখন কী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল ওদের রক্ষণশীল পরিবারে। বাড়ির সেরা মেয়ে বনরেখা, তার জন্যে ওঁরা রাজপুত্র গড়বার ফরমাস দেবেন ভাবছিলেন, সেই সময়ে এই বিপত্তি। মা কেঁদেছিলেন, বনরেখা টলে নি। বাবা তর্জন করেছিলেন, ও ভাঙে নি। সেই সময় ওর অসামান্য মনের জোর দেখেছি। ওর দাদা নাকি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, প্রসাদটা তো একটা লোফার। তোর বন্ধু শ্রীলার সঙ্গেই ঘুরতো বলে শুনেছি। ছি-ছি, বন, তুই একটা বাজে লোকের—

দাদা! বনরেখা শালীনতা ভুলে চেঁচিয়ে উঠেছিল।

ওর দাদাও সমানে গলা চড়িয়ে বলেছিলেন, ঠিকই বলছি। আমি জানি, ও কী চায়। তোকে নয়, আমাদের টাকা।

বনরেখার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গিয়েছিল। ও কাঁপছিল। ওর বিষয়ে কাকা তখন বলেছিলেন, এখনও উপায় আছে। এ বিয়ের বিচ্ছেদ হতে পারে! তুই মনটাকে যদি শক্ত করিস, আমি উকিলের পরামর্শ নিতে পারি।

বনরেখা তার মন শক্তই করেছিল। যারা লোফার বলেছে প্রসাদকে, যারা তাকে সন্দেহ করেছে অর্থ-লোলুপ বলে, তার মনুষ্যত্বকে এক কড়ার মর্যাদাও দেয় নি, এক কাপড়ে সেদিনই তাদের আশ্রয় ছেড়ে এসেছে।

মনে মনে ওর মনের জোরকে সেদিন নমস্কার জানিয়েছি। বারবার কামনা করেছি, ওরা যেন জয়ী হয়। প্রসাদ আমার প্রতি সুবিচার করে নি তবুও।

কলকাতায় প্রথম দু'বছর দেখেছি, কী কায়ক্লেশে কেটেছে ওদের সংসার। প্রসাদ অনেক ঘোরাঘুরি করেও একটা কাজ জোটাতে পারে নি। বনরেখা গোটা তিনেক টুইশানি নিয়েছিল, অবসর সময়টুকুতে বিশ্রাম না নিয়ে পড়া তৈরি করেছিল এম-এ পরীক্ষার। পরে বি-টিও ভালভাবে পাশ করল।

বাপের বাড়ি থেকে কতবার ওকে ফিরিয়ে নিতে লোক এসেছিল, যায় নি। গেল, একেবারে শেষের দিন, পাটনার স্কুলটিতে হেড-মিসট্রেসের পোস্টটা পেয়ে মাকে এসে প্রণাম করে।

আমি নিজে তখনও অকূল পাথারে ভাসছি। সেই টুইশানিই করছি, একটা যায়, আরেকটা ধরি। আমার বিদ্যের দৌড় তো বি-এ অবধি। শুধু ওইটুকু সম্বল করে এখনকার মেয়েরা আর ভাল কিছু জোটাতে পারে না। নির্ভরযোগ্য একটা বর পর্যন্ত না।

মনে পড়ল, শেষ টুইশানিটাও যেদিন হাতছাড়া হল, মামীমা বেশী রাত করে বাসায় ফেরবার জন্যে খোঁটা দিলেন, ঠাণ্ডা ভাতের থালা এগিয়ে দিলেন, সেদিন আমিও ঠিক করে ফেললাম, আর নয়।

পাটনার একটা টিকিট কিনে নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলাম।

বনরেখা বদলায় নি। একটু ভারিকী হয়েছে, পদোচিত গাম্ভীর্য এসেছে মুখে কিন্তু মনের প্রসন্নতা যায় নি। একটি সুস্থ-সুন্দর শরীরে মধ্য-যৌবনকে ধরে রেখেছে।

আমাকে দেখে খুশি হল। সব শুনে বললে, তাই তো, কী করি। যাক, দু'চার দিন এখানে থাক তো। ব্যবস্থা একটা হবেই।

এবং ব্যবস্থা সে একটা করে দিল ও। ওদেরই স্কুলে। কোন টিচারের পোস্ট তখন খালি নেই, একটা কেরানির কাজ ছিল। সেইটে আমাকে দিতে ওর কত সঙ্কোচ! বারবার বলেছে, শ্রীলা, এ-কাজ তোর যোগ্য নয়। কিন্তু বিশ্বাস কর, সুবিধে পেলেই তোকে—

কৃতজ্ঞতায় অভিভূত, উপকৃত আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছি, বন, তুই আমার জন্যে যা করলি, সেই ঋণ আমি জীবনেও শোধ দিতে পারব না।

আজও কি পেরেছি ?

ওর পাশাপাশি একটা বাসায় আমার থাকবার জায়গা ঠিক করে দেয় বন। পুরো কোয়ার্টার নয়, ছোট একখানা ঘর।

যদি সেই সময়ে আমার মনে কিছু ছায়া ফেলে থাকে, তবে সেটা ওদের দাম্পত্য জীবনের ছোটখাটো ছবি। গোয়েন্দাগিরি আমার স্বভাব নয়, তবু হঠাৎ মাঝে মাঝে যেটুক্ চোখে পড়েছে, তা থেকে আমার বুঝতে বাকি থাকে নি যে, ওরা সুখী হয় নি। বন কিছু বলতে চাইত না। প্রসাদও আমাকে কিছু বলে নি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাকে প্রসাদ যেন একটু এড়িয়েই চলত, মুখোমুখি পড়ে গেলে জড়সড় হয়ে যেত। ও বুঝি তখনও ভুলতে পারে নি ; আমাকে অকস্মাৎ একদিন ছেড়ে দিয়ে ও বনরেখাকে অবলম্বন করেছিল।

সে সবতো কবেকার কথা কবেই চুকে গিয়েছে। আমিও কি সেই আঘাতের বেদনা একেবারে ভুলে থাকতে চাই নি ?

ওদের ঝগড়া প্রায়ই হত। নিষ্ঠুর কুৎসিত বচসা। আমি টের পেতাম। কতদিনই তো দেখেছি, বনরেখার মুখ থমথমে, গম্ভীর। শক্ত মেয়ে, তাই ; অন্য কেউ হলে কেঁদে-কেটে অনর্থ করত।

প্রসাদ পাটনায় এসেও সুবিধা করতে পারে নি। জুয়া খেলত, রাত কাটাত বাইরে। রেস খেলত। যেদিন জিতত, সেদিন হাত উপুড় করে খরচ করত, হারলে, বনরেখার কাছেই সেই হাত হয়ত চিত করত।

তখনই অনর্থ শুরু হত।

কতদিন শুনতে পেয়েছি, বনরেখা দাঁতে দাঁত চেপে বলেছে, দেবো না, আর এক পয়সাও দেব না আমি। প্রসাদ বলেছে, আলবাত দেবে। আরও বিশ্রী সব ইঙ্গিত করেছে, সেক্রেটারির ছেলে মহাবীরের সঙ্গে বনরেখার গূঢ় সম্পর্কের ইঙ্গিত ক'রে। চটে গেলে, বিশেষত মদ খেলে, ওর হুঁস থাকত না, মুখের আগলও না।

বনরেখাকে বলতে শুনেছি, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি।

প্রসাদ বেরিয়ে যেতও। ঠিক তখনই নয়। হয়তো কিছু পরে। কলকাতায় এসে দিন কতক গা-ঢাকা দিয়ে থাকত। পরে হয়তো আটদশ দিন পরে, কোন শনিবারে রেসে কিছু টাকা রোজগার করে নির্লজ্জ লোকটা আবার পাটনায় আবির্ভূত হত।

বনরেখার জন্য গভীর মমতা বোধ করেছি।

ওদের দাম্পত্য সম্পর্কের ফাঁকিটা শহরসুদ্ধ একরকম জানাজানি হয়ে গিয়েছিল, এ সব বেশিদিন চাপা থাকে না।

দু-একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওকে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরামর্শ দিয়েছে। আমরণ একটা দুর্গ্রহের জের টেনে চলে লাভ কী।

কিন্তু রহস্যময় কোন টানে, বা অন্য কী কারণে, জানি না, বনরেখা কোনদিন রাজি হয় নি। বলত, না-না, ছি ছি। আমরা শিক্ষা বিভাগের লোক। এসব স্ক্যাণ্ডাল হলে সব মান খোয়াব। লোকের কাছে কি মুখ দেখাতে পারব?

যুক্তিতে জোর ছিল। তবু, আমার বারবার মনে হয়েছে, ওর অনিচ্ছার কারণ অন্য। যে আকর্ষণে একদিন সব ছেড়ে প্রসাদের সঙ্গে চলে এসেছিল, সেটা ক্ষয়ে এসেছে বটে, কিন্তু ফুরোয় নি।

মৌলিক সাহেবকে আভাসে এ-সব কথাই বলতে হল। উনি জেরা করে করে জেনে নিলেন। চেয়ারটাকে দেয়ালে ঠেকিয়ে অবশেষে বললেন, আমরা কিছু কিছু জেনেছিলাম। বাকীটাও নিশ্চয়ই কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের গোচরে আসত। শ্রীলা দেবী আপনার কাছ থেকে নির্ভরযোগ্য কিছু খবর পেয়ে ভালই হল। থ্যাঙ্কস্, থ্যাঙ্কস্ এ লট্।

কিন্তু তখনও ওঁর জিজ্ঞাসা ফুরোয় নি। একটু জিরিয়ে নিয়ে, আমাকেও একটু জিরোতে দিয়ে আবার একটি একটি করে অনেক কথা জানতে চাইলেন। আমাকে আবার যা জানি, বলতে হল।

এবার পূজার ছুটিতে আমরা একসঙ্গেই কলকাতা এসেছিলাম। বাপের বাড়ির সঙ্গে খানিকটা বোঝাপড়া তো হয়েই গিয়েছিল, ওখানে বনরেখার উঠতে আর বাধা ছিল না। আমার মামার বাসাও কাছেই। রোজই আমাদের দেখা হত।

এখানে মৌলিক সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, বনরেখার স্বামী? প্রসাদ রায়? সে আসে নি?

একবার ইতস্তত করে বললাম, না। শ্বশুরবাড়িতে ওকে কেউ পছন্দ করে না, সে বোধটুকু ওর ছিল।

মৌলিক সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করে কথাটা শুনলেন।—আই সী। বেশ বলে যান।

বললাম, ছুটি ফুরিয়ে এল। ঠিক ছিল এক সঙ্গেই আমরা পাটনা ফিরব কিন্তু সাতদিন আগে আমাকে আগ্রা যেতে হল। বনরেখাকে বললাম, আমার ফিরতে একটু দেরী হবে ভাই। তুই আলাদাই যা। সে বলল, তা কেন শ্রীলা। তুই শনিবার আসানসোলে এসে থাকবি, আমি ওখান থেকে তোকে তুলে নেব।

বন্দোবস্তে ফাঁক ছিল না, আগ্রার কাজ চুকিয়ে আমি কাল সকালেই ফিরতে পেরেছি—

আগ্রায় আপনার কী দরকার ছিল? অবশ্য গোপনীয় কিছু হলে জানতে চাইব না।

একটুখানি চুপ করে থেকে বললাম, না, বলতে কোন বাধা নেই চাকরির একটা ইণ্টারভিউ ছিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই কখন চোখ দু'টি জলে ভরে গিয়েছে, হঠাৎ টের পেলাম। উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠেছি, এ খেদ আমার মরলেও যাবে না। ইণ্টারভিউ দিলাম, কিন্তু চাকরিটা আমার বোধহয় হবে না। অথচ একসঙ্গে এলে, জানি না, হয় তো, হয় তো বনরেখা বাঁচত, অন্তত এভাবে তার মৃত্যু হত না।

মৌলিক সাহেব মন দিয়ে কথাটা শুনলেন। বললেন, সবই বিধিলিপি বাকিটা বলুন।

তাও বললাম।

বিকেলের দিকে এক্সপ্রেসটায় বনরেখা এল। আমি প্ল্যাটফর্মেই ছিলাম। ও জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। আমি বললাম এ-গাড়ি কেন রে, এটা মেন লাইনের নয়, গ্রাণ্ড কর্ড দিয়ে যাবে। বনরেখা হেসে বলল, জানি। আমি এখানে নামছি না। বরাকরে যাচ্ছি দাদার ওখানে। শুধু দেখা করেই ফিরে আসব; সন্ধ্যার পরে যে-কোন একটা গাড়িতে তুই এখানেই থাকিস্, আমরা রাত্রে পাঞ্জাব মেল ধরব। বললাম আচ্ছা।

মৌলিক সাহেব, মনে হচ্ছিল, ঝিমুচ্ছেন। কিন্তু পরে বুঝলাম, কান দুটি

তার সজাগই ছিল। থামতেই বললেন, তারপর? নিজেই হাসলেন। আপনাকে আর বলতে হবে না। আমিই বলছি মিলিয়ে নিন। বিকেল গেল, সন্ধ্যা হল, বনরেখা ফিরল না। রাত্রি হল। আপনি একের পর এক ডাউন ট্রেন দেখছেন, বনরেখা কোনটাতেই নেই। তারপর একের পর এক আপ মেল আর এক্সপ্রেসগুলোও এল, গেল। পাঞ্জাব মেলও যথা সময়ে চলে গেল। আর আশা নেই দেখে আপনি—খুব সম্ভব ওয়েটিংরুমেই ফিরে এলেন। তাই না?

আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। অস্ফুট স্বরে বললাম, ঠিক তাই।

তারপর আজ সকালের কাগজে দেখলেন, সীতারামপুর আর বরাকরের মাঝামাঝি জায়গায় ওই এক্সপ্রেস গাড়ির একটি প্রথম শ্রেণীর কামরায় কোন মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে। রেলেরই একজন বড় অফিসার ওই গাড়িতে সীতারামপুর থেকে উঠেছিলেন। এই এক্সপ্রেসটার ওখানে দাঁড়াবার কথা নয়, তবু কাল দাঁড়িয়েছিল। অফিসারটির ধানবাদে জরুরী কাজ, সুবিধা পেয়ে তিনি টপ করে ওই গাড়িতে উঠে পড়লেন। কামরার আলো নেবান, সুইচ টিপলেন। ট্রাঙ্কটাকে সীটের নীচে রাখবেন বলে ভিতরের দিকে ঠেললেন। ট্রাঙ্কটা ঢুকল না। আবার ঠেললেন, এবার আরও জোরে। ট্রাঙ্কটা যেন স্প্রিংয়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এল। এবার অফিসারটি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন; তাঁর কপালে শরতের শেষের দিকেও ঘাম জমে উঠল। তবু ট্রাঙ্ক সরে না। তখন হাঁটু ভেঙ্গে নীচে বসলেন তিনি, যা দেখলেন, তাতে তাঁর রক্ত জমে জমে বরফ হয়ে যেতে পারত। সীটের নিচে একটি মহিলার মৃতদেহ। ওখানে বসেই তিনি নিজের বুকের রক্ত চলাচলের ধ্বনি যেন শুনতে পেলেন। গাড়ি পূর্ণবেগে চলছে। বরাকরের ব্রীজ সামনেই। সমস্ত সাহস, দৃঢ়তা, ইচ্ছা একত্রে গ্রথিত করে অফিসারটি চেন টানলেন, গাড়ি থামল। এল গার্ড, সামনের ছোট স্টেশনে খবর গেল। তারে তারে খবরটা রাষ্ট্র হল। ওখানেই লাশ নামান হল। তার টিকিট থেকে এবং ব্যাগ হাতড়ে নাম-ধাম, পরিচয় পাওয়া গেল। শ্রীলা দেবী, এ সমস্তই আপনি কাগজে পড়েছেন। তবু ভয় পাচ্ছেন কেন? নিন, এই কফিটা খেয়ে নিন, অনেকটা সুস্থ বোধ করবেন।

যন্ত্রচালিতের মত গরম কফির কাপটা হাতে নিলাম। চুমুক দিলাম। অবসন্ন গলায় বললাম, এবার যাই?

মৌলিক সাহেবও যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। সচকিত হয়ে উঠে বসে বললেন, আপনি আমাদের অনেক উপকার করলেন শ্রীলা দেবী, কাজ অনেক সহজ হল। আপনি এই তুফানেই ফিরছেন? ঠিকানাটা রেখে যান, কেস উঠলে আপনাকে হয়তো দরকার হবে। সাক্ষী দেবেন। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।

আমাকে দরজা অবধি এগিয়ে দিলেন মৌলিক সাহেব। নমস্কার করে বললেন, আবার দেখা হবে।

হঠাৎ কী হল, আমি এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে বললাম, বনরেখা এখন কোথায়?

মৌলিক সাহেব খুব অবাক হয়েছেন, এমন ভাবে বললেন, সে কী। সব জেনে এই কথা বলছেন? আঙুল তুলে তিনি আকাশটা দেখিয়ে দিলেন।

অপ্রতিভ হয়ে বললাম, না, না, সে কথা বলি নি।

ও, দেহটা? ওঁর আত্মীয়-স্বজনেরা খবর পেয়ে গেছেন তাঁরা বোধ হয় পরের গাড়িতে সবাই আসছেন। শুধু ওঁর স্বামীর কোন খোঁজ পাই নি। শ্রীলা দেবী, আপনি আন্দাজ করতে পারেন, প্রসাদ রায় এখন কোথায়?

বললাম, না। তবে যতদূর জানি, সে হয়তো পাটনাতেই।

কাল আপনার সঙ্গে যখন বনরেখা দেবী জানালায় দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন তখন ওঁর কামরায় আর কেউ ছিল।

আবার সেই জেরা। জেরার পর জেরা। ওঁর হাত থেকে রেহাই পেতে মুখে যা এল তাই যেন বলে দিলাম।—ছিল। যতদূর জানি মনে পড়ছে, একজন ছিল। একেবারে ওধারের সীটে, একজন ভদ্রলোক।

কেমন দেখতে তিনি, কী পোষাক পরেছিলেন?

বললাম, বলতে পারব না। ওদিকে মুখ ফিরিয়ে তিনি শুয়েছিলেন, এইটুকু মনে আছে। আমি ভাল করে দেখতে পাই নি, ওর কামরায় তখনও আলো জ্বালান হয় নি, ভদ্রলোকের পরনে পা-জামা ছিল, যতটা মনে করতে পারছি, বেশ লম্বা-চওড়া, সুপুরুষ।

আচ্ছা শ্রীলা দেবী, প্রসাদ রায় দেখতে কেমন?

কেন, বেশ লম্বা চওড়া সুপুরুষ—

মৌলিক সাহেব হেসে উঠলেন। সেই হাসির ধরণটা আমার একেবারে ভাল লাগল না। বিশেষ করে মৌলিক সাহেব হাসি থামিয়ে যখন বললেন,

আপনি কি শপথ করে বলতে পারবেন, শ্রীলা দেবী যে, যাকে শুয়ে থাকতে দেখেছেন সে প্রসাদ রায় নয়?

আমার মুখ শুকিয়ে গেল। অজ্ঞাতসারে, অসতর্কভাবে আমি কি তবে প্রসাদকে এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে ফেললুম। ছিঃ, তাই যদি হয়, তবে আমার অনুশোচনার যে অবধি থাকবে না। কম্পিত গলায় বললাম, মিস্টার মৌলিক, আমি তো শুধু লম্বা-চওড়া, আর সুপুরুষ বলেছি। ওরকম ভাসা-ভাসা বর্ণনা থেকে আপনি তো হাজার হাজার লোককে সনাক্ত করে বসবেন?

মৌলিক সাহেব হা-হা করে হাসলেন।—ওখানেই ভুল করলেন। সনাক্ত আমি কাউকে করছি না। তবে হ্যাঁ, সন্দেহের একটা দিক আছে, সেটা ভেবে দেখতে হয় বই কি। আমরা কী ভাবে সন্দেহ করি জানেন?

ভয়ে ভয়ে বললাম, কী ভাবে?

ডাক্তার যে-ভাবে রোগ নির্ণয় করেন, সেই ভাবে। অর্থাৎ লক্ষণ আর নজির মিলিয়ে। শতকরা আশীটি ক্ষেত্রে তাতে ভুল হয় না। ধরুন আমরা প্রথমে বিচার করি, মৃতের শত্রু কে বা কারা ছিল। কার সঙ্গে তার তুমুল কলহ হয়েছিল, বা হয়ে থাকে। মৃত্যুর ক'দিন আগে। তার পরে প্রশ্ন ওঠে, মৃত্যুতে কার বা কাদের লাভ হল। কার পথের কাঁটা দূর হ'ল, কে পাবে উইল বা ইন্সিওরেন্সের টাকা। শ্রীলা দেবী, এখানেই আসে আত্মীয় কুটুম্বের কথা। এই 'হুডানিটে'র অর্থাৎ 'কে করেছে'র পদ্ধতির পরের প্রশ্ন, কার সুযোগ সবচেয়ে বেশি ছিল। কে বা কারা অকুস্থলে ঘটনার সময়ে ছিল, কে-কে ছিল না। যারা ছিল না, তারা বেকসুর খালাস। তবে এই অনুপস্থিতি বা আমরা যাকে বলি alibi, প্রমাণ করা শক্ত, এতটুকু সন্দেহের অবসর থাকলে চলবে না। আর একটা ছোট প্রশ্ন থাকে, সেটা জানলে তদন্তের সময় আমাদের সুবিধে হয়; মৃতকে সবচেয়ে শেষে কে জীবিত দেখেছে। আর, মৃতদেহটি প্রথমে কার চোখে পড়ে, সৌভাগ্যক্রমে আমরা এ দু'জনকেই জানি। বনরেখাকে শেষবার জীবিত দেখেছেন আপনি, আসানসোলে মৃতদেহ প্রথম চোখে পড়ে রেলওয়ে অফিসারটির। অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে নিঃসন্দেহে জানা গেল, ঘটনাটা আসানসোল থেকে সীতারামপুরের মধ্যেই কোথাও ঘটেছে। শ্রীলা দেবী, আপনার সাক্ষ্য যদি নির্ভুল হয়, তবে সময়টুকুর মধ্যে ওই কামরায় লম্বা, চওড়া বলে যাকে বর্ণনা করেছেন, সে ছাড়া কেউ ছিল না। সেই

লোকটি যদি দেখতে প্রসাদের মত হয়, তবে অবশ্যই আমরা খোঁজ নেব, প্রসাদ সেই সময়ে পাটনায় ছিল, না কলকাতায়, না ওই গাড়িতেই।

স্পষ্ট যেন দেখতে পেলাম, প্রসাদকে ঘিরে একটি জাল ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। মরীয়ার মত বলে উঠলাম, কাজটা তো অপরিচিত লোকেরও হতে পারে।

মৌলিক হাসলেন। পারে। তবে সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য বা লাভের কথাটা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং মোটা। নগদ টাকার লোভে গুণ্ডা ধরণের লোকেরা এসব করে বটে, কিন্তু বনরেখা দেবীর সঙ্গে টাকা গহনা ইত্যাদি সামান্যই ছিল। আর, যতদূর বুঝেছি, আততায়ী একটি গহনাও স্পর্শ করে নি, সুতরাং লোভের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে ওঁর হাতব্যাগ থেকে দুশো টাকাও উধাও হয়েছে। টাকাটা সামান্য, এর জন্য কেউ মানুষ খুন করবে বলে মনে হয় না। আর একটা কথা আপনাকে বলি শ্রীলা দেবী, যার হাতে বনরেখার প্রাণ গয়েছে, সে অপরিচিত ছিল না।

কিসে বুঝলেন ?

তা'হলে ধ্বস্তাধস্তির চিহ্ন থাকত। যে একাজ করেছে, তাকে বনরেখা চিনতেন, পাশে বসতে দিয়েছিলেন, হয়তো মুখোমুখি বসে গল্প করেও থাকবেন। তারপর সুযোগ বুঝে আততায়ী ঝাঁপিয়ে পড়ে, এবং বনরেখাকে আত্মরক্ষার সুযোগটুকুও না দিয়ে গলা টিপে হত্যা করে। কণ্ঠনালীতে গভীর দুটি দাগ আছে। থাক বলব না, আপনি আবার ভয় পেয়েছেন। আপনার মন এত দুর্বল ? যাক, অনেকক্ষণ আটকে রেখেছি, আপনি একটা শুধু খবর বলুন। আপনার মনে আছে, বনরেখা কী রঙের জামাকাপড় পরেছিলেন ?

ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম, আছে। সবুজ জর্জেটের শাড়ি; আর লাল ওভারকোট।

আশ্চর্য, মৌলিক বললেন, আশ্চর্য। ঠিকই মিলছে। মৃতদেহে ওই পোশাকই ছিল। আপনি ছাড়া এই স্টেশনেই ওঁকে আর একজন দেখেছে, গাড়ির কণ্ডাক্টর গার্ড। তাকে ডেকে দাঁড় করিয়ে বনরেখা বরাকর থেকে ফেরবার গাড়ি কখন কখন আছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

এর মধ্যে আশ্চর্য কোনটা ?

আশ্চর্য এই পোশাকটা। শ্রীলা দেবী, এই অক্টোবরের শেষে, দিনের বেলায় এই অঞ্চলে এখনও পাখা চালাতে হয়, কেউ কি ওভারকোট পরে ?

বনরেখা ভারি শীত কাতুরে ছিল। আমি বললাম।

মৌলিক আমাকে নিজে গাড়িতে বসিয়ে দিলেন। ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, উনি আস্তে আস্তে বললেন, প্রসাদকে আমরা স্বভাবতই সন্দেহ করব, শ্রীলা দেবী। কিছু মনে করবেন না, পুরনো কথা আপনি হয় তো একেবারে ভুলতে পারেন নি, প্রসাদ কে এখন ও স্নেহ করেন, বা প্রীতির চোখে দেখেন—

না—না, আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম।

সে কথায় কর্ণপাত না করে মৌলিক বলে গেলেন, তাই তাকে বাঁচাতে চাইছেন। আর, আপনি হয় তো জানেন, গোয়েন্দা কাহিনীতে প্রথমে এবং সহজেই যার ওপর সন্দেহ আসে, সে সাধারণত অপরাধী হয় না। আসল জীবনে কিন্তু ঠিক তার উল্টো। অন্তত আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাই বলে। প্রথম অনুমানটাই খাঁটি হয়। অতএব, শ্রীলা দেবী, প্রসাদ রায়কে আমরা খুঁজে বার করবই। এইটুকু জানি, গতকাল সে পাটনায় ছিল না। কলকাতায় ছিল কি না, তাও জানতে আমাদের দেরি হবে না।

গাড়ি ছেড়েছিল। উনি কয়েক পা সঙ্গে সঙ্গে এলেন। হাত তুলে নমস্কার করে বললাম, আবার দেখা হবে।

উনি বললেন, নিশ্চয়ই।

যত তাড়াতাড়ি দেখা হবে ভেবেছিলাম, তার চেয়েও কিছু আগেই হল। বোধ হয় দু'তিন দিন পরে স্কুল থেকে ফিরে দেখি, মৌলিক সাহেব। সেই শালপ্রাংশু উন্নত দেহ, কিন্তু বিনয়ানত ভঙ্গি। বললেন, নমস্কার।

এই সন্ধ্যাবেলা পুলিশের লোক—আগন্তুক হিসাবে বিশেষ বাঞ্ছনীয় মনে হল না।

তবু বসতে বললাম। কলঘরে গেলাম তাড়াতাড়ি। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে যেন সাহস ফিরিয়ে আনতে চাইলাম। ফিরে এসে দেখলাম, উনি ঘুরে ঘুরে ঘরটা দেখছেন। বললেন, এনকোয়ারিতে এসেছি। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।

বললাম, বেশ তো, বসুন।

উনি বসলেন। দেখি, উত্তর দিকের জানালাটার দিকে বারবার চাইছেন। তাড়াতাড়ি বললাম, ওদিকেই বনরেখার কোয়ার্টার।

বললেন, জানি।

আমি আবার বললাম, আজকাল বন্ধ করে রাখি।

মৌলিক সাহেব কিছু বললেন না। খানিকক্ষণ আমিও না। শেষে নীরবতা ভাঙতেই জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু কিনারা হল?

উনি যেন অন্যমনস্ক ছিলেন। বললেন, কিনারা? হ্যাঁ, কিনারা প্রায় করে এসেছি। এখন শুধু হাতকড়া পরাতে পারলেই—

কে? অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটা তীব্র চীৎকার আমার গলা চিরে বেরিয়ে এল। কে, মৌলিক সাহেব, প্রসাদই কি?

মৌলিক রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসলেন, প্রসাদ? হ্যাঁ, প্রসাদ হতে পারে। আরও দু' একটা খবর নিচ্ছি। আপনি কিন্তু একটা জিনিস আমাদের কাছে লুকিয়ে গেছেন, শ্রীলা দেবী। এই পূজার ছুটিটায় প্রসাদ কলকাতাতেই ছিল।

ছিল?

মৌলিক ধীরে ধীরে বললেন, ছিল। এও জানি, বনরেখার সঙ্গে ওর প্রায়ই দেখা হত। বনরেখা দেখা করতে চাইত না, কিন্তু জুয়াড়ি, লম্পট লোকটা নাছোড়। মাঝে মাঝে দশ-বিশ টাকা কলকাতাতেও চেয়ে নিত।

আমি জানি।

জানেন, কিন্তু আমাদের বলেন নি। আপনি প্রসাদকে বাঁচাতে চেয়েছেন। গম্ভীর গলায় মৌলিক বলে উঠলেন, আপনাকে সেদিন বলি নি শ্রীলা দেবী, প্রত্যক্ষ সন্দেহ যার ওপরে পড়ে অধিকাংশ বাস্তব ক্ষেত্রে অপরাধী সেই হয়? তবে শুনুন। প্রসাদের মোটিভেরও অকাট্য প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আপনি চেপে গিয়েছেন, কিন্তু জেনেছি, শেষের দিকে ওদের কোনরকম দাম্পত্য সম্পর্ক ছিল না বললেই হয়। ডিভোর্স ঘটিত স্ক্যাণ্ডালের ভয়ও বনরেখা অতিষ্ঠ হয়ে শেষ অবধি জয় করেছিলেন। এবার কলকাতায় আইনজ্ঞের পরামর্শ নিতেই এসেছিলেন। উকিলের বাড়িতে গোপনে যখন যেতেন, তখন সঙ্গে কে থাকত জানেন?

কে?

আপনাদের স্কুলের সেক্রেটারীর ছেলে মহাবীর। হয়ত—হয়ত বিবাহটা বিচ্ছিন্ন হলে বনরেখাকে সেই বিয়ে করত। আপনি এদিকটা সম্পর্কে আমাকে বিশেষ কিছুই বলেন নি, শ্রীলা দেবী।

আমার রুচিতে বেঁধেছিল।

অর্থাৎ সত্য গোপন করেছেন। যাক, আমার মুখেই তবে শুনুন। মহাবীরও পূজার ছুটির বেশীর ভাগ সময়েই কলকাতায় কাটিয়েছে। ব্যাপারটা প্রসাদও অনুমান করে থাকবে। ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে সেও কলকাতায় যায়।

তারপর?

মোটিভের কথা বলছিলাম। কলকাতায় গিয়ে বনরেখাকে অনেক বোঝায় প্রসাদ, অনেক কাকুতি-মিনতি করে। কিন্তু বনরেখা অটল ছিল। প্রসাদকে সে দয়া করে দশ-বিশ টাকা দিয়েছে বটে, কিন্তু আমল দেয় নি।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, আমার ঘরের পর্দা কাঁপছে, জড়সড় হয়ে চৌকিতে বসলাম। কম্বলটা টেনে দিলাম পায়ের ওপর। বললাম, অর্থাৎ বলতে চান, হিংসার বশেই প্রসাদ—

উঁহু। শুধু হিংসা নয়। শ্রীলা দেবী, জেনুইন মোটিভও ছিল। বনরেখা রায়ের দশ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্সের কথাটা ভুলছেন কেন? এই টাকাটার নমিনি প্রসাদ, বিবাহ বিচ্ছিন্ন হলে নিশ্চয়ই নমিনি বদলাত, টাকাটাও বেহাত হত।

সেই মুহূর্তে টের পেলাম, প্রসাদের আর কোন আশা নেই, ফাঁসটা ওর গলায় ক্রমশ আঁট হয়ে বসেছে। দু'হাতে চোখ ঢেকে আস্তে আস্তে বললাম, ওকে কি আপনারা গ্রেপ্তার করেছেন?

না, শ্রীলা দেবী। একটুখানি মুস্কিল আছে যে। লোকটার মোটিভ যেমন আছে, alibiটাও তেমনি যে জোরালো। সেদিন ও যে ওই গাড়িতে ছিল, তার কোন প্রমাণ নেই। বরং শনিবার ওকে কলকাতায় রেসের মাঠে বিকেল বেলাতেও দেখা গিয়েছে—অন্তত ছ' সাতজন লোক তার সাক্ষী। ও একটা বড় পেমেন্টও পেয়েছে। ডবল টোটের দুটো লেগই মিলিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা প্রকাশ্যে একটা ক্লাবে বন্ধুদের নিয়ে হল্লা করেছে। একই সময়ে লোকটা দিব্য দেহধারী না হলে দুটো জায়গায় হাজির থাকতে পারে না। ক্রাইম ডিটেকশনে শ্রীলা দেবী, অলৌকিকের স্থান নেই।

সুতরাং?

সুতরাং আপাতত যতদূর মনে হচ্ছে লোকটা নির্দোষ। তবে কলকাতার পুলিশ ওকে এখনও নজরে রেখেছে। আসলে কেসটার এখন তদন্ত করছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, আমরা রেল-পুলিশ তদন্তে সহায়তা করছি মাত্র!

সম্মোহিতের মত শুনছিলাম। হাওয়া আরও জোরাল, আরও কনকনে

হয়ে উঠেছিল। বাইরের রাস্তায় কয়েকটা কুকুর বিশ্রী সুরে ডাকছিল। বললাম, এখন আপনাদের তবে কাকে সন্দেহ, মহাবীরকে?

মৌলিক বললেন, আপনি বুদ্ধিমতী। মহাবীরকেও সন্দেহ করা যায় বৈ কি! বিশেষত, ওর একটা আচরণ তো রীতিমত রহস্যজনক। আপনি কি জানেন, বনরেখার মৃত্যুর দিন থেকে লোকটা উধাও হয়েছে? এখানে নেই, কলকাতায়ও নেই।

নেই?

না। আরও শুনুন, ওর নামে ওই গাড়িতেই একটা বার্থ রিজার্ভ করা হয়েছিল। তবে ও যে স্টেশনে এসেছে বা গাড়িতে উঠেছে, তার কোন প্রমাণ নেই। প্ল্যাটফর্মে রিজার্ভ বার্থের যাত্রীদের নামের লিস্ট যার কাছে থাকে, সেও কিছু বলতে পারে না। অবশ্য তাতে কিছু প্রমাণ হয় না, কেন না, ওরা অনেক সময় ভুল করে।

তবে কি ওই অপরাধী?

হতে পারে। মৌলিক চুরুট ধরিয়ে বললেন, ঠাণ্ডার দিনে এই জিনিসটা আরামপ্রদ। হাাঁ, মহাবীর অপরাধী হতে পারে। তবে কী জানেন, ওর alibi অর্থাৎ অনুপস্থিতির জোরাল কোন প্রমাণ নেই বটে, কিন্তু মোটিভ ও তো তেমন কিছু নেই। বনরেখার মৃত্যুতে ওর লাভ কিসে? হয়ত, হয়ত— মৌলিক ইতস্তত করে বললেন, আর ও এমন কিছু রহস্য আছে, যা আমরা জানতে পারি নি।

বলতে বলতে মৌলিক ওঁর চেয়ারটা আমার চৌকির কাছে নিয়ে এলেন, কানের কাছে মুখ এনে বললেন, শ্রীলা দেবী, আপনিও আমাদের সব কথা বলেন নি!

আমি দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে সিলিঙের শিকারী টিকটিকিটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলেছি, কী কী বলি নি?

ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল, মৌলিক উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলেন। ফিরে এসে স্থির কণ্ঠে বললেন, সবই বলব।

উনি এগিয়ে এসেছিলেন। আমি সরে গিয়েছিলাম চৌকিটার একেবারে ওপাশে জানালায় ঠেস দিয়ে বসেছিলাম। বন্ধ জানালা, ও পাশেই বনরেখার কোয়ার্টার ছিল।

মৌলিককে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, চোখ বন্ধ করে ছিলাম। আমার

ছোট্ট ঘরটা জুড়ে একটি গম্ভীর কণ্ঠ, নিষ্কম্প, অবিচলিত, অন্য কোন অস্তিত্ব নেই।

সবার আগে আপনাকে আমাদের ছোট একটা ভুলের খবর দিয়ে শুরু। শ্রীলা দেবী। বনরেখা আসানসোল আর সীতারাম পুরের মধ্যে নিহত হন নি। হয়েছিলেন বর্ধমান আর আসানসোলের মাঝামাঝি কোনখানে।

অবিশ্বাসী কণ্ঠে বলে উঠলাম, সে কি!

মৌলিক হাত তুলে আমাকে ইঙ্গিতে থামতে বললেন। ব্যস্ত হবেন না। হ্যাঁ, বনরেখা সম্ভবত আণ্ডালের কাছাকাছি কোন জায়গায় খুন হয়েছিলেন। অন্তত আমাদের ডাক্তারি রিপোর্ট তাই বলে। আসানসোলের পরে যদি খুন হতেন, তবে সীতারামপুরেই তো ওঁর দেহ আবিষ্কৃত হয়, অত তাড়াতাড়ি রিগর মার্টিস আসত না, শরীরটা শক্ত, ঠাণ্ডা আর ভারি হয়ে যেত না। আরও গরম থাকত।

কিন্তু আমি বলে উঠলাম, আমি যে ওকে এখানে, এই স্টেশনেই দেখছি মিস্টার মৌলিক। সে যে আমার সঙ্গে কথাও বলেছে।

মৌলিক সাহেব আবার বললেন, আস্তে। আপনি দেখছেন। ওখানেই তো যত খটকা শ্রীলা দেবী। আমাদের ভাবিয়ে তুলেছিলেন। পরে কিন্তু ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল। আপনি দেখেছেন। বনরেখা রায়কে এই স্টেশনে একমাত্র আপনিই দেখেছেন শ্রীলা দেবী, আর কেউ দেখে নি।

অত্যন্ত জোর দিয়ে বলে উঠলাম, মিথ্যে কথা। আপনি নিজেই বলেছেন, অন্তত আর একজন দেখেছে। এক্সপ্রেসের কণ্ডাক্টার গার্ড। বনরেখার সঙ্গে সে কথা বলেছে, আপনি নিজেই বলেছেন।

চোখ দুটি অতিশয় ছোট করে মৌলিক সাহেব বললেন, সে যদি আপনাকেই দেখে থাকে, শ্রীলা দেবী?

হেসে উঠলাম, সেই হাসি দেয়াল থেকে দেয়ালে ঘা খেয়ে আবার আমার কানেই ফিরে এল। তখন বললাম, আপনি পাগল, মৌলিক সাহেব। কণ্ডাক্টার কি লাল ওভারকোট দেখে নি?

উচ্চহাসি দিয়ে মৌলিক সাহেব আমার হাসিটারই যেন জবাব দিলেন। শ্রীলা দেবী, বুদ্ধিমতী হয়েও আপনি একটা যুক্তিহীন কথা বললেন। পোশাকটা তো আসলে খোলস। এক রঙের খোলস কি দুটো মানুষের হয় না?

এবার আমার গলা কেঁপে গিয়েছে, তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠে দুর্বলতাকে চাপা দিতে চেয়েছি। কী, কী বলতে চান আপনি ?

আমার চোখ দিয়ে ঘৃণা, আতঙ্ক ফুলঝুরির মত ঝরছিল। হিস হিস করে বললাম, অভদ্র কোথাকার।

মৌলিক সাহেব দরজার পাশে দাঁড়ালেন। নির্বিকার গলায় বললেন, কোয়াইট। কিন্তু হত্যাকারী নই। শ্রীলা দেবী, আপনার প্রিয় সখী বনরেখা রায়কে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী হত্যা করার অভিযোগে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলাম।

কতক্ষণ কেটে গিয়েছিল মনে নেই। হয়ত জ্ঞান হারিয়ে থাকব। সম্বিত ফিরে এলে দেখি, ঘরে আরও অনেক লোক, তাদের আমি চিনি না। একজন ভদ্রলোক আমার নাকের কাছে স্মেলিং সল্টের শিশি ধরে আছেন।

মৌলিক সাহেবকেও দেখতে পেলাম। হেলান চেয়ারে কাত হয়ে পা দুটো শূন্যে তুলে রেখেছেন। ইঙ্গিত ওঁকে আমি কাছে ডাকলাম। উনি এলেন।

তখন আমিও অবসন্ন। ক্ষীণ গলায় বললাম, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

বলুন। স্নেহার্দ্র কণ্ঠ, পূর্ব উত্তাপের লেশ মাত্র নেই।

ওদের চলে যেতে বলুন।

মনে আছে, সকলে চলে গিয়েছে, বালিশে মাথা রেখে আমি শুয়ে আছি। মৌলিক সাহেব চেয়ার টেনে এনে কাছে বসেছেন।

কী বলবেন বলুন ?

বললাম। নির্বোধের মত শোনাল জানি, তবু বললাম—কী করে—কথাটাকে আমি সম্পূর্ণ করতে পারলাম না।

উনি সহায়তা করলেন। কী করে ধরলাম জানতে চাইছেন তো ? সত্যি বলতে কি, প্রথমে আমার প্রসাদকেই অপরাধী মনে হয়েছিল। কিন্তু খটকা লেগেছিল পোশাকটায়। একে লাল রঙ, তাতে অকালে ওভারকোট, এমন অদ্ভুত পোষাক বনরেখা কেন পরবেন ? যেই পরে থাক, সে নিজের প্রতি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিল, সন্দেহ রইল না। তখন ভাবলাম, কেন, কেন ? কোন সদুত্তর পেলাম না। তখনও জানতাম না, ঘটনাটা আসানসোলের পশ্চিমে ঘটে নি। ডাক্তারি রিপোর্টে যখন নিশ্চিত ভাবে

জানা গেল, বনরেখা আস্তালের কাছাকাছি কোথাও নিহত হয়েছেন, তখন খটকা আরও বাড়ল। লাল ওভারকোট পরা মহিলাকে আসানসোলে দেখা গিয়েছে, তিনি যদি বনরেখা নন, তবে কে? তখন জিজ্ঞাস্য হল, তাঁকে কে কে দেখেছে? দেখেছে কণ্ডাক্টার গার্ড, কিন্তু বনরেখাকে সে চেনে না, সে শুধু পোশাকটাকেই মনে করে রেখেছে।

আর দেখেছেন আপনি। আপনি মৃত মহিলাটির আবাল্য বন্ধু, শুধু পোশাক দিয়ে আপনার চোখে ধুলো দেওয়া তো সহজ নয়। তবে, তবে কি—

আমার ভাবনা সেই প্রথম স্পষ্ট সন্দেহের রূপ নিল। যে বর্ধমানের পর বনরেখাকে হত্যা করেছে, সেই পরে লাল ওভারকোট পরে আসানসোলে জানালা থেকে মুখ বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু আপনার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারত না। সে যে স্ত্রীলোক, তাতে সন্দেহ নেই, কেন না পুরুষ মেয়ের কোট পরবে না, এবং অস্পষ্টভাবে যেন বুঝতে পারলাম, হয় আপনি তাকে বাঁচাতে চান, নয়ত সে-ই আপনি। কেননা আগে বলেছি, আসানসোলেও বনরেখা যে জীবিত ছিলেন একথার একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাক্ষী আপনি।

তবে একটা খটকা তখনও ছিল। হত্যাকারীকে বনরেখা চিনতেন! সে তাঁর সঙ্গে পাশাপাশি বসেছে। এ ব্যাপারটা যদিও আপনার দিকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, তবু নিঃসন্দেহ হতে পারছিলাম না একটা কারণে। যিনিই হত্যা করে থাকুন, তাঁর গায়ে তো অনেক জোর হবে। কেননা, বনরেখা সহজেই পরাভূত হয়েছিলেন, কোন ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন দেখি নি। আপনি তো তেমন বলশালী নন। তবে?

এই তবেরও উত্তর পেলাম পোস্টমর্টেম রিপোর্টে। বনরেখার ফুসফুসে ক্লোরফর্মের গন্ধ ছিল। আততায়ী কৌশলে ক্লোরফর্ম ব্যবহার করে বনরেখাকে আচ্ছন্ন করেছিল। বনরেখাকে কেউ কোনদিন লাল ওভারকোট পরিহিত অবস্থায় দেখে নি। ওটা তবে হয়ত আপনার। লাল ওভারকোটটা আপনি যে দর্জিকে দিয়ে করিয়েছিলেন তার ঠিকানা সংগ্রহ করেছি শ্রীলা দেবী। কিন্তু ক্লোরফর্ম পেলেন কোথা থেকে, জানাবেন?

উত্তর দিলাম না।

মৌলিক নিজেই বলে গেলেন, শেষ যে প্রশ্নটার মীমাংসা বাকি ছিল, এবার সেটাকে নিয়ে পড়লাম। আপনার alibi। হত্যা যদি আস্তালে ঘটে

থাকে, আপনি সেখানে কি করে গেলেন! সকালেই তো আদ্রা থেকে আপনি আসানসোলে এসেছেন।

আবার অনুসন্ধান। শ্রীলা দেবী, দেখলুম আপনার স্টেটমেন্টের এই অংশটুকুও সত্য নয়। আপনি আদ্রা থেকে আসানসোলে তো ফেরেন নি, আগের রাত্রে বি, এন, আর লাইন দিয়ে ফিরেছিলেন হাওড়ায়। তারপর বনরেখার সঙ্গে একই এক্সপ্রেসে উঠেছেন, সম্ভবত বর্ধমান পর্যন্ত অন্য কামরায়। পরে, বর্ধমানে যখন বনরেখার গাড়িতে এলেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব খুশি হয়েই আপনাকে ডেকে নিয়েছিলেন। শ্রীলা দেবী, মহাবীরের নামে হাওড়া থেকে ভুয়ো বার্থ রিজার্ভেশন—সেও কি আপনি করিয়েছিলেন? শুধু সন্দেহটাকে নানা পাত্রে ছড়িয়ে দেবার জন্যে?

এবারও কোন উত্তর দিলাম না।

আপশোষ সূচক একটা অব্যয় উচ্চারণ করে মৌলিক বললেন, এত প্ল্যান, এত সতর্ক আয়োজন কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারলেন না শ্রীলা দেবী। সেই স্টেশনে আপনাকে সকালে তো কেউ দেখে নি। অনুমান করছি, কণ্ডাক্টার গার্ডের সঙ্গে কথা বলে আপনার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনি উল্টো দিকের দরজা দিয়ে অলক্ষ্যে নেমে পড়েছিলেন। তার আগে আপনি নিজের লাল কোটটি খুলে মৃতদেহে জড়িয়ে দিয়েছেন, তাকে ঠেলে দিয়েছেন সিটের নিচে। নেমে এসে নিজের পোশাকে ঢুকেছেন ওয়েটিংরুমে। তখন সমস্ত রাত্রি অনেকেই আপনাকে ওখানে দেখেছে। হত্যাকাণ্ডটা আসানসোলের পশ্চিমে ঘটেছে, এটা যদি প্রমাণ হত, তা'হলে শ্রীলা দেবী আপনাকে ছোঁয়া যেত না। আপনার alibi পাকা হত।

আস্তে আস্তে বললাম, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, ওই কামরায় লম্বা-চওড়া সুপুরুষ এক ভদ্রলোক ছিলেন।

শ্রীলা দেবী, সেও ভুয়ো। আর কেউ নাও থাকতে পারে। আপনার মুখের কথা ছাড়া তার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নেই। তাকে আপনি সৃষ্টি করেছিলেন, বোধহয় প্রসাদ রায় বা মহাবীরের পিছনে আমাদের ছুটিয়ে হয়রান করে দেবার জন্যে। না, শ্রীলা দেবী, আর মিথ্যে বাড়াবেন না। আমরা ক্লান্ত, ক্লান্ত আপনিও।

আশ্চর্য, আমার ক্লান্তি কিন্তু দূর হয়েছিল! আমি সোজা হয়ে

বসেছিলাম। হেসেছিলাম, হ্যাঁ, তখনও হাসতে পেরেছিলাম। একটু ঠাট্টাও করেছিলাম মৌলিক সাহেবকে।

ওঁর চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলেছি, আমার অপরাধ এখনও কিন্তু প্রমাণ হয় নি। এত দীর্ঘ বক্তৃতাতেও মোটিভ বা উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গটা কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। অথচ, আপনিই বলেছেন, উদ্দেশ্যেরও একটা সন্তোষজনক প্রমাণ থাকা চাই। বনরেখা আমার বন্ধু, নানাভাবে তার কাছে উপকার পেয়েছি। তার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। তাকে গভীর শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম। আমিই তার মৃত্যু ঘটাব, অন্য যত প্রমাণই আপনার কাছে থাক, এ কথাটা ব্যাখ্যা করে আদালতকে বোঝান আপনার পক্ষেও সহজ হবে না।

গভীর আত্মপ্রত্যয়ে যে হাসি ফোটে, সেই হাসি মৌলিক সাহেবের মুখে দেখলাম।

সে ব্যাখ্যাও আছে বৈকি শ্রীলা দেবী। ব্যাখ্যা আছে গূঢ় মনস্তত্ত্বে! আপনি নিজেই জানেন, বনরেখাকে আপনি ভালবাসতেন না।

না। ঘৃণা করতেন। নিজের মনের ভেতরটায় একবার চেয়ে দেখুন, শ্রীলা দেবী। আশৈশবকালের কি তীব্র হিংসা সেখানে তীব্রতর ঘৃণায় পরিণত হয়েছিল। তাকে আপনি ভালবাসার ভাল-মাছুষি কাপড়ে ঢেকে রেখেছিলেন মাত্র। আমাদের চেয়ে যারা শ্রেষ্ঠ, তাদের আমরা শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু ভালো কোনদিনও বাসতে পারি নে। একটা হিংসা অহরহ মনটাতে ছোবল মারে, ও কেন এত বড়, এত উদার, এত ভাল? কেন, কেন?

অপরাধতত্ত্ব বলে, পৃথিবীর বহু হীন কাজ এই হীনমন্যতা থেকে। যে ছোট, সে মুখে বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু তলে তলে প্রতিহিংসার অছিলা খোঁজে। ...া দেবী, আপনিও সেই নিয়মের বাইরে নন।

নিতান্ত শিশুকাল থেকে দেখে আসছেন, আপনাদের পরিবারে নিত্য অনটন, ওদের যথেষ্ট স্বাচ্ছল্য। একটু বড় হয়ে জানলেন, বনরেখা আপনার চেয়ে লেখাপড়ায় ভাল। ওকে হটিয়ে আপনি একবারও পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারলেন না। আরও বড় হয়ে আয়নায় দেখে আর নানা লোকের কথা শুনে টের পেলেন, বনরেখা আপনার চেয়ে রূপসীও। আগে শুধু ঈর্ষা ছিল, তখন থেকেই ঘৃণার সুরু, এই ঘৃণার বিষ হয়তো আপনার সচেতন মনের

অগোচরে একটু একটু করে জমতে থাকল। ভাবতেন, ও যেন কোথায় আপনাকে বঞ্চনা করে, আপনাকে সব বিষয়ে হারিয়ে দিচ্ছে। সেই ঘৃণা পাত্র ছাপিয়ে পড়ল সেইদিন, যেদিন আপনারই বন্ধু প্রসাদ রায়কেও বনরেখা ছিনিয়ে নিল। প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রেও বনরেখা? সেদিন ওর চেয়ে বড় শত্রু আপনার কেউ ছিল না শ্রীলা দেবী।

আপনার গ্লানি চরমে পৌঁছল তখন, যখন বনরেখারই দয়ার দান একটা চাকরি আপনাকে হাত পেতে নিতে হল। সেখানেও সে হেড মিস্ট্রেস, আপনি কেরানি মাত্র। সেখানে সে অনেক বড়, ঢের ওপরে। তার কাছে আপনার কৃতজ্ঞতা যত, তার প্রতি বিদ্বেষও তত। দেখুন, এই কৃতজ্ঞতার বোঝা যত বাড়ে, তত দুর্বহ হয়। যাকে ঘৃণা করি তার করুণা যেন ফাঁস হয়ে গলা জড়িয়ে ধরে। তখন—তখন শ্রীলা দেবী, মনে হয় চিরজীবন একজনের কাছে ছোট হয়ে থাকার মত গ্লানি আর নেই। যারা মুখ বুঁজে সয়ে যেতে পারে, তারা বেঁচে যায়। যারা তা পারে না, তারা মুক্তির উপায় খোঁজে। যেমন আপনি খুঁজেছেন। ঘৃণায় অন্ধ আপনারই একটা সত্তা স্থির করেছে, আর নয়, ওকে যদি কোনক্রমে সরিয়ে দিতে পারি, তবে আবার মাথা তুলতে পারব সহজে।

অশ্রুরুদ্ধ গলায় বলে উঠেছি, মৌলিক সাহেব, আমি একটা পশু।

না। মৌলিক সহানুভূতি দিয়ে আমার মাথায় হাত রেখেছেন। বললেন, না। আপনিও মানুষ। মানুষের মর্যাদা নিয়ে বাঁচার বাসনাই আপনাকে নিষ্ঠুর আর অকৃতজ্ঞ করেছে—

শুনে অঝোরে কাঁদছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বিচারে আত্মপক্ষ সমর্থন করে একটি কথাও বলে নি। আমার অপরাধ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। তবু, জানি না কেন, হয়ত আমি স্ত্রীলোক বলেই, আমার প্রতি আদালতের করুণা হল, হয়ত প্রথম অপরাধ বলেও, তিনি আমাকে প্রাণদণ্ডের বদলে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দিলেন।

সেও আজ কত বছর হয়ে গেছে। আজ আমার কারও প্রতি কোন দ্বেষ নেই। মনে পড়ে পূর্ণেন্দু মৌলিককে, সেই ধীরোন্নত, বুদ্ধিদীপ্ত রূপ না, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোন নালিশ নেই। বনরেখাকেও মনে পড়ে, তাকে

নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছি বটে, কিন্তু তারপর থেকে সত্যিই তাকে ভালবাসতে পেরেছি।

সেই ভালবাসার প্রেরণাতেই তো আজ নির্জন সেলে বসে, লুকিয়ে কাগজ-কলম আনিয়ে লিখে দিলাম এই কাহিনী। আমার প্রিয়সখীর মৃত্যুর কাহিনী।

চেনা-অচেনা

জয়ন্তী সেন

আশ্চর্য, এমন নাটকীয় পরিস্থিতিতেও মানুষকে পড়তে হয়। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফরমের ভিড় একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। জানলা দিয়ে কেতকী ওদের সারিবাঁধা বিষন্ন মুখগুলো দেখছিল। বৌদি, বড়দার ছেলে বাচ্চু, অতীন মামা, শেফালী। এই প্রথম বাড়িঘর ছেড়ে এলাহাবাদের কাছে একটা বিলিতি কনভেন্টে ড্রইং-টিচারের কাজ নিয়ে সে চলল। কলকাতার চাকরিও খারাপ ছিল না, এখানে মাইনে লোভনীয় হলেও ওখানে আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে থাকার আনন্দের স্বাদ ছাড়তে তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মা পর্যন্ত জেদ করলেন তার মন ও শরীরের কথা চিন্তা করে।

না, কেতকী সেদিনের দুর্ঘটনার পর সিনেমা অথবা আধুনিক উপন্যাসের নায়িকাদের মত ভেঙে পড়ে নি। প্রথম কয়েকদিন শুধু আচ্ছন্ন একটা ঘোরের মধ্যে তার কেটেছিল যেন। দেবাশীষ শেষ পর্যন্ত এতখানি বঞ্চনার আঘাত দিতে পারে, সে কথা তার কল্পনার বাইরে ছিল। আর মল্লিকা: মল্লিকার নাম মনের শ্লেট থেকে সযত্নে মুছে ফেলেছে কেতকী। মা আপশোষ করেন, বড়দা লুকিয়ে লুকিয়ে খোঁজে, শেফালী কাঁদে, কিন্তু কেতকীর জীবন থেকে মল্লিকার স্মৃতিও বুঝি হারিয়ে গেছে।

চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়েছিলো নিশ্চয়, রুমালের কোণ দিয়ে মুছতে মুছতে ধোঁয়াটে চোখে সামনের বেঞ্চিতে দেবাশীষকে দেখে বুকের মধ্যে এতদিনকার জমাট পাথরের ভূমিকম্পের উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল। চিনবে

না ঠিক করে কেতকী বই-এর পাতার মধ্যে অনিচ্ছুক মনকে জোর করে বেঁধে রাখতে গিয়েছিল, কিন্তু একটি অক্ষরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। শুধু বই-এর পাতাই নয়, চোখের সামনে দৃশ্যপটে সবকিছুই লেপে মুছে একাকার।

তা হবেই বা না কেন, মনের কোণে একপ্রান্তে জমে-ওঠা স্মৃতির শুকনো পাতাগুলো একত্র করে যদি আগুন ধরিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে সেই দাউ দাউ করে জ্বলে-ওঠা আগুনের শিখা, স্ফুলিঙ্গ, ধোঁয়া, কুয়াশার তোলপাড়ের দোলায় নিষ্কম্প প্রাণও বুঝি দুলে ওঠে।

এতদিন বাদে কেতকী বুঝল অত বড় বিশ্বাসঘাতকতার পরে দেবাশীষকে সে ভোলে নি। এর পরে আত্মপ্রবঞ্চনার আর কোন অর্থ হয় না। তবু ভালো, সঙ্গে মল্লিকা নেই। মল্লিকা থাকলে এতক্ষণ এভাবে স্থির হয়ে বসে থাকতে সে পারত না। হয় তো পাগলের মত চেন টেনে চলন্ত গাড়িকে থামিয়ে দিত, কিংবা নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়ত হাওড়া স্টেশনের অপস্রিয়মান প্ল্যাটফরমে।

'নিজেকে যখন ঠকাতে পারো না, তখন অপরকে ঠকিয়ে লাভ কি?' কথাগুলো জোর করে ছুড়ে মারল সে। দেবাশীষের মুখ ফেরানো ছিলো। স্পষ্ট দেখলো কেতকী, সে মুখ ছাই-এর মতো সাদা হয়ে উঠেছে। কোলের কাছে মুঠি করা হাত থর থর করে কাঁপছে।

'আমাকে চিনেছো তা হলে।' হাসিটা আলপিনের মতো ফুটিয়ে দিতে চাইলো কেতকী—'তিন বছর কিন্তু নেহাত কম সময় নয়। আমি মনে করেছিলাম বিবেক-দংশনের জ্বালা বুঝি এতদিনে মিটে গেছে।'

এবারে দেবাশীষ মুখ ঘোরালো। কোনরকমে জড়ানোগলায় অস্ফুটভাবে বলল, 'কেতকী! তুমি এখানে।'

'হ্যাঁ আমিই।' আশ্চর্য শান্ত শোনালো কেতকীর গলা। আয়নায়' নিজের মুখের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে নিজেই অবাক হচ্ছিল। দেবাশীষের বাগানবাড়ির ফোয়ারার বেদীতে বসানো সেই শ্বেতপাথরের মূর্তিটার মতো অভিব্যক্তিহীন নিষ্প্রাণ একটি ছবি—'ভয় পেওনা দেবাশীষ, তোমার কাছে আজ আমি হা-হুতাশ করে ব্যর্থ প্রেমের কাঁদুনী গাইতে বসব না। প্রেম শব্দটা আজকে আমার কাছে বড্ড খেলো হয়ে গেছে। অনেকটা তোমার সেদিনকার ব্যবহারের মতই। আমি শুধু জানতে চাই—'

'কি, কি জানতে চাও তুমি ?' দেবাশীষ যেন শিউরে উঠলো।

'আমার প্রশ্ন অনেকগুলো।' কেতকী বেশ রূঢ়ভাবে বলল—'অতীন মামা ঠিকই খবর এনেছিলো সেদিন। তুমি একটা স্কাউণ্ড্রেল এবং কাপুরুষ। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তুমি এর আগেও দু-তিন জায়গায় কেলেঙ্কারী করেছ। নিজের সত্যিকারের পরিচয় দেবার সাহস সেদিন কেন হয় নি তোমার—কেন বলতে পার নি ঘরে তোমার অভিজাতবংশীয়া স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে।'

দেবাশীষকে নিরুত্তর হয়ে বসে থাকতে দেখে কেতকী এবারে তার মোক্ষম বাণ ছুড়ল, 'জানো এখুনি পুলিশে খবর দিতে পারি আমি।'

'পুলিশ—'—কাপুরুষের মত পিছিয়ে গেলো দেবাশীষ—'পুলিশ কেন ?'

'কেন কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করছে না দেবাশীষ—। মল্লিকার বয়স তখন সতেরো, সে অন্যের বাগ্‌দত্তা এসব জেনেও তাকে ভুলিয়ে, ফুসলিয়ে তুমি সেই রাত্রিতে পালালে। চরম অপমানে লাঞ্ছিতা আর একটি মেয়ের কথা বেমালুম ভুলে যেতে কোনই অনুতাপ হোল না। নেহাৎ কলঙ্কের ভয়—বড়দা চুপ করে রইলো, আর আমার মুখ চেয়ে মা সব ভুলতে চাইলেন।'

একটা ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন যাওয়ার কোলাহলে কথার শব্দ শোনা গেল না। বাধ্য হয়েই বাইরের অন্ধকারের দিকে ফিরে তাকালো কেতকী। কয়লার গুঁড়োতে নয় মনের জ্বালাতেই তার চোখ দু'টো তখন জ্বলছে। অস্পষ্ট আগুনের ফুলকির মতো বিচ্ছিন্ন বসতির মাঝখানে আলোর আভাস, গাছগুলো যেন ছাই রঙের চক্‌খড়ি দিয়ে কালো শ্লেটে আঁকা। গাড়ির চলন্ত গতি তার সমস্ত সত্তাকে প্রচণ্ড আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে। দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। আকাশভরা গ্রহ-তারার দল যুগ-যুগান্তর ধরে কেবল চলেছে চলেছে আর চলেছে। একটি দিনও থেমে থাকার উপায় নেই। দেবাশীষের মুখে স্পষ্ট অপরাধীর ছাপ দেখতে পেয়েছে সেই কথা ভেবে মনে মনে খুশি হয়ে উঠল কেতকী। তার বদলে যদি আজ দেবাশীষের চোখে-মুখে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত ভাব ফুটে উঠতো, তা হলে বোধ হয় অপমানের জ্বালা আরও বেশি করেই বিঁধত।

দেবাশীষের কথা ভুলে হঠাৎ মল্লিকার মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেতকীর পরেই মল্লিকা, বয়সের তিন বছরের তফাৎ সত্ত্বেও ওরা পিঠোপিঠি বোন। চেহারায়-স্বভাবে অমিল, তবু দু'জনের ভাবের অন্ত নেই।

কেতকীর রঙ উগ্র সাদা, ছিপছিপে পাতলা গড়ন, মুখে-চোখে রুক্ষ অপ্রসন্নতার আভাস। মা বলতেন, 'আমার বড় মেয়ে হাসতেই জানে না।' মল্লিকা ঠিক উল্টো। কচি শ্যামলা রঙ, বয়স অনুপাতে ছেলেমানুষ চেহারা, হাসি-খুশিতে সর্বদা টলমল করছে। দেখলে মনে হবে, কাদার তাল—মাখনের মতো নরম। কিন্তু বাইরের খোলশটা দেখে যে মানুষকে বিচার করা যায় না, তার প্রমাণ পাওয়া যেত মল্লিকার চরিত্রে। কি ভীষণ জেদ, ইচ্ছার বিরুদ্ধে একপাও নড়বে না কিছুতে। বরং নরম হোত কেতকী। সেই ছেলেবেলা থেকে যখন যা চাইত মল্লিকা নিজের ভাগ থেকে অনায়াসে অক্লেশে ছোট বোনকে দিতে হয় এই সান্ত্বনায় নিজেকে বুঝিয়ে ওর হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করে নি। প্রথম সংঘাত বাধল সেদিন, যেদিন মল্লিকা তার কালো চোখ জলে ছল ছল করে বলল—'দিদি, তুই ভুল বুঝিস নে আমাকে। আমি নিজের মনকে এতকল বোঝাতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারি নি। ও লজ্জায় তোকে কিছু বলতে পারছে না।'

সেদিনের মত আজকেও ভুরু কুঁচকে চোখে আগুনের জ্বালা নিয়ে কেতকী বলল—'আমাকে ছলনা করার প্রয়োজন ছিল না। যে জিনিস অপরের, তার জন্যে কোনদিনই হাত বাড়ানোর স্বভাব আমার নয়।'

সেদিনও জবাব দিতে পারে নি দেবাশীষ, আজও পারল না। কেবল একটু অস্বস্তিভরা গলায় বলল—'তোমার কাছে সাবান আছে। আর ডেটল জাতীয় কিছু! হাতটা একটু ভাল করে ধুয়ে নিতাম।'

হাত দু'টো মুঠি করাই ছিলো, তবু নখের মধ্যে কালো দাগ চোখে পড়ল বলে একটু অবাক হোল কেতকী। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে দস্তুরমত শুচিবায়ু ছিল ওর। এমন কি, স্নানের শেষে মেয়েদের মতো আর্শীর সামনে দাঁড়িয়ে ক্রিম পাউডার পর্যন্ত মাখায় ওর ক্লান্তি ছিল না। আজকে এতক্ষণ পরে দেবাশীষকে কেন অন্য রকম দেখাচ্ছে বুঝতে পারা গেল। দেবাশীষের পোষাক-পরিচ্ছদে কোথাও পরিপাট্যের চিহ্ন নেই, চুল এলোমেলো, মোজায় কাদার ছাপ। নখ ম্যানিকিওর করতে যে ছেলে সারা সকাল কাটাতো, তার আজ সাবান পর্যন্ত আনতে ভুল হয়ে গেছে। এত বদলও মানুষের হয়। আর কি কথার পরে কি কথা!

'মল্লিকা কোথায়?'—এটাচী কেস খুলে লিকুইড অ্যান্টিসেপ্টিক সোপের বোতল আর একটা তোয়ালে বার করে হাসি সামলে নিল কেতকী। প্রশ্নটি

শুনে ভীষণ চমকে উঠে দেবাশীষ মুখ নীচু করে বসে রইলো নির্বাক হয়ে।

'কথাটা শুনতে পেয়েছো আশা করি। তিন বছরে মেয়েটা চিঠি পর্যন্ত দিল না, ওর জন্যে আমরা সবাই কি ভীষণ ভাবি সে কথা কি বুঝতে পারো না তোমরা? ও কি তোমাদের মুঙ্গেরের বাড়িতেই আছে, অতীন মামার সেই সেজশালা রণজিৎ না কি যেন নামটা, সে নাকি তোমাদের সাউথ ইণ্ডিয়ার কোন একটা হোটেলে দেখেছিলো। মল্লিকা নাকি ভীষণ রোগা হয়ে গেছে।'

কথা বলতে বলতে খেয়াল হোল দেবাশীষ শুনছে না। চোখের দৃষ্টিতে শূন্যতা ভরিয়ে সে বোবার মতো বসে রয়েছে।

'মল্লিকা কোথায়?' আবার কঠিন হয়ে উঠল কেতকী—'আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই একবার।'

'কেন?' একটু নড়েচড়ে বসল দেবাশীষ।

'একটা কথা তাকে জিজ্ঞাসা করার আছে। সে যদি প্রথম থেকে খোলাখুলি আমকে সব জানাতো, তা হলে আমি তাকে বাধা দিতাম না। লুকিয়ে-চুরিয়ে এভাবে পালিয়ে গিয়ে সে শুধু নিজেরই সর্বনাশ করে নি, আমাদের গোটা পরিবারকেও একেবারে শেষ করে দিয়ে গেছে। মার নার্ভস ব্রেক ডাউন হয়েছে ওরই দোষে, শেফালীর ভালো ভালো বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়, আর আমার—।'

'আমাকে ক্ষমা কর'—দেবাশীষ হাত বাড়িয়ে তোয়ালে আর সাবানের শিশি নিয়ে বাথরুমের দিকে তাড়াতাড়ি চলে' গেল। এ প্রসঙ্গের আলোচনা এড়িয়ে যাওয়ার মতলব থাকলেও কেতকী কিন্তু কিছুতেই তাকে ছাড়বে না। মল্লিকাকেও না। মল্লিকাকে ক্ষমা করা যায় না। তবু তার কথা মনে করে কেতকী চঞ্চল হয়ে উঠল।

এদিকে রাত বাড়ছে। কৃষ্ণপক্ষ, তাই একটু দেরি করে চাঁদ উঠেছে আকাশে। হাতঘড়িতে সময় এগারটা। বড়দা বলেছিল গাড়ি ছাড়লেই যেন বিছানাটা পেতে নিয়ে শুয়ে পড়ে সে। বিদেশ যাওয়ার উত্তেজনা ও শেষ মুহূর্তের হাতের কাজ গুছিয়ে নেওয়ার হাঙ্গামায় গত তিনরাত চোখের পাতা এক করতে পারে নি। বড়দা নিজেই সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, কিন্তু অফিসে মঞ্জুর হল না। বাচ্চুর এবারে ফাইন্যাল পরীক্ষার বছর। অতীন মামা

হার্টের অসুখে ভুগে আজকাল কেমন জবুথবু হয়ে পড়েছেন। কাজেই শেষপর্যন্ত একাই আসতে হল তাকে।

কে জানত এমন একটা চরম পরীক্ষার মধ্যে পড়তে হবে। যে লোকটা ধূমকেতুর মতো তার এবং মল্লিকার জীবনে সর্বনাশ এনে দিয়েছে, যাকে মূর্খের মতো তারা দু'জনেই ভালোবেসেছিলো, সব অপরাধ, সব অন্যায়ের কথা জেনেও যার স্মৃতিকে মন থেকে মুছে ফেলা যায় নি—সেই দেবাশীষের সঙ্গে একা ট্রেনের কামরায় সমস্ত রাত মুখোমুখি কাটাতে হবে জানলে বড়দা বোধ হয় ঘুমের ওষুধের পিল খেয়ে দরজা-জানালা এঁটে শুয়ে পড়ার উপদেশ তাকে দিত না।

দেবাশীষও বিছানা পাতে নি। এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কেতকী লক্ষ্য করল হোল্ডল, বা ঐ জাতীয় কিছু সঙ্গে তার নেই। এটাচী কেস, ব্যাগ, হাতবাক্স—কিছু না। বেঞ্চির নীচে কালো একটা ট্রাঙ্ক অবশ্য ঢোকানো রয়েছে। হয় তো কাছাকাছি অন্য কোন ষ্টেশনে নেমে যাবে বলেই বাড়তি মাল কিছু সঙ্গে রাখে নি। কতক্ষণ ধরে হাত ধুচ্ছে দেবাশীষ। পর পর অনেকগুলো প্রশ্ন তার মনের মধ্যে ভিড় করে এলো। সব জানতে হবে একে একে, মল্লিকাকে সে কি বিয়ে করেছে, মল্লিকা কি সুখী হয়েছে!

'ধন্যবাদ'—ভিজে তোয়ালে আর সাবানটা সামনে ধরে দিয়ে এতক্ষণ বাদে দেবাশীষ হাসলো। বুকের মধ্যে এখনও যে হাসি দেখলে ব্যথার মত মোচড় দিয়ে ওঠে।—'তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি কেতকী। ঠিক আগেকার মতই আছ।'

নিজেকে একটুও বিচলিত না হতে দিয়ে নীরসকণ্ঠে কেতকী বলল—'বল আমাকে, মল্লিকা কোথায়?'

'যদি বলি জানি না—' কপালের উপর ঢেউখেলানো ঘন বাদামী চুলে হাত ছোঁয়ালো দেবাশীষ। ওর পিঙ্গল চোখের তারায় কৌতুকের আভাস ঝিলিক দিয়ে উঠলো যেন। এতক্ষণে মানুষটা অতীতের লজ্জার গ্লানি থেকে বোধ হয় কিছুটা মুক্তি পেয়েছে। কেতকীর দৃষ্টিতে প্রশ্নচিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে সে আবার বলল—'একবার খাঁচা ছেড়ে পালানো পাখিকে কি অত সহজে শেকল পরানো যায় কেতকী। সুযোগ পেলে সে হাওয়া হয়ে যাবেই।'

'কোথায় গেছে সে?' উত্তেজনার ঢেউ কেতকীর চোখে-মুখে দুলে উঠল—'তার ঠিকানা না পেলে আমি পুলিশে খবর দেব।'

'এতকাল দাও নি কেন?' একটু থতমত খেয়ে বিব্রতমুখে দেবাশীষ বলল—'তিনবছর ধরে তোমরা তো তার কোন খোঁজ কর নি।'

'আমরা জানতাম, সে তোমার কাছেই আছে। অতীন মামার সেজ-শালাও তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছিল বৃন্দাবন গার্ডেন্স-এ আলোর ফোয়ারার পাশে।' কেতকীর গলা ধরে এলো কথা বলতে বলতে। গঙ্গার ধারে তার পাশে বসে দেবাশীষ একদিন সুদূর মহীশূরের বিখ্যাত আলোক-উদ্যানের স্বপ্নময় পরিবেশের কথা শুনিয়ে তাকে বুঝিয়েছিলো বিয়ের পরে মধুচন্দ্রিমা যাপন করতে তারা সেখানেই যাবে।

'তোমার বোন তোমার মতো একনিষ্ঠ প্রেমে বিশ্বাসী নয়—' দেবাশীষের গলায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুর—'ফুলের মধু খেয়ে ফুলকে অক্লেশে ভুলে যেতে পারে সে।'

'তুমি কথা ঘুরিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না দেবাশীষ', কেতকী সোজা হয়ে উঠে বসল, 'আমার নিশ্চিত ধারণা তাকে নিয়ে খেলার পালা তোমার মিটে গেছে। কিন্তু সে হতভাগিনী এখন কোথায় কিভাবে দিন কাটাচ্ছে, তা জানতে না পারলে পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হব।'

'আমাকে ভয় দেখাচ্ছো, কেতকী—' হঠাৎ উঠে এসে একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ালো দেবাশীষ। ওর চোখের তারা দু'টো এখন আগুনের কুচির মতো জলছে। কিন্তু আমি যদি তোমাকে সে সুযোগ না দিই। গাড়ি এখন ফুলস্পিডে চলেছে। আস্তে আস্তে এমনি করে তোমার গলাটা যদি টিপে ধরি, তা হলে যতই চিৎকার কর না কেন—কেউই সাহায্যের জন্যে ছুটে আসবে না।'

সত্যি সত্যি তার গলার কাছে আঙুলের ছোঁয়া অনুভব করে আতঙ্কে হিম হয়ে উঠলেও নিজেকে সংযত করে নিয়ে কেতকী জোর করে হাসলো।

'তারপর আমার ডেড-বডি নিয়ে কি করবে?'

'খালি ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় গয়না-পত্তর টাকাকড়ি কেড়ে নিয়ে সুটকেশ খুলে ছড়িয়ে রেখে যাব—লোকে ভাববে রাহাজানির কেস।' দেবাশীষ প্ল্যান করতে করতে হেসে ফেলল। 'একটা কথা কিন্তু তোমাদের খেয়াল করা উচিত ছিল। আজকালকার দিনে মেয়েদের একা একা ট্র্যাভেল করা ঠিক নয়। প্রায়ই তো কাগজে দেখি এ ধরণের কত কিছু ঘটছে।'

'কিন্তু বড়দা যে তোমাকে দেখে ফেলেছে'—কেতকী আশ্বস্ত করে ওর

হাত সরিয়ে দিল মুখের সামনে থেকে—'আমার কিছু ঘটলে তুমিও জড়িয়ে পড়বে!' কথাটা সম্পূর্ণ বানানো হলেও কেতকী সিরিয়াস গলায় থেমে থেমে বলল। আবার একটা ব্রিজের উপর দিয়ে ট্রেন চলাতে প্রচণ্ড কর্কশ শব্দে কোন কিছু শোনা যাচ্ছে না। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে বেঞ্চিতে বসে পড়ল দেবাশীষ। কেতকীর পাশেই। ক্লান্তভাবে গা এলিয়ে দিয়ে কপালের উপর ছড়ানো চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বলল—'তুমি একটুও ঠাট্টা বোঝ না কেতকী। ঠিক আগেকার মত জেদী, একগুঁয়ে দুষ্টুমেয়ে। মল্লিকা আমার কাছেই আছে। রেজিস্ট্রিমতে, আমাদের বিয়েও হয়েছে। কিন্তু—'

'কিন্তু কি? ওর কি কোন অসুখ করেছে?'

'না, না, সে কথা বলছি না আমি। ও ভালোই আছে। কেতকী, সেদিন সে ভুল করেছিলাম, সেই অপরাধের বোঝা আমার মনে ভারী হয়ে জমে আছে। আমি তোমাকেই ভালবাসি এই সত্যি কথাটা সেদিন আমরা কেউই বুঝি নি। তোমাকে ভুলতে পারছি না বলে মল্লিকা আজ তোমাকে অথবা আমাকে ক্ষমা করতে পারছে না।'

'একবার আমাদের দেখা করিয়ে দেবে দেবাশীষ—' চোখের জলের সঙ্গে সমস্ত দৃশ্যপট দুলতে লাগলো কেতকীর দৃষ্টিতে, 'মাত্র একটি বার। ওকে বোল আমি কিছু মনে রাখি নি সব ভুলে গেছি। এখন আবার আগেকার মত ও আমাদের মধ্যে ফিরে আসুক—।'

দেবাশীষ উত্তর দিতে গিয়েও বাইরের আকাশের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। জানলো দিয়ে হু-হু ক'রে হাওয়া এসে ওর চুলগুলো এলোমেলো করে দিয়ে যাচ্ছে। চোখের নীচে ঘন কালির ছোপ, যেন কতকাল ঘুমোতে পারে নি মানুষটা।

'কেতকী, তুমি আমার নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণার কথা শুনলে শিউরে উঠবে। মল্লিকা উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল।'

'কি করে?' কান্নায় গলার স্বর ভিজে শোনালো কেতকীর—

'সন্দেহ—ওর নিদারুণ সন্দেহ আমাকে নিয়ে—। আমাকে একদিন বিষ খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল। ডাক্তার এখন কিছুকাল খুব সাবধানে থাকতে বলেছে, কোনরকম শক অথবা উত্তেজনা ওর পক্ষে মারাত্মক—। কিছুকাল তোমার সঙ্গে ওর বোধ হয় দেখা না হওয়াই ভালো—।'

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নতার ঘোরে নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল কেতকী। মল্লিকা পাগল হয়ে গিয়েছিল—। গাড়ির চাকার শব্দের তালে তালে কথাটা তার কানের কাছে বাজতে লাগলো। মল্লিকা। না, এ অসম্ভব, এ হতেই পারে না।

'আমাদের ঠিকানাটা তোমার মনে আছে আশা করি—' কেতকী জলভরা চোখ মেলে চাইল—'ও একটু ভালো হলেই চিঠি দিও লক্ষীটি।'

দেবাশীষ আবার কাছে সরে এলো। ওর চোখের তারায় কেমন একটা বিহ্বলতার ছোঁয়া লেগেছে। কেতকীর হাত ধরে বলল—'জানি আমার কিছু বলার নেই। কি করে তোমাকে বলি আমার সেদিনকার ভুলটা ভুলই—।'

নিজেকে দুর্বল হতে দিল না কেতকী। হাত ছাড়িয়ে খুব সহজভাবেই বলল—'অতীতকে ভুলে যাওয়াই ভালো দেবাশীষ। আজ আমার বড় ক্লান্তি লাগছে। শুয়েই পড়ি। রাত প্রায় দুটো হতে চলল। দেখো, ঘুমের মধ্যে আবার রাহাজানির কেস্ না ঘটে—। কাল সকালে তোমার সঙ্গে কথা হবে। এলাহাবাদে সোনামাসির বাড়ি উঠব—তুমিও নামো না। মল্লিকার সঙ্গে আমার একবার দেখা হওয়া সত্যিই দরকার। ভালো করে বুঝিয়ে বললে ও বুঝবে তোমার জীবনে আমি এখন আর কিছুই নই।'

'সত্যি বলছ—' দেবাশীষ সামনে ঝুঁকে পড়ল।

'নিশ্চয়—' কেতকী হাল্কাভাবে হাসল, 'তুমি এতো সিরিয়াস মুখ করে কথা বললে আমার হাসি পায়। যাক্ গে ওসব কথা, শোবে কোথায় বিছানাপত্র তো সঙ্গে নেই দেখছি। এই নাও আমার চাদর আর বালিশ—। না, না, আমার আরও আছে, সেজন্যে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না।'

দু'টো বিছানাই নিপুণ হাতে পাতল কেতকী। বড় আলো নিভিয়ে দেওয়ার আগে ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ভরে দু'টো ঘুমের ওষুধের ট্যাবলেট খেয়ে নিল। কৃত্রিম আয়োজন নইলে এ চোখে এখন ঘুম নামবে না। চিন্তার রাশি ঢেউ-এর মতো দুলতে দুলতে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, মনের মধ্যে ভাবনা যেন আগুন হয়ে জলছে।

বালিশে মাথা রেখে বুজে-আসা চোখ মেলে কেতকী বলল—'এলাহাবাদে অন্তত একদিনের জন্যেও নামতে হবে কিন্তু—।'

জানলা দিয়ে হঠাৎ একরাশ আলো এসে কেতকীর চোখে-মুখে পড়ে ওর ঘুমন্ত সত্তাকে একটু একটু করে জাগিয়ে দিয়ে গেল। ইস্, অনেক বেলা হয়ে গেছে যে। দেবাশীষ! ঘরের চারিদিকে তাকে না দেখতে পেয়ে দরজা

ভেজানো বাথরুমে টোকা মারল কেতকী, সেখানেও সে নেই। চমকে উঠে কেতকী তার বালিশের নীচে রাখা হাতব্যাগে টাকাকড়িগুলো ঠিক আছে কি না দেখে নিলো। শিয়রের কাছে টেবিলে রিস্টওয়াচ, গলার তিন ভরির সোনার হার, আঙুলের আংটি। সবই আছে—। কোথাও কিছু খোয়া যায় নি। বরং সামনের বেঞ্চির নীচে সেই স্টীল ট্রাঙ্কটা অমনি পড়ে আছে। দেবাশীষ ওটাকে ফেলে গেলো কেন? ভীষণ অপ্রসন্ন ও হতাশ হয়ে কেতকী তার বিছানা গুছিয়ে ভরে ফেলল। দেবাশীষের জন্য পাতা বিছানটা সেই একভাবেই পড়ে আছে। দেবাশীষ একবার শোয় নি পর্যন্ত।

সব গোছগাছ করে যখন চায়ের অর্ডার দিলো কেতকী, ঘড়িতে তখন দশটা বাজছে। আর বেশি সময় নেই। বাকি পথটুকু স্টেশনে কোন গল্পের বই পড়েই দিব্যি কেটে যাবে।

কিন্তু দেবাশীষ এভাবে চলে গেল কেন, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ধু-ধু দিগন্তকে তার উপচে-পড়া চোখের জলের বিন্দুর মধ্যে কাঁপতে দেখল কেতকী। সে তো সত্যিই ওর কাছে অধিকারের দাবী জানাতে চেষ্টা করে নি। শুধু একবার মল্লিকার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিল মাত্র। মল্লিকাকে কাছে না পেয়ে মা আজকাল ছটফট করেন, বড় বড় মুখে কোনদিন হাসি কেউ দেখে না, আর তার নিজের জীবন ঐ ধানকাটা শুকনো রুক্ষ অফলা মাঠের মত নিষ্ফল হয়ে গেছে। দেবাশীষ এই সহজ কথাটা বুঝল না কেন। নাকি বুঝেও এড়িয়ে গেল অন্য কোন কারণে। হয় তো মল্লিকার অসুখ সারে নি।

সোনামাসি উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে হাত ধরে টেনে নিলেন কাছে। বিদেশবাসীর কাছে কলকাতা থেকে অতিথি-অভ্যাগত এলে তার আদরই আলাদা। কথাও ফুরেতে চায় না সহজে, কার বিয়ে ঠিক হল, কার হতে হতে হল না, অথবা হতে পারে, এ নিয়ে সোনামাসির অদম্য কৌতূহল।

কেতকীর থেকে হাল খবর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেওয়ার মতলবে তিনি মুখ বাড়িয়ে বললেন—যাও না গো, মেয়েটার মালপত্রগুলো নামিয়ে নাও। আমি বরং ওকে নিয়ে ওয়েটিং-রুমে ততক্ষণ বসি।

'একবারে বরং বাড়ি চলে যাই সোনামাসি।' কেতকী ক্লান্ত চোখে মিনতি জানালো, ভারি তো ক'টা মাল, নামাতে দু' মিনিটও লাগবে না।'

'সেই ভালো'—সোনামাসি পেটমোটা ব্যাগ সামলে চলার জন্যে পা

বাড়ালেন—'তুই সেজদির ননদের খবর শুনেছিস। সেই যে আমাদের বেলুর সঙ্গে পড়ত। শুনছি কোন এক পাঞ্জাবী ছেলের সঙ্গে খুব ভাব, তাকেই বিয়ে করবে।'

সোনামাসির কথাবার্তার স্রোতে বাধা দিয়ে লাভ নেই। সুবিধেও যথেষ্ট, কেবল হ্যাঁ আর না বলেই থালাস। বক্তৃতা একতরফা হলে যা হয়। এরই ফাঁকে কখন মালপত্র নামানো হয়ে গেল। মেসোমশাই রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে মুছতে বললেন, ট্রাঙ্কে কি ইট-পাথর পুরে এনেছ কেতকী—চারটে কুলি মিলে নামাতে পারে না।'

'ট্রাঙ্ক!' কেতকী সাদামুখে তাকায়—'ও ট্রাঙ্ক তো আমার নয়।'

'কিন্তু কম্পার্টমেন্টে আর কাউকে তো দেখলাম না'—মেসোমশাই অবাক হয়ে উঠেন 'হয় তো কেউ ভুল করে ফেলে গেছে। আর কে কে ছিল গাড়িতে?'

'ছিলেন একজন ভদ্রলোক।' কেতকী ঢোক গিলে বলল, 'আমি রাত্রিবেলা ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জানি না কখন নেমে গেল।'

'সেজদির খুব অন্যায় তোকে একা এভাবে আসতে দিয়েছে। যদি একটা কিছু হোত—' সোনামাসি গজ গজ করতে লাগলেন। আবার ট্রাঙ্কের প্রসঙ্গ ওঠাতে ঠিক হোল ওটা স্টেশন মাস্টারের ঘরে জমা দেওয়া হবে। যার জিনিস সেই গরজ করে খুঁজে নিয়ে যাক।

'লোকে ছোটখাট জিনিস ভুলে ফেলে যায়। এত পেল্লায় বাক্সটা কি করে নজর এড়িয়ে গেল জানি না বাপু। এমন তালকানা মানুষও হয়।' সোনামাসি কেতকীর হাত ধরে প্ল্যাটফরমের গেটের দিকে রওনা হলেন।

কুলিরা কিন্তু বাক্সটা নিয়ে ততক্ষণে হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছে। বেওয়ারিশ মাল হলেই সন্দেহজনক মনে হয়। তার উপর কেমন একটা অস্পষ্ট গন্ধ ওদের আরও ভয় পাইয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে মারাত্মক আবিষ্কার করেছে ভুখন্ বলে ছোক্‌রা কুলিটা। পাল্লার ফাঁকে একটুকরো ঝুলছিলো, তার গায়ে রক্তের কালো দাগ।

'বাক্সটা আপনার নয়,' পুলিশ অফিসার কেতকীর ভয়ার্ত মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

'না।'

'তা হলে কার ?'

'এক ভদ্রলোক হাওড়া থেকেই উঠেছিলেন।'

'চেহারার বর্ণনা দিতে পারেন।'

'না।' থেমে থেমে বলল কেতকী, ভালো করে লক্ষ্য করি নি। গাড়ি ছাড়ার পরেই স্লিপিং ট্যাবলেট খেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।'

'তা হলেও একটা আইডিয়া তো দিতে পারেন! লোকটা রোগা না মোটা, কালো না ফর্সা, চোখে চশমা আছে কি না, পোষাক-পরিচ্ছদ কি ধরণের, বয়স কত ইত্যাদি।'

খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে কেতকী বলল—মনে হয় মোটামুটি মাঝারি গড়ন, রং কালো বা ফর্সা কোনটাই নয়, চশমা –হ্যাঁ চশমা আছে। গাঢ় রঙের বুশ সার্ট আর প্যাণ্ট পরা ছিলো। বয়স বোঝা যায় না চল্লিশ হতে পারে, কিংবা আর একটু বেশি।

'আপনার বর্ণনা খুবই জেনারেল—এতে করে ঠিক লোককে স্পট কর: মুস্কিল। যা বলছেন তাতে মনে হয় আমাদের আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়াং তাদের মতই বিশেষত্বহীন কেউ একজন। যেমন ধরুন এই ভদ্রলোকটি— আপনার মেসোমশাই।'

কেতকী মেসোমশাই-এর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। সত্যিই অজান্তে অনেকটা তাঁর বর্ণনাই দিয়ে ফেলেছে সে। সোনামাসিও স্বামীর দিকে অস্বস্তিভরা চোখে তাকালেন।

'না, না এটা নেহাতই ঠাট্টা মিসেস বোস'—পুলিশ অফিসারের মুং তির্যক হাসির আভাস ফুটে উঠল। 'তবে আমি সেই লোকটির অসাধারং সাহসের কথা ভাবছি। হাওড়া স্টেশনে দিল্লী মেলে এই ট্রাঙ্ক নিয়ে ট্রেনে ট্রাভল্ করা মুখের কথা নয়—'

বাইরে থেকে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টার এসে দাঁড়াল। সমবেত সকলে: জিজ্ঞাসু চোখ তার মুখের দিকে!

'একটি অল্পবয়সী মেয়ে স্যার—খুব নিষ্ঠুরভাবে মার্ডার করা হয়েছে। কিন্তু চেনা-জানার উপায় নেই।'

'কোনো ক্লু পাওয়া গেছে'—অফিসার ভুরু কুচকে তাকালেন।

'সারা শরীর টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া ন্যাকড়া আর চটে জড়ানো লণ্ড্রির মার্কও খুঁজে পাই নি। কেবল একটা আংটি।'

কেতকী দেখলো চুনি আর পোকরাজ বসানো সেই আংটিটা। যেটা দেবাশীষ একদিন তার আঙুল থেকে খুলে মল্লিকার আঙুলে পরিয়েছিল।

'মল্লিকা!' বলে চিৎকার করে উঠল সে। ঘরের দেওয়ালগুলো কাঁপছে। অন্ধকার। তারপর আরও অন্ধকার।

জেলের বাইরে জেল

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

চৌরঙ্গীর একটি বিখ্যাত রেস্তোরায় ব্রজলাল একলাই ডিনার খেতে বসেছিল।

নমস্তে ব্রিজলালজী!

মুহূর্তের জন্যে ব্রজলাল চমকে উঠল। তারপর লোকটির পানে তাকিয়ে বলল, নমস্কার। কিন্তু মশাইয়ের বোধ হয় একটু ভুল হচ্ছে। আমার নাম ব্রিজলাল নয়, ব্রজলাল—ব্রজলাল পালধি।

বেশ। তাহলে নমস্কার ব্রজলালবাবু! বলে লোকটি ডান দিকের একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

মাপ করবেন, আপনাকে আমি ঠিক—

চিনতে পারছেন না, না?—ব্রজলালের কথার সুর টেনে নিয়ে লোকটি বলল, না চেনারই কথা। আমার নাম মমিন্ মিঞা। তবে কোন কোন মহলে নন্দগোপাল নামেই পরিচিত।···

নন্দগোপাল? ব্রজলাল ভ্রুকুটিভরে তার দিকে তাকাল। ও লোকটা কি করতে এসেছে তার কাছে? ওকে সে চিনতও না ভালরকম। শুধু চিনিমলের সঙ্গে দেখেছে বারকতক।

চিনিমল ব্রজলালের সঙ্গী। সঙ্গী ঠিক বলা চলে না। চোরাই-হীরে সংগ্রহ করে এনে দিত। সস্তাদামে ব্রজলাল সেগুলি কিনত তার কাছে। নন্দগোপাল তারই সাকরেদ। কিন্তু তারই সঙ্গে কোনদিন লেন-দেন করে নি ব্রজলাল।

ব্রজলালের মনের কথাটা যেন বুঝে মুখ দিয়ে একটা বিশ্রী আওয়াজ করে নন্দগোপাল বলল, চিনিমলের সঙ্গে আমার কথা হয়—

ব্রজলাল অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, কিন্তু চিনিমল তো মারা গেছে—

হ্যাঁ, নিউমোনিয়ায়। একই খাঁচায় আমরা ছিলাম। মারা যাবার দিনকয়েক আগে সে আমায় বলে, তোমার কাছে তার কিছু পাওনা আছে। আমি যেন সেই টাকা নিয়ে তার স্ত্রী রুক্মিণীর একটা ব্যবস্থা করি। তাই ঠিক করেছি—

কিন্তু—

ব্রজলালকে থামিয়ে নন্দগোপাল বলে চলল, খোদা কসম্ ব্রিজলালজী, দোস্ত বলে চিনিমল আমাকেই পৃথিবীতে জানত। তাই আমাকেই সে চলে যাবার সময় রুক্মিণীর ভার দিয়ে যায়—

ব্রজলাল বলে, কত টাকার কথা, কিছু বলেছিল চিনিমল ?

বলেছিল। পাঁচ হাজার—পাঁচ হাজার টাকার কথা !

তাই নাকি ?

ব্রজলাল আর একটা সিগারেট ধরালো। ভাবতে লাগলো চিনিমলের কথা।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ব্রজলালের যে, চিনিমল মারা গেছে। নইলে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যদি সে ব্রজলালের নামটা একবারও করত, তাহলে তাকেও পুলিশে ধরে টানা-ছেঁড়া করত নিশ্চয়ই। হয়ত চিনিমল অতটা বিশ্বাসঘাতক ছিল না, তবু ভুল করতেই বা কতক্ষণ ! যে হীরের নেকলেশ চুরি করায় অপরাধে সে ধরা পড়েছিল, তার থেকে ব্রজলাল লাভ করেছে পনেরো হাজার টাকা। কথা ছিল তার থেকে পাঁচ হাজার চিনিমলকে দেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে চিনিমল সেইদিনই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর আর তাদের দেখা হয় নি ; চিনিমল মারা গেল জেলেতেই।

আজ তারই কথামত নন্দগোপাল এসেছে।

চিনিমলের সঙ্গে এসে লোকটা তার কারবারের অনেক গোপন তথ্যই জেনেছে। যদি ঘুণাক্ষরেও সে-কথা পুলিশে জানায় সে, তাহলে নির্বাসন দণ্ড তার সুনিশ্চিত। শুধু এইখানেই ব্রজলালের দুর্বলতা। জগতের মধ্যে এই লোকটিকেই আজ শুধু তার ভয়।

কতক্ষণ পর তাই সে বলল, আচ্ছা চলো আমার সঙ্গে। চিনিমলের টাকাটার অর্ধেক আজ তোমায় দেব।

শহরের সীমান্তে ব্রজলালের বাড়ী।

সামনেই বাড়ী। পুরোনো আমলের। দূর থেকে দুর্গ-দুর্গ মনে হয়। ছোট ছোট জানলা, ভারী ভারী দরজা। সদরে কোলাপ্সিবল গেট।

সিমেন্ট-বাঁধানো খানিকটা চত্বর পার হয়ে নন্দগোপালকে নিয়ে সে ভেতর দিকে আর একটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলেই বোঝা যায়, বিশেষ কায়দায় তৈরী সেটা। অদ্ভুত আকৃতির এক কল বসানো দুটো পাল্লার মাঝে। বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নেই যে, সেখানে একটা কব্জা বসানো রয়েছে।

সরু কাঠির মত লোহার একটা চাবি তার মধ্যে ঢোকাতেই দরজাটা আপনা থেকে খুলে গেল।

প্রথমে ব্রজলাল, তার পিছনে নন্দগোপাল ভেতরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

ব্রজলাল পাকা লোক। জুয়েলারীর ব্যবসাদার বলেই বোধ করি বাড়ীর দরজাগুলো এমন বিশেষ কায়দায় তৈরী করিয়েছে, যাতে সাধারণ লোক চট করে ঢুকতে না পারে, কিম্বা ঢুকলেও বেরোতে না পারে।

ভেতরে গভীর অন্ধকার। নিজের অস্তিত্বটুকুও যেন উপলব্ধি করা যায় না।

ব্রজলাল একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললো। স্থানটা আলোকিত হতেই নন্দগোপাল একবার চমকে উঠল।

চমকাবার কারণও অবশ্য আছে। অদ্ভুত আকৃতির ঘর। ত্রিকোণ এবং অত্যন্ত নিচু। হাত তুললে কড়িতে গিয়ে ঠেকে। সামনেই আর একটা ছোট্ট দরজা। থিয়েটারের ষ্টেজে তিন পিস কাঠের তৈরী যেমন ছোট ছোট জানলা-দরজা দেখা যায়, কতকটা সেইরকম। প্রথম দর্শনে মনে হয় বুঝি বা ক্যানভাসে আঁকা সেগুলো।

বাঁ-দিকে টেবিলের ওপর থেকে একটা পোড়া মোমবাতির টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে ব্রজলাল সেটা ধরালো। তারপর টেবিলের একান্তে সেটি রেখে বলল, আমার এখানে আলো নেই নন্দগোপাল···বসো ওই চেয়ারটায়।

টেবিলের গায়ে একখানা কাঠের চেয়ারে বসে নন্দগোপাল চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এমন অদ্ভুত ঘর সে এর আগে দেখে নি। দু'ইঞ্চি

ব্যারাকের লোহার গরাদ দেওয়া বড় জানলাটাও যেন তার চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে দেখা দিল। হাত গলানো দূরে থাক একটা আঙুল গলানোও দুঃসাধ্য তার ফাঁক দিয়ে মনে হয়, আলোর জন্যে নয়, শুধু মাত্র বাতাস চলাচলের জন্যেই সেটা তৈরী করা হয়েছে।

মাঝে মাঝে সেখান দিয়ে অল্প বাতাস এলেও ঘরটায় অসহ্য একটা গুমোট গরম। কেমন একটা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নন্দগোপালের নাকে এসে লাগল যেন।

সরু কাঠির মত লোহার সেই চাবিটা ব্রজলাল অপর প্রান্তের দরজার দুই পাল্লার মাঝামাঝি করে লাগালো।

দরজাটা খুলে গেল।

সে-ঘরেও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ভেতরে ঢুকে গিয়ে ব্রজলাল একটা চিমনী ধরালো। কিন্তু অন্ধকার তাতে বিশেষ দূর হলো না—আবছায়া হয়ে উঠল মাত্র।

লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে ঝির্ ঝির্ করে হাওয়া আসছিল। মোমবাতির শিখাটা কেঁপে কেঁপে উঠছিল তারই মৃদু ঘায়ে।

ও-ঘরের চিমনীর আবছা আলোয় নন্দগোপালের হঠাৎ চোখ পড়ল ব্রজলালের ওপর। দরজার সামনাসামনি ওদিককার দেওয়ালের ধারে সিন্দুক খুলে সে তখন টাকা গুণছে।

কর্‌করে কয়েক তাড়া বড় বড় নোট!

নন্দগোপালের বুকের রক্ত বোধ করি চমক খেয়ে উঠল। শরীরের সমস্ত স্নায়ুশিরা দুর্নিবার লোভেই বুঝি চন্‌মন্ করে উঠল, চক্ চক্ করে উঠল জবার মত লাল চোখ জোড়া।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল সে।

পদশব্দে চোখ তুলে তাকাল ব্রজলাল। কতকটা আদেশের ভঙ্গীতেই বলল, ওইখানেই বসো নন্দগোপাল, এদিকে পা বাড়িও না।

নন্দগোপাল বসল না, থামল মাত্র। কি একটা কথা বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু ঠোঁটের কাছে এসে আটকে গেল।

ব্রজলাল এবার চেঁচিয়ে উঠল: ওইখানেই বসো নন্দগোপাল!

অস্ফুট স্বরে নন্দগোপাল বলবার চেষ্টা করল: পুরো টাকাটাই দাও না দোস্ত!

তবু সে বসল না দেখে ব্রজলাল সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করে এগিয়ে এসে

ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে বলে উঠল, চুপচাপ বসে থাক, নইলে খালি হাতেই আজ ফিরতে হ'বে তোমাকে।

স্খলিত চরণে নন্দগোপাল পেছিয়ে এসে বসল তার চেয়ারটায়। টেবিলের ওপর যে ভারী কাচের পেপার-ওয়েটটা ছিল, সেটা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

ব্রজলালও স্বস্থানে ফিরে গিয়ে দাঁড়াল।

প্রবল উত্তেজনাতেই বোধ করি নন্দগোপাল তখন ঘামতে সুরু করেছে। চোখ দুটোয় আগুনের আভা। একটা অজানা আক্রোশে পেপার-ওয়েটটা সে সজোরে চেপে ধরল। বোধহয় নিজের নির্বুদ্ধিতার কথাই ভাবছিল সে। এত সহজে পাওয়া যাবে জানলে সে ব্রজলালের কাছে আরও বেশি টাকার কথা বলত!

কতক্ষণ পর কি একটা বলতে গিয়েও সে মনে হলো থেমে গেল। চকিতে তার মাথায় খেলে গেল একটা কথা: ব্রজলালের হাতের টাকাগুলো ছিনিয়ে নিলে কেমন হয়? সমস্ত জীবনটা তাহলে বেশ সুখেই কেটে যায়! ব্রজলাল বাধা দেবে, দিক! নয় তাকে সে আজ খুনই করবে! দেখছে কে? বাড়ীতে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। সুতরাং উপস্থিত এখানে কারোরই আসবার সম্ভাবনা নেই! এলে মাসখানেক পরে আসবে। দু'মাস পরেও আসতে পারে। ছ'মাস হওয়াও আশ্চর্য নয়। তারপর যখন খোঁজ-খবর পাবে না, পুলিশে খবর দেবে তারা। পুলিশ হয়ত আসবে, তা আসুক! ততদিনে ব্রজলালের শরীর গলে পচে—অবশিষ্ট থাকবে শুধু হাড় ক'খানা। শরীরে আঘাতের কোন চিহ্নই থাকবে না। সমস্ত প্রমাণই তখন যাবে লুপ্ত হয়ে।

পেপার-ওয়েট হাতে নন্দগোপাল আবার সশব্দে দাঁড়িয়ে উঠল।

ব্রজলালও চমকে ফিরে তাকাল। বলল, অত ছটফট করছো কেন? চুপচাপ বসতে পারো না?

না।—গর্জন করে উঠল নন্দগোপাল: আমাকে পুরো টাকাটাই আজ দিতে হবে।

কথাশেষে পেপার-ওয়েটটা হাতের 'পরে লুফতে লুফতে পা টেনে টেনে সে এগোতে লাগল।

ব্রজলালের চোখদুটো ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল। বাঁ-হাতে সিন্দুকের ডালাটা বন্ধ করে সে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, তার মানে? কি বলতে চাও তুমি? এক পয়সাও তোমাকে আমি দোব না—এক পয়সাও না—

নন্দগোপাল আরও এক পা এগোল। শেষে-তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, দেবে না, কেমন ?

তার হাতের দিকে চোখ পড়তেই ব্রজলাল চকিতে তার ডান হাতটা পকেটে ভরল। নিকষ কালো চকচকে একটা পিস্তল বার করে বলল, মারণাস্ত্র একটা আমার কাছেও আছে—। তোমাকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম, এখন দেখছি মহা ভুল করেছি। একটা কাণা কড়িও আমি তোমাকে দোব না জেনো—বেরিয়ে যাও এখান থেকে—বেরিয়ে যাও—

কোন কথা নয়, ব্রজলালের ললাট লক্ষ্য করে নন্দগোপাল চকিতে সেই ভারী পেপার-ওয়েটটা সজোরে ছুঁড়ে দিল।

ব্রজলালও সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলের ঘোড়া টিপল। কিন্তু হায়রে! নন্দগোপাল তার আগেই একপাশে সরে দাঁড়িয়েছে।

নন্দগোপালের লক্ষ্য কিন্তু ব্যর্থ হয় নি। ভারী কাচের গোলাকার বস্তুটি ব্রজলালের কপালে আঘাত করে, সশব্দে মেঝেয় পড়ে তিন টুকরো হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রজলালও বসে পড়ল মেঝেয়। অকথ্য যন্ত্রণায় সারা মুখখানা কুঁচকে বীভৎস হয়ে উঠল। ক্ষতস্থান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল তাজা রক্তের স্রোত।

তারপর একসময় সে পুনরায় উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। টল্‌তে টল্‌তে কোনরকমে দরজা গোড়ায় এল, কিন্তু দুর্ভাগ্য তার! মাথাটা কেমন যেন ঘুরে উঠল। কম্পিত হাতে দরজার কপাটটা আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না—পারল না সে স্থির হয়ে এক মিনিট দাঁড়াতে, পারল না আর একবার লক্ষ্য স্থির করে ঘোড়াটা টিপতে। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল ঘরের মধ্যেই এবং সেই সঙ্গে দরজাটাও গেল সশব্দে বন্ধ হয়ে।

বিমূঢ়ের মত প্রথম কয়েকটা মুহূর্ত নন্দগোপাল তাকিয়ে রইল সেদিক পানে। তারপর একসময় এগিয়ে গিয়ে দরজাটায় ঠেলা দিল, কিন্তু খুলল না। বিশেষ কায়দায় তৈরী কপাটের কব্জা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেছে।

তালাবদ্ধ অবস্থায় রক্তাক্ত ব্রজলাল রইলো 'ষ্ট্রেজ-ঘরেই' বন্দী হয়ে।

নন্দগোপাল ভাবতে লাগল, এখন কি করবে সে? পালাবে? টাকা না নিয়েই? উপায়ই বা কি! সিন্দুকের কাছে পৌঁছবার কোন পথই খোলা নেই! এক যদি ভেঙে ফেলা যায়! কিন্তু তাতে বিপদ অনেক। বাইরে নিস্তব্ধ

রাত থম্‌থম্‌ করছে। নির্জন বাড়ীর দরজা ভাঙার শব্দ গিয়ে পৌছবে দূরে—অনেক দূরে—

নিষ্ফল আক্রোশে নন্দগোপাল মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল। নিজের নির্বুদ্ধিতায় আজ সব কিছু হারাল সে। ব্রজলাল নিজের থেকে যা দিতে চেয়েছিল, শুধু সেটুকু নিলেই ভাল হতো।

মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে এসেছে। বাইরের ঝির্‌ঝিরে হাওয়ায় ঘন ঘন কাঁপছিল সেটা। এখনই হয়ত নিভে যাবে।

নন্দগোপাল আর একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল, এখানে আসার কোন চিহ্ন সে রেখে যাচ্ছে কিনা। নাঃ, কোন চিহ্নই পড়ে নেই! লোকে জানে ব্রজলাল কলকাতার বাইরে গেছে, মাসখানেক পরে ফিরবে! সুতরাং উপস্থিত এদিকে কারোর আসার সম্ভাবনা নেই।

নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে নন্দগোপাল পিছন ফিরে ঘরের দ্বারপথে পা বাড়ালো। কিন্তু পরক্ষণেই বিস্ময়ের একটা অব্যক্ত ধ্বনি করে উঠল সে। মোমবাতির মৃদু আলোকেও মনে হলো, মুখখানা যেন তার ছাইয়ের মত পাংশু হয়ে গেছে। চোখ দুটো যেন স্বতঃই ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়।

সে-দরজাও বন্ধ!

মনে পড়ল, ঢোকবার সময় সে নিজেই সেটা ভেজিয়ে দিয়েছিল। তখনই কৃত্রিম উপায়ে তালাবন্ধ হয়ে গেছে এবং তার চাবিটা রয়েছে ব্রজলালের কোমর-সংলগ্ন রিংয়ের সঙ্গে!

ভয়ে ভাবনায় নন্দগোপাল আবার ঘেমে উঠল। জানলা গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতেই কানে এল তার বাইরে অপেক্ষমান ট্যাক্সির তীব্র হর্ণের শব্দ! আরোহীদের বাড়ী থেকে বেরোতে না দেখে ড্রাইভার হয়ত এখুনি চেঁচামেচি সুরু করবে এবং কোন হদিশ না পেয়ে পুলিশে খবর দেবে, আর—

অকস্মাৎ দমকা একটা বাতাসে মোমবাতির ক্ষীয়মান শিখাটা বার দুই কেঁপেই দপ্‌ করে নিভে গেল।

পরক্ষণেই ঘরটা ঘন অন্ধকারে ভরে' উঠল।

যন্ত্রচালিত পুতুলের মত নন্দগোপাল ধীরে ধীরে সেখানেই মেঝের ওপর বসে পড়ল।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যু

পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

কৈলবারা থেকে কমলমীর যাবার পথে এখানে সেখানে যে ছোট ছোট গ্রামগুলি সাদা ব্লটিং-এর ওপর কালির বিন্দুর মত ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলোর কাঁটালতা ও ভাঙা দেউলগুলোর আড়ালে ইতিহাসের কত ছেঁড়া পাতা যে অবহেলায় অনাদরে প্রায় বিস্মৃত হয়ে পড়ে আছে, তার হিসেব দিতে গেলে পুরো একটা বই লিখতে হয়। পাহাড়ঘেরা মরুময় এই অঞ্চলটির মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে আমগাছের ছায়ায় ঢাকা ছোট একটি গ্রাম, যখন হঠাৎ চোখে পড়ে তখন মন ভেসে যায় রাজপুত ইতিহাসের সেই বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের মাঝখানে। যে দিন জানের চেয়ে মানের দাম ছিল অনেক বেশি, বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ির মধ্যেও শৌর্য-বীর্যের এমন পরিচয় মিলতো, আজকের শহরে মানুষ, সভ্যতার কল্যাণে অতিরিক্ত হিসেবী মানুষ যা সহজে কল্পনাও করতে পারে না।

রাজপুত জীবনের সব চেয়ে বড় অভিশাপ বোধ করি তাদের আত্মকলহ। তবু, গোষ্ঠীগত প্রাধান্য অর্জনের জন্য তাদের এই অবিশ্রান্ত মারামারি হানাহানির মধ্যে হঠাৎ এমন এক একটা মানুষের দেখা পাওয়া যেতো, যারা রাজপুতসুলভ খুনোখুনি, কাটাকাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও এমন সৃষ্টি ছাড়া দুঃসাহস, আত্মমর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিত যার ফলে ইতিহাসের ধারাই যেত উল্টে।

কৈলবারা থেকে কমলমীর যাবার পথে একপ্রান্তে, 'মামা দেবীর' দেউল থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়ী উপত্যকার মাঝখানে একটি নিরলঙ্কার স্মৃতি-মন্দির আজও লোকের চোখে পড়ে। মাড়বারে প্রবেশের পথের ধারে—আশপাশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়েই পড়ে আছে স্মৃতি-মন্দিরটি, পাহাড় বা টিলাগুলোর ওপর দাঁড়ালে চোখ যেটির দিকে সহজেই ছুটে যায়।

এই ভাঙা দেউলটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মেবারের এক দুরন্ত, দামাল ছেলের স্মৃতি—যে নিজের খেয়াল খুশিমত চলতে গিয়ে পিতৃ-আজ্ঞায় রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়েও এতটুকু দমে নি, সেকালের সবচেয়ে তেজস্বিনী

রাজপুতানী যার গলায় মালা দিয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিল, আর নিজের হঠকারিতার মূল্য হিসেবে যাকে প্রাণ দিতে হয়েছিল এই অখ্যাতপল্লীর প্রান্তে এসে, একান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে।

রাজপুতদের বাড়িতে সম্মানিত অতিথির সমাগম হলে সন্ধ্যার সময় স্থানীয় মেয়েরা আজও এই দুঃসাহসিক ছেলেটির গান আর গল্প শুনিয়ে অতিথিকে সমাদর জানায়—এরই কাহিনী বর্ণনা করা নাকি মেবারে অতিথিসেবার প্রকৃষ্টতম উপায়—চারণীরা আজও পথে প্রান্তরে এই ছেলেটির কাহিনী সুরে-তালে গেয়ে বেশ দু-পয়সা উপার্জন করে।

ইতিহাসের পাতায় ছেলেটি আমাদের অপরিচিত নয়। আমারা তাকে পৃথ্বীরাজ বলে জানি।

খৃষ্টীয় ১৪৭৪ সালের কথা।

রাণা কুম্ভর পর মেবারের সিংহাসনে বসলেন রায়মল। রায়মলের তিন ছেলে—সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ আর জয়মল্ল। সঙ্গ মুসলমানদের বিরুদ্ধে একাধিকবার যুদ্ধ করে মেবারের ইতিহাসের পাতায় নিজের স্থান করে নিল, আমরা তাকে জানলাম সংগ্রাম সিংহ রূপে। আমাদের আজকের গল্প কিন্তু সঙ্গকে নিয়ে নয়। তার ছোটভাই পৃথ্বীরাজকে নিয়ে। কৈলবারা থেকে কমলমীরের পথে যে ভাঙা স্মৃতি-মন্দিরটি দেখা যায় তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই দুঃসাহসী দামাল ছেলেটিরই নাম।

মানুষের ইতিহাসে মাঝে মাঝে এমন এক-আধজন খাপছাড়া লোকের সন্ধান পাওয়া যায়, যারা চিরাচরিত হিসেব-নিকেশ, নিয়ম-কানুনগুলো কিছুতেই মেনে চলতে পারে না। তাদের জন্মলগ্নে কোন্ গ্রহ অবস্থান করে সে খবর আমার জানা নেই, কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন তারা কক্ষচ্যুত উল্কার মত সাধারণ মানুষের মনে চমক লাগিয়ে যায়।

বড়ভাই সঙ্গর সঙ্গে পৃথ্বীরাজের বুঝি কোন দিক থেকেই কোন রকমের মিল ছিল না। সঙ্গ ভেবে চিন্তে কাজ করতেন, আর পৃথ্বীরাজ চলতো তার সিধে-উল্টো রাস্তা ধরে। জ্যেষ্ঠ সংগ্রাম সিংহ সিংহাসনে বসবে এটা সে কিছুতেই সহজভাবে মেনে নিতে পারত না কথাটা মনে হলেই তার মাথায় যেন খুনের নেশা চেপে যেত। জ্যেষ্ঠ হলেই শ্রেষ্ঠ হয় না, এই ছিল তার বিশ্বাস।

একদিন তিন ভাই বসে এই সব বিষয় জল্পনা করছে। এদের খুড়ো

সুরযমলও আছেন সেই আসরে। সঙ্গ বললে, রীতি অনুযায়ী মেবারের সিংহাসন আমার প্রাপ্য হলেও চারুণী দেবীর মন্দিরে যে পূজারিণী আছেন, তিনি যদি আর কাউকে সিংহাসনে বসবার যোগ্য বলে ইঙ্গিত করেন, তাহলে আমি মেবারের দশ হাজার গ্রাম আর শহর শাসন করবার দাবী সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দেব।

কথাটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল পৃথ্বীরাজ। তখুনি ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে পড়ল চারজনে—উদয়পুরের দশ মাইল পূর্বে নহরা মুগরোর পথে। চারুণী দেবীর মন্দির এইখানেই।

অনর্থটা ঘটলো এই মন্দিরে। সঙ্গ মন্দিরে গিয়ে ব্যাঘ্রচর্মের একটি আসনের ওপর বসল, সুরযমল রইলেন একেবারে তার কাছ ঘেঁষে। মন্দিরের পূজারিণী সমস্ত ব্যাপার শুনে ইঙ্গিত করলেন সেই ব্যাঘ্রচর্মাসনের দিকে। অর্থাৎ সঙ্গ রাজ্যের অবিসম্বাদী অধিকারী। দুরন্ত পৃথ্বীরাজের মাথার রক্ত টগবগ করে ফুটে উঠল—তরবারি নিষ্কাষিত করে সে আঘাত করতে উদ্যত হল সঙ্গের বক্ষঃস্থলে।

পূজারিণীর ভবিষ্যদ্বাণী বুঝি এই মুহূর্তেই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।…কিন্তু না, সঙ্গকে উত্তরকালে তৈমুর বংশোদ্ভবদের সঙ্গে বহু ইতিহাস বিখ্যাত যুদ্ধে লড়াই করতে হবে, সুরযমল ছুটে এসে সে আঘাত প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করলেন। দুইপক্ষে রীতিমত অসিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। পূজারিণী ভয়ে মন্দির ছেড়ে পালালো। পৃথ্বীরাজের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল সুরযমলের ওপর। আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল সুরযমলের শরীর। সঙ্গও রেহাই পেল না। দেহের পাঁচ জায়গায় তলোয়ারের চোট নিয়ে তাকে পালাতে হল। চোখে তীরও বিঁধেছিল একটা, একটা চোখ শেষ পর্যন্ত নষ্ট হয়েই গেল। পলাতক সঙ্গ আশ্রয় নিল গিয়ে দেবী চতুর্ভুজার মন্দিরে।

ঘটনার বিবরণ শুনে রাণা রায়মল একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। যে দুর্বিনীত সন্তান জ্যেষ্ঠের গায়ে অস্ত্রাঘাত করতে কুণ্ঠিত নয়, তাকে খুন করতেও প্রস্তুত, তিনি তাকে ক্ষমা করবেন না।—কিছুতেই না। পৃথ্বীরাজকে তিনি রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন। দেখা যাক, নিজের দম্ভ আর দুঃসাহস সম্বল করে হতভাগা কি করে দিন কাটায়!

দুঃসাহসের সঙ্গে আত্মবিশ্বাসও ছিল পৃথ্বীরাজের মনে পুরোমাত্রায়। পিতৃআজ্ঞা। নিঃশব্দে মাথা পেতে নিয়ে পৃথ্বীরাজ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে

এল। পাঁচটি মাত্র ঘোড়া আর পাঁচজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে পৃথ্বীরাজ রাজ্য ত্যাগ করল।

পিতৃরাজ্য ছেড়ে এল পৃথ্বী গদোয়ারে। এ অঞ্চল ছিল আদিম অধিবাসীদের আধিপত্য। পৃথ্বী কিন্তু বেশি দিন নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল না। ধীরে ধীরে নিজের একটি শক্তিশালী দল গড়ে তুলে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, আক্রমণ করে সেগুলি দখল করতে শুরু করল। ক্রমে ক্রমে সারা গদোয়ার অঞ্চলেই তার আধিপত্য গড়ে উঠল—শুধু আধিপত্য নয়, এখানকার বিশৃঙ্খল জীবন-যাত্রায় রীতিমত মেবারী শাসনের সূত্রপাতও হল বুঝি সেই দিন থেকেই।

ইতিমধ্যে রাণা রায়মলের জীবনে আর একটা প্রচণ্ড আঘাত এল ছোট ছেলে জয়মলের তরফ থেকে।

সঙ্গ তখনও পলাতক। পৃথ্বীরাজ নির্বাসিত। কাজেই জয়মল এবং আরও অনেকেই ধরে নিয়েছিল যে সিংহাসন জয়মলেরই। রাণা রায়মলের তখন বয়স হয়েছে, কাজেই তাঁর সন্তান জয়মলও যদি খুশিমত চলতে শুরু করে তাতে বাধা দেবে কে?

জয়মল হঠাৎ প্রেমে পড়ল। আর সে প্রেম এমনি উন্মাদ, এমনি উদ্দাম যে, তার পরিণাম পর্যন্ত ভেবে দেখবার অবসর পেল না জয়মল। মৃত্যু দিয়ে তাকে এই প্রণয়-কামনার মূল্য পরিশোধ করতে হল।

সেদিনের রাজপুতানায় যে মেয়েটির রূপ আর সৌন্দর্যের খ্যাতি ঘরে ঘরে যুবজনের মনে স্বপ্ন আর আবেশ সৃষ্টি করতো, তার নাম তারাবাই। তারা-বাইয়ের পিতা রাও সুরতানকে পাঠানেরা তাঁর রাজ্য থোড়া কেড়ে নিয়ে সেখান থেকে বিতাড়িত করেছিল। থোড়া থেকে বিতাড়িত হয়ে রাও সুরতান আশ্রয় নিয়েছিলেন আরাবল্লী পর্বতের পাদদেশে বেদনৌর অঞ্চলে। তরুণী তারাবাই ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াত, তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম নিয়ে খেলা করতো। নারীসুলভ লজ্জা, কোমলতা, এ-সবের সঙ্গে তার তখনও পরিচয় ঘটে নি। সুরতান তাকে নিজের হাতে অসিযুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ পর্যন্ত শিখিয়েছিলেন। সুরতান মাঝে মাঝে থোড়া পুনরুদ্ধারের জন্য আফগানের বিরুদ্ধে নিষ্ফল অভিযান চালাতেন। এই সব অভিযানে পিতার সঙ্গিনী হতো তারাবাই। এমনি করে রূপের সঙ্গে তার সাহসের খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল রাজস্থানের চারদিকে। কিন্তু তারার সেদিকে এতটুকু

খেয়াল ছিল না। অপহৃত পিতৃরাজ্য কি করে আফগানের কবল থেকে আবার ছিনিয়ে নেওয়া যায়, তারই কল্পনায় তার মনপ্রাণ যেন ভরপুর হয়ে থাকতো। সুরতান বলতেন, বয়েস হচ্ছে বেটি, এবার বিয়ের সম্বন্ধ দেখি, কি বল?

তারা জবাব দিতো, না বাবা, থোড়ায় না ফিরে আমি বিয়ে করব না।

এই তারার রূপলাবণ্যের বর্ণনা একদিন রায়মলের ছেলে জয়মলের কানে পৌছলো। জয়মল একেবারে বেদনৌরে গিয়ে হাজির হল ঘোড়া ছুটিয়ে। তারার পাণিপ্রার্থনা করলে।

পিতার সামনে দাঁড়িয়ে জবাবটা তারাই দিলে—আফগান দস্যু লিল্লার হাত থেকে থোড়া উদ্ধার করে দিন। আপনার প্রার্থনা পূর্ণ হবে।

জয়মল প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফিরে চললো। কিন্তু এ তারা যে তার ভাগ্যের তারা নয়, জয়মলের বোধ করি সেটুকু ভাববার অবসর ছিল না। ফিরে এল বটে জয়মল, কিন্তু তারাকে কাছে পাবার কামনাটা মনের মধ্যে এমনি উগ্র হয়ে উঠল যে থোড়া পুনরুদ্ধার করে তারাবাইকে যথারীতি বিবাহ করা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবার মত মনের অবস্থা তার রইল না। থোড়া আফগানদের কবলে যাক আর নাই যাক, তারাবাইকে তার চাই।

প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবার আগেই তারাবাইকে অঙ্কশায়িনী করবার জন্যে ক্ষেপে উঠল জয়মল—আবার গিয়ে বেদনৌরে হাজির হল এবং ছলে বলে কৌশলে তারাবাইকে নিয়ে পালাবার জন্যে সচেতন হয়ে উঠল। সুরতানকে অর্থের প্রলোভন দেখাতেও কুণ্ঠিত হল না।

সুরতান ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। মেয়ের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা তিনি জানতেন, থোড়া উদ্ধারের জন্য তাঁর নিজের আগ্রহও বড় কম ছিল না। এই অবস্থায় একজন রাজপুত যে মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে তাঁর মেয়ের মনোহরণ করবে, তাঁকে উৎকোচ দেবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করবে, এ তিনি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারলেন না।

ক্রোধান্ধ সুরতান মেবারের রাণার ছেলে জয়মলকে হত্যা করে বসলেন।

যথাসময়ে সে সংবাদ পৌছোলো বৃদ্ধ জয়মলের কাছে। সভাসদ ও সর্দারেরা প্রতিশোধ নেবার জন্য রাণাকে প্ররোচিত করতে লাগল। রায়মল উত্তর দিলেন: জয়মল আমার ছেলে হলেও যে বিপন্ন রাজপুতকে, এক রাজপুত নারীকে প্রতারিত করতে গিয়েছিল। সে তার সমুচিত শাস্তি পেয়েছে।

এমন কথা বুঝি শুধু রাজপুতের মুখেই শোনা যায়। আরও শোনা যায়, এজন্যে তিনি সুরতানকে নাকি পারিতোষিক হিসেবে একটা জায়গীরও দিয়েছিলেন।

কনিষ্ঠ সন্তানের মৃত্যুতে রায়মল আঘাত বড় কম পান নি। জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গ তখনো নিরুদ্দেশ, পৃথ্বীরাজ পলাতক। রাজ্যের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে, রাণা রায়মল ক'দিন ভালো করে ঘুমোতে পারলেন না। তারপর হঠাৎ একদিন গদোয়ারের পথে রাণার একজন পত্রবাহক ছুটল ঘোড়া ছুটিয়ে। সংক্ষিপ্ত একটি পত্র, পৃথ্বীরাজের নামে : ক্ষমা করলাম। ফিরে এসো।

পৃথ্বী যে গদোয়ার অঞ্চলে অরাজকতা দূর করে শাসন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনেছে, সে-খবর তিনি আগেই পেয়েছিলেন। কিন্তু জয়মল বেঁচে থাকতে তাকে ডেকে পাঠাবার সাহস তিনি পান নি।

দুরন্ত দুঃসাহসী অবাধ্য সন্তানকে স্নেহান্ধ বাপ-মা যে কখন কি করে মনে মনে ক্ষমা করে বসে, সেকথা তারা ভিন্ন বোধ করি আর কেউ বলতে পারে না।

দীর্ঘকাল পরে পৃথ্বী বাড়ি ফিরল। কিন্তু জয়মলের শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী শুনে মনটা আবার ছটফট করতে লাগল সুরতানের মেয়ে তারাকে দেখবার জন্যে। তারার খ্যাতি পৃথ্বীর অজানা ছিল না—কিন্তু যে মেয়ের জন্যে তার ভাই প্রাণ দিতে পারে, সেই রূপবতী সাহসিকাকে একবার চোখে দেখা দরকার। শুধু চোখের দেখাই নয় কিন্তু। সেই সঙ্গে এ-কথাও সেই রাজপুতানী আর তার হৃতরাজ্য পিতাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে আফগান দস্যুর হাত থেকে থোড়া উদ্ধার করবার মত সাহসী ছেলে আজও রাজপুতনায় আছে এবং একবার কোন প্রতিশ্রুতি দিলে, সে-প্রতিশ্রুতির মর্যাদাও তারা রাখতে জানে।···হ্যাঁ, এই কথাই সে গর্বিতা তারাবাই আর তার বুড়ো বাপকে মুখের ওপর শুনিয়ে দেবে এবং তাই হবে জয়মলের অপমৃত্যুর পাল্টা জবাব।

পিতার কাছে বিদায় নিয়ে পৃথ্বী ঘোড়া ছোটাল বেদনৌরের পথে।

সাড়া পড়ে ছোট সহর বেদনৌরে—তারাবাইয়ের মত পৃথ্বীরাজের সাহস এবং শৌর্যবীর্যের খ্যাতিও গোটা রাজস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল অনেক আগে থেকেই। তার হঠকারিতা, দুর্দমনীয় দৃঢ় সঙ্কল্পের কাহিনীও এই অঞ্চলের

অধিবাসীদের অজানা থাকবার কথা নয়। হৈ চৈ সুরু হয়ে গেল এই ক্ষুদ্র জনপদে—রাণা রায়মলের আর এক ছেলে এসেছে তার কনিষ্ঠের মৃত্যুর হিসেব-নিকেশ করতে। দেখা যাক, কি ঘটে আবার!

নাটকীয় ব্যাপারই একটা ঘটে গেল শেষ পর্যন্ত। পৃথ্বীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে সাহসিকা তারাবাই সেদিন সর্ব প্রথম অনুভব করল যে সেও নারী, তার বর্শা বল্লম আর ঢাল-তলোয়ার-ঢাকা দেহের আড়ালে কোথা থেকে হঠাৎ যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল শাশ্বত কালের প্রণয়িনী—যার চোখে স্বপ্ন, ওষ্ঠপ্রান্তে লজ্জার মৃদু শিহরণ, হাতে বরণমালা।

উদ্ধত পৃথ্বীরাজ বেদনৌরের সভায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল—থোড়া আমি পুনরুদ্ধার করব। নইলে আমি রাজপুত নই—

আর কিছু বলার প্রয়োজন হল না। রূপমতী বীর্যবতী তারার কানে কানে কে যেন বলে গেল, আর ভয় নেই। সে প্রতিশ্রুতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করে নিল সুরতানের মেয়ে, তারপর সসঙ্কোচে চাইল বৃদ্ধ পিতার দিকে—

মণিপুর-দুহিতা চিত্রাঙ্গদা যেন নতুন করে অর্জুনের দেখা পেলো।

পিতা বুঝলেন মেয়ের মনের কথা। তার দিন কয়েক পরেই বিয়ের শানাই বাজল মেবারের রাণার ছেলে আর থোড়ার রাজকন্যাকে ঘিরে।

সোনায় যেন সোহাগা পড়ল। তারাবাই শুধু পৃথ্বীরাজের অঙ্কভাগিনী হল না, হল তার দুরন্ত দুঃসাহসের যোগ্য সহযাত্রিণী।

পৃথ্বী পাঁচশত দক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে আফগানদের আক্রমণ করবার সঙ্কল্প করল। মাত্র পাঁচশত সৈন্য নিয়ে আফগানদের পরাস্ত করা কঠিন তাই ঠিক হল তাজিয়া উৎসবের সময় অতর্কিত তাদের ওপর আক্রমণ শুরু করা হবে।

তারার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে, কৈশোর থেকে সে যে পণ করে বসেছিল, এতদিনে এলো তা পূর্ণ হবার লগ্ন—তারই স্বামী চলেছে তার পিতার হৃতরাজ্য শত্রুর কবল থেকে উদ্ধার করতে। তেজস্বিনী তারা কি চুপ করে প্রাসাদ-অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকবে, তার নিজের বর্শা-বল্লমগুলোর একটাও কি শত্রুর রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে না?

তারা বলল, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

পৃথ্বী হাসতে হাসতে বলল, তথাস্তু। পাঁচশত অশ্বারোহীর পুরোভাগে ছুটল স্বামী-স্ত্রীর ঘোড়া—রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে।

ওরা যখন থোড়ায় পৌঁছোল, তখন শোভাযাত্রীরা তাজিয়া নামিয়ে শহরের প্রধান চকে বিশ্রাম করছে। চারদিক লোকে লোকারণ্য। আফগান-অধিপতি লিল্লা তখন প্রাসাদে সাজ-সজ্জায় ব্যস্ত, গোঁফের প্রান্তে একটু আতর মাখানো আর দু-চোখে একটু সুর্মা টানা হলেই নেমে এসে শোভাযাত্রায় যোগ দেবেন। হঠাৎ বহু অশ্বখুরধ্বনির শব্দ তাঁর নিরুদ্বিগ্ন প্রসাধন-পর্বে ব্যাঘাত ঘটাল। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে তিনি ছুটে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন—

চকের ওপরেই প্রাসাদ।

শত্রুকে চিনে নিতে তারাবাইয়ের এক মুহূর্তের বেশি দেরি হল না—ইঙ্গিতে সে পৃথ্বীর দৃষ্টি আকর্ষণ করল বারান্দার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথ্বীরাজের হাতের একটা বর্শা এবং তারাবাইয়ের ধনুকের একটা তীর প্রায় একসঙ্গেই গিয়ে বিঁধল আফগান-অধিপতির বুকে—

একটা আর্তনাদ! তার পরেই সব শেষ।

সমবেত জনতা কিছুক্ষণের জন্য হতচকিত হয়ে রইল—হঠাৎ কি যে ঘটল সেটুকু বুঝে নিতে যে সময় লাগে ততক্ষণ। তার পরেই সবাই 'মার মার করে চিৎকার করে উঠল—শত্রু এসেছে, তাকে শায়েস্তা করতে হবে; মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে মৃত্যু দিয়ে— পৃথ্বী আর তারা তখন ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছে শহর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্যে ফটকের দিকে—

কিন্তু ফটক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একটা হাতি পথ রোধ করে—বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। দেরি করবার সময় ছিল না, তারাবাই মুহূর্তের মধ্যে হাতিটাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলল, হাতি লুটিয়ে পড়ল পথের ধারে, ওরা ছুটে বেরিয়ে গেল শহরের বাইরে, যেখানে পাঁচশত অশ্বারোহী অপেক্ষা করছিল তাদের জন্যে—

তারপর শুরু হয়ে গেল রীতিমত যুদ্ধ। যে যুদ্ধের ফলে সুরতান তাঁর হৃত-রাজ্য ফিরে পেয়েছিলেন, পৃথ্বী আর তারাবাইয়ের পণরক্ষা হয়েছিল।

এরপর এই কথাই আমাদের অনুমান করে নেওয়া স্বাভাবিক যে পৃথ্বী আর তারার জীবনের পরবর্তী দিনগুলি কেটেছিল স্বপ্নের মত স্বচ্ছন্দে, দাম্পত্য জীবন তাদের সুখে-শান্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল—

কিন্তু পৃথ্বীরাজের মত দুরন্ত দুঃসাহসী ছেলের জীবন-কাহিনীর উপসংহার এত সহজে অনুমান করে নেওয়া চলে না।

অপ্রত্যাশিত একটা কিছুকে ডেকে আনাই তাদের জীবনযাত্রার রীতি।

পৃথ্বীর জীবনেও ঘটল ঠিক তাই। যে কাহিনী অনায়াসে মিলনান্ত হতে পারত, ভাগ্যের বিচিত্র বিধানে তার পরিসমাপ্তি ঘটল সম্পূর্ণ অন্য ভাবে।

ঘোড়া পুনরুদ্ধার করে পৃথ্বী আবার বাড়ি ফিরল। কিন্তু খুড়ো সুরযমলের সঙ্গে শত্রুতাটা আবার নূতন করে জিইয়ে উঠল। সুরযমল সিংহাসন দখলের চক্রান্ত করছিলেন। দুই পক্ষে মারামারি, কাটাকাটি চলতেই লাগল—শেষ পর্যন্ত রীতিমত যুদ্ধই শুরু হয়ে গেল। সেসব যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা রাজপুতানার ইতিহাসে বিশদভাবেই বর্ণনা করা আছে, এখানে সেগুলির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু দুটি দিনের ঘটনা এখানে উল্লেখ না করলে রাজপুত-চরিত্র বর্ণনা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। দুই পক্ষে যুদ্ধ তখন বেশ ঘোরাল হয়ে উঠেছে। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সেদিন সুরযমলের রীতিমত অসিযুদ্ধ হয়ে গেছে—ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে সুরযমল রণস্থল থেকে প্রস্থান করেছেন। যুদ্ধের ফলাফল অমীমাংসিত। পরের দিন আবার যুদ্ধ হবে।

সুরযমল রণস্থল থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে তাঁবু ফেলেছেন। রাত্রি হয়েছে। নাপিত ডেকে সুরযমলের দেহের ক্ষতস্থানগুলি সেলাই করা এবং প্রলেপ দেওয়া চলছে। সুরযমল অবসন্নের মত খাটিয়ায় পড়ে আছেন। হঠাৎ সেই তাঁবুর মধ্যে এসে দাঁড়াল পৃথ্বীরাজ।

সুরযমল কুচক্রী হলেও আশ্চর্য হলেন না। এমন অভাবিত ব্যাপারের জন্যে রাজপুতদের সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হয়। ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়েই সুরযমল উঠে দাঁড়ালেন দুর্বিনীত ভ্রাতুষ্পুত্রকে স্বাগত জানাতে।

পৃথ্বী বলল, এখন কেমন বোধ করছেন কাকা?

খুব ভালো। প্রায় সেরে উঠেছি বলতে পারো। কারণ, তোমার দেখা পেলাম।

ভারি খিদে পেয়েছে। কিছু খেতে দিতে পারেন?

নিশ্চয় পারি।

সুরযমল তখনই খাবার আনবার হুকুম দিলেন। এলো লাড্ডু, পুরী—তখনকার মত যা সংগ্রহ করা সম্ভব। খুড়ো-ভাইপো মুখোমুখি বসে একই থালা থেকে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করল। সুরযমল পান আনালেন। পৃথ্বীরাজ তাও অসঙ্কোচে মুখে দিল।

যাবার সময় বললে, কাল আবার দেখা হবে—লড়াইয়ের মাঠে।

নিশ্চয় হবে। একটু সকাল সকাল এসো।

ক্লান্ত, নির্জীব দেহ নিয়ে সুরযমল খাটিয়ায় শুয়ে পড়লেন—ওঠা-হাঁটার জন্যে ক্ষতস্থানগুলো দিয়ে আবার রক্তপাত শুরু হয়েছিল, সেদিকে লক্ষ্য করলেন না। চোখ বুজে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন প্রভাতের—শক্তি পরীক্ষার।

একাধিক কারণে খুড়ো-ভাইপোর এই সাক্ষাৎকারটুকু স্মরণীয় য প্রতি পক্ষের সঙ্গে সকালে প্রাণান্তকর যুদ্ধ হবে, রাত্রে তার সঙ্গে বসে পান-ভোজন—এ যে কতখানি মনোবল এবং কত বড় উদার চিত্তের পরিচয়, আজকের এই ধরা-বাঁধা জীবনের খাঁচায় বন্দী আমরা বুঝি তা কল্পনাও করতে পারব না।

পরদিন এবং তার পরের অনেক দিন ধরে পৃথ্বীর সঙ্গে সুরযমলের লড়াই চলেছিল। এমনও দেখা গেছে, একদিনের যুদ্ধ শেষ হবার পর তাঁবুতে ফেরবার আগে দুজনে তরবারি কোষবদ্ধ করে পরস্পরকে আলিঙ্গন পর্যন্ত করেছেন।

শত্রুতার এই মহত্তর রূপ শুধু রাজপুতানার ইতিহাসেই দেখা যায়।

শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজই জয়ী হয়েছিল। মেবারের ইতিহাসের পুরোন পাতাগুলো উল্টোতে বসে ভাবছিলাম, এইবার বুঝি পৃথ্বীর জীবনে দিন কয়েকের জন্যে শান্তি আসবে, আসবে নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব জীবনের মোহ, আসবে ছন্দ আর শৃঙ্খলা। ··কিন্তু না, আমি এই বিংশ শতাব্দীর সাবধানী মানুষ, আপনাদের মত আমারও হিসেবের ভুল হয়েছিল।

পৃথ্বী নতুন করে অশান্তি ডেকে নিয়ে এলো দিন কয়েক যেতে না যেতে।

রাণা রায়মলের একটি মেয়ে ছিল—পৃথ্বীর বোন। মেবারের ইতিহাসে তার নাম খুঁজে পেলাম না। কিন্তু পৃথ্বীর জীবন-ইতিহাসের শেষ অধ্যায় ত্বরান্বিত করেছিল এই মেয়েটিই।

রাণা রায়মল মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন আবু অঞ্চলের শিরোহী বংশীয় এক রাজকুমারের সঙ্গে। লোকটির নাম ছিল প্রভু, প্রভু রাও। প্রভুত্বের গর্ব লোকটির বুঝি একটু বেশী মাত্রাতেই ছিল আর সেই মাত্রাধিক্যের পরিচয়টা সে দিত স্ত্রীর প্রতি জোর-জুলুম, অকথ্য অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে। দিনের পর দিন নিঃশব্দে এই অত্যাচার উপদ্রব সহ্য করার পর হঠাৎ একদিন মেয়েটির ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

পৃথ্বী তখন সুরযমলকে পরাস্ত করে রাজ্যে ফিরে এসেছে। দাদাকে চিঠি লিখলো বোন: এ অত্যাচার আর সহ্য করতে পারছি না। যদি পারো, এ নরক-যন্ত্রণা থেকে আমায় মুক্তি দাও—এখান থেকে আমায় উদ্ধার করে নিয়ে

যাও। নইলে সমস্ত যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবার ব্যবস্থা আমি নিজেই করবো।

দুনিয়ার দুর্বিনীত, বেপরোয়া, কড়া প্রকৃতির লোকগুলোর মনের এক একটা জায়গা এমন কোমল, এমন দুর্বল যে সেখানে স্পর্শ করলেই তাদের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসে। বোনের চিঠি পৃথ্বীর মনের সেই দুর্বল জায়গাটাকেই স্পর্শ করে গেল। তারপর আর কিছু ভাববার প্রয়োজন হল না। পৃথ্বীরাজের ঘোড়া ছুটল শিরোহী বংশের সেই রাজকুমারের প্রাসাদ লক্ষ্য করে।

পৃথ্বী যখন সেখানে পৌঁছলো রাত তখন অনেক। প্রাসাদের ফটক বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু মনের মধ্যে সঙ্কল্প একটা স্থির হয়ে গেলে বৃথা সময় নষ্ট করা পৃথ্বীরাজের নিয়ম নয়। প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে পৃথ্বী ফটক ডিঙিয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করল···সন্তর্পণে উঠে এল উপরে, প্রভুরাও যেখানে বিলাস-শয্যার ওপর গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন—·

পৃথ্বীর কোষমুক্ত তরবারি প্রভু রাওয়ের কণ্ঠস্পর্শ করতে উদ্যত হল···কঠিন তো বটেই, তা বোঝা বুঝি আরও কঠিন।

যে স্বামীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে রায়মলের মেয়ে দাদাকে চিঠি লিখেছিল, দাদার হাতে উদ্যত তলোয়ার দেখে সে-ই এখন লুটিয়ে পড়ল পৃথ্বীর পায়ের কাছে।

'না, না, এ মুক্তি আমি চাই নি। এ মুক্তিতে আমার কাজ নেই। তুমি ওকে মেরো না।'

ছোট বোনের চোখের জলে পৃথ্বীর পাষাণ-সঙ্কল্প গলে গেল। তরবারি কোষবদ্ধ হল। কিন্তু প্রভু রাওকে এত সহজে সে ক্ষমা করবে না, কিছুতেই না।

পৃথ্বী বলল, 'প্রভুরাওকে আমি ক্ষমা করতে পারি একটি মাত্র সর্তে। সে সর্ত এই যে তাকে তোমার নাগরা জোড়া মাথায় করতে হবে, আর তোমার গায়ে হাত দিয়ে শপথ করতে হবে—কোনদিন আর তোমার প্রতি দুর্ব্যবহার করবে না।

স্ত্রীর পাদুকা মাথায় ধারণ করা এবং তার পায়ে হাত দেওয়াই ছিল রাজপুতের পক্ষে চরম অপমান। কিন্তু প্রাণভয়ে প্রভু রাও সেই অপমানই মাথায় তুলে নিলো।

খুশি হল পৃথ্বীরাজ—বুকে জড়িয়ে ধরল ভগ্নীপতিকে। শুধু তাই নয়,

শো-কেসের কাচটায় ময়লা এমনই পুরু হয়ে জমেছিল যে সে আস্তরণ ভেদ ক'রে আমার দৃষ্টি ভেতরে ভাল ক'রে প্রবেশ করণে করতে পারছিল না। তাই, জিনিসটাকে একবার হাতে ক'রে দেখবার জন্যে দোকানের ভেতরে পদক্ষেপ করলাম। কাউন্টারের পেছন থেকে এগিয়ে এল অবিশ্বাস্য রকমের বৃদ্ধ এক চীনাম্যান। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে সে আমায় কৌটো সম্বন্ধে অনেক কথা বললে। ডিবেটা বেশ ভারি, আগাগোড়া তামা দিয়ে তৈরি, গোলাকার, চার ইঞ্চি উঁচু আর ব্যাস প্রায় তিন ইঞ্চি। ভেতরে একটা কিছু জিনিস নিশ্চয় ছিল, কেননা ঝাঁকানি দিলে ভেতরে সেটা নড়ে ওঠার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কৌটোটাকে কেউ নাকি আজ পর্যন্ত খুলতে পারে নি। চীনাম্যানটি এটি কিনেছিল চট্টগ্রাম থেকে সদ্য আগত এক জাহাজের খালাসীর কাছ থেকে। কিন্তু পৃথিবীর কোন্ অংশ থেকে ডিবেটির আবির্ভাব ঘটেছে—সে সম্বন্ধে কোন তথ্যই সে আমায় সরবরাহ করতে পারল না।

'গিভ মি টু লুপিজ স্যার।' বললে চীনাম্যানটি।

আমি তাকে একটা টাকা দিলাম। ডিবেটি নিয়ে বাড়ি ফিরে সিধে গেলাম আমার ছোট্ট ওয়ার্কশপটায়। প্রথমেই কৌটোটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাল ক'রে জোর আলোয় পরীক্ষা করলাম। সেটার গঠনভঙ্গি থেকেই মনে হল, বহু পুরোন আমলের সামগ্রী সেটি—এমন কি ডিবেটা তৈরি করার সময়ে লেদের ব্যবহারও করা হয় নি—আগাগোড়া হাতে তৈরি। কৌটোর ঢাকনির ওপর এক সময় একটা কিছু খোদাই ক'রে লেখা হয়েছিল, কিন্তু উকো দিয়ে ঘসে সেটুকুও তুলে ফেলা হয়েছে।

এরপর আমার কাজ হ'ল ডিবেটার কোন ক্ষতি না ক'রে ঢাকনিটিকে খোলার ব্যবস্থা করা। ডালাটা এমনই এঁটে বসে গেছল যে শুধু হাতের জোরে অথবা কোন মামুলী পদ্ধতিতে তা খোলা অসম্ভব। অতএব বিজ্ঞানের শরণ নিতে হল।

প্রথমেই আমি ডিবেটার ডালা নিচের দিক ক'রে এক ডিস গ্লিসারিনে এক হপ্তা ডুবিয়ে রাখলাম। ইতিমধ্যে তামার পাত কেটে তৈরি ক'রে ফেললাম দুটি কলার—একটা কৌটোটির জন্য, অপরটি কৌটেরে ঢাকনির জন্যে। সাতদিন কেটে যাবার পর আমি নাট আর স্ক্রু দিয়ে কলার দুটোকে বেশ শক্ত ক'রে লাগিয়ে দিলাম। তারপর কৌটোটাকে 'ভাইস'এ চেপে ধরে কলারের উপর হাতুড়ি ঠুকে ঢাকনিটাকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে

লাগলাম। ঢাকনিটা ঘুরল না। তখন বিপরীত দিকে হাতুড়ির ঠোকে দিতেই তৎক্ষণাৎ ঘুরে গেল ডালাটা। বুঝলাম, আজ পর্যন্ত কেন কেউ এটা পেঁচিয়ে খুলতে পারে নি। কৌটোটার প্যাঁচ সাধারণ নিয়মের সম্পূর্ণ উল্টো—ডান দিকে ঘোরালে তবে সেটা খোলে। মনে পড়ল, বহু বছর আগে এইরকম উল্টো নিয়মেরই প্রচলন ছিল।

যাই হোক, ধীরে ধীরে ঢাকনিটা ঘুরিয়ে দিতে লাগলাম। অতি সন্তর্পণে হাত দুটি সামনে বিস্তার ক'রে ধরেছিলাম ডিবেটা। কেননা, ভেতরে এত বছর ধরে কি বস্তু যে লুকিয়ে আছে, তা তো জানি না। বোমার মত সেটা আচমকা ফেটেও পড়তে পারে, লাফিয়ে উঠে হয়তো আমার মুখে প্রচণ্ড আঘাতও হানতে পারে। ডালাটা খুলে আনার পর কিন্তু চাঞ্চল্যকর বিশেষ কিছু ঘটল না। মনে হ'ল ডিবেটার অর্ধেক শুধু ধুলোতেই ভর্তি, কিন্তু একেবারে তলায় ছিল বিনুনীপাকান খানিকটা কোঁচকান চুল। সিধে ক'রে ধরলে লম্বায় সেটি প্রায় ন' ইঞ্চি আর প্রায় একটা পেন্সিলের মত মোটা। বিনুনীর দু-একটি পাক খুলে দেখলাম, অতি সূক্ষ্ম শত চুলের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু সেখানে নেই। কিন্তু চুলগুলির ওপর নোংরা এমনই জমাট বেঁধে রয়েছে যে, উল্লেখযোগ্য আর কিছুই দেখতে পেলাম না সুতরাং সেগুলোকে পরিষ্কার করাই হ'ল আমার পরবর্তী কাজ।

প্রথমে জল-মেশানো পাতলা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে রাখতে চুলের তেলতেলে ভাবটা চলে গেল, তারপর কাপড়-কাচা সোডার জলে ডুবিয়ে রাখতে চুলে আর অ্যাসিডের অবশিষ্ট লেগে রইল না। এর পরে ডিস্টিল্‌ড ওয়াটারে বেশ ক'রে ধুয়ে অ্যালকোহলে ডুবিয়ে তুলে নিলাম। ফলে জলকণা-মুক্ত হল চুলগুলি। সবশেষে ইথারে ডুবিয়ে দিলাম বিনুনীটা।

ইথার থেকে যখন চুলের গোছাটা সবে তুলেছি, এমন সময়ে খবর এল যে ফোনে আমায় কে ডাকছে। সুতরাং হাতের কাছে প্রথমেই যে পরিষ্কার জিনিসটা পেলাম, সেটা একটুকরো সাদা কার্ডবোর্ড—তার ওপরেই পিন দিয়ে বিনুনীটাকে গেঁথে চলে গেলাম ফোন ধরতে।

পরে যখন চুলের গুচ্ছটাকে ভালভাবে পরীক্ষা করলাম, একটি বিষয় দেখে যেমনই আশ্চর্য হলাম. তেমনই হলাম কৌতূহলী। চুলগুলি একজন নারীর কেশ থেকে সংগৃহীত হয় নি—বিভিন্ন নারীর কেশসম্ভার থেকে সংগ্রহ ক'রে এনে তবে তাদের বিনুনী পাকিয়ে একত্র ক'রে রাখা হয়েছে। ঘোর কৃষ্ণবর্ণ

থেকে শুরু ক'রে বাদামী, লালচে, সোনালী এমন কি শ্বেতশুভ্র চুল পর্যন্ত পাকিয়ে রাখা হয়েছে পরম যত্নে। কোন চুলেরই কৃত্রিম রঙ নেই, তা থেকেই প্রমাণিত হয় কত বহু বছর আগেকার সে বিনুনীটি।

এরপর নিছক কৌতূহলের বসে দু'একজনকে বিনুনীটি দেখালাম, কিন্তু বস্তুটি তাদের বিশেষ আগ্রহের খোরাক হয়ে উঠেছে বলে মনে হ'ল না। সুতরাং সেটিকে আমি তামার ডিবেতে ভরে কাবার্ডের অন্যান্য সংগ্রহের সাথে রেখে দিলাম। তারপর এক সময়ে ধীরে ধীরে মন থেকে মুছে গেল সেকথা।

আর তারপরেই ঘটল প্রথম অদ্ভুত ঘটনাটা।

প্রায় দিন দশেক পরে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল আমার এক বন্ধুর সাথে আর এক বন্ধুর বৈঠকখানায়। বন্ধুটির নাম সমরজিৎ। সমরজিতের কপাল ঘিরে একটা পুরু ব্যাণ্ডেজ। স্বভাবতই জিজ্ঞেস করলাম তার মাথায় কি হয়েছে। কিন্তু তার উত্তর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। মাথায় যে তার কি হয়েছে, তা সে নিজে তো জানেই না, এমন কি তার ডাক্তারও জানে না। চা খেতে খেতে আচম্বিতে সে ধড়াস করে পড়ে যায় মেঝের ওপর—নিস্পন্দ দেহে থাকে পড়ে। বেজায় ভয় পেয়ে গিয়ে তার স্ত্রী তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালে ডাক্তারের কাছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই চেতনা ফিরে আসতে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করলে সমরজিৎ যে কে তার কপালে মারল। কিছুক্ষণের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠল সে—শুধু কপালে তীব্র যন্ত্রণাবোধ ছাড়া আর কোন অসুবিধা রইল না। কপালের যে স্থানটায় যন্ত্রণাটা অনুভূত হচ্ছিল, সেখানটায় ডাক্তার প্রথমে একটা লালচে দাগ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলে না। দাগটা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠতে লাগল দাগটা—শেষে মনে হ'ল কপালের ঐ স্থানটায় লাঠি দিয়ে হানা হয়েছে এক প্রচণ্ড আঘাত। পরের দিন দাগটা সেই রকমই রইল, তবে দেখা গেল দাগটার চারদিকে বেষ্টন করে গোল ভাবে ফুটে উঠেছে থেঁতলে যাওয়ার মত একটা চিহ্ন—নীলচে কালশিটার আভা। তারপর ধীরে ধীরে সব ভাল হয়ে আসতে লাগল। ব্যাণ্ডেজ খুলে সমরজিৎ দাগটা আমায় দেখাল। গোলাকার কালশিটার মাঝে ঈষৎ বাঁকানো রক্তবর্ণ একটা দাগ ছাড়া আর কিছুই নেই—বিশ্রী কৃমিকীটের মত লাল আভা নিয়ে প্রকট হয়ে রয়েছে দাগটা।

ডাক্তারের মতে দুর্বলতা বশত হঠাৎ মাথা ঘুরে যাওয়ার ফলে পড়ে যায়

সমরজিৎ, সেই সময়ে কোনরকমে মাথাটা ঠুকে যাওয়ার ফলেই এই বিপত্তির সৃষ্টি। ডাক্তারের যুক্তিহীন মতের এইখানেই সমাপ্তি।

প্রায় মাসখানেক পরে সুমিতা বলল, সত্যি তোমার ওয়ার্কশপটা একটু গোছগাছ করা দরকার। মাগো, কি নোংরা!

—তাই নাকি? বললাম আমি।

—আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, কোন ভদ্রলোক কি ওখানে কাজ করতে পারে?

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম আমি, কিন্তু সুমিতা ছাড়বার পাত্রী নয়। কোমরে আঁচল জড়িয়ে এক হাতে ঝাঁটা এবং অপর হাতে আমাকে ধরে যাত্রা করল ওয়ার্কশপ অভিমুখে।

পরিষ্কার করার মধ্যে কাজ ছিল শুধু ঘরের বিভিন্ন স্থান থেকে যন্ত্রপাতি-গুলো সংগ্রহ ক'রে সেল্‌ফের যথাস্থানে রক্ষা করা আর মেঝের বাজে জিনিস দেখলেই তুলে জঞ্জাল-গাদায় স্তূপীকৃত করা। আর তার মাঝেই অবিরাম চলতে লাগল সুমিতার সম্মার্জনী।

প্রথমেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল একটুকরো সাদা কার্ডবোর্ডের ওপর—এটা সেই বোর্ড, যার ওপর আমি টেলিফোন-কল আসার জন্যে চুলের গুচ্ছটা রেখে গেছলাম।

কার্ডবোর্ডটার অপর দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, সেটা ফ্ল্যাশলাইটে তোলা একটা গ্রুপ ফটোগ্রাফ—বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমিও আছি সে ফটোটিতে। সুমিতা ফটোগ্রাফটার দিকে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ সে বলে উঠল, আচ্ছা, সমরজিৎ বাবুর কপালে ওটা কিসের কাটা দাগ বল তো?

আমি সেদিকে তাকালাম, আর দেখলাম—না, কোন ভুল হয় নি আমার—সেই একই দাগ, যে দাগ দেখেছিলাম একমাস আগে সমরজিতের কপালে; সেই রকমই ঈষৎ বাঁকানো, রক্তবর্ণ চিহ্ন। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হ'ল এই যে ফটোটা তোলা হয়েছিল প্রায় পাঁচ মাস আগে।

এরপর আমরা ফটোগ্রাফের পেছন দিকটা লক্ষ্য করলাম। দেখলাম একটা আবছা বাদামীরেখা। ইথার থেকে তুলে নিয়ে পিন দিয়ে গেঁথে শুকোতে দিয়ে গেছলাম—রেখাটা নিশ্চয় সেই পিনেরই দাগ। আর তারপরে কার্ডবোর্ডটা ইথারটুকু শুষে নিয়েছে বলেই বিপরীত দিকে সমরজিতের কপালে ফুটে উঠেছে ঐ দাগটা। পিনের দাগের মধ্য দিয়ে একটা ছুঁচ এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দিতে; সত্যই সেটা এপাশে সমরজিতের কপালের সেই চিহ্নটার

মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল। দুটো ঘটনাই একসাথে সংঘটিত হওয়াটা আপাত-দৃষ্টিতে বেশ অদ্ভুত।

এরপর কি জানি আমার মনে হ'ল, আমি সময় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার প্রয়াস পেলাম। অবশেষে স্থির একটা সিদ্ধান্তেও পৌছলাম। একটা বিশেষ দিনে ৪টা থেকে ৪-১৫ মিনিটের সময় আমি ফটোগ্রাফটা পিন দিয়ে গেঁথেছিলাম,আর ঠিক সেইদিনেই প্রায় ৪-১৫ মিনিটের সময়ে সমরজিতের ওপর হয়েছিল সেই আশ্চর্য আক্রমণটা (!)—এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহের বাষ্পটুকুও অবশিষ্ট রইল না। দুটো ঘটনার মধ্যেই রয়েছে বেশ স্পষ্ট একটা এককালীন সংঘটনের সম্পর্ক।

এই কথাগুলোই একদিন চিন্তা করতে করতে আচম্বিতে মনের মধ্যে উদিত হ'ল একটা মতলব। পরীক্ষাটা একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে হবে। অবশ্য সমরজিৎ বেচারার ওপর আর নয়, কেননা, ইতিপূর্বেই তার ওপর অজান্তেই তো বেশ একচোট হয়ে গেছে, আর তা ছাড়া সে আমার বন্ধু তো বটেই। শত্রুদের প্রতি আমাদের যে সদয়ভাবাপন্ন হওয়া উচিত—এ হিতবাক্য আমার অজানা নয়, আর বাস্তবিকপক্ষে সে বাক্য আমি কিছু কিছু মেনে চলতেও চেষ্টা করি। কিন্তু যেখানে এরকম একটা এক্সপেরিমেণ্টের নিতান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে—যদিও সহস্রের মধ্যে একটিতেও সাফল্য আসবে কিনা সন্দেহ, তবুও স্বভাবতই বন্ধু অপেক্ষা শত্রু মনোনয়নই শ্রেয়। সুতরাং এর পর থেকে আমি ব্যস্ত রইলাম মনোমত একটা শিকার অন্বেষণে। যাতে দৈবাৎ যদি আবার একটা coincidence ঘটে যায়, তবে আমার বিশেষ ক্ষতি হবে না। আর যে ব্যক্তিবিশেষটিকে মনোনীত করলাম, সে আমার পরবর্তী গৃহের অধিবাসিনী এক আয়া।

বাথরুমের জানালা থেকে ওদের উঠোনটা আমরা দেখতে পেতাম। প্রায় লক্ষ্য করেছি, শিশুটা যখন তার তত্ত্বাবধানে থাকত, আর আশপাশে যদি কাউকে না দেখা যেত, তখন শিশুটির সঙ্গে নিতান্ত অকারণে ব্যবহার করতো অত্যন্ত হৃদয়হীনার মত। অপরের গৃহের দৈনিক ঘটনাবলী লক্ষ্য করা অবশ্য অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু অবোধ শিশুটার ওপর তার অযৌক্তিক নির্দয় আচরণ তুমি দেখলে নিশ্চয় এ অপরাধ থেকে আমায় মুক্তি দিতে। আমরা তো ওকে দু-চোখে দেখতেই পারতাম না এ জন্যে। আরও একটা ব্যাপারে মেজাজটা আমার তার ওপর বিগড়ে ছিল। প্রথম যখন সে ও বাড়িতে এল,

বাগানের পাঁচিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে গোলাপের গন্ধ শুঁকত। এতেই যদি ক্ষান্ত থাকত, তাহলে কিছুই হত না। কিন্তু অনর্থক বোঁটাশুদ্ধ ফুলগুলো তুলত আর ছুড়ে ফেলত মাটিতে। অচিরেই সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া আমি বন্ধ করলাম। পাঁচিলের ওপর থেকে সহজলভ্য কয়েকটি গোলাপ গাছের চারপাশে বঁড়শি দিয়ে এমন সুকৌশলে এক দুর্ভেদ্য ব্যারিকেড রচনা করলাম যে, পরের দিনই সকালে বেশ একটু হৈ-চৈ শোনার পর এক হপ্তা ধরে দেখেছিলাম আয়ার হাতে পুরু ব্যাণ্ডেজটা।

মোটের ওপর আমার এক্সপেরিমেণ্টের পক্ষে সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি হ'ল সে। কাজেই, আমার প্রথম কাজ হ'ল তার একটা ফটোগ্রাফ তুলে ফেলা। পরের দিন ঝলমলে রোদ্দুর ভরা সকালে যখন সে উঠোনে পায়চারি করছে, আমি বাথরুমের জানলা থেকে এরোপ্লেন ওড়ার মত কি ঐ রকম একটা বিদ্‌ঘুটে শব্দ করতে সে মুখ তুলে তাকাল, আর তৎক্ষণাৎ শাটার টিপে দিলাম আমার জাইসআইকনের।

প্রথম প্রিণ্টটা যখন শুকোল, সেই রাত্রেই প্রায় এগারটার সময়ে, আমি চুলের বিনুনীটা নিয়ে তার কপালে দুটো পিন দিয়ে আটকে রাখলাম। অবশ্য নিজের এই নির্বোধ কার্যকলাপের জন্য হাসি পাচ্ছিল খুবই, কিন্তু নিতান্তই একটা ছেলেখেলা পরীক্ষার মত সহজভাবে সেটাকে গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। তারপর, পিন লাগানো ফটোগ্রাফটা রেখে দিলাম ওয়ার্কশপের কাবার্ডে।

পরের দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরতে সুমিতা বলল, শুনেছ আজ সকালে পাশের বাড়ির আয়াটাকে বিছানায় মরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আরও অনেক কিছুই গর্‌ গর্‌ করে বলে গেল সুমিতা, লোকজন এ ব্যাপারে বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছে, পুলিশ এসে জোর তদন্ত করেছে, ইত্যাদি।

মনে হ'ল, চোখের সামনে ঘরের দেওয়ালগুলো ঘুরতে শুরু করেছে। কতক্ষণ স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না, অবশেষে আত্মসংবরণ ক'রে নিয়ে প্রশ্ন করলাম, কিসে মারা গেছে, কিছু শুনেছ ?

বুঝতেই পারছ, সুমিতা আমার এক্সপেরিমেণ্ট সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ জানত না। জানলে, এ পরীক্ষায় হাত দিতে কখনই সে আমায় দিত না। জানোই তো, কুসংস্কারের হাওয়া সব সময়ে তাকে কেমন ঘিরে থাকে—আমার সঙ্গে এতকাল বসবাসের পরও মনের অন্ধকার তার এখনও পুরোপুরি ঘোচে নি।

যত তাড়াতাড়ি পারলাম, সুমিতা চোখের অন্তরালে যেতেই ওয়ার্কশপের

কাবার্ড থেকে বার করলাম ফটোগ্রাফটা—আর, জানি তুমি বিশ্বাস করবে না একথা, কিন্তু তাতে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না—বিনুনী থেকে যখন পিন-দুটো খুলে নিলাম, দেখলাম আয়ার কপালে দুটি সুস্পষ্ট রক্তবর্ণ চিহ্ন!

কতক্ষণ যে অভিভূতের মত বসেছিলাম, সে সময়ের হিসাব ছিল না। ইংরাজীতে যাকে coincidence বলে, তা কি কখনও দুবার ঘটা সম্ভব? একবার সমরজিতের ক্ষেত্রে, আবার এই আয়ার ক্ষেত্রে, কিন্তু আমার চোখকে আমি অবিশ্বাস করতে পারি না, আমার চোখের সামনে আয়ার কপালে দুটি জ্বলজ্বলে রক্তবর্ণ বিন্দু আমার শিক্ষা-সংস্কৃত মনকে যেন মৌন ভাষায় বিদ্রূপ করতে লাগল।

এই ব্যাপারে তখনকার মত মনের মধ্যে যেটুকু অনুতাপের অগ্নিশিখা দেখা দিয়েছিল, প্রবল ঔৎসুক্যের বারি-সিঞ্চনে অচিরেই তা নিভে গেল। প্রথমেই শুরু হ'ল আমার ব্যক্তিগত তদন্ত, কিভাবে আয়ার মৃত্যু ঘটেছে, সে অনুসন্ধান করতে আমি উঠে পড়ে লাগলাম। পুলিশী রিপোর্টে অবশ্য ছিল মৃত্যুটা হয়েছে নিছক প্রকৃতির নিয়মানুসারে, অর্থাৎ ব্রেনের মধ্যে কয়েকটি শিরা অতিরিক্ত রক্তের চাপে ফেটে যাওয়ার ফলেই মৃত্যু এসেছে; কিন্তু শুধু একটি স্থানেই সব ডাক্তারদের বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল যে প্রকৃতির সেই নিয়মটি কি কারণে হঠাৎ কার্যকরী হয়ে উঠে এ মৃত্যুকে ডেকে আনলে। সমরজিতের কপালে যেমন চিহ্ন দেখেছিলাম, এরও কপালে ছিল হুবহু সেই চিহ্ন, তবে এবার সংখ্যায় দুটি। দু-একজন ডাক্তার অবশ্য বলেছিল যে এক্সরে ক'রে করোটির ভেতরটা দেখা যাক। এক্সরে ফটোও উঠেছিল, কিন্তু আভ্যন্তরিক কোন স্নায়ু-বিকৃতি দেখা যায় নি। সুতরাং ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেল এইখানেই।

কিন্তু আমার মস্তিষ্কে তখন চিন্তার বল্লরী ঔৎসুক্যের বনস্পতিকে ঘিরে পাক খেয়ে ঊর্ধ্বে উঠছে। শরীর খারাপ থাকার জন্যে মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়াটাও তো আয়ার পক্ষে সম্ভব? আরও তো কত কারণ থাকতে পারে! সত্যিই কি ঐ কেশগুচ্ছের সঙ্গে এ মৃত্যু সম্পর্কিত? বাস্তবিকই ঐখানেই বিষয়টার ওপর আমি যবনিকা টেনে দিতে পারলাম না। সুতরাং আবার একটা পরীক্ষার জন্য খুঁজতে লাগলাম আর একজনকে, আর অনেক ভেবে-চিন্তে আমার বাড়ির বিপরীত দিকের বাড়ির এক বাসিন্দাকে মনে মনে বেশ পছন্দ হয়ে গেল।

লোকটি অবশ্য আয়ার মত ততটা খারাপ ছিল না। কেননা, নিষ্ঠুর

প্রকৃতির মানুষ সে নয়—অন্তত নিজের ইচ্ছায় তো নয়ই। শুধু সারাদিন, বিশেষ ক'রে গভীর রাত পর্যন্ত বেহালা বাজাবার এক বিদ্ঘুটে নেশা তার ছিল। সুতরাং স্থির করলাম, খুন করাটা উচিত হবে না—তার চেয়ে অন্যের ওপর দিয়ে একটু মজা করা যাক।

মুস্কিল হ'ল ফটো তোলা নিয়ে। কেননা, বাইরে সে খুবই কম বেরোত। যার সঙ্গে আমার দৈনিক একাধিকবার চোখাচোখি হচ্ছে, তার অগোচরে তারই মুখের পরিষ্কার ফটো তোলা যে কি কঠিন ব্যাপার, তা তুমি উপলব্ধি করছো নিশ্চয়। যাই হোক, প্রায় দিন পনেরো পরে এ দিকটা আমি কোনমতে কায়দা ক'রে সামলে নিলাম। ফটোটা যদিও খুবই ছোট্ট হয়েছিল, কিন্তু পরে আমি সেটা বেশ বড় ক'রে এনলার্জ ক'রে নিলাম।

সন্ধ্যার পর থেকে ওপরের একটা ঘরে বেশ অঙ্গভঙ্গি ক'রে ছড়ি টানত ভদ্রলোক। একনাগাড়ে টেনেই যেত, আর বিচিত্র সব রাগ-রাগিনীর স্বর লহরীতে ভরিয়ে তুলত আকাশ-বাতাস। সুতরাং রাত্রের খাওয়া সাঙ্গ হলে আমি গেলাম আমার ওয়ার্কশপের জানলায়। অপেক্ষা করতে লাগলাম সেখানে। খেয়েদেয়ে এসে লোকটি যখন আবার ছড়ি তুলল, আমিও তুলে নিলাম আমার চুলের গোছাটি—সে যখন ছড়ি ছোঁয়ালে বেহালার তারে, আমি বিনুনী দিয়ে স্পর্শ করলাম ফটোটি—খুব আলতো ভাবে।

প্রথম যখন বিনুনীটা ছুঁয়ে গেল ফটোটা—ভদ্রলোকের বেহালা থেকে উত্থিত হ'ল এক বেসুরো শব্দ। এতে আমার মনটা তৃপ্ত হ'ল না—আবার ধীরে ধীরে বিনুনী ছোঁয়ালাম ফটোটিতে। এবার আর কোন সন্দেহই রইল না অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে কাঁধ থেকে সে নামিয়ে নিল বাদ্য-যন্ত্রটি এবং প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরে ডাঙায় ওঠা মাছের মত খাবি খেতে লাগল। তার ছটফটানি দেখে মনে হ'ল, নিশ্বাস যেন তার রুদ্ধ হয়ে আসছে। উদ্গ্রীব হয়ে দেখতে দেখতে আমি এমন অবাক হয়ে গেলাম, মনে হ'ল যেন আমার নিজেরও নিশ্বাস-ক্রিয়া রহিত হয়ে আসছে।

বিনুনীটা আমি সরিয়ে নিলাম।

তারপরে ভাবতে লাগলাম যে, এর পরে আমার কর্তব্য কি। বিপদজনক ঐ চুলের গোছাটা কি পুড়িয়ে ফেলব, না রেখে দেব? অনেক ভেবে দেখলাম, সাধারণদর্শন কিন্তু অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ঐ চুলগুলোকে আরও বিভিন্ন উপায়ে আমি ব্যবহার করতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে আমার কার্যপন্থাও স্থির হয়ে গেল।

আমার পরবর্তী এক্সপেরিমেন্টগুলোর বিশদ বিবরণ তোমায় বলতে গেলে একটা বই লিখে ফেলা দরকার। এ-সব পরীক্ষা চলেছিল বেশ কয়েকটি মাস ধরে। শেষকালে সমগ্র বিষয়টাকে আমি এমন একটা নিখুঁত বিজ্ঞান-পরিধির মধ্যে কেন্দ্রীভূত ক'রে ফেলাম যে, যে কোন জীবন্ত প্রাণীকে মশক দংশনের মত ক্ষুদ্র যন্ত্রণা দেওয়া থেকে শুরু ক'রে হত্যা করা পর্যন্ত আমার কাছে নিতান্ত ছেলেখেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। মনে রেখো, এ সাফল্য এসেছিল একটি পুরুষ, একটি নারী, অসংখ্য কুকুর, বেরাল, খরগোশ আর চেতনা সম্পন্ন প্রাণীর বিনিময়ে।

এরকম একটা আবিষ্কার ক'রে যে আনন্দ আমি পেয়েছিলাম, এক্সপেরিমেন্টের পর এক্সপেরিমেন্ট ক'রে যে মজা অনুভব করেছিলাম—তা প্রকাশ করা ভাষার সাধ্য নয়। মনটা কেমন জানি এক নিষ্ঠুর আনন্দে উঠত ভরে, আর বার বার সেই আনন্দেই আস্বাদ পাওয়ার নেশায় মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠত। তারপর একদিন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে, এই অপরিমেয় শক্তির প্রসাদে ত্রিভুবন জয় করাও আমার আর অসাধ্য নয়।

কেশগুচ্ছটার ব্যবহার-মাত্রা সম্বন্ধে আমার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা এমনই গভীর আর নির্ভুল হয়ে উঠল যে, ভাবলাম এরপর যদি এ শক্তিকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করি, তাহলে সেটা হবে নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। অর্থাৎ অন্য ভাবে বলতে গেলে, অধিক জীবন নষ্ট না ক'রে অল্প সময়ে এবং অল্পায়াসে সৌভাগ্য-সূর্যকে মধ্যগগনে আনতে হলে এবার শক্তির বাস্তব প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজন।

ভেবে দেখলাম, অপ্রিয়ভাজন আর অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের ওপর ক্রমাগত শক্তির প্রয়োগ করতে গেলে সময় লাগবে অনেক। অর্থাৎ ধরা যাক, যে লোকগুলোকে তুমি দু'চক্ষে দেখতে পার না, তাদের নামে মোটা ইন্সিওর ক'রে দিলে। এর পরেই তাদের মৃত্যু হওয়াটা নিতান্ত অস্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে—সুতরাং অন্তত পক্ষে একবছর তো তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আর তাছাড়া, কয়েকবার এই রকম মৃত্যু হওয়ার পর প্রত্যেকেরই মনে একটা খটকা লাগবে—তখনই কোম্পানীর পেমেন্ট দেওয়া নিয়ে শুরু হবে হাঙ্গামা। ভাবতে ভাবতে, আচম্বিতে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ-চমকের মতই খেলে গেল এক অভিনব পরিকল্পনা।

তোমার বোধ হয় মনে থাকতে পারে যে, কয়েকমাস আগে থেকে আমি

রেসকোর্সের মাঠে যাতায়াত শুরু করেছিলাম, আর প্রতিটি বাজীতে মোটা অর্থ ফেলেছি, তুলে এনেছি তার বহুগুণ অর্থ। তোমরা বলেছিলে, হঠাৎ আমার ওপর মা-লক্ষ্মী সদয় হয়ে উঠেছেন—কেননা একটি বাজীতেও না হেরে স্বল্পকালের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকার মালিক হওয়ার এরকম নজীর তোমাদের চোখে আর পড়ে নি। কিন্তু আমার এ সৌভাগ্যের মূলে কি জানো?

বিচিত্র বর্ণের ঐ কেশগুচ্ছটি।

কাজটা খুবই সহজ। আমাকে সংগ্রহ করতে হয়েছিল শুধু একটুকরো কার্ডবোর্ড, আর তার ওপরে আঠা দিয়ে লাগিয়ে রেখেছিলাম একটি ছাড়া সব ক'টি দৌড়বাজ ঘোড়ার ফটোগ্রাফ—যেটির ফটো ছিল না, সেটির ওপরই বাজী ধরতাম আমার সর্বস্ব। তারপর দৌড় শুরু হওয়ার একটু আগে এসে বসতাম সুবিধামত নিরালা দেখে এক জায়গায়। এমন জায়গা বেছে নিতাম, যেখান থেকে সমস্ত রেসকোর্স'টা পড়ে থাকত আমার চোখের সামনে।

ভাবছ বুঝি, রেসের ঘোড়াগুলোকে আমি জখম ক'রে দিতাম? ভুল তোমার ধারণা! মারাত্মক রকমের আমি কিছুই করতাম না। শুধু ঘোড়াগুলো যখন দৌড়োতে শুরু করত, আমি চিহ্নটি খুব আলতো ভাবে ফটোগুলোর ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিয়ে যেতাম—ফলে ক্লান্তিবোধ ছাড়া ঘোড়াগুলোর আর কোন ক্ষতিই হ'ত না। যদি দেখতাম, তা সত্ত্বেও কোন তেজী ঘোড়া আমার প্ল্যান বানচাল করার চেষ্টা করছে, তখন আবার একটু মোলায়েম স্পর্শ—ব্যস!

দৌড়ের মাঝে সব ক'টি ঘোড়াই যেন ক্লান্ত হয়ে না পড়ে আর দৌড় যেন পণ্ড না হয়ে যায়—সেজন্য আমি গোড়া থেকেই বেশ সতর্ক হয়ে থাকতাম। একটা ছাড়া নব ক'টি ঘোড়াই যদি ভূমিশয্যা গ্রহণ করে, অথবা থেমে গিয়ে ছটফট করতে থাকে—তাহলে রেস বাতিল হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই বেশি। সুতরাং রীতিমত নৈপুণ্যের সঙ্গে চুলের গোছা ব্যবহার করেছি প্রতিবার, আর ঘরে এনেছি রাশি রাশি অর্থ।

কিন্তু এজন্যে আগে থেকেই আমায় দিতে হয়েছিল তিন-তিনটি মহড়া। আর প্রতিটিই হয়েছিল অতীব চমৎকার।

এই সময় থেকেই আমার মানস-তটে আছড়ে পড়তে লাগল একটির পর একটি পরিবর্তনের ঢেউ। তোমার কাছে সবই আজ স্বীকার করতে বসেছি—গোপন কিছুই করব না। সাধারণ মধ্যবিত্তের অনটনের মধ্য থেকে অপরিমেয়

কম উ... অর্থ-প্রাচুর্যের মধ্যে এসে পড়লে পরিবর্তন আসাটা স্বাভাবিক। আমি শুধু বৈভব-স্রোতেই গা ভাসালাম, তা নয়, সেই-সাথে বিস্মৃত হলাম আমার আজন্মের শিক্ষা—নৈতিক নিষ্ঠা। ভুলে গেলাম আমার চরিত্রের নিষ্ঠতা আর আদর্শ, ভুলে গেলাম আমার বিবাহিত জীবনের কর্তব্য।

আমি মদ ধরলাম, একদিনেই আসক্তি আমার আসে নি। মনটা যখন নেশায় খুশি হয়ে উঠত—তখন খুশির মাত্রায় আরও দু'এক পর্দা রঙ চড়াবার অভিলাষে দু'এক চুমুক রঙীন পানীয়ের আস্বাদ গ্রহণ করতাম। যত দিন যেতে লাগল, অর্থ আসতে লাগল স্রোতের মত, আর ততই ধীরে ধীরে মনের যেটুকু বাধা ছিল, তাও গেল মুছে। বিজয় গৌরবে উল্লসিত হয়ে মদ খাওয়াটা তখন প্রায় নিত্য-কর্মেই দাঁড়িয়ে গেল। এজন্যে কোনদিন আর অনুভব করি নি কোন গ্লানি। সুমিতা প্রথমটা ধরতে পারে নি—তারপর যখন পানীয়ের মাত্রা সীমা ছাড়াল, সুমিতার আর কিছুই অজ্ঞাত রইল না। কিন্তু ভাই আশিস্, তার মত স্ত্রী পাওয়া বহু জন্মের পুণ্যের ফল। সে রাগ করে নি, অভিমান করে নি। শুধু গভীর দুটি বড় বড় চোখে নীল সায়রের মত অশ্রুধারা নিয়ে আমাকে মিনতি করেছে, দুটি পা চোখের জলে ধুইয়ে দিয়েছে—কিন্তু তবুও আমার চৈতন্য হয় নি। হেসে তার মিনতিকে উড়িয়ে দিয়েছি—খাচ্ছি তা একটা খাবারই জিনিস। অখাদ্য তো নয়, কেন এত ভাবছ বল তো? আর যে কত কি বলেছি—তা মনে নেই। কিন্তু জানোই তো যার ওপর সুরার ক্রিয়া একবার হয় শুরু—ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে আসে তার স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি আর চেতনা বোধ। এই রকমই এক রঙিন নেশাভরা মুহূর্তে সুমিতা চোখের জলে দুটি গাল ভাসিয়ে আমাকে কাকুতি মিনতি ক'রে বলছিল এ জিনিস ত্যাগ করতে—ঐ রকম একটা সুন্দর আমেজভরা মিষ্টি মুহূর্তে কানের কাছে একঘেয়ে কান্না শুনতে শুনতে হঠাৎ কেমন জানি মেজাজটা বিগড়ে গেল। বললাম, আমার স্ত্রী তুমি, তুমি আমার সহধর্মিনী। যে ধর্ম আমার, সে ধর্ম তোমারও। অতএব—

এরপর যা হল তা লিখে আর লেখনী কলঙ্কিত করতে চাই না। সুমিতার মুখে শেষ পর্যন্ত এক ফোঁটা হুইস্কিও ঢালতে পারি নি। কিন্তু সেদিন তার যা মূর্তি দেখেছিলাম—জীবনে আর দেখি নি সে মূর্তি। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি তাকে—তার মুখ অশ্রুসিক্ত, চুল এলোমেলো আর অঙ্গের বসন বিস্রস্ত। কণ্ঠে তার সে কি তীব্রতা। যেটুকু চৈতন্য আমার জেগেছিল—

এরপর সেটুকুও যেন লোপ পেল। কি সে বলেছিল [illegible] মনে আছে মাথার মধ্যে যেন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছিল [illegible] আগুন চিৎকার ক'রে বলেছিলাম, তবে দেখ আমার ক্ষমতা—য[illegible]কে আজ খাওয়াবই! চক্ষের পলকে আলমারি থেকে টেনে বার ক[illegible] পারিবারি[illegible] অ্যালবাম। আর পকেট থেকে চুলের গোছাটা বার ক'রে চেপে ধরলাম ফটোটির ওপর…

তুমি জানো, ডাক্তার বলেছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সুমিতা মারা গেছে। হৃদরোগ তার সত্যই ছিল—অতখানি উত্তেজনার পর শক্তি[illegible] ঐ আকস্মিক আঘাত তার দুর্বল হৃদযন্ত্র বহন করতে পারে নি—চিরতরে নিস্প[illegible] হয়ে গেছে।

●

তারপরে দিনের পর দিন গেছে কেটে, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। রাতের নিদ্রা আমায় ত্যাগ করেছে, অনুভব করতে পারি না ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা চোখ বুজলেই চোখের সামনে দেখি উস্কোখুস্কো কেশে বিস্রস্ত-বাসনা বিস্ফারিত চক্ষু সুমিতার সেই মূর্তি—যে মূর্তি জীবনে একবারই দেখেছিলাম। চোখ খুললেই মাথার মধ্যে অনুভব করি এক যন্ত্রণা; দিবানিশি একটি চি[illegible] অক্টোপাশের মত মারণ-বাহু দিয়ে আঁকড়ে রয়েছে আমার মস্তিষ্কের স্নায়ু গুলোকে—নির্মল, নিষ্ঠুর, নির্দয়ভাবে শোষণ করছে, পেষণ করছে আমার মস্তিষ্ককে। আমার স্ত্রীর হত্যাকারী আমি স্বয়ং শ্রীবিবেক রায়। এ ছাড় আর কোন চিন্তা আমার নেই। বুঝতে পারছি, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি দিবারাত্র বিড় বিড় ক'রে কি সব বকি—ভালবাসি নির্জনে থাকতে—এমন ক রাধুও সামনে এসে পড়লে উঠি আঁৎকে—এই বুঝি সে ধরে ফেলল আমার অপরাধ। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার চিন্তাধারা বিকৃত হয়ে যাচ্ছে—আমি উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তার আগেই লিখে রেখে গেলাম আমার স্বীকৃতি। বিশ্বাস করো আর নাই করো, যে মহাপাপ আমি করেছি—তার শাস্তি দেবার আয়োজন করেছেন বিধাতা স্বয়ং সারাটা জীবন ধরে। কিন্তু আমি পারব না, পারব না—এ শাস্তি সারা জীবন ধরে বহন করতে আমি পারব না!

ইতি—

তোমার বিবেক

রা একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে।

বললাম আমি।

পায়ে পড়ি—এখুনি চল। আমার কেমন জানি বিপদ এখুনি ঘটবে। বলতে বলতে রমিতার দুই

আমরা পৌঁছলাম বিবেকের প্রাসাদে। তিনতলায় দরজা -ঠেলা দিতেই খুলে গেল।

র ঘরে কাউকে চোখে পড়ল না। নিবিড় নৈঃশব্দে ঘরের আবহাওয়া হয়ে উঠেছে। টেবিলের ওপর রক্ষিত একটিমাত্র টেবিল-ল্যাম্পের স্তি আলোয় রহস্যঘন আলো-আঁধারিতে ভরে উঠেছে ঘরের দা।

কে ভাল ক'রে চোখ বোলাতে গিয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল পালঙ্কের য়িত একটি মানুষের ওপর। এগিয়ে গেলাম।

ন ধরে অযত্নবর্ধিত দাড়ি-গোঁফে মুখ আচ্ছন্ন থাকলেও. বিবেককে আমাদের দেরি হল না। সে যেন গভীরভাবে ঘুমোচ্ছে। শান্ত মুখশ্রী। ডানদিকে একটা বীভৎস রক্তবর্ণ ক্ষতচিহ্ন—চিহ্নটিকে বলয়াকারে 'রে রয়েছে নীলচে কালসিটার সুস্পষ্ট চিহ্ন।

শেই পড়ে রয়েছে একটা ফটোগ্রাফ। আলোর কাছে ধরলাম সেটি। ফটো। তার প্রশস্ত ললাটের মাঝে বিদ্ধ একটা পিন আর একটা গাছা।

নটা আর কেশগুচ্ছটা সরিয়ে আনতে যা দেখলাম. তাতে আমার ণ্ডের মধ্য দিয়ে হিম-শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল।

ফটোতে বিবেকের ললাটে উজ্জ্বল হয়ে জেগে রয়েছে একটা রক্তবর্ণ চিহ্ন!

তাসের আড্ডায় আমরা প্রায় জমে গিয়েছিলাম, এমন সময় ... দাঁড়িয়ে গেল। সোমনাথ বিরক্ত চিত্তে বলল, আবার কি হ'ল?

শিবু তাচ্ছিল্য প্রকাশ ক'রে বলল, হয়তো আবার কেউ চেন টেনেছে।

ভূষণ আমাদের চার-বন্ধুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছটফটে এবং ... জানলা দিয়ে প্রায় আধখানা শরীর বাইরে বের ক'রে দিয়ে ... অবস্থান অনুমান করবার চেষ্টা করল, ওহে, এ যে দেখছি ... দণ্ডকারণ্যের মধ্যে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়াল! তা এত ভাল ভাল জায়গা ... এসে এই ঘোর জঙ্গলে কেন বাবা?

শিবু ভূষণের পিঠে একটা আঙুলের খোঁচা দিয়ে ... অমন আধখানা হয়ে না গিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এস দিকি! ... জমে উঠেছিল—

আমিও বললাম, হ্যাঁ ভূষণ, গাড়ি আবার এখনি চলতে শুরু করবে, এসে তাস ধর।

ভূষণ আমাদের অনুরোধ রাখল। জানলার বাইরে থেকে মাথাটা ভেতরে টেনে আবার জাঁকিয়ে বসল। কিন্তু খেলা আর ... একমিনিট দু'মিনিট ক'রে দশ-দশটা মিনিট পার হয়ে যেতেও যখন গাড়ির ... কোন স্পন্দন দেখা দিল না, তখন হাতের তাস ছুড়ে ফেলে আমরা ... হয়ে বসলাম।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত বারোটা বেজে গেছে, অথচ একটা সময় আমাদের আলিপুরদুয়ারে গাড়ি বদল করতে হবে। বেশ সময় মাফিক আসছিল, জংশনের কাছাকাছি এসে একি বিভ্রাট! বর্ষাকালে এ অঞ্চলে পথ-ঘাট মোটেই সুবিধের নয় জানতাম, কিন্তু তার যে এমন হাতে হাতে প্রমাণ পেয়ে যাব, আশা করি নি।

বাইরে দু'চারজন যাত্রীর ক্ষীণ কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগল। ব্যাপার জানবার জন্যে তারা বোধ হয় নিচে নেমেছে। ভূষণ জামাটা চড়িয়ে ...

আমরা চশমাটার দিকে ভাল ক'রে তাকালাম। ফ্রেমটা কেমন একটু অদ্ভুত ধরণের মনে হ'ল, শঙ্খের মত ধবধবে সাদা, বেশ চওড়া আর নকসা কাটা।

আমি একটু উৎসাহিত হয়ে বললাম, রোমাঞ্চকর ইতিহাস? যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে বসলেন। বুঝলুম এইবার গল্প শুরু হবে। আমরা তাঁর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক সর্বপ্রথম পকেট থেকে একটা অতিকায় পাইপ বের ক'রে তাতে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে তামাক ঠাসতে লাগলেন। মনে হ'ল তিনি যেন গল্পটা সাজিয়ে নিচ্ছেন তাঁর অতীতের স্মৃতি মন্থন ক'রে।

বাইরে দিগন্তজোড়া অন্ধকারে বৃষ্টির ঘুঙুর দ্রুতলয়ে বেজে চলেছে একটানা। মনে হচ্ছে আমাদের সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে আদি-অন্তহীন একটা আবহসঙ্গীত ধ্রুপদের মত ঘুরে ঘুরে আসছে। কিম্বা অতৃপ্ত কান্না যেন পাক খাচ্ছে, কেবলই পাক খাচ্ছে, বন্ধ শার্সিগুলোর ওপর এসে আছড়ে পড়ছে।

গাড়ির সমস্ত আলো হঠাৎ কে যেন ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল। চমকে ওঠবার মত অবসরও আমরা পেলাম না।

—এ আবার কি শুরু হ'ল? শিবু পাংশু গলায় স্বগতোক্তি করল।

ভদ্রলোক পাইপে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বললেন, যান্ত্রিক গোলযোগ। এ লাইনে এসব হামেশা লেগেই আছে, ব্যস্ত হবেন না।

লালচে আলোয় চশমার পরকলা দুটো জ্বলে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্যে। তারপর মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে আচমকা জিজ্ঞেস করলেন, স্পিরিট, অর্থাৎ অশরীরি শক্তিতে আপনাদের বিশ্বাস আছে?

আমি জোর গলায় বললাম, না।

—আমারও ছিল না একদিন—ভদ্রলোক ভাঙা ভাঙা অন্ধকার গলায় কথা বললেন, তখন আমিও ভাবতাম ও সব হচ্ছে কায়দাবাজদের ফক্কিকারী। কিন্তু আজ? আজ আর সে-কথা ভাববার মত স্পর্ধা আমার নেই—বলবার তো নয়ই।

চুপ করলেন একটু ক্ষণের জন্যে, পাইপটা টানলেন বার দুই, তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে আবার শুরু করলেন: ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা

এখন থাক। আমার চশমার ইতিহাসটিই আপনাদের শোনাব এবং এক্ষেত্রেও বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠবে না বলেই আশা রাখি।

মুখখানা মাঝে মাঝে আগুনের আভায় দৃশ্যমান হয়ে উঠলেও তাঁর আশ্চর্য দৃষ্টি থেকে আমরা পিছলে পিছলে সরে যেত পারছিলাম বলে অন্ধকারে বেশ স্বস্তি বোধ করছিলাম, আর তাই আমাদের মন উৎকর্ণ হয়ে উঠছিল তাঁর কাহিনী শোনবার জন্যে।

তাঁর মুখ অন্ধকারের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল আগেই, তাঁর কণ্ঠস্বর এবার যেন বৃষ্টির আবহের মধ্যে মিশে গেল। যেন আলাদা কোন শব্দ নেই, অথচ কথাগুলো ভেসে ভেসে আসছে আমাদের কানে, আর আমরা বাইরে বৃষ্টির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। সেই আশ্চর্য অভিভূত মুহূর্তগুলির কথা ভাষায় প্রকাশ করতে আমি অক্ষম। শুধু ভদ্রলোকের গল্পের একটা হুবহু প্রতিলিপি আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরলাম :

এই চশমাটা আমি কিনি নি, আমাকে কেউ উপহারও দেয় নি, এটি আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম দশ বছর আগের এক রাত্রে।

সে রাত্রিটির কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। দিনটা ছিল রবিবার ঠিক আজকের মতই। আমি যখন পার্ক স্ট্রিটে আমার বন্ধুর সঙ্গে দাবা খেলা শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালাম, তখন গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে ঠিক বারোটা বাজল।

বড্ড বেশি রাত হয়ে গেছে দেখে আমার বন্ধু সুরজিৎ আমাকে তার ওখানেই থেকে যেতে বলল, কিন্তু আমি রাজি হলাম না। আমার স্ত্রী উদ্বিগ্ন মনে ঘর-বার করছে, না, আমাকে ফিরতেই হবে। ট্রাম এবং বাস বন্ধ হয়ে গেছে। আমার বন্ধু আমাকে একখানা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরতে বলল।

আকাশ সে রাত্রেও এমনি মেঘাচ্ছন্ন ছিল প্রথমে, আর বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরোতে না বেরোতেই মুসলধারায় বৃষ্টি। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একখানা চলন্ত ট্যাক্সিকেই হাত নেড়ে কাছে পাওয়া গেল। জলে ভিজে আমি তখন কাকমূর্তি, এক মুহূর্ত বিলম্ব না ক'রে গাড়িতে উঠে বসলাম।

আমার নির্দেশ মত ট্যাক্সি বিবেকানন্দ রোডের দিকে ছুটে চলল।

খুব শীত করছিল। ট্যাক্সির আবছা খোলের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে মনের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তির ভাব জেগে উঠল। শরীর অসুস্থ হলে অনেক সময় অমন একটু-আধটু হয়ে থাকে, ব্যাপারটাকে তেমন আমল দিলাম

না। ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাব, পাঞ্জাবী [illegible] হ'ল! দোকানে
থেকে ডাকল : বাবুজি শুনিয়ে—

ফিরে তাকিয়ে দেখি, কি একটা সাদা জিনিস সে আমার উদ্দেশে বাড়িয়ে ধরেছে।

জিনিসটা হাতে নিলাম। ড্রাইভার আমার ফেলে আসা জিনিস আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে উধাও হ'ল। আমি বৃষ্টির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লাম।

ইলেকট্রিক আলোর নিচে এসে আমি অত্যন্ত অবাক হলাম। আমার আহৃত বস্তুটি আমার ব্যবহৃত গগলস্ নয়, একটি বিচিত্র চশমা। এই প্রথম এটি আমি দেখলাম। কার জিনিস কে জানে, উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার নিশ্চিন্ত হয়েছে।

রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। বিমলার পীড়াপীড়িতে আর চমশা নিয়ে মাথা ঘামালাম না। খেয়ে এসেছিলাম, সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে উঠেই চশমাটা নিয়ে বসলাম। সত্যিই অদ্ভুত ধরণের গড়ন। ফ্রেমটা হাতির দাঁতের, অতি সূক্ষ্ম খোদাই-কাজ করা। খুব শৌখিন কোন ব্যক্তির ফরমাসে তৈরি জিনিস বলেই মনে হয়।

যাই হোক, যার জিনিস তাকেই ফিরিয়ে দেওয়া মনস্থ ক'রে খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন পাঠালাম এবং বিজ্ঞাপনে আমার দোকানের ঠিকানা দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম এই ভেবে যে, চশমার মালিক যে কোন সময়ে এসেও তাঁর জিনিস তিনি নিয়ে যেতে পারবেন। এইখানেই বলে রাখা দরকার, আমহার্স্ট স্ট্রিটে আমার নিজের একটি চশমার দোকান আছে, আর আমি একজন চক্ষু-বিশারদ। রাস্তার গুণেই হোক বা আমার হাতযশেই হোক, দোকানটা তখনও জমে ওঠে নি। বেশির ভাগ সময়ই আমার চেম্বারে বসে বইপত্র ঘেঁটে-কেটে যায়। কোন-কোনদিন দু'একজন খরিদ্দার আসে, আবার কোন-কোনদিন একদম চুপচাপ।

চশমাটা দেরাজে বন্ধ ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু মনটা সারাদিন উসখুস করছিল চশমাটাকে আবার দেখার জন্যে। ভাবলাম, হোক না পরের জিনিস, ভাল ক'রে একবার নেড়েচেড়ে দেখায় দোষ কি! কিন্তু দোষ যে ছিল, তা একটু পরেই বুঝতে পারলাম : চশমাটা আমাকে একটু একটু ক'রে নেশার মত পেয়ে বসল। একবার দেখলে আবার দেখতে ইচ্ছে করে, আবার, আবার।

এখন থাক। আলমারিয়ে শো-কেসে ওটাকে রেখে দিলাম। আমার চেয়ারের একটু ফাঁক করলেই কাচের শো-কেসটা কোনাকুনি দেখা যেত। ভেলভে মোড়কের ওপর চশমাটা সেইখানেই রেখে দিলাম।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে ঘড়ি দেখার মত সেটার দিকে দূর থেকে তাকি দেখি। মনে হয় চশমাটাও আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

সোমবার দিনটা এই ভাবে কাটল। শুধু সোমবার নয়, বলতে গেলে সে সপ্তাহটাই আমার ঐভাবে কেটেছে। শুধু একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রেছি, আমা মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্থির ভাব এসেছে। কোন কাজেই গভী ক'রে মন বসে না। জমাট কোন উপন্যাস খুলে বসেছি, বার বার আম মনোযোগ ব্যাহত হয়েছে। কেবলি মনে হয়েছে, কে যেন আমায় দেখছে কার যেন অদৃশ্য দুটি চক্ষু আমাকে অবিরাম লক্ষ্য ক'রে চলেছে। চাপা অস নিয়ে পর্দা সরিয়েছি, কিন্তু দোকান ঘরের মধ্যে কাউকে দেখতে পাই নি সেই ঘরের মধ্যে কারও পক্ষে লুকিয়ে থাকাও সম্ভব নয়। নিজের মনে বুঝিয়েছি সে কথা। তারপরে ব্যাপারটা কি চিন্তা করতে করতে কখ সোজা চশমাটির ওপরে গিয়ে আমার দৃষ্টি পৌঁছে গেছে। দেখি অন্য চশমার মধ্যে মধ্যমণি হয়ে সেটি যথাস্থানেই বিরাজ করছে। সত্যি, চশম মালিক আজও এল না! পর পর কয়েকটা বিজ্ঞাপন দিয়েছি দৈনিক পত্রিক এবং প্রতিদিন হারানোর বিজ্ঞাপনগুলো লক্ষ্য করেছি, কিন্তু কোন সন্ মেলে নি।

দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়া থেকেই একজন দুজন ক'রে লোক আসতে শু করল। না, তারা কেউই চশমার দাবী নিয়ে আসত না, আসত তাদের সাঁ কৌতূহল নিয়ে। তাদের সকলেই পথচারী, হয়তো এতদিনও তারা এ পথেই আনাগোনা করেছে, কিন্তু আমার দোকানের সামনে কেউ থামে কখনও। আজকাল লক্ষ্য করি অনেকেই যেতে যেতে থমকে যায় মিনি খানেকের জন্যে। শো-কেসটার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। দু'চারজ চশমাটা সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেয়। দাম জিজ্ঞেস করে, বিক্রীর জন্যে কি- তাও।

চশমাটার যে অদৃশ্য একটা আকর্ষণ আছে, এটা তার সার্বজনীন প্রমা কিন্তু আমার মনে ইদানিং কেমন একটা ভাবান্তর দেখা দিয়েছে। চশমাটা এখন আর আমি সত্যি সত্যিই বুঝি ছাড়তে চাই না। সব সময়েই কো

একটা ভয়ে ভয়ে থাকি—এই বুঝি ওর মালিক হাজির হ'ল! দোকানে কেউ ঢোকবামাত্র চমকে তাকাই।

কিন্তু সেই অদৃশ্য চক্ষু আমাকে রেহাই দিচ্ছে না এক মুহূর্তের জন্তেও। যতক্ষণ দোকানে থাকি, একটা অস্বস্তিভরা তার অস্তিত্ব আমাকে সব সময় জাগিয়ে রাখে। আমাকে ভুলতে দেয় না আমাকে কেউ দেখছে। আমি ভেবে পাই না, এ আমার কি মানসিক ব্যাধি জন্মাল। রাত্রে যখন বাড়ি ফিরি, তখন কোন উপসর্গ থাকে না। শুধু মাঝরাত্রে, এই রাত বারোটা নাগাদ ঘুম ভেঙে যায়। কোন স্বপ্ন দেখে নয়। নিতান্তই যেন অকারণে। আর বিছানায় শুয়ে এ-পাশ ও-পাশ করতে করতে খালি মনে হয়, কি যেন ফেলে এসেছি কোথায়। কিছুতেই মনে পড়ে না। মনে করার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে আবার কখন ঘুমিয়ে পড়ি।

বিমলা আজকাল প্রায়ই অভিযোগ করে, আমি নাকি দিনকে দিন কেমন হয়ে যাচ্ছি। মুখ-চোখ শুকিয়ে যাচ্ছে। সব সময় কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকি, কেউ কথা বললেই চমকে উঠি। ব্যাপার কী? কি হয়েছে আমার?

আমিও নিজেকে এই প্রশ্নই করি: কি হয়েছে আমার? কেন আমি শান্তি হারিয়ে ফেলছি দিনের পর দিন? কে এর উত্তর দেবে? আমি জানি না কি করলে আমি সুখী হব, মনে মনে সুস্থ হয়ে উঠব।

পরদিন দোকানে গিয়ে শো-কেস থেকে চশমাটা বের ক'রে নিলাম। কৌতূহল যেন ক্রমশই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছিল। চশমার কাচ অর্থাৎ পরকলা দুটো সত্যিই পাওয়ার-লেস। মনে মনে একটা ইচ্ছা বিদ্যুচ্চমকের মত খেলে গেল। কিন্তু সেই ইচ্ছেটাকে আরও কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখবার জন্তে আমি মিছিমিছি একটা কাজের ছুতো খুঁজে নিলাম। ম্যাগনিফাইংগ্লাস নিয়ে ফ্রেমটা পরীক্ষা করতে বসলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল: আশ্চর্য!

হাতির দাঁতের কাজ করা ফ্রেম; আগেই সেটা লক্ষ্য করেছিলাম। কিন্তু যেগুলোকে নিতান্তই অর্থহীন নক্সা-খোদাই ভেবেছিলাম, তারা মোটেই তা নয়। গুহাচিত্রের মত ধারাবাহিক একসার ছবিই ফ্রেমের ওপরে খোদাই করা আছে। সারি সারি ছবি, তবে এক সার নয়—তিন সার। এত সূক্ষ্ম কাজ যে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। একটা চালের পরিমাণ জায়গার মধ্যে একটা একটা মানুষের পূর্ণ মূর্তি ধরান হয়েছে। ছবিগুলোর নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে।

মনোযোগ দিয়ে ছুটো হাণ্ডেলই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলাম, কিন্তু কোন খুঁজে পেলাম না, তবে এটা বুঝতে বাকি থাকল না যে কোন এ অলৌকিক গল্পকেই চিত্রার্পিত করা হয়েছে।

যাই হোক, কিছু বুঝতে না পারার দরুণই চশমাটার প্রতি আমার আ আরও বেড়ে গেল, কৌতূহলের ইচ্ছেটা আরও প্রবল হয়ে উঠল। একটু ইত ক'রে চশমাটা শেষ পর্যন্ত চোখে দিলাম।

এইখানে ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গেলেন, আমরাও যেন গল্পের ঘুম জেগে উঠলাম। কখন ট্রেনে চলতে শুরু করেছে টের পাই নি। সেইটে অনুভব করলাম। মনে হল বৃষ্টি থেমে গিয়েছে। সোমনাথ ব বাড়িয়ে তার পিছনের জানালাটা খুলে দিল। তার দেখাদেখি আমি কামরার ভেতর এক ঝলক ভিজে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ঢুকল।

ভদ্রলোকের পাইপটা নিভে গিয়েছিল, লাইটার বের ক'রে ফের আ ছোঁয়ালেন। আবার তামাকের মন্থর গন্ধ আমাদের নাকে ভেসে এল, হ'ল একশো বছর আগেকার ধূপের গন্ধ। মাথার ভেতরটা কেমন একটু ঝিম ক'রে উঠল, মৃদু—অতি মৃদু রকম! গাড়ির আলো তখনও জ্বলে তবে আকাশে জ্বলন্ত মোমের মত একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে। ভদ্রলো মুখটা মনে হচ্ছে ব্রোঞ্জে গড়া, সাদা চশমাটা তার ওপর একটা অদ্ভুত মায়াছ রচনা করেছে। সেই জ্যালজেলে পাতলা অন্ধকারে তাঁর বসে থাকবার ভ মুখের ভাস্কর্য, পাইপের চমকে চমকে ওঠা লালচে আভা, সব মিলে যেন এ 'অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট'।

সেই পাথর-খোদাই নিস্তব্ধতার বুকের ওপর মৃদু গতিতে ট্রেন চ ধুকধুক আওয়াজটা পেণ্ডুলামের মত দুলতে লাগল। আমাদের মনে হ লাগল, আমরা হারিয়ে যাচ্ছি অতীতের কোন পিছল গর্ভে, যেখানে রাত্রি অন্ধকার সমুদ্রের মত হাঁ ক'রে রয়েছে।

ভদ্রলোকের গম্ভীর কণ্ঠ আবার বেজে উঠল গ্রামোফোন রেকর্ডের ম আমার বেশ মনে আছে, চশমাটা চোখে দিয়েই আমার মাথাটা কে একটু টলে গেল এবং মুহূর্ত দুই-তিন একেবারে কিছু দেখতে পেলাম ন স্বচ্ছ কাচের মধ্য দিয়ে তাকিয়ে কিছুটি দেখতে না পেয়ে প্রথমটা গিয়েছিলুম, কিন্তু তারপর এমন একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম, যার চেয়ে

কিছু না দেখতে পাওয়া ঢের ভাল ছিল। সে দৃশ্য আজও আমার মনের মধ্যে কণ্টকিত হয়ে আছে।

একটা হাল্কা কুয়াশার মধ্যে আমার চোখ দুটো যেন হারিয়ে গেছে, আর আমি আকুল আগ্রহে সেই সাদা কুয়াশার দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছি, প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে একটি তুষার যুগ বলে মনে হচ্ছে। বুকের মধ্যে রক্তের তোলপাড় নিয়ে আমি ভাবছি, এখনি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। এমন একটা কিছু ঘটবে, যার ধাক্কা আমার হৃৎপিণ্ড হয়তো সহ্য করতে পারবে না, আমার স্নায়ুকেন্দ্র হয়তো বিকল হয়ে যাবে। মানুষ মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করে, প্রতি মুহূর্তে নিজের সমগ্র চেতনার ওপর তার পদধ্বনি শুনতে পায়, এখন তার চেয়েও ভীষণ; আমার মৃত্যুর অভিজ্ঞতা হয় নি, মুমূর্ষু নই, কিন্তু আমার মনে হয়েছে মৃত্যুর চেয়েও ভীষণ এই অপেক্ষা ক'রে থাকা।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল একজোড়া চোখ আমি দেখতে পাচ্ছি, তার দৃষ্টিটা যেন আমার সর্বাঙ্গ একটা অলৌকিক নিষ্পেষণে কাছে টানছে। যেন একটা আশ্চর্য শক্তিধর মাকড়সা আমাকে তার অদৃশ্য সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে অক্টোপাসের মত, কি শীতল তার আকর্ষণ! আমি একচুল একচুল ক'রে তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি মনে হ'ল। সত্যি সত্যি এগিয়ে যাচ্ছি কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের ব্যবধান কমে আসছে, ক্রমশ কমে আসছে। আর যত কমে আসছে, ততই মনে হচ্ছে আমার শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে একটু একটু ক'রে চন্দ্রকলার মত। একটু একটু ক'রে আমার শারীরিক অনুভূতি লোপ পাচ্ছে। তারপর এমন অবস্থা হ'ল, আমাদের মধ্যে আর ব্যবধান নেই, শুধু একটা কাচের দেয়াল ছাড়া। এবং আমার শরীর নেই, শুধু একটা অনুভূতি ছাড়া। হয়তো আমার ছায়াটা দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু শরীর নেই, শরীরের স্মৃতিটা আছে। আমার সমস্ত সত্তা চক্ষুময় হয়ে উঠেছে, শুধু আমি দেখতে পাচ্ছি। আর আমার সামনে কোন জগৎ নেই। ঘ্রাণের নয়, স্পর্শের নয়, বোধের নয়।

কতক্ষণ লেগেছিল জানি না। ঘড়ি ধরে হয়তো দশ-পনের সেকেণ্ড, কিন্তু বলতে অনেকটাই সময় লেগে গেল। সময় অল্প হলেও যখন আমার এই ভয়ঙ্কর মূর্চ্ছা ভাঙল—হ্যাঁ, মূর্চ্ছা ছাড়া অন্য কিছু আজ আর মনে হয় না—দেখলুম সময়টা মাত্র কয়েকটা সেকেণ্ড হলেও অনুভূতি কাল খুব সামান্য নয়, যেন কয়েকটা বছরই আমি এই ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। তার

ফলে হাঁটতে গিয়ে বাঁ-পায়ে একটু কষ্ট পাচ্ছি। আয়নার সামনে আমার পূর্ব অনুমান সমর্থিত হ'ল, নিজেকেই নিজের কাছে এক ঠেকল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কপালে কয়েকটা বলি দিয়েছে।

দোকান বন্ধ ক'রে রাত্রে যখন বাড়ি ফিরলাম, নিজেকে কেমন কুটীল মনে হতে লাগল। সারাটা রাস্তা প্রায় উড়ে এসেছি, আম জোর যেন দশগুণ বেড়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে কাউকে আমার করবার নেই, আমার সামনে দাঁড়াবার স্পর্ধা আজ আর কারও নেই, যজ্ঞের দিগ্বিজয়ী ঘোড়ার মত আমি ছুটে চলেছি যেন। আমি যা দেখ যেন নতুন, এর আগে আমি এমন করে দেখি নি। কিন্তু বাড়িতে সঙ্গে সঙ্গে মনটা মাকড়সার জালের মত জটিল হয়ে উঠল।

বিমলা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল, যতক্ষণ আমি জা ছাড়ছিলাম। মুচকি হেসে তার দিকে ফিরে তাকাতেই সে থতমত তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। আমার ভারি আশ্চর্য লাগল ত অদ্ভুত ব্যবহার। খাবার সময়েও তার মুখখানা গম্ভীর মনে হ'ল, কথ বলছিল না। যন্ত্র চালিতের মত আমার সামনে বসে আমাকে পা করল, কিন্তু অন্য দিনের মত গল্প করল না, এটা খাও ওটা খাও বলল সবচেয়ে অবিশ্বাস্য লাগল আমাকে চশমা পরতে দেখে—বিশেষত এই ধরণের চশমা পরতে দেখে একটা প্রশ্ন পর্যন্ত করল না। কিন্তু কিছু তার হয়েছে তা বুঝতে পারলাম। আমার দৃষ্টিকে সে অত্যন্ত সতর্ক এড়িয়ে চলেছে বলে মনে হ'ল।

একটা মর্মান্তিক অমঙ্গলকে টেনে আনলাম আমার বাড়িতে। য কোন ঘটনা ঘটে নি আর, যদিও দিনের পর দিন একই আবর্তে ঘুরে চলে বৈচিত্র্যহীনভাবে, তবু কয়েক দিনের মধ্যেই স্পষ্ট বুঝলাম আমার জীব ছন্দ কেটে গেছে। আমার আর বিমলার মধ্যেকার স্বাভাবিকতা গেছে হয়ে। কোথায় যেন একটা গুরুতর ত্রুটি ঘটেছে ঠিক ধরতে পারছি ন তবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রবৃত্তি আমার হয় না, বাইরের চিন্তা-ভাব আমি ছেড়ে দিয়েছি। নিজের মনেই কাজ করে যাই, দোকানে আজকা লোকজনও দু'চারজন ক'রে হচ্ছে। টাকা পয়সাও আসতে শুরু করেছে এবং হয়তো সেই কারণেই আমার মনের সমস্ত অস্বাচ্ছন্দ্য দূর হয়েছে। যখ

আপন ... হয়ে থাকি। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত ... থাকেনা। বিমলাও আমার কথা খুব যে মনে ... হয় না। বেশির ভাগ সময় সে তার নিজের ঘরেই থাকে, ... আমার ... রাত হয় বলে কোন কোন রাত্তে তার ... না। ঠাকুর ... সমস্ত দেখাশোনা করে।

... বিমলার শোবার ঘরের মধ্যে একটা দরজা আছে সেটা ... কবে থেকে জানি বন্ধ হয়ে গেছে। টের পেলাম

... আমার জীবনের শনিরন্ধ্র। ঘুমিয়ে ছিলাম। অকথ্য চিৎকার ক'রে উঠে বসলাম। কে যেন সাঁড়াসি দিয়ে আমার ... ড়ে নেবার চেষ্টা করছিল। বেড স্যুইচ টিপতেই দুঃস্বপ্ন মিলিয়ে ... পড়ল বিমলা। কখন যে সে চোরের মত আমার শিয়রে এসে ...।

... জ্বালতেই তার মোমের মত পাণ্ডুর মুখ চোখে পড়ল, যেন দীর্ঘ-... শয্যা থেকে এইমাত্র উঠে এসেছে সে। সমস্ত শরীর থরথরিয়ে ... সে যে এমন শুকিয়ে গেছে, এতদিন আমার নজরে পড়ে নি. আজ ... তার মুখে যেন অন্ধকার একটা ছায়া পড়েছে।

... তাকে দু'হাত দিয়ে ধরে ফেললাম। সে আমার বুকের মধ্যে মুখ ... উঠল। মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, ... তোমার বলো তো?

... আয়ত চোখ দুটি তুলে সে আমার দিকে তাকাল। মনে হ'ল ... পরে সে আমার দিকে অমন অন্তরঙ্গ চোখে তাকাল, যেন সে ... য়েছে। কিন্তু কিছুই বলতে পারল না, কিংবা বলতে চাইল না।

... নরম গলায় শুধোলুম, তোমার কি হয়েছে আমায় সব খুলে বলো, ... আমি শুনব, তোমার সব কথা শুনব। কোন সঙ্কোচ করো না,

... ভরা চোখে বিমলা আবার আমার দিকে তাকাল, চোখের কোলে ... চিকচিক করছে। তার বুকের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করলাম ... মধ্যে। ঠোঁট দুটো ঈষৎ ফাঁক করা, নাকের দু'পাশ ফুলে ফুলে ... হাঁপাচ্ছে তখনও।

বললাম, বলো ?

সে কথা বলতে পারল না, শুধু বাঁ হাতখানা আমার ... ধরল।

আমি চমকে উঠে বললাম, এটা তোমার ... কে

বিমলা বলল, তোমার চোখ থেকে খুলে দিয়েছি, তুমি ... তাই।

—চশমা পরে ঘুমোচ্ছিলাম ! আমি অবাক হয়ে প্রায় ... প্রতিধ্বনি ক'রে উঠি। তারপর একটু রাগের ভঙ্গিতেই বলি বলো না, ওটা আমি খুলে রেখে শুয়েছি আমার স্পষ্ট মনে আছে।

—আসলে ? অধর দংশন ক'রে বিমলা প্রশ্ন করল।

—তুমি অসুস্থ। যাও এতরাত্রে আর পাগলামো ন... ক'রে ... হ্যাঁ যাবার সময় চশমাটা টেবিলের ওপরে রেখে যে... কিন্তু।

—কিন্তু তুমি তো রোজই—

—আঃ বিমলা। আমি ওকে মাঝপথেই থামিয়ে দেই।

চশমাটা সত্যিই আমার বড় আদরের। অথচ বিমলা ওটাকে ...খতে পারে না, মুখে না বললেও সেটা আমি টের পাই।

বিমলা আমার হাত ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে পাশের ঘরে চলে গে... ...ক্ষ্য করলাম, দুটি ঘরের মাঝের দরজাটা সে ব্যবহার করল না ...লো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম এবং শুয়ে পড়ে আমার ... ...ন্তা করতে করতে একটা কথা আমার হঠাৎ মনে পড়ল, বিমল... ...তো ভিত্তিহীন নয়। গতকালও ভোর বেলা ... ...বিছানায় চোখ পড়ায় আশ্চর্য হয়েছিলাম। কিন্তু তখন ভেবেছিলা... ক'রে রাত্রে চশমা খুলে শুই নি। তবে আজ রাত্রের কথা ... ...ঃ মনে আছে, আজ রাত্রে চোখে চশমা এল কি ক'রে ? কী এক... ...ৃ চশমাকে কেন্দ্র ক'রে জমে উঠেছে বুঝতে পারছি না।

সকাল বেলা ঠাকুর আর চাকরের মিলিত চিৎকারে আমার ঘুম ...ড়িয়ে বিছানা থেকে নেমেই বাইরে ছুটলাম কারণটা জানবার ...স্থানী চাকর আর ওড়িয়া ঠাকুর পরস্পর জড়াজড়ি ক'রে ... ক'রে কাঁপছে বারান্দার এক কোণে। আমি চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস ... হয়েছে তোদের ?

বুড়ো হয়েছে। চোখে খোয়াব দেখতে শুরু করেছে জানলে মনিব তাকে তাড়াবেন। এত বছর এ বাড়িতে কিছু দেখা গেল না, আর আজ কিনা—। পরিশেষে দুজনেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার অনুমতি চাইল। তাদের স্থির বিশ্বাস মা ঠাকরুণের এ দশা অপদেবতার কীর্তি। এবং বাবুও যদি এ বাড়ি—

ঠাকুর-চাকরের জবানবন্দী শুনে ভুলে-যাওয়া একটা কথা স্মরণ হ'ল। পাড়ার বিনায়কবাবু একদিন সকালে পথে দেখা হতেই জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বলে-ছি ,' আজকাল দুপুর রাত্রে ছাতে উঠে কি করেন মশাই? ঘুম ভেঙে গেলে জানলা দিয়ে আপনাকে দেখতে পাই।

আমি তার উত্তরে হেসে বলেছিলাম, আমার দোকানেই আসবেন, সস্তায় চশমা করে দেব। ভদ্রলোক মহা খাপ্পা হয়ে গেলেন।

ইন্সপেক্টর গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর ছাদ থেকে ঘুরে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মিঃ রায়, আপনাদের ছাদের লাগোয়া পাশের ছাদটি কাদের বাড়ির?

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, কেন বলুন তো? আপনি কি মনে করেন—

তিনি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বললেন, না, আমি ঠিক তা মনে করি না। এটা আত্মহত্যাই। তবে হত্যাই হোক আর আত্মহত্যাই হোক, সব কিছুরই একটা পটভূমি থাকে। এ ক্ষেত্রেও সেই 'মোটিভ-কী' তাই খুঁজে বের করতে হবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে চাবি আপনাদের ঘরে মিলবে না—

আমি বললাম, পাশের বাড়িটা বছর কয়েক ধরে খালি পড়ে আছে। যাঁদের বাড়ি, তাঁরা থাকেন মুর্শিদাবাদে। বাড়ি একজন মালী দেখাশোনা করে।

তিনি গম্ভীর মুখে সব নোট ক'রে নিলেন। তারপর ঘর তল্লাসী শুরু করলেন। কিছুই পাওয়া গেল না, বিমলার ঘর থেকে শুধু তার ডায়েরীখানা ছাড়া।

ইন্সপেক্টর আমার কাছে সেখানা দেখবার অনুমতি চাইলেন।

আমি বললাম, আপনি স্বচ্ছন্দে দেখতে পারেন। তবে একটা কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এই প্যারাসুটের দড়িটা বিমলা কোত্থেকে পেল! এটা ছিল আমার টেবিলের দেরাজে।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, খুবই সহজে পেয়েছিলেন। আপনার মস্তিষ্ক

এখন প্রকৃতিস্থ নেই বলে বুঝতে পারছেন না। হয়তো দড়িটা নেবার জন্যেই তিনি কাল রাতে আপনার ঘরে এসেছিলন।

আমি চুপ ক'রে গেলাম।

রহস্যটা আমার মনে দানা বেঁধে উঠেছিল, পুলিশ ইন্সপেক্টর আমাকে বিমলার ডায়েরীটা যাবার আগে ফেরত দিয়ে গিয়েছিলেন। ডায়েরীটা নিতান্তই মামুলী ধরণের। সংসারের টুকিটাকি খরচের হিসাব থেকে পুজোর ছুটিতে বেড়াতে যাবার পরিকল্পনা পর্যন্ত তাতে নোট করা আছে, কিন্তু তার নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন স্বাক্ষর নেই।

সাধারণত দেখা যায় মেয়েদের ডায়েরীতে মনস্তত্ত্বের কোন চিহ্নই থাকে না। নিজেদের মনের কথা লিখতে হয় তারা সঙ্কোচ বোধ করে নয়, একথাই প্রমাণ হয় যে মন বলে তাদের কোন পদার্থ নেই, কোন কালে ছিলও না। জলের মতই তারা পাত্র-নিরপেক্ষ, সব পরিবেশেই তারা মানিয়ে যায়। কিন্তু মন জিনিসটা আদপেই এমন মানিয়ে যাবার বস্তু নয়।

যাবার আগে ইন্সপেক্টর একটা কথা বলে গেছলেন, আর তাইতে আমার মনে রহস্যটা দানা বেঁধে উঠেছিল। ডায়েরীর সাদা পাতার ভেতর থেকে একটি পাতা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে তিনি আত্মপ্রত্যয়-ভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, কেমন বলেছি কি মিঃ রায়, যে রহস্যের চাবিটা পাওয়া যাবে বাইরে থেকে?

তাকিয়ে দেখলাম বিমলা একছত্র কথা লিখে রেখেছে: আবার সেই চোখ? কেমন ক'রে এখানেও আমার সন্ধান পেল আশ্চর্য!

নিচে তারিখ লেখা আছে পনেরই শ্রাবণ। অতীত জীবনে মেয়েদের একটা গল্প থাকে, এটি হয়তো তেমনি কোন দূরের ইঙ্গিত। কিন্তু কার দেখা সে এতদিন পরে আবার পেল?

বসে থেকে থেকে একের পর এক সিগারেট পুড়িয়ে চলেছিলাম। আর আমার মাথার মধ্যে অসংখ্য চিন্তা কিলবিলিয়ে বেড়াচ্ছিল। একটা জায়গায় এসে আমার সমস্ত মীমাংসা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল, সেটা আর কিছুই নয়, চোখ থেকে চশমাটা খুলে মুছতে গিয়ে থমকে গিয়েছিলাম আমি। আমার চশমার একটা পরকলা ফেটে গিয়েছে! চশমায় কোন আঘাত কখনও লেগেছে বলে আমার মনে পড়ে না, অথচ ফাটল কি ক'রে?

ভদ্রলোক চুপ ক'রে পাইপ টানতে লাগলেন। অন্ধকার ট্রেনটা জংশনে

প্রবেশ করছিল। শানটিং-লাইন থেকে রেলবগি সংঘর্ষের শব্দ ভেসে আসছিল কানে। গুড়ুম গুড়ুম গুম। আর নিয়ন-আলোর ধারালো এক একটা ঢেউ আমাদের কামরার ভেতরে প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে ফ্ল্যাশ লাইটের মত বিচিত্র গতিতে ছুটে যাচ্ছিল। ভদ্রলোকের মুখখানা চল্লিশ বছরের একটা পুরনো মুদ্রার মত রহস্যময়। চুলে পাক ধরেছে।

সোমনাথ অধৈর্য গলায় বলল, তারপর?

ভদ্রলোক ঠোঁট থেকে পাইপটা সরিয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, তারপর আর কি, পরেরটুকু বানিয়ে নিতে হবে।

শিবু দাঁত বার ক'রে বলল, নিজের জিনিস নিজে বানালেই কি ঠিক হ'ত না মশাই? একটু তাড়াতাড়ি করুন, স্টেশন এসে গেছে।

ভদ্রলোক বললেন, বেশ, কিন্তু যেখানে শেষ করব, সেখানেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। কোন প্রশ্ন করা চলবে না। গলার স্বর বেশ কঠিন মনে হ'ল ভদ্রলোকের।

আমরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

ভদ্রলোক আবার শুরু করলেন: বিমলার মৃত্যুর মাসখানেক পরে পার্ক স্ট্রিটে সুরজিতের বাড়িতে গেছি। বহুদিন তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই, বিমলার মৃত্যুর সংবাদও সে জানে না। আমিই জানাই নি।

আমাকে দেখেই সুরজিৎ শিউরে উঠল, এ চশমা তুই কোথায় পেলি?

আমি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এ চশমা তুই আগে কখনও দেখেছিস নাকি?

—দেখেছি মানে!—সুরজিৎ অধীর কণ্ঠে বলল, এ যে আমার বিশেষ পরিচিত এক ভদ্রলোকের চোখে দেখেছি।

আমি চাপা গলায় জানতে চাইলাম, কে সে?

আমাদের বাড়ির পেছন দিকে যে সাইকোঅ্যানালজিস্টের ক্লিনিক আছে, তার মালিক ডক্টর মিত্র।

আমি বললাম, তাঁর সঙ্গে এখন একবার দেখা হবে?

সুরজিৎ হতাশভাবে ঘাড় নাড়ল, না!

—কখন হতে পারে?

—তিনি মারা গেছেন, কাগজে পড়িস নি? তাঁকে খুন করা হয়েছে, অবিশ্যি,—সুরজিৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, মৃত্যু তার বহুকাল আগেই হওয়া

উচিত ছিল। কারণ সমাজের বুকে বসে চিকিৎসকের ছদ্মবেশ নিয়ে সে যে সমস্ত কুকার্য করেছে, মৃত্যুই তার একমাত্র শাস্তি।

আমি হাঁ ক'রে রয়েছি দেখে সুরজিৎ বলল, এই কলকাতার অনেক ধনী বনেদী পরিবারের ধ্বংসের মূলে সে. মানসিক চিকিৎসার জন্যে যারা একবার এসে পড়েছে—তার সম্মোহন থেকে রক্ষা পায় নি। পাইথন যেমন তার শিকারকে হিপনোটাইজ ক'রে মুখের কাছে টেনে আনে—তেমনই ডক্টর মিত্রের ছ'চোখের ক্ষুধা কাউকে রেহাই দেয় নি—যাক গে সে কথা, তো ব্যাপারটা খুলে বল আমাকে। তা

আমি বললাম, আচ্ছা ভদ্রলোক কি খুঁড়িয়ে হাঁটতেন?

—হ্যাঁ, বাঁ-পাটা একটু ছোট ছিল ভদ্রলোকের। কিন্তু তুই কি ন জানলি?

—আর একটা প্রশ্ন. তিনি মারা গেছেন কবে?

—যে রাত্রে তুই আমার বাড়ি থেকে অনেক রাত্রে ফিরে গেলি, সেই রাত্রেই তিনি—

—সেদিনের তারিখটা মনে আছে? আমি পাথরের মত ভারি গলায় জিজ্ঞাসা করলাম।

—পনেরই শ্রাবণ।

ট্রেন থেমে গিয়েছিল। ভদ্রলোক পরমুহূর্তেই নেমে গেলেন দরজা খুলে

শিবু চেঁচিয়ে উঠল, ক্রুট্!

